"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

শিল্প, কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।

প্রথম খণ্ড, ১৯১২।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীঅমৃত লাল সরকার, এফ, সি, এস।

কার্য্যালয়-

৫১নং শাঁখারীটোলা, কলিকাতা

৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

উদ্ভিদ কীট ও তাহার বিনাশের উপায়।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ হইলেও অন্যান্য দেশে উদ্ভিদের অপকারী নানাবিধ কীট নষ্ট করিবার যেরূপ বিভিন্ন প্রথা অবলম্বিত হয়, এখানে সেরূপ হয় না। তবে আজকাল ভারতীয় কৃষকও কীট নষ্ট করিবার উপায় অবলম্বন করিতেছে। কেননা ফলকর বৃক্ষ, মূল্যবান শস্য, শাক সব্জি, ইত্যাদি কীট হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে, শস্যের বা উৎপন্ন দ্রব্যের বহু অপচয় হইয়া থাকে। এই জন্য গভর্ণমেণ্টও এই সমস্ত নাশের উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য কৃষকের ক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারত গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। এদেশে যে সমস্ত দ্রব্যে কীট নষ্ট হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও রীতিমত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কৃষকগণ সেই সমস্ত পদার্থ ব্যবহারও করিতেছে। বাজারে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই সেই সমস্ত পদার্থ পাওয়া যাইয়া থাকে। অন্যান্য দেশে যে সমস্ত পদার্থ কীট নষ্ট করিবার জন্য বহুল প্রচলিত, এদেশে সেইগুলির ব্যবহারে কতকগুলি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে আরসিনিক বিষ প্রধান। এই বিষ শুয়া পোকা, পঙ্গপালের ন্যায় বড় বড় ফড়িঙ্গ, যে সমস্ত কীটে উদ্ভিদের পাতা নষ্ট করিয়া ফেলে সেই সমস্ত ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র কীট নাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সমস্ত প্রতিবন্ধকের জন্য ভারতীয় শস্যক্ষেত্রে এই বিষ ব্যবহৃত হইতে পায় না, তাহা বিদূরিত করিবার উপায় নাই। এই কীট নাশকের নাম লেড আরসিনিয়েট (lead arseniate)। ইহা আমেরিকায় বহুল প্রচলিত হইয়া থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও এই বিষের প্রয়োগ হইয়াছিল, এমন কি বর্ত্তমানে ভারতে এই বিষাক্ত পদার্থ প্রস্তুতও হইয়া থাকে, এবং সামান্য পরিমাণে কৃষকগণ ব্যবহারও করে। ইহার বহুল প্রচার না হইবার প্রধান কারণ এই যে, ইহা কেবল কীট নাশক নহে, পরন্তু মানব ও গৃহপালিত পশুও ইহা ভক্ষণে ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া পড়ে। কাজেই ইহা বহুল প্রচলিত হইলে গো মহিষও নষ্ট হইতে পারে। কেবল তাহাই নহে, ভারতের দারুণ রৌদ্রের উত্তাপে এই পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বিশ্লিষ্ট পদার্থ জলে দ্রবণীয়। কাজেই উদ্ভিদ সেই জল শোষণ করিলে উদ্ভিদের উপরেও বিষের প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। অধিকন্তু ইহা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, এবং সহজলভ্যও নহে, কেননা ভারতে কেবল মাত্র একটি স্থানে এই পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিচক্ষণতার সহিত ব্যবহার না করিলে, ইহা গো মহিষের প্রভূত অপকার করিয়া থাকে। আমাদের দেশে শস্যক্ষেত্রে বেড়া দেওয়া থাকে না বলিয়া, গো, মহিষ, ছাগলাদি

অনায়াসে শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্যের সহিত বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে।

লেড আরসিনিয়েটের সমতুল্য অন্য দ্বিতীয় কীট নাশক ঔষধ আর নাই। কিন্তু ভারতে ইহার প্রতিবন্ধক লক্ষ্য করিয়া, পুসা কলেজে গভর্ণমেণ্ট ইহার সমতুল্য অন্য ঔষধ আবিষ্কার করিবার জন্য, কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য এখনও বিশিষ্ট-ফল-দায়ক ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, তবে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফল অত্যন্ত আশাপ্রদ। এই সমস্ত বিষে এই কয়টি বিষয়ের উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহা জলে অদ্রবণীয়, বৃষ্টির জলে বৃক্ষ পত্র হইতে ধৌত হইতে না পারে, সুলভ, এবং বৃক্ষপত্রে অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় থাকিতে পারে, অর্থাৎ কোন কারণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বৃক্ষের অপকারী হইয়া না পড়ে।

আইডোফরম বৃক্ষপত্রে ছড়াইয়া দিলে কীট নষ্ট হইতে পারে বটে কিন্তু পত্র হইতে অতি শীঘ্র ধৌত হইয়া যায়। ম্যাগনেশিয়াম কারবনেটে কীটসমূহ তত ধ্বংশ হয় না। কপার সালফাইডে অন্যান্য সমস্ত গুণ রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা কীট নষ্ট করিতে পারে না, বিতাড়িত করিতে পারে।

অবশেষে লেড ক্রোমেট নামক ঔষধ প্রয়োগেই বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা কীটের পক্ষে অত্যন্ত বিষাক্ত। এমন কি এই ঔষধ সাধারণ মাঠে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতেও বিশেষ ফল পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহা হরিদ্রা বর্ণের বলিয়া ইহা বৃক্ষ পত্রে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কি না বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ, ইহা জলে অদ্রবণীয়, জলে দ্রবীভূত হইলেও আরসিনিকের ন্যায় বৃক্ষের হানিকর নহে। উত্তাপে বা অন্য কারণে বৃক্ষ পত্রের উপরেই বিশ্লিষ্ট হয় না। জল-প্রয়োগে বৃক্ষ পত্র হইতে সহজে ধৌত হইয়া পড়ে না। এমন কি ছড়াইয়া দিয়া দুই একদিন পরে রীতিমত জল দিতে আরম্ভ করিলে অথবা অত্যন্ত বর্ষা হইলেও সম্পূর্ণ ধৌত হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে। কিন্তু শুয়া পোকা ইত্যাদি কীট নষ্ট করিতে হইলে আরও তীব্রতর বীষের প্রয়োজন। পারিস গ্রীন (Paris Green) নামক এক প্রকার ঔষধ এই সমস্ত কীটের অত্যন্ত বিষ। ৩২ গ্যালন জলে এক পাউণ্ড লেড ক্রমেট গুড়া ঢালিয়া সেই জল বৃক্ষপত্রে ছড়াইয়া দিলে, সেই জলের সহিত যে গুড়া থাকিবে, তাহাই কীট নষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট। সেইরূপ এক পাউণ্ড পারিস গ্রীনে ২০০ গ্যালন জলের প্রয়োজন হয়।

পোটাসিয়াম বাইক্রমেটের দ্রাবণে লেড নাইট্রেট দ্রাবণ নিক্ষিপ্ত হইলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের লেড ক্রমেট অধঃস্থ হইয়া থাকে। প্রথমে কেরোসিন টিনের একটিন জলে ২ আউন্স লেড নাইট্রেট দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে এক আউন্স পোটাশিয়ম বাইক্রোমেট ঢালিয়া দিলেই এক টিন জল (প্রায় ৪ গ্যালন) বৃক্ষে দিবার উপযোগী

হয়। এই জল স্প্রেইং মেশিনের (spraying machine) দ্বারা বৃক্ষে প্রয়োগ করা উচিত। উক্ত মেশিনের মূল্য অধিক নহে, এবং ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যয়ও সামান্য। ভারতের শস্যক্ষেত্রে এই সমস্ত ঔষধের প্রয়োজন হইলেও কৃষকগণ সাধারণতঃ ঔষধ প্রয়োগ করে না। অনভিজ্ঞতাই সম্ভবতঃ তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু অনেকেই শাক সবজী বা ফুলের বাগানে এই সমস্ত কীট নষ্ট করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা অনায়াসে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারেন। যে কোন ঔষধের দোকানে লেডনাইট্রেট ও পোটাসিয়াম বাইক্রমেট পাওয়া যায়। গাছে জল দিবার পিচকারী দ্বারা এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অ[illegible]
গাছগুলি পোকার অত্যাচারে বিনষ্ট [illegible]
কীট নষ্ট করিতে পারেন।

(M[illegible]

খাদ্য-গ্রহণ-প্রথানুসারে দুই প্রকার উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমশ্রেণীর উদ্ভিদ সাধারণতঃ মৃত্তিকা, বায়ুমণ্ডল ও জল হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া স্বয়ং পরিপাক করে; আম, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি যাবতীয় সহজ-বোধ্য উদ্ভিদ মাত্রেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর উদ্ভিদ স্বয়ং সম্পূর্ণ অপক্ক খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না. অন্য বৃক্ষের স্কন্ধে বর্দ্ধিত হইয়া তাহারই ভুক্ত খাদ্যে পুষ্টিলাভ করে। এই সমস্ত বৃক্ষকে সাধারণ ভাষায় পর-গাছা (parasite) বলে। এতদ্ভিন্ন অন্য এক প্রকার উদ্ভিদ রহিয়াছে, তাহারা স্বয়ং অপক্ক খাদ্য গ্রহণ করিয়া স্বয়ং পরিপাক করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন মৃত বা গলিত জন্তু বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থে উপ্ত বা পরিবর্দ্ধিত হয় না। ইংরাজিতে ইহাকে স্যাপ্রোফাইট (saprophyte) বলে। ব্যাঙ্গের ছাতি (a kind of mushroom) শেষোক্ত জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ। ইহার বর্ণ সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় সবুজ নহে, ইহার শাখা, প্রশাখা বা কন্দ নাই। সাধারণ জ্ঞানের উদ্ভিদের সহিত ইহার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। কিন্তু ইহার বৃদ্ধি-প্রণালী, ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এই জাতীয় সমস্ত উদ্ভিদের নাম Fungus।

প্রথম বর্ষার কিছুদিন পরেই যখন বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণ জলকণাসিক্ত থাকে তখন প্রান্তরে, প্রাঙ্গনে, জঞ্জাল স্তূপে, পচা খড়ের গাদায়, জঙ্গলে, বৃক্ষের গাত্রে রাশি রাশি বিভিন্ন জাতীয় fungus উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে স্থানে গলিত উদ্ভিদের বা গলিত জান্তব

পদার্থের প্রাচুর্য্য সেই স্থানেই রাশি রাশি fungi। তাহাদের বর্ণ-বৈচিত্র, ঔজ্জ্বল্য, কোমলতা, বাস্তবিকই অত্যন্ত নয়নাকর্ষক।

এই সমস্ত fungi দুই প্রকার,—কতকগুলি মানুষের খাদ্য উপযোগী, কতকগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত। নিরাপদ ও খাদ্যোপযোগী fungi র সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিকই রসনার তৃপ্তিকর। ইহাদের মধ্যে পোল ছাতিই (edible mushroom—Agaricus campestris, Linn) প্রধান। এই ছাতির বর্ণনার পূর্ব্বে ইহা কোন শ্রেণীর fungi র অন্তর্গত, সেই সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে অন্য fungi হইতে অথবা বিষাক্ত বা বিস্বাদ ছাতি হইতে পৃথক করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত ছাতি Agaricaceæ নামক fungi র অন্তর্ভুক্ত। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পাতলা, চ্যাপ্টা, ছুরির ফলার ন্যায় ইহার কতকগুলি দৈহিক উপাদান রহিয়াছে। এইগুলি দেখিতে দীর্ঘ ও অতি অল্প-প্রস্থ পরদার ন্যায়, ইংরাজিতে ইহাকে গিল (gills) বলে। ব্যাঙ্গের ছাতি কখনও দেখেন নাই, এরূপ বাঙ্গালী অতি অল্প। বর্ণনীয় ছাতিতে অতি ক্ষুদ্র, স্থুল কাণ্ডের উপরে একটি টুপির ন্যায় আবরণ থাকে। তাহারই নিম্নদেশে গিল সমূহ বর্ত্তমান এবং দেখিতে বাস্তবিকই একটি ক্ষুদ্র ছত্রের ন্যায়। সেই জন্য, ভেক বর্ষার সময়ে ইহার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও, লোকে ইহার ক্ষুদ্রতার জন্য ইহাকে বেঙ্গের ছাতি বলিয়া থাকে। এই স্থূল ক্ষুদ্র কাণ্ড টুপির ঠিক মধ্যস্থলে সংলগ্ন, এবং কাণ্ডের সংযোগস্থল হইতে টুপির নিম্নগাত্রে সংলগ্ন হইয়া গিলগুলি টুপির প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আবার কতকগুলি কাণ্ড কেবল টুপির পার্শ্বে সংলগ্ন থাকে, এবং গিলগুলিও সেইস্থান হইতে বিস্তৃত হয়। সমস্ত গিলগুলিই টুপীর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ্ডে মিলিত হয় অথবা মধ্য পথেই বিভিন্ন হইয়া পড়ে।

যদি ধীরতার সহিত গলিত উদ্ভিদ্ স্তূপ ও মৃত্তিকা হইতে যে কোন একটি ছাতি উত্তোলন করা যায়, তাহা হইলে শুভ্র সূত্রবৎ কতকগুলি পদার্থ বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের কতকগুলি সূক্ষ্ম; এবং কতকগুলি অত্যন্ত স্থুল, জমাট ও গ্রন্থি বিশিষ্ট জালের আকারে মৃত্তিকা বা উদ্ভিদ স্তূপ পরিবেষ্টন করিয়া থাকে; এবং দেখিতে অনেকটা স্থূল মাকড়সার জালের ন্যায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানানুসারে ইহার নাম ম্যাইসিলাম (mycelium) এবং ইংরাজ কৃষকগণ ইহাকে স্পন (spawn) বলিয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ এইগুলিকে শিকড় নামে অভিহিত করিলেও, বস্তুতঃ শিকড় হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। এই শিকড়গুলিই গলিত পদার্থ হইতে জল ও খাদ্য শোষণ করে, আর যে অংশকে আমরা ছাতি বলি, তাহা বাস্তবিকই fungus এর ফল। শিকড়গুলি জল পাইলেই অথবা মৃত্তিকা ও গলিত স্তূপ ক্রমাগত আর্দ্র থাকিলেই অতি ত্বরিত গতিতে বৃদ্ধি পায়, এবং শিকড়ের কোন কোন স্থান হইতে নূতন নূতন ছাতি উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত উদ্ভিদের জীবনী-

শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকে, এবং মৃত্তিকা উপযুক্তরূপে আর্দ্র হইলেই শিকড় বৃদ্ধি পাইয়া ছাতি উৎপন্ন করে। কাজেই বর্ষার প্রারম্ভে জলের প্রাচুর্য্য হইলেই এই গুলি ত্বরিত বৃদ্ধি পায়। শিকড়ের স্থানে স্থানে বর্ত্তুলাকার স্থূলতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কোন কোনটি এক একটি আলপিনের মাথার ন্যায় সূক্ষ্ম, আবার কোন কোনটি আখরোটের ন্যায় বৃহৎ। এইগুলি ক্রমাগত স্ফীত হইয়া ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া মৃত্তিকার উপর বাহির হইয়া পড়ে। তখন অনেকটা গোল বোতামের ন্যায় দেখায়। এইগুলিই অপরিণত ছাতি। এই বোতামের উপরিভাগে একটা পাতলা আবরণ দেওয়া থাকে। সময় ক্রমে সেই আবরণ ফাটিয়া যায় এবং ছাতির শৈশব অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সময়ে সময়ে এই আবরণের চিহ্ন কাণ্ডের তলদেশে একটা বাটির আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই এই আবরণ একবারে নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত গিলের (gills) উপরেও অপরিণত অবস্থায় একটা আবরণ দেওয়া থাকে। অনেকেই ফার্ণ (fern) দেখিয়াছেন। স্যাঁতা ও আওতায় এই উদ্ভিদগুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই উদ্ভিদের পরিণত পত্রের নিম্নভাগে কতকগুলি বাদামী বর্ণের বর্ত্তুলাকার চূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এইগুলির ইংরাজি নাম স্পোর (spore)। এই স্পোর মৃত্তিকায় পতিত হইয়া নূতন ফার্ণ উৎপাদন করে। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ মাত্রেই এইরূপ স্পোর হইতে উৎপন্ন হয়। Fungi রও স্পোর হইয়া থাকে। এই স্পোর পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই ছাতির গিলের আবরণটি ছিন্ন হইয়া যায়। এই আবরণ চিহ্ন ছাতির কাণ্ডে প্রায়ই গোলভাবে লাগিয়া থাকে। কিন্তু কোন কোনটিতে এরূপভাবে এই আবরণ ধ্বংশ হইয়া যায় যে আবরণের কোন চিহ্নই থাকে না। প্রথমাবস্থায় মৃত্তিকার ভিতরে ছাতির বৃদ্ধি অতি অল্প অল্প হইতে থাকে। কিন্তু যখন শিকড়ের গ্রন্থিটি বেশ পরিণত হয়, তখন ধীরে ধীরে "বোতাম"টি মৃত্তিকার উপরিভাগে বাহির হইয়া পড়ে। তখনও বৃদ্ধির পরিমাণ অতি অল্প থাকে। কিন্তু গুমট সন্ধ্যা বা রাত্রিতে ইহার বৃদ্ধি এত শীঘ্র হইতে থাকে, যে এক রাত্রি প্রভাত হইলেই পূর্ণাকার ছাতি দেখিতে পাওয়া যায়। শিকড়ের গ্রন্থি স্ফীত হইবার প্রারম্ভ হইতে ছাতি পূর্ণাকার হওয়া পর্য্যন্ত প্রায় এক সপ্তাহ লাগে। অবশ্য উত্তাপ ও বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের তারতম্যের অনুপাতে এই সময় পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যখন ছাতি পরিণত হয়, তখন গিলের উপরিভাগ স্পোর সমূহে আবৃত হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্পোরগুলি উচ্চ শ্রেণীর বৃক্ষের ফল স্বরূপ। যদি একটি পরিণত ছাতির টুপি কাণ্ড হইতে কাটিয়া লইয়া একখানি শুভ্র কাগজের উপর রাখা হয়, তাহা হইলে প্রায় একঘণ্টা পরে টুপীটি ধীরে ধীরে উঠাইয়া লইলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক গিলের নিম্নে ধূলি কণার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ দ্বারা কতকগুলি রেখা পাত হইয়াছে, এই ধূলিকণার ন্যায় পদার্থগুলিই স্পোর। সে গুলি গিলের পার্শ্ব হইতে

স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্পোর হইতেই নূতন নূতন ছাতি উৎপন্ন হয়। বর্ষায় ছাতির খাদ্যোপযোগী স্থানে স্পোর নিপতিত হইলেই, স্পোর উপ্ত হয়, এবং সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শিকড় বা mycelium প্রস্তুত হয়। ইহাতেই ছাতির অঙ্কুর নিহিত থাকে। প্রত্যেক স্পোর এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ দৃষ্টিতে নয়ন গোচর হয় না, কতকগুলি একত্র হইলে তবে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন ছাতিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্পোর উৎপন্ন হয়।

অতঃপর খাদ্যোপযোগী ছাতি কিরূপ তাহাই দেখা যাউক। এই ছাতির টুপিগুলি নিম্নাভিমুখে চ্যাপ্টা হইয়া থাকে, অথবা একবারে চ্যাপ্টা না ও হইতে পারে। সময়ে সময়ে একটু বক্রও হয়। "বোতাম" অবস্থায় টুপিটি অর্দ্ধ গোলকবৎ থাকে; ইহার বর্ণ বিশুদ্ধ শুভ্র বা প্রায় শুভ্র। ইহার উপরিভাগ প্রায়ই রেশমের ন্যায় চিক্কন। টুপির উপরিস্থিত আবরণ অনায়াসে খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। সময়ে সময়ে এই আবরণ টুপির প্রান্ত পার হইয়া ভিতরের দিকে অর্থাৎ গিলের প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। টুপির মধ্যভাগ অত্যন্ত স্থুল এবং প্রান্ত অভিমুখে ক্রমশঃ পাতলা। গিলগুলি কাণ্ডে আদৌ সংলগ্ন থাকেনা। গিলগুলি অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট এবং ইহার বর্ণ শৈশবাস্থায় সামান্য লাল, ক্রমে মাংস বর্ণে, ও বাদামী বর্ণে, অবশেষে গাঢ় বাদামী বর্ণে পরিণত হয়। এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ এই যে এই সময়ে অতি ত্বরিত গতিতে স্পোর উৎপাদিত হইতে থাকে। এই স্পোরগুলি রক্তাভ বাদামী বর্ণ। যখন স্পোরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প তখন গিলগুলি লাল দেখায়, কিন্তু স্পোরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গিলের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, অবশেষে গিলগুলির বর্ণ গাঢ় হইয়া উঠে। টুপিগুলি সাধারণতঃ ২ হইতে ৫ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট। কাণ্ডগুলির দৈর্ঘ্য ২ হইতে ৪ ইঞ্চ, কিন্তু স্থুলতার পরিমাণ নানারূপ হইয়া থাকে। কতকগুলির স্থুলতা সাধারণতঃ $\frac{২}{৩}$ হইতে $\frac{১}{২}$ ইঃ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইউরোপের কোন কোন প্রদেশের আবাদী ছাতির কাণ্ডের স্থুলতার পরিমাণ প্রায় ১ ইঞ্চি। কাণ্ড শূণ্যগর্ভ নহে, পূর্ণ; অবশ্য দৃঢ় নহে, কোমল। সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিলে দেখা যায় যে কাণ্ডের বাহিরের দিক কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় তন্তু পূর্ণ, এবং ভিতরের দিক কোমল জমাট তন্তু পূর্ণ। কাণ্ডের মধ্যাংশের উপরিভাগে চক্রাকার একটা পরিবেষ্টন থাকে।

বর্ণ ও স্থুলতায় আবাদী ও স্বতঃ উৎপন্ন ছাতী নানারূপ হইয়া থাকে। উপরিভাগ প্রায়ই অবন্ধুর ও প্রায় শুভ্র, কিন্তু সময়ে সময়ে খরস্পর্শ ও কর্কশ হইয়া থাকে। পরিণত অবস্থায় উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ বাদামী, এবং মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া লইলে ২।৩ ঘণ্টায় মধ্যে বর্ণ গাঢ়তর হইয়া পড়ে। খাদ্যের জন্য ছাতিগুলি প্রায়ই ২।৩ ইঞ্চ উচ্চ, ২।৩ ইঞ্চ ব্যাসবিশিষ্ট ও $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চ স্থুল হইয়া থাকে। অবশ্য উর্ব্বরা ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাও বৃহদায়তনের খাদ্য উপযোগী ছাতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ছাতি বিষাক্ত বা অখাদ্য না হইলেও ছোট ছাতির ন্যায় সুস্বাদু ও সহজ পাচ্য নহে। যে সময়ে "বোতামের"

আবরণ বিদীর্ণ হইয়া গিল গুলি বাহির হইয়া পড়ে, সেই সময়েই ছাতিগুলির আস্বাদ অতিশয় তৃপ্তিকর। টাটকা ছাতির অরন্ধনাবস্থায় প্রায়ই কোন গন্ধ থাকে না। যদি গন্ধ পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা দুর্গন্ধ নহে।

খাদ্যোপযোগী ছাতি প্রায়ই ছিন্ন তৃণাচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে, গোচর মাঠে, বিশেষতঃ খড়, কুটি ও বিচালীর গাদায় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই এই সমস্ত ছাতিকে সাধারণ ভাষায় প্রধানতঃ পোল (পচা খড়, কটী ও বিচালি) ছাতি বলে। ইহা বনে বা জঙ্গলে কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না; কিম্বা কর্ত্তিত বৃক্ষের কাণ্ডে বা মূলেও উৎপন্ন হয় না।

অতি প্রভাতেই ছাতি সংগ্রহ করা ভাল। আবার নানাবিধ কীট এই খাদ্যকে আক্রমণ করিতে পারে বলিয়া, ছাতি সংগ্রহ করিয়াই রন্ধন করা ভাল, এবং রন্ধনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই খাওয়া উচিত। এগুলিকে উপড়াইয়া লওয়া উচিত নহে, মৃত্তিকা হইতে অল্প দূরে কাটিয়া লওয়া ভাল, যেন কোনরূপ ময়লা বা মাটী লাগিয়া না থাকে। অতঃপর ছাতিগুলিকে উল্টাইয়া, কাণ্ড উপরের দিকে রাখিয়া দিতে হয়; এবং অনেক ছাতি এক কালে সংগ্রহ করিতে হইলে, ঝুড়ির মধ্যে এক একটা থাক থাকা উচিত; নতুবা নিম্নস্থিত ছাতিগুলি উপরের ছাতির ভারে একবারে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি দেখা যায় যে, ছাতিতে কীট বাসা করিয়াছে, অথবা কীট ডিম্ব প্রসব করিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে সেই গুলিকে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া উচিত। টুপীর নিকটে কাণ্ডটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ছাতিতে পোকা বাসা করিয়াছে কি না। যদি সন্দেহও হয় যে, পোকা বাসা করিয়াছে, তাহা হইলেও সে ছাতি ফেলিয়া দেওয়া ভাল।

প্রধানতঃ খাদ্যোপযোগী ছাতির এইগুলিই বিশেষত্ব। যথা—

(১) ইহা উন্মুক্ত, ছিন্ন তৃণাবৃত প্রান্তরে, খড় ও কুটির গাদায় প্রচুর উৎপন্ন হয়।

(২) ইহার আয়তন অনতিদীর্ঘ (টুপীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ২ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা)।

(৩) গিল গুলি কাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং প্রথমাবস্থায় ঈষৎ রক্তাভ।

(৪) স্পোরগুলি গাঢ় লাল, অথবা গাঢ় বাদামী।

(৫) কাণ্ড শূন্য-গর্ভ নহে, স্থূল; এবং মধ্য পথের উপরিভাগে চক্রাকারে একটা পর্দ্দা লাগিয়া থাকে।

এই বিশেষত্বগুলি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে; ইহার কোনটিও বর্ত্তমান না থাকিলে হয়ত ছাতি খাদ্যোপযোগী নাও হইতে পারে। অবশ্য অন্যান্য নানাপ্রকার খাদ্যোপযোগী ছাতি রহিয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলির সংখ্যা তত অধিকও নহে, ও তত সহজে উৎপন্নও হয় না। নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষত্ব দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ছাতি খাদ্যোপযোগী নহে:—

(১) যে সমস্ত ছাতির কাণ্ডের মূলে কোনরূপ টুপী বা টুপীর সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত।

(২) যে সমস্ত ছাতির গন্ধ মধুর নহে, কিম্বা খাদ্যোপযোগী গন্ধ নহে, অথবা কোমল নহে, সেগুলিও অখাদ্য।

(৩) যে সমস্ত ছাতি হইতে দুধের ন্যায় রস নির্গত হয়, সেগুলির অধিকাংশই অখাদ্য। খাদ্যোপযোগী কোন কোন ছাতি হইতে শুভ্র রস নির্গত হয় বটে, কিন্তু কোন্‌গুলি খাদ্যোপযোগী তাহা রীতিমত জানিয়া না লইয়া খাওয়া উচিত নহে।

(৪) যে সমস্ত ছাতি সহজ-ভঙ্গুর, এবং যাহার গিলগুলি সকলই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান, টুপী অত্যন্ত পাতলা, এবং টুপীর বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল, সেগুলিও অখাদ্য।

(৫) যে সমস্ত ছাতির "বোতাম" মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাকে, সে সমস্ত ছাতিও অখাদ্য।

(৬) কীট দষ্ট, অতি পক্ক, গলিত বা প্রায় গলিত-অবস্থা-প্রাপ্ত খাদ্যোপযোগী ছাতিও অখাদ্য।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়েই ছাতি রন্ধন করা হয়। প্রথমতঃ উপরের আবরণ উন্মোচিত করিয়া ও কাণ্ডটি বাদ দিয়া কড়ায় মাখন চাপাইয়া ও তাহার উপর টুপীগুলি ফেলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে মৃদু উত্তাপে সিদ্ধ করিতে হয়। মাখন গলিয়া যাইলে পাতি লেবুর অম্ল রস ঢালিয়া দিতে হয়। বেশ ভাজা হইবার পূর্ব্বেই লবণ, লঙ্কা ও অন্যান্য মসলার চূর্ণ ঢালিয়া দিতে হয়। অর্দ্ধঘণ্টা আন্দাজ অল্পে অল্পে ফুটিবার পর ডিম্বের হরিদ্রা অংশ ঢালিয়া দিতে হয়; এবং ডিম্বের সহিত মিশ্রিত হইয়া গেলেই, কড়া নামাইয়া লইতে হয়। পল্লী অঞ্চলে সাধারণতঃ কেবল সরিসার তৈলেই ছাতি ভাজিয়া লওয়া হয়, তাহাতেও ইহার আস্বাদ অতি মধুর হইয়া থাকে।

ছাতির রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায়ঃ—

জলীয় অংশ	৯১·৩০	৯১·৯৮
প্রোটিন (Protein.)	২·২৫	২·৬৯
নাইট্রোজেন (Total nitrogen).	০·৬০	০·৬৭
আলবুমিনইড নাইট্রোজেন (Albuminoid nitrogen).	০·৩৬	০·৪৩
আলবুমিন শূন্য নাইট্রোজেন (non-albuminoid nitrogen)	০·২৪	০·২৪
মাখন জাতীয় অংশ (fat)	০·২০	০·১৭
শর্করা জাতীয় অংশ (Carbohydrates)	৪·৯৫	৩·২৩
Ash	০·৫০	১·৩২
Fibre	০·৮০	০·৬১

এই বিশ্লেষণ দৃষ্টে রসায়নবিৎ চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, ছাতি পুষ্টিকর উচ্চশ্রেণীর খাদ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বাম অংশের বিশ্লেষণ তালিকা U. S. Dept. of Agriculture, Farmer's Bulletin No 79 হইতে গৃহীত হইয়াছে, এবং দক্ষিণাংশের লিখিত বিশ্লেষণ পুসা কলেজে Mr. H. E. Annett এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ছাতিতে জলীয় অংশ অত্যন্ত অধিক, কাজেই ইহাতে রসনার তৃপ্তি ভিন্ন শারীরিক পুষ্টি অতি সামান্যই হইয়া থাকে।

ফরাসি দেশে ছাতির অতি বিস্তৃত আবাদ হয়। পারিসের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর গহ্বর বহুদূর বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, এমন কি এই সমস্ত গহ্বরের গভীরতা স্থানে স্থানে অল্পও নহে। এই সমস্ত গহ্বরে অশ্বশালার খড় কুটা ও অন্যান্য উপযুক্ত সার ছড়াইয়া দিয়া কৃষকগণ ছাতির শিকড় (mycelium or spawn) বপন করে। বায়ুমণ্ডল সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প পূর্ণ করিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয়, বায়ু কণা চলাচলের পথও অবারিত থাকে, এবং প্রচুর ছাতি উৎপন্ন হয়। এক বর্গ গজ ক্ষেত্রে তিন সের ছাতি উৎপন্ন হইলেই সাধারণতঃ প্রচুর বলিয়া মনে হয়। প্রায় ১,২৫,০০০ মন ছাতি পারিসের বাজারে বৎসর বৎসর বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহার এক তৃতীয় অংশ টাটকা অবস্থাতেই খাওয়া হয়। এবং অবশিষ্ট অংশ টিনে করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত করা থাকে। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ফরাসী দেশের বাজারে ছাতির কিরূপ আদর। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই খাদ্যোপযোগী ছাতি দেখিতে পাওয়া যায়। "ভারতের মধ্যে পাঞ্জাব প্রদেশে এই ছাতি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবীগণ টাটকা ও শুষ্ক দুই অবস্থাতেই প্রচুর ছাতি খাইয়া থাকে। আফগানিস্থানে বস্তুতঃ এই জাতীয় উদ্ভিদ অতি সাধারণ।" (Dr. Watts Dictionary of Economic Products of India. Fungi, P. 131)। Dr. Stevsart বলেন যে বর্ষার পর মধ্যপাঞ্জাব, দক্ষিণ পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবের অন্তর্গত মরুভূমি প্রদেশে এই ছাতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। দেশীয়গণ প্রচুর খাইয়া থাকে; এবং যে সমস্ত ইংরাজগণ ইউরোপের উৎপন্ন ছাতি খাইয়াছেন তাহারাও বলিয়া থাকেন যে, সেই সমস্ত ছাতির সহিত দেশীয় ছাতি সম্পূর্ণ সমতুল্য। ভবিষ্যত আহারের জন্য ইহাকে শুষ্ক করিয়া রাখা হইলেও দেশীয়গণ বলেন যে শুষ্ক অবস্থাতেও ইহার সুগন্ধ তত নষ্ট হইয়া যায় না। চাটনী প্রস্তুতের জন্য ইউরোপে ছাতি বহুল উৎপাদিত হইয়া থাকে। যদি চাষের সাহায্যে পাঞ্জাবী ছাতিগুলি উন্নত করা হয়, তাহা হইলে ইহা একটি ব্যবসায়ের উপাদান হইতে পারে। বাজারে রীতিমত আমদানী করা হইলে ভারতের প্রায় সকল প্রধান নগরেই ছাতি বিক্রীত হইতে পারে।

পাট ও ধান।

অনেক অভিজ্ঞের মুখে শুনা যায় যে পাটের চাষের জন্যই ধানের চাষের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অনেক কৃষক পাট চাষের পরে সেই ক্ষেত্রেই ধানের আবাদ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ দেখা যাউক, কোন্ কোন্ জমীতে প্রধানতঃ পাট চাষ হয়, এবং সেই জমীতে ধান চাষের বা উৎপন্ন ধানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির কিরূপ সম্ভাবনা। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ চারি প্রকার জমীতে পাট চাষ হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার :—এই সমস্ত জমী মাঠের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমি, এবং বর্ষার জল প্রায়ই ইহাতে সঞ্চিত থাকে না। পাটের ব্যবসায় বর্ত্তমানকালে যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এইরূপ হইবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ কেবল এইরূপ উচ্চ ভূমিতেই পাটের আবাদ হইত। এই সমস্ত জমীতে প্রধানতঃ দুই প্রকার ফসল হইয়া থাকে :—প্রথম পাট অথবা আউস ধান, দ্বিতীয় রবি শস্য। প্রথম ফসল বর্ষায় এবং দ্বিতীয় শীতকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সমস্ত জমীতে আউস ধানই অধিক হইত। কাজেই এই সমস্ত জমীর উৎপন্ন আউস ধান আজ কাল আর পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রকার : এই সমস্ত জমী প্রথমোক্ত জমী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নভূমি, কাজেই বর্ষায় জল সঞ্চিত হইতে পারে; ইহাতে পাট চাষ শেষ হইয়া যাইলে, আমন ধানের চারা রোপণ করা যাইতে পারে। বর্ষা সুপ্রচলিত হইলে এই সমস্ত জমীতে আউস কিম্বা পাট দুইটির কোনটি রীতিমত উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু এখন কৃষকেরা আউসের দিকে আদৌ লক্ষ্য করে না, ফলে পাটের চাষই হইয়া থাকে, ধান চাষের বিস্তর ক্ষতি হয়। শুধু তাহাই নহে, নানা কারণে আমন ধানও আদৌ রোপণ করা হয় না। কেননা কৃষকেরা এই সমস্ত জমীতে অতঃপর রবিশস্য উৎপাদন করাই অধিকতর লাভ জনক মনে করিয়া থাকে। অতএব এই সমস্ত জমীতে পূর্ব্বে আউস ও আমন দুই প্রকার ধানই হইত, বর্ত্তমানে পাট ও রবিশস্য, ধানের জমী অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পাটের জমীতে চারা ধান রোপণ করিলেও, পাট চাষের জন্য জমী এত অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে, যে উৎপন্ন ধান আদৌ আবাদের উপযুক্ত গণ্য হয় না।

তৃতীয় প্রকার :— এই সমস্ত জমী সাধারণতঃ বিল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না বৎসরের মধ্যে ৬ মাস এই সমস্ত জমী জলে ডুবিয়া থাকে। এইরূপ জমীতে পাটের চাষ তত সুবিধা জনক হয় না। মেটে ধান প্রচুর উৎপন্ন হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষক মেটে ধানের বীজ এই সমস্ত জমীতে ছড়াইয়া দিয়া আইসে। মাঠ যতই জলে ডুবিতে থাকে, ধান গাছও ততই বৃদ্ধি পায়। পৌষ মাসে এই ধান কাটা

হয়। ধান কাটা ও পুনরায় ধান বোনার মধ্যে এত অল্প সময়ের ব্যবধান, যে অন্য কোনরূপ ফসল এই জমীতে উৎপন্ন হইতে পায় না। বিলের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষেত্রগুলি বর্ষার প্রারম্ভেই জলে ডুবিয়া যায় না, কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে মেটে ধানের সহিত আউসের চাষও হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময়ে আউস ধানগুলি কাটিয়া লওয়া হয় এবং মেটে ধান পৌষ মাস পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থলেই আউসের পরিবর্ত্তে পাট বোনা আরম্ভ হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে অধিকাংশ স্থলে বিলের প্রান্তবর্ত্তী এই সমস্ত জমীতেই মেটে কিম্বা আউস কোন ধানই বোনা বা রোপণ করা হয় না, কেবল পাটই হইয়া থাকে। ফরিদপুর, ঢাকা ও পাবনা জেলায় বিলের প্রান্তবর্ত্তী জমী গুলিতেই মেটে ধানের সহিত আউসের পরিবর্ত্তে পাটের চাষ হইয়া থাকে। অন্যত্র কেবল পাটের চাষই হয়। মেটে ও আউস একই জমীতে এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইলে, কেহ কাহারও ক্ষতি করে না; কিন্তু পাট ও মেটে একসঙ্গে হইলে, মেটে ধানের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং উপযুক্ত পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বে এই সমস্ত জমীতে আউস হইত এখন আউস হয় না। পূর্ব্বে মেটে ধানও প্রচুর হইত, এখন মেটেও প্রচুর হয় না।

চতুর্থ প্রকার ঃ—এই সমস্ত জমী নদিগর্ভস্থ চড়া, অথবা বর্ষায় নদীর জল এই সমস্ত জমী দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে যথেষ্ট পলি পড়ে, কাজেই জমীর উর্ব্বরতার প্রায়ই হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। এই জমিগুলি যদি অত্যন্ত নিম্নভূমি না হয়, তাহা হইলে বর্ষার প্রারম্ভে ভাদুই—প্রধানতঃ আউস ধান—ও শীতে রবিশস্য প্রচুর উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজ কাল আউস ধান আর তত বেশী হয় না। অধিকাংশ স্থলেই পাট চাষ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয় হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত জমীতে পূর্ব্বে আউস ধান হইত, এখন সেই সমস্ত জমীতেই পাট হইয়া থাকে। যদি আউস অপেক্ষা পাটের চাষ লাভজনক না হইত, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে চাউলের মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পাইত না। বঙ্গ দেশে প্রায় ২৫,০০,০০০ লক্ষ একর জমীতে পাট চাষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই জমীতে আউস ধান হইত। সুখের বিষয় গত বৎসর হইতে কৃষকেরা পাট অপেক্ষা আউস ধানেই অধিকতর মনঃ-সংযোগ করিতেছে। বাস্তবিকই পাট চাষের জন্য আউস ধান্যের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। এমন কি আমন ধানও পাটের কবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। কেননা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার জমীতে পাট চাষের জন্য আমন বা মেটে ধান ভাল উৎপন্ন হয় না। শুধু তাহাই নহে, নানা কারণে পাটের জমীতে ধান চাষ আর আদৌ করাই হয় না।

মোট যে সমস্ত জমীতে পাট চাষ হইয়া থাকে, তাহার দুই তৃতীয়াংশ জমীতেই পাট ব্যতীত অন্য ফসল উৎপাদিত হইয়া থাকে; আর অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ জমী একবারে পড়িয়া থাকে। যে সকল কারণে এই সমস্ত জমী পড়িয়া থাকে, তাহার মধ্যে পাট

কাটার পর পাট প্রস্তুত করিবার ব্যাপারে কৃষকগণের অধিক কাল নিযুক্ত থাকাই প্রধান। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টি ও ও অন্যান্য নৈসর্গিক কারণেও দ্বিতীয় শস্য উৎপাদনে প্রচুর ব্যাঘাত হয়, এবং পাটের জমীর উর্ব্বরতা এত কমিয়া যায় যে, তাহাকে আবার কিছুকাল ফেলিয়া না রাখিলে জমী পুনর্ব্বার শস্য উৎপাদনের উপযোগীই হয় না। অধিকন্তু বঙ্গের কৃষকগণের আলস্য ও উচ্চ আশাশূন্যতাও দ্বিতীয় শস্য না হওয়ার একটা প্রধান কারণ। আবার অনেক স্থলে ধান কাটা হইলেই গরু, মেষ, ছাগ, মহিষ মাঠে চরিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় বলিয়া, অনেক সময়ে ধান কাটার পরে রবি শস্যও উৎপন্ন হয় না। অবশ্য পাট চাষ প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া আজকাল অনেক পতিত জমী ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পাটের চাষে কৃষকের দুই পয়সার সংস্থানও হইতেছে। লোকে নানারূপ সারের উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু ধানের কথা ভাবিলেই মনে হয় যে পাট চাষ প্রচলিত না হইলেই ভাল হইত। পাটে যাহা লাভ হয়, ধানের অভাবে তাহা ব্যয়িত হইয়া যায়। কৃষকের অবস্থা একটু ভাল হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত সমস্ত লোকেরই অবস্থা হীনতর হইয়া পড়িতেছে। ভিতরের কথা চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাটের চাষে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই। পাটের দুর্গন্ধে দেশ রোগের আবাস স্থল হইয়া পড়িতেছে। পাটের পচা জলে অধিকক্ষণ অবস্থান করায়, কৃষকগণের শরীরও অযথা শক্তি হীন হইয়া আসিতেছে।

ইষ্টক ও লোণা।

অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহের দেওয়ালে লোণা লাগিয়া চুণ বালি খসিয়া যায়, অথবা এক প্রকার দাগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ একতালা, স্যাঁতা গৃহে প্রায়ই এইরূপ লোণার দাগ বাহির হইয়া পড়ে। কেবল যে নূতন দেওয়ালেই এরূপ হয় তাহা নহে, পরন্তু পুরাতন দেওয়ালে অথবা পুরাতন ইষ্টকে গাঁথা দেওয়ালেও এইরূপ যথেষ্ট লোণা লাগিয়া থাকে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরাতন গৃহের দেওয়ালে পূর্ব্বে লোণা লাগে নাই, তাহাতে সম্প্রতি লোণা লাগিতেছে। ইষ্টকের উপাদানে নানা প্রকার ধাতব যৌগিক বর্ত্তমান থাকাই এইরূপ লোণা লাগিবার এক মাত্র কারণ। কলিকাতায় গৃহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য সমস্ত ইষ্টকই নিকটবর্ত্তী নানা স্থান হইতে আসিয়া থাকে। এই সমস্ত স্থানের নদীর জল সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বলিয়া প্রায়ই লবণাক্ত। যে মাটীতে ইষ্টক নির্ম্মিত হয়, তাহাতে খুব সম্ভবতঃ কোনরূপ [illegible] লবণ না থাকিতে পারে; অথবা থাকিলেও তাহা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু যে জল প্রয়োগে ইষ্টকের মাটী প্রস্তুত করা হয় সেই জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে বলিয়া ইষ্টকের উপাদানে লবণ চিরকালের জন্য মিশ্রিত হইয়া

যায়। নদীর জল অর্থাৎ সমুদ্র নিকটবর্ত্তী স্থানের জল সাধারণতঃ বর্ষায় অল্প লবণ মিশ্রিত থাকে, এবং শীতে লবণের ভাগ অত্যন্ত অধিক হয়। শীতকালেই ইষ্টকের উপাদান প্রস্তুত হয় বলিয়া ইষ্টকেও প্রচুর লবণ মিশ্রিত হয়। যদি বর্ষাকালে ইষ্টক প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে গৃহের দেওয়ালে হয়ত লোণা লাগিতে পাইত না, অথবা লাগিলেও অতি সামান্যই লক্ষ্য করিতে পারা যাইত। ইষ্টক পুড়িবার সময় ইষ্টকে মিশ্রিত এই সমস্ত ধাতব লবণ, মৃত্তিকার সহিত রাসায়নিক সম্মিলনে সোডা ও পটাশের ক্লোরাইড উৎপাদন করে। এই দুই ক্লোরাইডই জলে দ্রবণীয়, কাজেই যে সমস্ত গৃহ স্যাঁতা, অর্থাৎ কৈশিক আকর্ষণে ইষ্টকের ভিতর দিয়া গৃহ ভিত্তির জল দেওয়ালে পরিচালিত হয়, সেই সমস্ত গৃহের ইষ্টকে এই সামান্য জল লাগিলেও ইষ্টকস্থিত লবণ গলিয়া যায়। এই গলিত লবণাক্ত জল পুনরায় ইষ্টক বাহিয়া চূণ ও বালির ভিতর দিয়া দেওয়ালের গাত্রে আসিয়া পড়ে, এবং বায়ু সহযোগে জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইলে, এই লবণ দেওয়ালের গাত্রে থাকিয়া যায়; কাজেই একতালা গৃহের দেওয়ালে যত দূর পর্য্যন্ত স্যাঁতা উঠিতে পারে ততদূর এইরূপ লোণা লাগিতে থাকে। এই লোণা আর কিছুই নহে পূর্ব্বোক্ত সোডিয়াম ও পোটাসিয়ামের ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি তাহাই, এবং পোটাসিয়াম ক্লোরাইড এই লবণেরই অনুরূপ আর এক প্রকার লবণ, তবে খাদ্য নহে। ইষ্টকের ভিতরে, বাহিরে, পার্শ্বদেশে, সর্ব্বত্রই স্যাঁতার জল লাগিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতেছে, সেই জল ক্রমাগত বাহির হইয়া আসিতেছে, কাজেই লোণাগুলি একবার ছাড়াইয়া দিলেও পুনরায় লোণা বাহির হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে যখন দেওয়ালে চূণ বালির প্ল্যাষ্টার লাগাইয়া দেওয়া হয়, তখন হইতেই ইষ্টকের ও এই প্ল্যাষ্টারের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতে থাকে। কাজেই শুধু স্যাঁতা গৃহেই যে লোণা লাগিবে তাহার কোন কারণ নাই। স্যাঁতা নহে এরূপ গৃহেও প্রায়ই লোণা লাগিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে গৃহের দেওয়ালে প্রায়ই লোণা লাগিত না। কারণ বর্ত্তমানে গৃহের তলদেশ প্রায়ই সিমেণ্ট, প্রস্তর বা মার্ব্বেল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কেবল ইষ্টক বা টাইল বসাইয়া দেওয়া হইত। সেই জন্য গৃহভিত্তির জল দেওয়ালে প্রবাহিত না হইয়া তল দেশ দিয়াই প্রবাহিত হইয়া বাষ্পীভূত হইত। এখন তলদেশের স্যাঁতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা হয় বলিয়া, স্যাঁতা অন্য পথ না পাইয়া দেওয়াল দিয়াই প্রবাহিত হয়। ফলে পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে দেওয়ালের গাত্রে লোণা ধরিতে থাকে। কাজেই বর্ত্তমানে আমরা শুষ্ক তলদেশ ও স্যাঁতা দেওয়াল বিশিষ্ট গৃহই দেখিতে পাই। ইহার কোন প্রতিকার আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রতীকার হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা সাময়িক ভিন্ন চিরস্থায়ী হইবে না। ইংরাজগণ নিম্ন-লিখিত প্রথা কয়েকটি অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন :—

(১) ইটগুলি জলে ডুবাইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্বুদ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত বুরুশের দ্বারা ইষ্টকের উপরিভাগ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

(২) অথবা সাইট্রিক বা টারটারিক এসিডের (citric or tartaric acid) দ্রাবণে ইটগুলিকে ডুবাইয়া লইতে হইবে। উক্ত এসিডের অভাবে গোঁড়া লেবু হাঁড়ীতে ফুটাইয়া সেই জলে ইট ডুবাইয়া লইলেও চলে।

(৩) অথবা অর্দ্ধ পাইট স্পিরিট অফ সল্ট (Spirit of Salt) এক কলসী জলে মিশ্রিত করিয়া ইটের উপরিভাগে রীতিমত ছড়াইয়া দিয়া দুই এক দিন পরে ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হইবে।

(৪) অথবা অতি ক্ষীণ এসেটিক এসিডের (acetic acid) দ্রাবণে ভিজা ইট ডুবাইয়া লইয়া, পরে ন্যাপথা (naphtha) ঢালিয়া দিতে হইবে।

দেশীয় কারিকরগণ এইরূপ ব্যয় বহুল কোন প্রথাই অবলম্বন করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ তেঁতুলের জলে ইটগুলি ডুবাইয়া লইয়া থাকেন। মনে হয় ইংলিশ প্রথা অপেক্ষা এই দেশীয় প্রথা গুণে কোন অংশে হীনতর নহে। যে মৃত্তিকা হইতে ইষ্টক প্রস্তুত হয়, তাহাতে যদি অধিক পরিমাণে লবণ থাকে এবং সেই ইষ্টক পাথুরে কয়লায় পোড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকাস্থ লবণের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হইয়া ক্লোরাইডের পরিবর্ত্তে সাল্‌ফাইড প্রস্তুত হয়। তাহাও পূর্ব্ব বর্ণিত কারণে দেওয়ালের গাত্রে লোণার আকারে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্লোরাইডের আকারের সহিত সাল্‌ফাইডের আকারের কিছু তারতম্য আছে। শেষোক্তগুলি প্রায়ই অতি শুভ্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল সূচীর (needle) ন্যায়। যদি ইট প্রস্তুত করিবার মাটীতে এরূপ উপাদান থাকে যে ভবিষ্যতে সেই ইট হইতে লোণা বাহির হইতে পারে, তাহা হইলে এক হন্দর পরিমাণ ইটের মাটীতে ১ আউন্স বেরিয়াম কারবনেট (barium carbonate) মিশ্রিত করিয়া দেওয়া ভাল। এই ইট কাষ্ঠ প্রয়োগে অথবা কোক কয়লা প্রয়োগে পুড়াইয়া লইলে প্রায়ই লোণা লাগিতে পায় না।

ক্রমোন্নতি-শীলতা।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তাবৎ শিক্ষিত লোকের নিকটেই জীবের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধীয় অভিমত নূতন নহে। পৃথিবীস্থ পরিদৃশ্যমান যাবতীয় চেতন পদার্থ,—উদ্ভিদ ও জীব,—উভয়ই আবহমান কাল ধরিয়া একইরূপে অবস্থিত নহে। অতিপ্রাচীন কালে, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় জীব ও উদ্ভিদের শরীর ও শক্তি যেরূপ ছিল, অধুনা সেরূপ নাই। প্রাচীন জীব ও উদ্ভিদ ক্রমাগত অবস্থান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; বস্তুতঃ প্রকৃতি ও লক্ষণে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, হয়ত সম্পূর্ণ বিপরীত অন্য কোন পুরাতন জীব বা উদ্ভিদের বংশেই, এই নূতন বা আধুনিক চেতন পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। "জীবের ক্রম-বিকাশ" অভিমতে ইহাই সূচিত হয় যে, বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বর্ত্তমান অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ সমূহের উৎপত্তির একমাত্র কারণ,—তাহাদের ক্রমাগত আকার পরিবর্ত্তন। বৈজ্ঞানিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, জীব জন্তু মাতৃ-গর্ভে একবারেই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না। পরন্তু প্রথমে মাতৃ গর্ভে প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন, জটীলতা শূন্য, সামান্য, মৌলিক, সূক্ষ্ম, একটি মাত্র কোষ (cell) বিশিষ্ট হইয়া জীব জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কাল ক্রমে এই একটি সূক্ষ্ম কোষই ক্রমাগত রূপান্তরিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন উন্নতির ক্রমে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে নিজকে তৎসোপানের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া, শারীরিক উপাদান সমূহ ও জীবনী-শক্তি পরিচালিত করিবার যন্ত্র সমূহকে ক্রমাগত জটীল হইতে জটীলতর করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে, উপযুক্ত সময়ে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। ঠিক এইরূপেই প্রাচীন কালে পৃথিবী-পরিব্যাপ্ত অতি মৌলিক, শারীরিক গঠনে সম্পূর্ণ জটীলতা শূন্য জীব হইতেই, শারীরিক গঠনে ও জীবনী শক্তি পরিচালন যন্ত্রাদিতে ক্রমাগত পরিবর্দ্ধমান জটীলতা বিশিষ্ট জীবশ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছিল, এবং সেই হইতেই বংশ-পরম্পরায় ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া ও রাশি রাশি বিভিন্ন জীব পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া আধুনিক জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্য জীবের ক্রমবিকাশ বলিলেই জীবের ক্রমোন্নতি-শীলতা অভিমত আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। প্রাচীন মৌলিক জীব যে আধুনিক জটীল জীব হইতে অত্যন্ত হীনতর অবস্থাপন্ন ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। জীব ক্রম-বিকশিত হইতেছে বলিলেই জীব ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে, এইরূপ বোধগম্য হইয়া থাকে। এই ক্রমবিকাশ অভিমতের প্রথমাবস্থায় বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিয়া লইতেন, যে জীব বাস্তবিকই ক্রমবিকশিত হইয়াছে, এবং এই অভিমত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই বর্ত্তমান জীবজন্তু বর্ণনায় মনঃ সন্নিবেশ করিতেন। কিন্তু

অধুনা পণ্ডিতগণ এই উন্নতির বিভিন্ন পর্য্যায়গুলির ও কোন নিগুঢ় শক্তিবলে এইরূপ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের গবেষণাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান কালে, এই বিভিন্ন কোটী কোটী জীব সমূহের বিভিন্নতা ও তাহাদের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক অথচ বিশদ ব্যাখার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতেছেন।

জীব রূপান্তরিত হইয়াই যে বিভিন্ন জীব-জাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার দুইটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। প্রথমতঃ হয় জীবের আভ্যন্তরিক কোন বিশেষ শক্তি বশতঃ,—এই শক্তি সাধারণতঃ জীবে প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু সময়ে সময়ে যখন কর্ম্মশক্তি সম্পন্ন হয়, তখনই কিয়ৎপরিমাণে নিজকে অন্য অবয়বের ছাঁচে ঢালিয়া ফেলে,—অথবা, যে সমস্ত শক্তিতে প্রাণ গঠিত হয় তাহাদেরই নিরবচ্ছিন্ন কার্য্যশীলতায়, এবং এই সমস্ত শক্তির উপর প্রাকৃতিক ও বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের প্রভাব বশতঃই, এইরূপান্তর ক্রমশঃ পরিচালিত হইতেছে। এই অভিমতের মধ্যে কোনটি বস্তুতঃ সত্য তাহাই পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিতেছেন। তাঁহাদের মতে জীবনী শক্তির প্রকৃতি ও কারণ বুঝিতে পারিলে, সমস্ত ব্যাপার অনেকটা স্থিরীকৃত হইতে পারে।

পৃথিবীতে দৃষ্টি শক্তির বহির্ভূত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব ও উদ্ভিদ আছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেই তাহারা প্রত্যক্ষ হয়। এই সমস্ত আনবিক জীব ও উদ্ভিদ সমূহ বস্তুতঃ এক একটি কোষ (cell) বিশিষ্ট। কাজেই তাহাদের জীবনের কার্য্য পরিচালন প্রণালী যতদূর সম্ভব জটীলতাশূন্য। কিন্তু যখন আমরা মনে করি যে, এই প্রকাণ্ড জীব ও উদ্ভিদ জগৎ, সর্ব্বোপরি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব, প্রাচীন কালের এই সমস্ত এক কোষ বিশিষ্ট, অতি সূক্ষ্ম প্রাণীর অনুরূপ অথবা তাহা হইতেও আরও মৌলিক অন্য কোন জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তখনই মনে হয় যে, আমরা একটা প্রকাণ্ড কল্পনা করিয়া লইতেছি; এবং এই কল্পনা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সাধারণ পর্য্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ, অথবা অতি পুরাতন পুরাণ বর্ণিত প্রাচীন যুগের বৃক্ষ লতা কত শত শত শতাব্দী ব্যাপিয়া একই রূপে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের কোন পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে না। এই সমস্ত দেখিয়াও মানব বিভিন্ন জীব হইতে ক্রমবিকিশিত হইয়াছে, এরূপ কল্পনা বাস্তবিক সত্যানুমোদিত নহে বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া পড়ে।

এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তরায় বলিয়াই যখন অষ্টাদশ খৃষ্ট শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবের ক্রমোন্নতি-শীলতার অভিমত প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কেবল মাত্র সাধারণ মানব নহে, পরন্তু সুধীমণ্ডলীও এই অভিমত বিরুদ্ধে আপাতঃ-প্রতীয়মান অকাট্য যুক্তি সমূহের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই নূতন অভিমত পোষণ করা দূরে থাক, ইহার কোন সারবত্তা আছে কিনা, তাহা আদৌ কেহ চিন্তা পর্য্যন্ত

করিলেন না। ফলে এই অনাদৃত অভিমত উৎপন্ন হইয়াই লয় প্রাপ্ত হইল। কাজেই আমাদের যুগে ইহা আবার নূতন করিয়া উত্থাপিত হইল। কিন্তু এমন. বৈজ্ঞানিক যুগেও ইহা বিদ্রূপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ মহামতি Darwiner ডারউইনের "The Origin of Species" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্রই চারিদিক হইতে নিষ্ঠুরও তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। তবে এখন সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নূতন অভিমত প্রতিষ্ঠা-জনিত সুধী-সমাজের বিবাদ বিসম্বাদেরও পরি সমাপ্তি হইয়াছে। জীবের "ক্রম" বিকাশ এই অভিমত এখন বৈজ্ঞানিক জগতে বদ্ধমূল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতগণ প্রাণিজগৎ যতই বিশ্লিষ্ট করিতেছেন, ততই এই অভিমতের সত্য উপলব্ধি করিতেছেন। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত জীবের ক্রমবিকাশ ও কোন্ কোন্ বিভিন্ন পর্য্যায়ে জীব ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া আধুনিকত্ব লাভ করিয়াছে এতৎ সম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য আজও সম্যক উদ্ঘাটিত হয় নাই। বস্তুতঃ আজও পর্য্যন্ত জীবনী শক্তির কুহেলিকা অপসারিত করিতেও পণ্ডিত মণ্ডলী সমর্থ হন নাই। কখন যে এ বিষয়ে সম্যক মীমাংসা হইবে তাহারই স্থিরতা কি? সুদূর ভবিষ্যতে ইহার মীমাংসা হইলেও এখন আমরা বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি। এ সমস্ত দুরূহ বিষয়ের কথা দূরে থাক, ইহা অপেক্ষাও সরল বিষয় সমূহও,—কেমন করিয়া এবং কোন্ শক্তি বলে এক নির্দ্দিষ্ট প্রাথমিক জীব হইতে জীব ক্রমোন্নতি শীলতা লাভ করিয়াছে তাহাও—সম্পূর্ণ মীমাংসিত হয় নাই। কোন পণ্ডিতের গবেষণাই এটি সত্য বা ওটি অসত্য এরূপ নির্দ্ধারণে আজও পর্য্যন্ত সক্ষম নহে। কেমন করিয়া ক্রমোন্নতি-শীলতা পরিচালিত হইল, এবিষয়ে এখনও অনেক সন্দেহ আছে; কিন্তু জীব যে ক্রমোন্নতী-শীলতা বশতঃই উন্নত হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রাণি-জগৎ প্রাচীন জীব জগতের শেষ পর্য্যায়। আধুনিক জীব মণ্ডলী একবারেই এরূপ অবয়ব ও শক্তিলাভ করিয়া উদ্ভূত হয় নাই।

যদি আমরা ক্রমোন্নতিশীলতার অভিমত পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে রাশি রাশি বিষয় একবারেই অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাণী জগতের যতই পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা হইতে থাকে, ততই এই অভিমতের সারবত্তা, প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্য্যতা বদ্ধমূল হইতে থাকে। প্রাচীন কালের জীব জন্তু ও বৃক্ষ লতার প্রস্তরীভূত অবয়ব সকল নিত্য নিত্য নূতন প্রমাণ সংস্থাপন করিতেছে। পক্ষীর চঞ্চু ও তৎমধ্যগত দন্ত সমাবেশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হয় যে, একটা সরীসৃপ মাত্র পক্ষাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত ও প্রাচীন প্রাণী জগতের ভূগর্ভ প্রোথিত প্রস্তরীভূত কঙ্কাল অবলোকন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন জগতে জীবের কিরূপ সমাবেশ ছিল ও বর্ত্তমান জীব সমূহ হইতে তাহাদের অবয়বেরই বা কি বিভিন্নতা ছিল। পৃথিবীস্থ দেশ বিভাগ অনুসারে জীব

জন্তু এবং বৃক্ষ লতার বিভিন্ন সমাবেশের কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, এই অভিমতের পোষকতা করিতে হয়।

একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। মৎস্যের উদ্ধতন সমস্ত মেরুদণ্ডী জীব সমূহের মণিবন্ধ কঙ্কাল, দুই সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দ্বারা গঠিত, এবং বহিঃস্থ সারিতে হস্ততালুর পাঁচটি অস্থি শ্রেণী সমাবিষ্ট। এই গুলিই উচ্চতর জীবের অঙ্গুলি। এই বহিঃস্থ সারিটি সরল রেখা ক্রমিক নহে পরন্তু বক্র, কাজেই দুই সারির মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। উভচর জীব ও সরীসৃপ দিগের এই ব্যবধান টুকু কতকগুলি বিশেষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি রাশিতে পূর্ণ। এই মধ্য অস্থি রাশি অনেক স্তন্যপায়ীর বিশেষতঃ মানবের মণিবন্ধে আদৌ বর্ত্তমান নাই. এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির পরিবর্ত্তে এই ব্যবধান টুকু এই প্রধান দুই শ্রেণীর অস্থির একটি স্ফীত হইয়া পূর্ণ করিয়াছে। এক্ষণে যদি জীবের ক্রম-বিকাশ অভিমত সত্য হয়, তাহা হইলে এই মধ্যগত ক্ষুদ্র অস্থি সমূহের চিহ্ন মানবেও বর্ত্তমান থাকা উচিত ছিল। নানারূপ পরীক্ষার পর রোসেনবার্গ (Rosenburg) নামক পণ্ডিত লক্ষ্য করিলেন যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ মণিবন্ধে এইরূপ মধ্য অস্থিখণ্ড বাস্তবিকই সমাবিষ্ট থাকে।

এইরূপ নানা পরীক্ষায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে পথ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন জীব শ্রেণী সৃষ্টি হইয়াছে, সেই একই পথ অবলম্বনে প্রত্যেক জীবও পর্য্যায় পর্য্যায় উন্নীত হইয়াছে. এবং পূর্ব্ব পুরুষের গঠন প্রণালী পরবর্ত্তী পূর্ণাবয়ব জীবে বর্ত্তমান না থাকিলেও গর্ভস্থ ভ্রূণ শরীরে সে সমস্তই বিরাজিত থাকে। নিম্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী মৎস্য সমূহ কানকো দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া পরিচালন করিয়া থাকে। এই শ্বাস যন্ত্র কয়েকটি "খিলান" দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। এই সমস্ত খিলানের মধ্যে জলের গমনাগমন পথের জন্য শূন্যগর্ভ ব্যবধান রহিয়াছে। যদিও পক্ষী, সরীসৃপ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব বায়ু কোষ বা ফুস ফুস দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা করে, এবং সমস্ত জীবনে কখনও এই কার্য্যের জন্য কানকো ব্যবহার করে না, তথাপি কি ডিম্বে বা কি জরায়ু মধ্যে অতি প্রথম অবস্থায় জীব শিশু এইরূপ কানকো সাহায্যেই শ্বাস প্রশ্বাস পরিচালিত করিয়া থাকে। কালক্রমে জীব অনুসারে এই যন্ত্র অন্তর্হিত হইয়া নূতন যন্ত্র বা নূতন অবয়ব সন্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে।

পূর্ণাবয়ব মানবের পঞ্জরাস্থির সংখ্যা ১২ জোড়া, কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় ইহার সংখ্যা ১৩ জোড়া, এবং অতি নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর বহু সংখ্যক, এই সংখ্যা রাশি ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সিম্পাঞ্জি, গরিলা, প্রভৃতি বানরে ১৩ জোড়ায় পরিণত হইয়াছে। মানবের শৈশবেও সেই ১৩ জোড়া : প্রভেদ এই যে, মানব শিশুর গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই ত্রয়োদশ যোড়াটি অপসারিত হইয়া পড়ে।

লেভেরিয়ার (Leverear) কর্ত্তৃক নেপ্‌চুন গ্রহ আবিষ্কার যেরূপ সত্যানুমোদিত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় অবলোকন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জীবের ক্রম-বিকাশ অভিমতও

যে, সেইরূপ সত্যানুমোদিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রত্যেক জ্যোতিষেত্তাই অবগত আছেন, যে নেপচুন সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরতম গ্রহ; এবং সূর্য্য বেষ্টন করিতে ইহার আমাদের জগতের ১৬৫ বৎসর প্রয়োজন হয়। জুপিটারের উপগ্রহের পথে সামান্য বিশৃঙ্খলতা লক্ষ্য করিয়াই প্রথমে গ্রীনউইচ মান মন্দিরের (Greenwitch Observatory) আডাম (Adam) এবং পরে লেভেরিয়ার এই গ্রহের অবস্থিতির মীমাংসা করিলেন এবং বিশৃঙ্খলীকৃত স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিখ্যাত মান মন্দিরের দূরবীক্ষণ, সেই স্থান অন্বেষণে নিযুক্ত হইল। ফলে বার্লিন মান মন্দিরের গ্যালে নেপচুন গ্রহও আবিষ্কৃত করিলেন। সেইরূপ ক্রমাবিকাশেরও নানারূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কোন্ শক্তি বলে ইহা পরিচালিত হইতেছে তাহারই মীমাংসার জন্য ও সেই শক্তি আবিষ্কারের জন্য পণ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

রাশি রাশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ সত্তেও যদি কেহ অনুমান করেন যে, পৃথিবী নিশ্চল এবং সূর্য্যই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অল্পতা ভিন্ন আর কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় না। এইরূপ এত প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্তেও "যদি জীব ক্রম বিকশিত হইয়াছে, বা জীব ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছে" এই অভিমতে কেহ বীতশ্রদ্ধ হন, তাহা হইলে তাহার পর্য্যবেক্ষণ শক্তির অল্পতাই প্রমাণিত হইয়া পড়ে। ক্যাণ্ট-ল্যাপল্যাসের অভিমত ব্যতীত সৌর জগতের কার্য্য প্রণালী বা অবস্থান প্রণালী যেরূপ আদৌ বোধগম্য নহে, সেইরূপ ক্রমবিকাশ অভিমত ব্যতীত জীব জগতের কোন সত্যই মীমাংসিত হইতে পারে না। ক্রমবিকাশ ও সৌর জগৎ এই দুইটির তুলনা করিলে, প্রথম দ্বিতীয়ের ন্যায় অখণ্ডনীয় নহে বলিয়া দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ ইহা সৌর জগতের ন্যায় অঙ্কপাতে প্রমাণিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ক্রমবিকাশ জীব জগতের পরিবর্ত্তন প্রণালীরই ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। দুইটি আপত্তিই ন্যায়ানুমোদিত। কিন্তু জীবনী-শক্তির প্রকৃতি এতই জটিল ও দুর্বোধ্য যে, অঙ্কপাতে ইহার মীমাংসা করিলে সমস্ত ব্যাপারটিই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু জীবনী শক্তির মূল কারণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে এখনও আমাদিগকে বহু বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে, কেননা এই বিজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ অভিনব। কাজেই যদি কেহ সৌর জগতের অভিমত, ক্রমবিকাশ অভিমত অপেক্ষা অধিকতর অখণ্ডনীয়, কাজেই প্রথম দ্বিতীয় অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া, বিবেচনা করেন, তাহা হইলে কেহই তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না বটে, কিন্তু এইরূপ তুলনা করিলে একটা বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। ক্যাণ্ট-ল্যাপল্যাসের বিশ্বোৎপত্তি অভিমত সমস্ত বিষয়ের এখনও মীমাংসা করিতে পারে নাই; এই অভিমত অনুসারে এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয় যে, বিশ্বোৎপত্তির মূল কারণ ঘূর্ণায়মান নভঃস্তূপ। কিন্তু কি প্রকারে

এই ঘূর্ণায়মান নভঃস্বপ সৃষ্ট হইল, তাহা আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই ; সেইরূপ ক্রমবিকাশ অভিমতে জীবনী শক্তি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল এইরূপ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে,, এবং তাহা হইতে কি প্রকারে কোন্ কোন্ পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া এই বর্ত্তমান জীব শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে. তাহাই নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

আর্য্য ও অনার্য্য।

প্রসিদ্ধ পর্যটকগণ বিভিন্ন অনার্য্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অনার্য্যগণের দৃষ্টি-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি, ঘ্রাণ-শক্তি, ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি আর্য্যগণের অপেক্ষা অধিকতর তীক্ষ্ণ। কিন্তু বাস্তবিক প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা কি এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করা হইয়াছে ? এই সমস্ত পর্য্যটকগণের বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া সাধারণে ইহাই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন যে বাস্তবিকই অনার্য্যের পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি আর্য্যের অপেক্ষা বলবত্তর। স্পেন্সার ইহার একটা প্রকৃষ্ট কারণও দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, আনার্য্যগণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তির তীক্ষ্ণতাই, তাহাদের নিকৃষ্টতার পরিচায়ক। কেননা তাহারা জীবনের সমস্ত কার্য্য পরিচালনের জন্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে ; সেই জন্যই ইন্দ্রিয়-জাত সংস্কারের উপরেই তাহারা সমস্ত মনোযোগ নিয়োগ করে। ইহার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন স্পৃহায় স্বতঃই তাচ্ছিল্য আসিয়া পড়ে, এবং বুদ্ধি বৃত্তিও ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হয়। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলস্বরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলাধানের ন্যায়, নিয়মতি পঞ্চেন্দ্রিয় পরিচালনের ফল তাহাদের অত্যধিক তীক্ষ্ণতা। এই একই কারণে, আমরাও দেখিতে পাই যে নীচ জাতীয় অশীতিপর বৃদ্ধের দৃষ্টি শক্তি অপেক্ষা অধ্যয়নশীল উচ্চ জাতীয় বিংশ বর্ষ যুবকের দৃষ্টি শক্তি অল্প। র্যাঙ্কি (Ranke) নামক জনৈক পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য ব্রেজিলবাসী অনার্য্যগণকে পরীক্ষা করেন। ইহারা দৃষ্টি শক্তির তীক্ষ্ণতার জন্য বিখ্যাত। র্যাঙ্কির পরীক্ষার ফল এই হইল যে, বস্তুতঃ উহাদের দৃষ্টি শক্তি আর্য্যগণের দৃষ্টি শক্তি অপেক্ষা অত্যধিক তীক্ষ্ণতর নহে। পরীক্ষার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট দূরতায় কতকগুলি অক্ষর সন্নিবিষ্ট করিয়া ইউরোপীয় আর্য্য ও ব্রেজিল অনার্য্যগণকে পাঠ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ষ্টেপি (Steppe) অধিবাসী কালমুক (Kalmuk) নামক অনার্যগণও দৃষ্টশক্তির তীক্ষ্ণতার জন্য প্রসিদ্ধ। এইরূপ কথিত আছে যে, ইউরোপীয়গণ পশুপাল উত্থিত দূরস্থিত যে ধূলিকণা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই লক্ষ্য করিতে পারে না, এই কালমুকগণ অনায়াসেই তাহা নয়নগোচর করিয়া থাকে।

এই কালমুকগণকেও পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বাস্তবিকই তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ইউরোপীয়-গণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিকতর। কিন্তু যে ৪০ জন কালমুক লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ২।৪ জন ব্যতীত প্রায় সকলেরই দৃষ্টি শক্তি, যে সমস্ত ইউরোপীয়গণের দৃষ্টি শক্তি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণতর, তাহাদেরই সমতুল্য। কেবল মাত্র ইউরোপীয় আর্য্যগণকে লইয়াই পরীক্ষা করা হয় নাই, পরন্তু আরব, মিসর, পারস্য, ভারত ইত্যাদি বহুস্থানীয় আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখার সহিত বিভিন্ন অনার্য্য জাতির পঞ্চেন্দ্রিয় শক্তির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। রিভার্স (Rivers) নামক জনৈক পণ্ডিত পাপুয়া দ্বীপের (Papua) অধিবাসিগণকে লইয়া পরীক্ষা করেন, তাঁহার পরীক্ষার ফল বস্তুতঃই সন্তোষ ও বিশ্বাস-জনক। তিনি পরীক্ষার জন্য কতকগুলিকে নির্ব্বাচিত করিয়া লয়েন নাই, যাহাকে পাইয়াছিলেন, তাহাকে লইয়াই তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে ১১৫ জনকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষিত লোক-গুলির প্রত্যেকের দৃষ্টি শক্তি ইউরোপীয়গণেরই সমতুল্য। তবে গড়ে পাপুয়ানদিগের দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণতর। অধ্যাপক উডওয়ার্থ (Woodworth) ডাক্তার ম্যাকগির (McGee) সহায়তায় গত ১৯০৪ সালের সেণ্ট লুই ফেয়ারে (St. Louis Fair) নানা জাতীয় লোককে পরীক্ষা করিয়া উক্তরূপই ফল পাইয়াছিলেন। ৩০০ বিভিন্ন জাতীয় অনার্য্য গণকে পরীক্ষা করিয়া অতি তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি শক্তি কাহারও দেখিতে পান নাই। এই সমস্ত অনার্য্যগণের কতকগুলি ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি প্রায় দুই শত ইউরোপীয়গণের অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর পরীক্ষিত হইয়াছিল। জার্ম্মান সৈন্য বিভাগে কতকগুলি সৈন্যেকেও এইরূপে পরীক্ষা করা হয়, তাহাদের দৃষ্টি শক্তির অত্যাধিক তীক্ষ্ণতার সহিত এই অনার্য্যগণের আদৌ তুলনাই হয় না। আমেরিকার অধিবাসী ইণ্ডিয়ানগণ ও ফিলিপাইনের অধিবাসিগণ দৃষ্টি শক্তিতে সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক শত জন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন ইউরোপীয় গণের তুলনায় এক শত ইণ্ডিয়ান ও ফিলিপিনোসের দৃষ্টি শক্তি শতকরা দশ ভাগ উৎকৃষ্ট। উক্ত অনার্য্যগণের ৬৫ হইতে ৭৫ জন ব্যক্তির দৃষ্টি মোট এক শত জন ইউরোপীয়ের দৃষ্টি শক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। কিন্তু এই দৃষ্টি শক্তির হীনতা বা তীক্ষ্ণতাই যে জাতির উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পরিচায়ক এরূপ কখনই হইতে পারে না। কেননা ফিলিপাইন দ্বীপের অধিবাসী নেগ্রিটোগণ (Negrito) যদিও মালয় দ্বীপ বাসিগণের অপেক্ষা জীবিকা সংগ্রহ ব্যাপারে এবং যাবতীয় ক্রিয়া কলাপে অধিকতর হীনাবস্থাপন্ন, এমন কি হয়ত এই মালয় দ্বীপ বাসিগণই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন জাতি, তথাপি মালয় দ্বীপ বাসিগণের দৃষ্টি শক্তি নেগ্রিটো গণের অপেক্ষা অনেক হীনতর, এবং ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা আদৌ তীক্ষ্ণতর নহে। অবয়বের কৃষ্ণতার সম অনুপাতে দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয় ইহাও বাস্তবিক সত্য নহে, তবে হয়ত বর্ণের তারতম্যে দৃষ্টি শক্তিরও তারতম্য হইতে পারে, এবং সেই জন্য রিভার্স (Rivers) অনুমান করিয়াছেন, বর্ণই বোধ হয় এরূপ দৃষ্টির তারতম্যের

এক মাত্র কারণ। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে কৃষ্ণতম বর্ণ বিশিষ্ট অসভ্য জাতির দৃষ্টি শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতম এরূপও সম্ভব নহে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বরং এইরূপ মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, বিভিন্ন জাতি অনুসারে দৃষ্টি শক্তির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পরীক্ষার ফল দৃষ্টি শক্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মায়োপিয়া (Myopia) নামক এক প্রকার দৃষ্টি শক্তির পীড়া আছে। এই পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি দূরের জিনিষ দেখিতে পায় না। কিন্তু চক্ষুর অতি নিকটস্থ পদার্থ বেশ নয়ন গোচর করিতে পারে। যে সমস্ত ইউরোপীয়কে লইয়া উপরোক্ত পরীক্ষা সকল সংসাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যদি অল্পাধিক মায়োপিয়া আক্রান্ত লোক থাকে তাহা হইলে গড়ে দৃষ্টি শক্তি হীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর বাস্তবিকই যদি দৃষ্টি শক্তিতে জাতিগত কোন পার্থক্য আছে কিনা, তাহারই গবেষণা করিতে হয় তাহা হইলে পরিক্ষণীয় জাতি হইতে দৃষ্টি শক্তি সংক্রান্ত রুগ্ন ব্যক্তি সমূহ পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতিতেই দৃষ্টি শক্তি সংক্রান্ত রুগ্ন ব্যক্তি বর্ত্তমান। তবে এই রোগের অল্পতা বা আধিক্য, দৃষ্টি শক্তি যে যে বিষয়ে সর্ব্বদা নিযুক্ত হয় এবং তজ্জন্য দৃষ্টি শক্তিতে যে প্রতি-ক্রিয়া হয়, সেই প্রতি-ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। রিভার্স সাহেব দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষায় এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন; এবং তিনি যে প্রথায় দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে যদি কোন চিত্র বা অক্ষর পরীক্ষার্থে নিয়োজিত হয়, এবং ঐ অক্ষর বা চিত্রের দূরতাই দৃষ্টি শক্তির অল্পতা বা আধিক্যের পরিমাপক হয়, তাহা হইলে যে দূরতায় লোকে বুঝিতে পারে যে, অনায়াসে চিত্র বা অক্ষর সম্বন্ধীয় সঠিক উত্তর দিতে পারা যায়, সেই দূরতা হইতে অক্ষর বা চিত্র অধিকতর দূরস্থিত করিলে, লোকে সেই অক্ষর বা চিত্র অনেকটা অনুমান করিয়া সঠিক উত্তর দিয়া থাকে, আরও দূরস্থিত করিলে লোকে আন্দাজ করিয়া একরূপ উত্তর দেয়। উত্তরের সত্যাসত্যের উপর কোন আস্থা রাখে না। যাহাদের দৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ অনুমান শক্তি প্রবল, তাহাদের পরীক্ষার ফল নিশ্চয়ই অধিকতর সন্তোষ জনক হইয়া থাকে। সভ্য জাতিগণ শিক্ষা, ক্রিয়া কলাপ ও নানা কারণে এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, পদার্থ যতক্ষণ নয়ন গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা কি কিছুই অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু অসভ্য জাতি এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করে বলিয়াই অনেক সময়ে কোন পদার্থ বাস্তবিক স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও অনুমান করিয়া পদার্থ সম্বন্ধে এরূপ উত্তর দিয়া থাকে, যে তাহার উত্তর শুনিলেই মনে হইবে যে, বস্তুতঃ সে পদার্থ নয়ন গোচর করিয়াছে। এই কারণেই অনেকস্থলে দৃষ্টি শক্তি পরীক্ষায় অসভ্যগণ জয়ী হইয়া থাকে। এই বিষয় ও অন্যান্য অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপই নির্দ্ধারিত হইবে যে, যথার্থ দৃষ্টিশক্তি কি অসভ্য কি সভ্য সকলেরই সমান। অথবা হয়ত অতি সামান্য প্রভেদও

বর্ত্তমান থাকিতে পারে। কিন্তু সুপরিচিত কোন পদার্থের সামান্য পরিচয় পাইয়াই অসভ্যগণ সেই পদার্থের নির্দ্দেশ করে বলিয়া, তাহাদের দৃষ্টি শক্তি যে সভ্যগণ অপেক্ষা অত্যন্ত প্রখর এরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভ্রমাত্মক। রিভার্স এবং রাঙ্কি উভয়েই অসভ্য জাতির মধ্যে যাহারা দৃষ্টি শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, যদিও তাহাদের দৃষ্টি উৎকৃষ্ট বটে, তথাপি অনন্যসাধারণ নহে।

পর্য্যটকগণ অসভ্য জাতির শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধেও, তাহাদের দৃষ্টি শক্তির ন্যায় ভ্রান্ত ধারণা করিয়া ফেলিয়াছেন। বস্তুতঃ পরীক্ষা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সভ্যগণের শ্রবণ শক্তি প্রখরতর। মায়ার (Mayer) পাপুয়াবাসিগণকে পরীক্ষা করিয়াও এইরূপ নির্দ্ধারিত করেন, এবং পূর্ব্বোক্ত সেণ্টলুই ফেয়ারে ব্রুণারও (Bruner) বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ১৩৭ জন ফিলিপিনোর মধ্যে শত করা ১৫ জন, ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রবণ শক্তি-বিশিষ্ট, অন্য দুই এক জাতি অল্প উৎকৃষ্টতর, কিন্তু অধিকাংশই হীনতর। পরীক্ষায় যাহা হউক না কেন, শিক্ষা ও চতুপার্শ্বস্থ নানা কারণে সভ্যের শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণতর হইয়া পড়ে। সভ্যতা প্রযুক্ত লোকে নানারূপ বিপদ হইতে শ্রবণ শক্তিকে রক্ষা করিতে শিক্ষা করে, অধিকন্তু শ্রবণ যন্ত্র সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথা পরিষ্কার রাখিবার উপায় সভ্যগণ নিয়তই অবলম্বন করিতেছে। আবার সভ্যগণ নানারূপ শব্দ শ্রবণে অভ্যস্ত বলিয়া বিভিন্ন শব্দের তারতম্য অনায়াসে অভ্যাস করিয়া রাখে। টিক টিক শব্দ ঘড়ি হইতে বা অন্য কোন্ কারণে উদ্ভূত হইতেছে, তাহা শব্দ শুনিলেই অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে। সঙ্গীতের ও বাদ্যযন্ত্রের নানারূপ স্বর সভ্যের যেরূপ আয়ত্ত, অসভ্যের সেরূপ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কাজেই এইরূপ নানা কারণে শ্রবণ শক্তি তীক্ষ্ণতর হইয়াছে বলিয়া মূলতঃ সভ্য ও অসভ্য দুই জাতিরই শ্রবণ শক্তি প্রায়ই একরূপ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নহে।

ঘ্রাণ-শক্তির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধেও আর্য্য ও অনার্য্যের বিশেষ পার্থক্য নাই। অসভ্য বর্ব্বর জাতি অনেকাংশে প্রায়ই নিকৃষ্ট জীব শ্রেণীর অন্তর্গত। কুকুরাদি নিকৃষ্ট জীব সমূহের ঘ্রাণ-শক্তি অত্যন্ত প্রবল। সেই জন্যই পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, অসভ্যের ঘ্রাণ-শক্তি স্বাভাবতঃই তীক্ষ্ণতর হওয়া সম্ভব। এরূপ অনুমানের মূল কারণই এই যে, সময়ে সময়ে অসভ্যগণের অদ্ভুত ঘ্রাণ-শক্তির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে নানা জাতীয় লোক লইয়া নানারূপে পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। মূলতঃ কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধির কারণ সেই ইন্দ্রিয়ের নিয়মিত ও অনবরত পরিচালনা। আমরা হয়ত তাম্রের, স্বর্ণের বা এইরূপ কোন খনিজ পদার্থের কোন গন্ধ অনুভব করিতে পরি না, কিন্তু এক জন প্রকৃত রাসায়নিক পণ্ডিত ঘোর অন্ধকারেও এক খণ্ড পরিষ্কৃত ও অকৃত্রিম তাম্র পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার ঘ্রাণ-শক্তি দ্বারা তাম্র

বলিয়া বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি অনভ্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে গন্ধদ্বারা কোন্ ফল কি তাহা অনুমানও করিতে পারেন না। আর্য্য ও অনার্য্য দুইই মানব। কার্য্য ও কারণ বশতঃ মস্তিষ্কের শক্তি দুই জনেরই পৃথক হইতে পারে; কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তি এমন কি মস্তিষ্কও দুই জনেরই মূলতঃ এক। যে কারণে ও যে যন্ত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় কুক্কুরের ঘ্রাণ শক্তি, গৃধিনীর ঘ্রাণ ও দৃষ্টি শক্তি প্রবল, মানবে,—আর্য্যই হউক আর অনার্য্যই হউক—সে কারণ বা সে যন্ত্র সন্নিবেশ সম্ভবতঃ সম্ভবপর নহে। কাজেই ঘ্রাণ শক্তি আর্য্য ও অনার্য্য উভয়েরই সমান।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের শক্তি সম্বন্ধে সেরূপ অতি বিস্তৃত পরীক্ষা আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। ম্যাকডুগাল সাহেব পাপুয়া বাসিগণের মধ্যে এক জাতির স্পর্শ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলিয়া মনে করেন। দুইটি সূচিকার অগ্রভাগের পার্থক্য অনুমান করাই এই পরীক্ষার প্রশ্ন। এই বিষয়ে পাপুয়ানগণের বাস্তবিকই স্পর্শ শক্তি তীক্ষ্ণতর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এক পাপুয়ান জাতি ভিন্ন আর কোন জাতিই আর্য্যগণের সমকক্ষ হয় নাই।

এই সমস্ত পরীক্ষায় সেরূপ বিশেষত্ব নাই, কেননা কোন জাতির কোন ইন্দ্রিয়ের বিশেষত্বের কারণ অনুসন্ধান করা অসম্ভব নহে। অন্যথায় সর্ব্বজাতিরই ইন্দ্রিয় শক্তি একই রূপ। কিন্তু কোন্ জাতি কতটুকু শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, এইটির পরীক্ষাই অতিশয় চিত্তাকর্ষক। কেননা এক এক জাতি শারীরিক নানারূপ যন্ত্রণায় যেরূপ সহিষ্ণুতা ও শান্তচিত্ততা দেখায়, তাহা বস্তুতঃই অতিশয় প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য মানসিক কোন কারণে অনেকে নানারূপ অদ্ভুত শারীরিক যন্ত্রণার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপও করে না। ইতিহাসে তাহার অনেক ঘটনা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কিন্তু এরূপ মানসিক তেজঃ ব্যতীতও অনেক অসভ্য অনায়াসে নানাবিধ শারীরিক যন্ত্রণাকে গ্রাহ্য করে না। অসভ্যগণের যন্ত্রণানুভূতি শক্তি অতি অপকৃষ্ট। সময়ে সময়ে অসভ্যগণ নানা কারণে দগ্ধীভূত হইয়াছে, বা অর্থের লোভে অনায়াসে জ্বলন্ত অনল কুণ্ডে হস্ত প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিশেষ চিত্ত বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় নাই। শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি সম্বন্ধেও নানারূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। শরীরের কোন স্থানের চর্ম্ম টানিয়া তাহাতে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে, কতটুকু চাপ প্রয়োগ করিলে মুখ মণ্ডলে যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকটিত হয়, তাহার দ্বারাই পরীক্ষার মীমাংসা হইয়াছে। ম্যাক-ডুগাল, উডওয়ার্থ, বারনার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানা প্রকার অসভ্য জাতি লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বস্তুতঃই এই বিষয়ে অসভ্যগণ কতকটা জয়ী হইয়াছে। শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসভ্যগণ যেরূপ সক্ষম, আর্য্যগণ তত নহে। কিন্তু সভ্যগণের যেরূপ অধিকাংশ লোকে সামান্য চাপ প্রয়োগেই কাতর হইয়া পড়েন,

সেইরূপ অসভ্যগণের অতি অল্পাংশ লোকেই অধিক চাপ প্রয়োগ সহ্য করিতে পারে। সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা অত্যধিক চাপ সহ্য করিতে পারেন, তাহারা অসভ্যগণের সম্পূর্ণ সমকক্ষ। যতই হউক অসভ্যগণ বস্তুতঃই অতিশয় সহনশীল। তবে পরীক্ষায় নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এরূপ অধিক বিভিন্নতা হইয়াছিল। যন্ত্রনা সহ্য করিবার প্রথম সীমা কোনটা তাহার বিবেচনা করিবার শক্তি অর্থাৎ চাপ প্রয়োগ কখন কষ্টকর হইল, তাহা বিচারের শক্তি মানসিক, শারীরিক নহে। পরীক্ষা স্থলে আর্য্যগণ স্বভাবতঃই মনে করিয়া ছিলেন, যে পরীক্ষা কালে শারীরিক অসুবিধা বা অসচ্ছন্দতাই যন্ত্রণা সহ্য করিবার প্রথম বা আদি সীমা। কিন্তু অসভ্যগণ রীতিমত আহত হইবার পূর্ব্বাবস্থাই যন্ত্রণার প্রথম সীমা মনে করিয়া থাকিতে পারে, কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে অসভ্যগণই যে জয়ী হইবে তাহা আর অসম্ভব কি? পরীক্ষকগণ পরীক্ষার্থী অসভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যেন তাহারা আহত হইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে। মনে হয় এই সমস্ত পরীক্ষাতেই কোন্ জাতি কতটুকু শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, তাহার মীমাংসা আদৌ হয় নাই; বরং কোন্ জাতি পরীক্ষাটিকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই মীমাংসা হইয়াছে।

যত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সমস্তগুলি অনুধাবন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গড়ে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিতেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও তীক্ষ্ণতা সমান। তবে প্রত্যেক জাতিতেই এক এক বিভাগের মধ্যেই বিভিন্নতা যথেষ্ট বর্ত্তমান। আবার যদি এই বিভাগের লোক সমষ্টি অতি অল্প হয়, এবং অন্যান্য বিভাগ হইতে এই বিভাগ সম্পূর্ণ সম্পর্ক শূন্য থাকে ও লোক সংখ্যা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বিবাহাদি আদান প্রদান সেই বিভাগের জন সমাজ হইতেই সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সেই বিভাগের যদি কোন বিশেষত্ব থাকে, তাহা নষ্ট নাও হইতে পারে, পরন্তু বৃদ্ধি পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। মৌলিক বর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন জাতির দৃষ্টি শক্তি নিরূপণ তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া রিভার্স সাহেব এইরূপ নানা বিধ বিশেষ বিশেষ জাতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কোন কোন জাতি মৌলিক সমস্ত বর্ণ বুঝিতে পারে, আবার কোন কোন জাতি লাল ও সবুজ আদৌ বুঝিতে পারে না। যে যে জাতি এইরূপ বর্ণ বিষয়ে অন্ধ তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তবে তাহাদের সংখ্যা, নানারূপ প্রমাণে বুঝিতে পারা যায় যে, চিরকালই প্রায় একরূপ রহিয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিতেই বর্ণান্ধ লোক বর্ত্তমান। তবে অনার্য্যগণের প্রতি জাতিতে এই বিষয়ে লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক-তর। কেবল মঙ্গোলিয়ান জাতির বর্ণান্ধ লোক আর্য্যগণ অপেক্ষা অল্পতর। এই বিষয়ে সুমীমাংসিত পরীক্ষা করিতে হইলে পরীক্ষণীয় জাতির বহু লোক লইয়া পরীক্ষা করা উচিত। কিন্তু সেরূপ ভাবে একবারও পরীক্ষা করা হয় নাই। এমন

কি ইউরোপীয়গণের মধ্যেও শতকরা কত লোক এরূপ বর্ণান্ধ তাহারই মীমাংসা ও হয় নাই। এইরূপে বর্ণান্ধতা পরীক্ষা করিতে যাইয়া একটি বিষয় পরিষ্কার মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সমস্ত লোকেই লাল কিম্বা সবুজ কোন এক বর্ণে অন্ধ এরূপ কোন জাতিই আবিষ্কৃত হয় নাই। যে শারীরিক যন্ত্রের দ্বারা এইরূপ বর্ণ জ্ঞান অনুভূত হয়, তৎসম্বন্ধে এই সকল পরীক্ষার ফল হইতে বুঝিবার বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অনেকে এরূপ বর্ণান্ধতা দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকৃতি বা পীড়া বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণ ও চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ লাল বা সবুজ বর্ণ বিষয়ে অন্ধতা বস্তুতঃই কোন পীড়া নহে। লোকের এইরূপ বর্ণান্ধতা দেখিলে মনে হয় যে, তাহার বর্ণানুভূতি শক্তি তাহার আদিম পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন জাতির বর্ণ জ্ঞানের গবেষণায় মানবের ক্রমোন্নতি শীলতার আর একটী প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহামতি গ্ল্যাডষ্টোন হোমারের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন কালে লক্ষ্য করেন যে, হোমারের সম সাময়িক গ্রীকগণের বর্ণজ্ঞান তত প্রখর ছিল না। কেন না বর্ণনীয় বিষয় সমূহকে রঞ্জিত করিবার বিবিধ বর্ণের প্রয়োজন হইলেও নামোল্লেখ করিতে পারে নাই। তিনি মীমাংসা করেন যে গ্রীকগণের বর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি শক্তি তখনও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে গ্রীকগণ নীল, ধুসর ও গাঢ় বর্ণ বিশিষ্ট প্রত্যেক পদার্থের বর্ণনায় একই বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন। গেজিয়ার নামক জনৈক পণ্ডিত গ্লাডষ্টোনের এই অভিমত অনুসারে প্রাচীন সাহিত্য সমূহ অধ্যয়ন করিয়া লক্ষ্য করিলেন যে প্রাচীন কালে বাস্তবিকই লোকের বর্ণ জ্ঞান অত্যন্ত অল্পতর ছিল। বেদ প্রভৃতি প্রাচীন হিন্দুগ্রন্থ, বাইবেল ইত্যাদি নানাবিধ গ্রন্থে আকাশ নীল বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। সেইরূপ বেদে এবং সমসাময়িক গ্রন্থে হরিৎ বর্ণেরও উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ, শ্বেত, লোহিত এই তিন বর্ণের উল্লেখই প্রাচীন গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। ভাষাজ্ঞানের ইতিহাস অনুধাবন করিয়া গেজিয়ার সাহেব লক্ষ্য করিলেন যে, মানব প্রথমে লোহিত বর্ণেরই জ্ঞান লাভ করে। অরুণের লোহিত কিরণ ছটাই তাহার কারণ।

আধুনিক অসভ্য জাতিগণই অনেকটা আর্য্যগণের প্রথমাবস্থার দৃষ্টান্ত স্থল। এই অসভ্যগণের মধ্যে অনেক জাতিতেই লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত এই তিন বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের নাম পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহে। ভাষাই যে জাতির জ্ঞানের সম্যক পরিচায়ক তাহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা কত শত প্রকার গন্ধ অনুভব করি, কিন্তু তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কিন্তু অনুভূতি রহিয়াছে। সেইরূপ হয়ত বর্ণের অনুভূতি হইতে পারে কিন্তু বর্ণনার ভাষা সৃষ্ট হয় নাই।

তবে ক্রমাগত প্রয়োজন হওয়ায় আমাদের দৃষ্টিরও শক্তি নানারূপে প্রসস্ত হইতেছে। মানবেরও ক্রমোন্নতিতে ইহাই সূচিত হয়, যে মানবের শারীরিক যন্ত্রাদির

শক্তিও ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত হইতেছে। প্রথমাবস্থায় মানবের যত প্রকার বর্ণের অনুভূতি হইত এখন হয়ত তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বর্ণের অনুভূতি হইতে পারে।

বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে যত প্রকারই পরীক্ষা হউক না কেন, অসভ্যগণের নানারূপ বর্ণের অনুভূতি হইতেছে কি না তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নানা কারণে বরং ইহাই সূচিত হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তিতে, স্বাভাবিক বর্ণজ্ঞানে ও তাহাদের প্রভেদ অবধারণে সভ্য অসভ্য দুই জাতিই সমান। বর্ত্তমানে মানব যে প্রকার জীব এইরূপ জীব পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হইয়া যে সমস্ত নৈসর্গিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, সম্ভবতঃ আজও পর্য্যন্ত তাহাই আছে, তবে সেই জ্ঞান নানারূপে উন্নত হইয়াছে এবং উন্নতির পরিচয় দিবার জন্যও নানারূপ উপায় উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষমতায় সভ্য ও অসভ্য, আর্য্য ও অনার্য্য, শ্বেত ও কৃষ্ণ সকলেই সমান।

সমালোচনা।

খাদ্য :—রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু এম, বি; এফ, সি, এস কর্ত্তৃক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য এক টাকা।

আজ কাল আমাদিগের দেশে যেরূপ হীন ও কুরুচি সম্পন্ন উপন্যাসের স্রোত চলিতেছে তাহার মধ্যে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রচলিত করিবার আশা অতি অল্প। রায় বাহাদুর চুনিলাল বসু মহাশয় খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়া জন সাধারণকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সমাজের উন্নতি দেখিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখিতে হয়। যে সমাজে ব্যক্তি মাত্রেরই স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট, সে সমাজ পৃথিবীর অগ্রগণ্য। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিত মণ্ডলি আপন আপন জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে প্রতিনিয়ত যত্নবান, সেজন্য খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রাশি রাশি পুস্তক বৎসর বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। কিরূপে সবল ও বলিষ্ঠকায় হওয়া যাইতে পারে, এই চিন্তা তাঁহাদের মস্তিষ্কে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। স্বাস্থ্যের উপর মনের তেজঃ নির্ভর করে; এই জন্যই ইটালি দেশীয় মনীষীগণ বলিয়াছেন "Mens sana incorpore sano" অর্থাৎ সুস্থ শরীরেই সুস্থ মন। হিন্দুর ন্যায় ধর্ম্ম জীবন জাতিও স্বাস্থ্যকে সকল ধর্ম্মের আদি ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। যথা :— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং"। রায় বাহাদুর মহাশয়ের এই পুস্তক খানির এক বৎসরের

মধ্যে যে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে ইহা অতীব আশাপ্রদ। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, রায় বাহাদুর মহাশয়ের মত সুলেখক হইলে জটীল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও জন সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে।

এই পুস্তক খানি বঙ্গভাষায় প্রণীত হওয়াতে, বাঙ্গালির যে একটি ঐশ্বর্য্য বাড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহাদের মাতৃ ভাষা বাঙ্গলা নহে, অথচ কাল ধর্ম্মে পতিত হইয়া ইংরাজী ভাষায় ইহাঁর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের জন্য ও বাঙ্গালির এই একটি নূতন সম্পদ অন্যান্য জাতিকে দেখাইয়া সুখী হইবার জন্য, ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রতি মাসে আমাদের এই "বিজ্ঞানে" সন্নিবিষ্ট করিতে যত্নবান রহিলাম।

তড়িৎ *।

আবহমানকাল ধরিয়া সর্ব্বজনপ্রিয়তায় ও কৌতুহলোদ্দীপকতায় কোন বিজ্ঞানই তড়িৎবিজ্ঞানের সমকক্ষ নহে। ইহার নৈসর্গিক নিয়ম-সমূহ অতিশয় প্রীতিপ্রবণ এবং অন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তড়িতের নৈসর্গিক নিয়মানুবর্ত্তী ক্রিয়াসমূহ বহু বিভিন্ন-পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হয় বলিয়া, ইহা স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং সেই ক্রিয়াগুলি এরূপ হৃদয়গ্রাহী যে তাহাদের চিত্র আমাদের চিত্তক্ষেত্রে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া যায়। যে শক্তিবলে শান্তপ্রকৃতির নগ্নমাধুরি পরিস্ফুট হইয়া পড়ে,—তাহাও তড়িৎ, আবার যে শক্তিবলে দানবী প্রকৃতি বিশ্ববিধ্বংশকারী সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে,—তাহাও তড়িৎ। প্রকৃতির কি ভীষণতায়, কি ভূমা মহান সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে, সকল সময়েই, সকল বিষয়েই,—কি সাধারণ, কি অশ্রুতপূর্ব্ব—সমস্ত ক্রিয়াতেই তড়িৎ সংশ্লিষ্ট। চির রহস্যময় ও চির-অমীমাংসিত শক্তিতে তড়িৎই যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিয়া মৌলিক পদার্থে, আবার সেই সমস্ত মৌলিক পদার্থকে সংশ্লিষ্ট করিয়া যৌগিক পদার্থে পরিণত করিতে পারে। সঞ্চরণশীল অবস্থায় (Dynamical state) নীরবে, নিঃশব্দে জলকণাকে দ্বিধা বিশ্লিষ্ট করিয়া মৌলিক বায়বীয় পদার্থে, আবার স্থির-অবস্থায় (Statical state) সেই বায়বীয় পদার্থদ্বয়কে বজ্রনিনাদে সংযুক্ত করিয়া জলে পরিণত করিতে তড়িৎই সক্ষম। সঞ্চরণশীল অবস্থায় অথবা স্থির অবস্থায় তড়িৎ, কি জান্তব, কি উদ্ভিদ

* পূর্ব্বে "বিজ্ঞান দর্পণে" এই প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অংশ বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইলে পুনরায় ইহাতে পরবর্ত্তী অংশ প্রকাশিত হইবে। একই পত্রিকায় প্রবন্ধ সম্পূর্ণ রাখিবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে।—বিঃ সঃ।

সমস্ত চেতন পদার্থের পেশী ও স্নায়ু সমূহে কত বিস্ময়কর, কখনও কখনও কত ভয়ঙ্কর ক্রিয়া প্রকাশ করে। সেই তড়িতই স্থির অবস্থায় এবং পর ও অপর তড়িতের (positive and negative electricity) ক্ষীপ্র পরিবর্ত্তনে (i.e., in the state of high frequency.) অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে অচিন্তনীয়, কল্পনার বহির্ভূত অতি তীব্র গতিতে সঞ্চালিত হইয়া, পেশীর ভয়ঙ্কর তীব্র আকুঞ্চন অথবা মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনীশক্তি-ধ্বংশের পরিবর্ত্তে জীবিতের শরীর দিয়া স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয়; এবং তাহারই ধন্বন্তরী-শক্তিতে মানব কত দুরারোগ্য ব্যাধির নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। বিদ্যুত—গ্রীক পুরাণান্তর্গত প্রমিথিয়াসের অগ্নি*—জলকণাপূর্ণ মেঘ রাশিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ কি অপরিমেয় গতিতে শূন্যমার্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে। এই বিদ্যুতই আমাদের বজ্র; তখন তড়িতের অসীম তেজে মুহূর্ত্তে বিশ্ব বিধ্বংশ হইতে পারে। আবার সেই বিদ্যুতই কুহেলিকাপূর্ণ-সূক্ষ্মচাতুর্য্যে এবং বিস্ময়জনক কার্য্যতৎপরতায় জীবিত পাদার্থে ও জড় পদার্থে যে সকল অচিন্তনীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দার্শনিক বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। তড়িৎ বজ্ররূপে মুহূর্ত্তে মানব জীবন হরণ করে, আবার সেই তড়িৎই প্রাণরক্ষার মূল হইয়া হৃদয় যন্ত্রকে ধীরে ধীরে স্পন্দিত করিতে থাকে। সুইডেনবাসী বিজ্ঞানবিৎ (Arrhenius) আরিনিয়াস সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষার এবং দ্রাবক সম্মিলিত হইবার সময়, তাহাদের অণুসমূহ বাহ্যতঃ তীব্রশক্তিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে: এই শক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয় যে মানবোদ্ভাবিত কোন শক্তিই এই শক্তির সমকক্ষ নহে। ক্ষার দ্রবীভূত করিলে, ক্ষার এবং দ্রাবকের প্রতি-পরমাণু অপরিমেয় তড়িৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় কতক গুলি পরমাণু পর তড়িৎ এবং কতকগুলি অপর তড়িৎ শক্তি সম্পন্ন হয়। এই তড়িৎযুক্ত পরমাণু সমূহের প্রকৃতি, ক্রিয়া, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্যকরূপে অবগত হইবার বহু পূর্ব্বে ফ্যারাডে (Faraday) তাহাদিগকে আয়ন (Ion) বলিয়া অভিহিত করিয়া ছিলেন। এইরূপ অনুমানেই আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আরিনিয়াসের মতে এই আয়ন গুলিই বাস্তবিক কার্য্যকর—"It is the ions, which act." এই আয়নবলেই জীবিত প্রাণীর পেশী ও হৃদয় কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, হৃদয় তন্ত্রী তালে তালে নৃত্য করে এবং জীবে জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে পেশী সমূহের ক্রিয়াবলীর মূল কারণ, এমন কি চৈতন্য-শক্তির অর্থাৎ জীবনের মূলই তড়িৎ। কাজেই বজ্র মৃত্যুর কারণ হইলেও, জীবনের উৎপত্তি মূলেও তড়িৎ প্রয়োজন।

---

* প্রমিথিয়া —টাইটন কুলসম্ভূত ইয়াপিটাস ও ক্লাইমেনের পুত্র। ইনি বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে সমস্ত মানব জাতিকে পরাভূত করতঃ মৃত্তিকাদ্বারা মানব সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ পূর্ব্বক মৃত্তিকা-মানবকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যুতের ক্রিয়া সমূহ এমনই অনির্ব্বচনীয়, রহস্যপূর্ণ ও অবোধ্য যে তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কোন সময়ে কোন গৃহে নিশাকালে বজ্র পতিত হইয়া, গৃহ সংলগ্ন বৈঠকখানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল। বজ্র পতিত হইবামাত্র আলোক সমূহ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। পুনরায় আলোক জ্বালিলে দেখা গেল, যে গৃহপ্রাচীর সংলগ্ন ঘটিকা যন্ত্রের সুবর্ণ, তড়িৎসহযোগে আনীত হইয়া টেবিলস্থিত রজতবর্ত্তিকাধারের স্থানে স্থানে লেপিত হইয়া গিয়াছে। কোন সময়ে প্রান্তরস্থিত কোন লোকের উপর বজ্র পতিত হইলে তাহার শারীরিক কোন ক্ষতি হইবার পরিবর্ত্তে, তাহার পাদুকা পদ হইতে অপসারিত হইয়া প্রায় চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সমস্ত লৌহ কীলক গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। একদা কোন কৃষক বালিকার উপর বজ্র পতিত হইলে, তাহার বস্ত্র সমূহ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, এবং বালিকাও অজ্ঞান হইয়া কিছুক্ষণের জন্য ভূতলে পতিত হইল। অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে তাহার বস্ত্র সমূহ নিকটবর্ত্তী কোন এক বৃক্ষ শাখায় বিলম্বিত রহিয়াছে। কোন মজুর এক দিন তাহার প্রাতর্ভোজনের কালে প্রথম গ্রাস হস্তে তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছে, এমন সময়ে বজ্রাহত হইয়া তদবস্থাতেই মৃত্যু মুখে পতিত হইল; দেখিলেই মনে হয়, যেন খাদ্য মুখে দিবার উদ্যোগ করিতেছে। আহা, তাহার খাদ্য মুখ সন্নিকটেই রহিয়া গেল! অবশেষে কোন লোক তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে ভস্মরূপে পরিণত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় লোকটি নিজে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিহিত বস্ত্রে উত্তাপের দাগ পর্য্যন্ত লাগে নাই। এই সমস্তই তড়িতের অবোধ্য শক্তি সম্ভূত। পিটার্সবার্গ নিবাসী অধ্যাপক রিচম্যান, ১৭৫৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কোন এক দিন ভীষণ বজ্রাঘাত সহ ঝড় বৃষ্টির সময় বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িতের ক্রিয়াবলী পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত নিজ আবাসে উত্তোলিত insulated তড়িৎ পরিচালক দণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, সেই দণ্ড বিচ্ছুরিত, অগ্নি গোলকের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। যে বৈদ্যুতিক তেজে রিচম্যান নিহত হইয়াছিলেন, আজ কাল মানব বুদ্ধি বলে সেই বিদ্যুতকে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া, তাহাকে ব্যোমপথে নিজ অভিলাষমত তরঙ্গায়িত করতঃ স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতেছে। এখন বিদ্যুৎ মানবের ক্ষিপ্র সংবাদ বাহিকা, সুদূরতর সমুদ্র, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালাব্যবহিত শত শত যোজনের কথা মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছে। বিদ্যুৎ সুবিশাল বট বৃক্ষকে ধ্বংশ করে বটে; কিন্তু তেমনই আবার নক্ষত্রালোকিত কুঞ্জ বনে বিকশিত কোমল কুসুমদল হইতে আলোক ছটারূপে বিচ্ছুরিত হইয়া প্রান্তর সুষমার আধার করিয়া তুলে।

প্রবল বাত্যাসংক্ষুব্ধ তড়িৎ সঞ্জাত ঘূর্ণী বায়ু এবং প্রকাণ্ড ও বিস্ময়কর জলস্তম্ভের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। তাহাদের শক্তি অপরিমেয়, তাহাদের সঞ্চলন পথে যাহা

কিছু পতিত হয়; সমস্তই মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়, তাহাদের অস্তিত্বও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেখিলেই মনে হয় তাহাদের উৎপত্তি সৃষ্টি ধ্বংশের জন্য। তাহাদের বজ্র নিনাদ, সঙ্গে সঙ্গে বিভীষিকাময় ঘন ঘন আলোক স্ফুলিঙ্গ যেন প্রলয়ের সূচনা করে। তাহাদের আকর্ষণী শক্তি অতি প্রচণ্ড; পৃথিবীর উপরিভাগে সুবিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া অতি তীব্র বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। তখন তীব্র গতিতে ধুলিকণা ও অন্যান্য লঘু পদার্থ সমূহকে তাহাদের সহিত বায়ুমণ্ডলের মর্দ্দিত প্রদেশে উদ্গত করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্থানে পরিবদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাদের প্রচণ্ড ক্ষমতা পরিদর্শন করিলে মানবের মনে এক অপূর্ব্ব বিভীষিকার সঞ্চার হয়, এবং নিকট ভবিষ্যতে কোন এক দৈব দুর্ব্বিপাকের সূচনা মনে করিয়া ভয়ে মানব আত্মহারা হইয়া পড়ে, লোকে অবসন্ন হয় এবং প্রলয় আসন্ন ভাবিয়া শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। আবার

মেরু-ছটা।

দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মেরু দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গীয় মাধুরিতে প্রোজ্জ্বল করিয়া. তুষার ধবল মেরু প্রদেশ মহিমামণ্ডিত করিয়া, অরুণ বরণ মেরুছটা (aurora) কি স্নিগ্ধ, কি শান্ত, কি প্রীতিপ্রদ! উহার সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। সমস্ত মেরু প্রদেশে প্রকৃতি দেবী যেন একটি আলোকময় চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। তাহার স্বর্গীয় বর্ণে বিচিত্র রামধনুর সর্ব্ব বর্ণ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তে শত শত রূপ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সেই আলোকতোরণ কখনও শুভ্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার সৃষ্ট করে। রশ্মি পরিবর্তনশীল ... ঘন-ক্ষেত্র-বিশিষ্ট-কাচ-খণ্ড (prism) নির্ম্মিত আলোক রশ্মির পরস্পর সংমিশ্রণসম্ভূত প্রদীপ্ত সুষমায় সেই আলোকময়-চন্দ্রাতপ মণ্ডিত হইয়া কি অনাবিল কি মহিমাপূর্ণ সৌন্দর্য্যের

আঁধার হইয়া পড়ে। এই প্রাণোন্মদ ছবি, বিশ্বনিয়ন্তার এই মধুর লিপি-চাতুর্য্য, প্রকৃতির এই মনোরম আলেখ্য দর্শনে হৃদয় যুগপৎ আনন্দে ও ভক্তিতে স্বতঃই আপ্লুত হইয়া পড়ে। বিশ্বস্রষ্টার অপার সৃষ্টি কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; সে দৃশ্য দর্শনে মনে হয় যেন, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইয়া কেবল মাত্র এক মেরু-ছটাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তখন দর্শকের সমস্ত ইন্দ্রিয় নয়নে পরিণত হইলেও তাহার দেখিবার আশা পূর্ণ হয় না। সে তখন সেই লোকাতীত শোভার সাগরে ডুবিয়া থাকিতে চায়।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াবলী তড়িৎ সমুৎপন্ন। প্রকৃতির ভীষণতাও তড়িৎ. প্রকৃতির সুমঙ্গল সৌন্দর্য্যও তড়িৎ। কাজেই সমস্ত বিজ্ঞান অপেক্ষা তড়িৎ বিজ্ঞানের
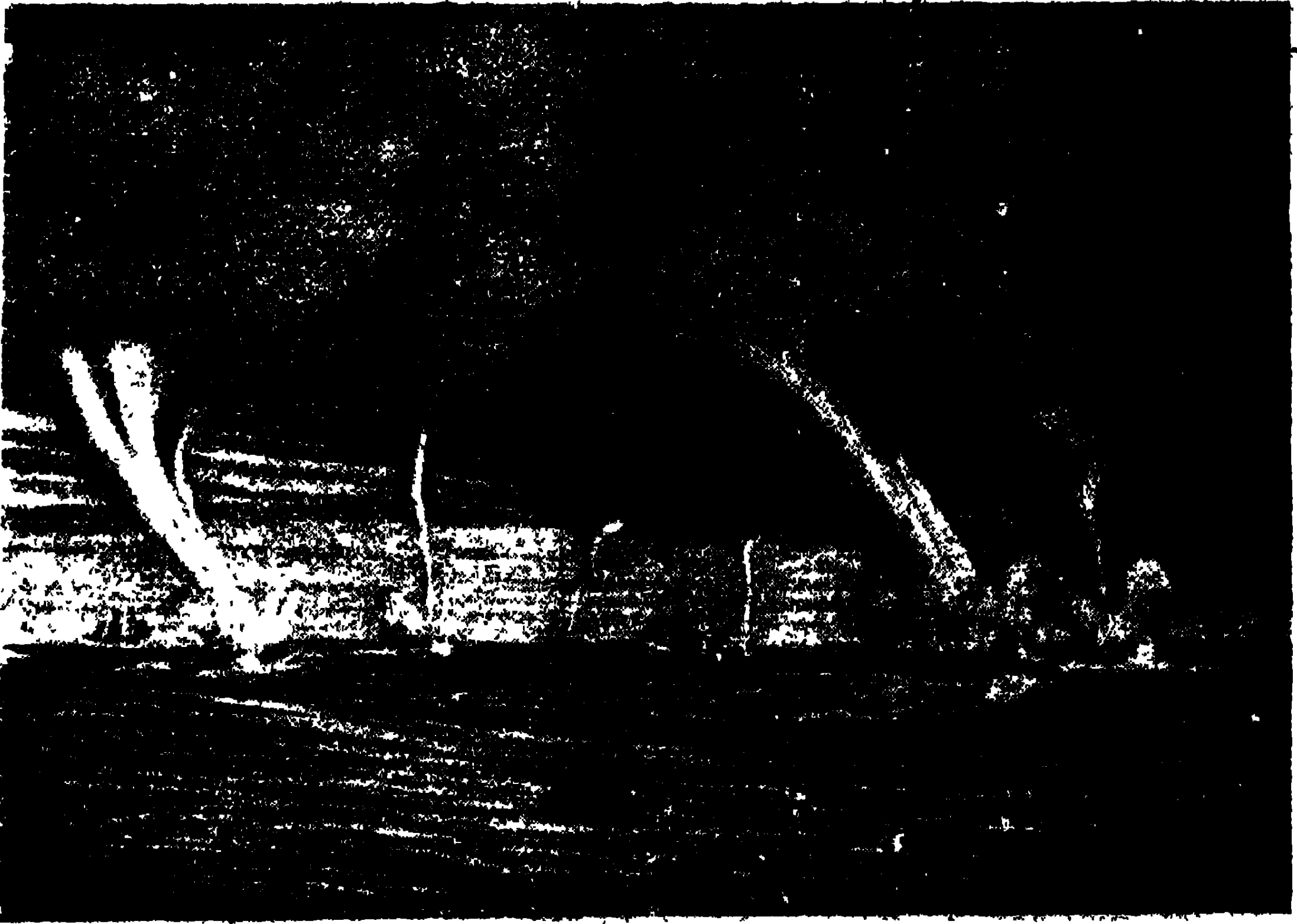
জলস্তম্ভ।

১ম চিত্র।

আলোচনা ও গবেষণা বাস্তবিক বড়ই আনন্দ জনক ও প্রীতিপ্রদ। প্রকৃতির সর্ব্বস্থানে, প্রকৃতির শিরায় শিরায়, প্রকৃতির সহিত ওতঃপ্রোতঃ ভাবে তড়িৎ বিজড়িত রহিয়াছে। তড়িৎ সম্বন্ধে সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইলে ইহার প্রধান এবং মূল অংশ গুলির পর্য্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ সেই সমস্তই ইহার ভিত্তি স্বরূপ। তড়িতের কোন ক্রিয়ার কারণ বুঝিতে হইলে, ইহার নৈসর্গিক নিয়মাবলী ও সেই নিয়ম সমূহ দার জন্য যে সমস্ত বিষয় কল্পিত হইয়াছে, সেই কল্পিত বিষয় সমূহ এবং তড়িৎ

সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের নানারূপ অভিমত গুলির বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা ও ঐ সম্বন্ধে প্রগাঢ় অধ্যয়ন প্রয়োজন। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত যত কিছু অভিমত কল্পিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটীই সম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। তবে ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিতে পারে, যে দিনে এই সমস্ত কল্পিত অভিমত ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া সত্যে পরিণত হইবে ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। তড়িতের ভিত্তি প্রোজ্জ্বল-ইথারের (Luminiferous Ether) উপর ন্যস্ত। ইথার একটী কল্পিত পদার্থ এবং প্রাকৃতিক তেজঃ সমূহ, অর্থাৎ আলোক, উত্তাপ, ইত্যাদি পরিবাহিত হইবার মার্গ স্বরূপ। ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পাতলা। ইথার মহাকাশের সমস্ত স্থানে এমন কি পদার্থের পরমাণুদ্বয় মধ্যস্থিত স্থানেও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আলোক ও উত্তাপ সঞ্জাত এবং electromagnetic

জলস্তম্ভ।
২য় চিত্র।

তরঙ্গ মালার স্বরূপতা ও একভাববত্তা পর্য্যালোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সমূহের কারণ নির্ণয়ার্থ ইথারই প্রধান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন। আধুনিক মতে ইথার সমুদ্ভূত যত কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা সমস্তই তড়িৎ; এমন কি ইথারই তড়িতের প্রতিরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইথারই তড়িৎ সমষ্টি; এবং আলোক, চুম্বক শক্তি, স্থির অথবা সঞ্চরণশীল উভয় তড়িৎ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই ইথারের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। প্রবাহ, বিস্তার, বিকিরণ, সমাঘাত, ইত্যাদি বহুবিধ বৈদ্যুতিক বিষয়ের মীমাংসার প্রধান পদার্থই ইথার। সেই জন্য ইহার ধর্ম্ম ও শক্তির আলোচনা বিশেষ আবশ্যক।

সার অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) কর্তৃক অনুমিত প্রোজ্জ্বল বা আম্বর (luminiferous) ইথার বলবিজ্ঞানের ও আভাসিক বলবিজ্ঞানের (quasi mechanical) কতকগুলি ধর্ম্মসম্পন্ন। যথা চলিষ্ণুতা এবং অসঙ্কোচ্যতা, অর্থাৎ আয়তনের অসীম-স্থিতি স্থাপকতার সঙ্গে সঙ্গে গঠনেরও কতক পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন স্থিতিস্থাপকতা। তিনি আরও অনুমান করিয়াছেন যে, ইথার দুইটি বিরুদ্ধভাব সম্পন্ন উপাদান সমুৎপন্ন,—একটি পর তড়িৎ এবং অন্যটি অপর তড়িৎ। এই দুইটি উপাদান এরূপে সম্পৃক্ত যে একটি যাহা কিছু করিবে, অন্যটি তৎক্ষণাৎ তাহার ঠিক বিপরীত এবং সম্পূর্ণ সমান-শক্তি সম্পন্ন কার্য্য সম্পাদন করিবে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, ইথার গঠনে একরূপ বায়বীয় পদার্থের ন্যায়; কিন্তু বায়বীয় হইলেও ইহা কঠিন পদার্থের দৃঢ়ত্ব-বিশিষ্ট, অথচ বায়বীয় পদার্থের স্থিতিস্থাপকধর্ম্মসম্পন্ন। ইহার ঘনত্ব বা নিবিড়ত্ব জলের নিবিড়তার ১০,০০, ০০,০০,০০ অংশের ৯৩৬ অংশের সমান, এবং কাঠিন্য ইস্পাতের কাঠিন্যের ১০,৪০,০০,০০,০০,০০ অংশের এক অংশের সমান। কেহ কেহ ইহাকে সমস্ত স্থান পরিব্যাপক জেলীর (jelly) ন্যায় মনে করেন; এবং ইহাতে আলোক, অন্যান্য দীপ্তিমান প্রাকৃতিক তেজঃসঙ্ঘাত ও electro-magnetic তরঙ্গমালা ক্রমাগত স্পন্দিত হইতেছে। সাধারণ পদার্থের কণিকা সকল অনায়াসে এবং নির্বিঘ্নে ইথারের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে; পদার্থের অণু মধ্যস্থিত স্থানেও ইথার বর্ত্তমান; কোন স্থান হইতে, কোন শূন্যগর্ভ স্থান হইতে, এমন কি যে স্থান হইতে বায়ু অপসারিত হইয়াছে, এরূপ স্থান হইতেও ইথার নিষ্কাশিত করা অসম্ভব।

অতি দূরস্থিত পদার্থ নিঃসৃত আলোক রশ্মি পরিবাহিত হইয়া আমাদের নয়ন গোচর হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই ইহার অনুমান উদ্ভূত হইয়াছিল। শূন্য মার্গে কোন কোন নক্ষত্র পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, তাহাদের আলোক-রশ্মি পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে কতদিন, কত মাস, কত বর্ষ অতিবাহিত হইয়া যায়। কোন নক্ষত্র সৃষ্ট হইবার হয়ত এক সহস্র বৎসর পরে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। সেই নক্ষত্র হয়ত এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে এক শত বৎসর আবশ্যক হয়। কাজেই সেই নক্ষত্র ধ্বংশ হইবার পরেও আমরা এক শত বৎসর তাহার আলোক দেখিতে পাইব। কেন না পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে তাহার শেষ রশ্মির এক শত বৎসর প্রয়োজন হইবে। আমরা আকাশে অনেক আলোক রশ্মি দেখিয়া থাকি; কিন্তু সেই রশ্মির উৎপত্তি স্থল অনেক দিন—বহুশত বৎসর পূর্ব্বে, নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এরূপও সম্ভব, হয়ত শূন্যমার্গে আরও শত শত সূর্য্য রহিয়াছে, তাহাদের রশ্মি এখনও ব্যোম পথ অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হয় নাই, ভবিষ্যতে সেই রশ্মি আমাদের নয়ন গোচর হইলে বুঝিব যে জ্যোতিষ্ক জগতে আর

একটী ভাস্বর পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। সূর্য্য আলোক প্রদানে বিরত হইবার অব্যবহিত পর হইতে ৮ মিনিট ২০ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত আমরা আলোক রশ্মি দেখিতে পাইয়া থাকি। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈজ্ঞানিক ক্যামিলি ফ্ল্যামেরিও (Camile Flamarion) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ইউরেনিয়ায় (Urania) এ সম্বন্ধে একটু সুন্দর আভাস দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইউরেনিয়া বলিতেছেনঃ—"আমরা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে পৃথিবীর আলোক এখানে উপস্থিত হইতে, জুলিয়াস সিজারের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যত সময় অতিবাহিত হইয়াছে. তত সময় আবশ্যক হইবে। সেই বীরের সমসাময়িক যে সমস্ত ক্রিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, সেই রশ্মি এতদিনে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলো মিটার অর্থাৎ প্রায় ১৮৬,৩৫৪ এক লক্ষ ছিয়াসি হাজার তিনশত চুয়ান্ন মাইল। আলোকের গতি ক্ষীপ্র, বাস্তবিকই অতি ক্ষীপ্র, কিন্তু মুহূর্ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিচালিত ও পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। পৃথিবীর নরনারী আমাদের সন্নিহিত নক্ষত্র সমূহের বর্ত্তমান আকৃতি দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু যে আলোক রশ্মি তাহাদের নয়ন গোচর হইতেছে, সেই রশ্মি এই সমস্ত নক্ষত্র হইতে যে দিন নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই সময়ে ইহাদের শারীরিক গঠন বা প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহাই দেখিতেছে, কাজেই তাহারা ইহাদের ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা অবলোকন করিতেছে। কেহই পৃথিবী হইতে বা ব্যোমপথের কোন স্থান হইতে কোন নক্ষত্রের দর্শনকালীন অবস্থা দেখিতে পায় না; তাহাদের অতীত অবস্থারই আভাস পায় মাত্র, যে যত দূরে অবস্থিত, সে ততই তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা আরও অতীত ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তুমি দূরবিক্ষণযন্ত্রে বিলয় প্রাপ্ত বহু নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। আমাদের নয়ন পথে সাধারণতঃ যে সমস্ত নক্ষত্র পতিত হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা Spectroscope (আলোক-বিশ্লেষক-যন্ত্র বিশেষ) সাহায্যে কোন কোন্ নভঃস্তূপ (nebula) কি কি পদার্থে সংগঠিত, তাহা অতি সহজে বিশ্লেষিত করিতে পারি। কিন্তু যে নভঃস্তূপ বিশ্লেষিত করিতেছি, তাহা হয়ত বর্ত্তমানে আর নভঃস্তূপ নাই কোন সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে। অন্তরীক্ষ বিক্ষিপ্ত যে সমস্ত সুন্দর মৃদুলোহিতালোকোজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাও, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যদি আমরা সে স্থানে উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম না। মহাকাশ স্থিত অনন্ত সূর্য্য নিঃসৃত আলোক, অথবা সেই সমস্ত সূর্য্যোদ্ভাসিত লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পৃথিবী প্রতিবিম্বিত আলোক, সেই সমস্ত পৃথিবী উপরিস্থিত যত কিছু কার্য্যের, যত কিছু ঘটনায়, মুহূর্ত্তে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারাও আলোকচিত্রে লইয়া শূন্যে, মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত অপরিমেয় গতিতে প্রধাবিত হইতেছে। একটী নক্ষত্র

দেখিতেছ,—যাহা দেখিতেছ, সেই পদার্থ বা সেই জ্যোতিঃ সেই নক্ষত্র হইতে বহির্গত হইবার সময়ের যে অবস্থা তাহাই দেখিতেছ। দূরে কামান গর্জ্জন করিল, তুমি আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলে, ধূম দেখিতে পাইলে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শুনিতে পাইলে না। একটু পরে কাণে আওয়াজ প্রবেশ করিল। ঐ শব্দটুকু আসিতে সময় লাগিয়াছে। কামান হইতে শব্দ বিনির্গত হইয়া, ও মধ্যপথের বায়ু টুকু তরঙ্গায়িত করিয়া তোমার কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। আরও দূরে থাকিলে আরও বিলম্বে শব্দ শুনিতে পাইতে। সেইরূপ আলোকও কোন পদার্থ হইতে বিনির্গত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইতে সময় গ্রহণ করে, কাজেই তুমি আলোক নির্গত হইবার সময়ের অবস্থাই জানিতে পার।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সুদূর ইতিহাসের আলোকচিত্র এখনও শূন্যপথে পরিবাহিত হইতেছে। হলদিঘাটের মহাযুদ্ধের ছবি এখনও মহাশূন্যে ছুটিতেছে, চিরকাল ছুটিবে, কখনও বিনষ্ট হইবে না। অনন্তের সুবিশাল বক্ষঃস্থলের কোনও না কোন স্থানে আমাদের ক্রিয়াবলীর ছবি চির সুদীপ্ত, ও চির অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকিবে; তবে আমাদের পৃথিবীর বা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহগণের পরমায়ু নিশ্চয়ই শেষ হইবে। কেবল তাহাদের স্মৃতির জন্য অনন্তের বক্ষঃস্থলে একটি সচঞ্চল উজ্জ্বলছবি চির বর্ত্তমান থাকিবে। কিন্তু আবার নূতন তপন সৃষ্ট হইবে, তখন নূতন ধরণী নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়া, নূতন নির্ঝর, নব কিসলয়ে নূতন রূপ হাসিতে থাকিবে, এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া এই অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নূতন জীবন সৃষ্ট হইয়া নূতন লাবণ্যে পরিস্ফুট হইবে।

যাহা হউক আমরা তড়িতের বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আলোক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম, সমস্তই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, কাজেই ইহা সকলেরই প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

আলোকের জন্য যে ইথারের প্রয়োজন, তড়িতের ক্রিয়াবলী বা নিয়মাবলীর পদ্ধতি স্থিরীকৃত করিতে হইলেও সেই ইথারেরই প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা তরঙ্গ ঠিক আলোক তরঙ্গেরই অনুরূপ। পদার্থের মধ্য দিয়া সঞ্চরণ, অন্য পদার্থ হইতে প্রতিফলন, পরিবর্ত্তন, বক্রীভবন, সমাঘাত, শোষণ ও বিপরীত প্রবাহ,—এই সমস্ত ব্যাপারে তড়িৎ আলোকেরই ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। অপ্রতিবদ্ধ, মুক্ত ইথারে আলোক ও তড়িৎ বিকিরণ সম্পূর্ণরূপে অবিচ্ছিন্ন। সার অলিভার লজ বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন উপায়ে এবং যতদূর সম্ভব নির্দ্দোষ এবং প্রকৃষ্ট পরীক্ষা দ্বারা [illegible] [illegible] যে, alternating machine উৎপন্ন তড়িৎবিক্ষোভ (disturbance) [illegible] [illegible] প্রকাণ্ড, অতি দীর্ঘ ইথার [illegible] বায়ু মধ্য দিয়া, অর্থাৎ [illegible] [illegible] সহিত সমবেগে প্রধাবিত হইয়া থাকে। আলোকতরঙ্গ এক ক্ষুদ্র [illegible]

এক সহস্র তরঙ্গভাগ এক ইঞ্চ পরিমিত স্থানে অনায়াসে পরিবদ্ধ হইতে পারে। আবার তড়িৎ তরঙ্গ এত দীর্ঘ যে তাহাদের প্রত্যেকের দৈর্ঘ্য শত সহস্র মাইল। কিন্তু উভয় তরঙ্গেরই গতির বেগ বা দ্রুততার মধ্যে কোন পার্থক্য বোধগম্য হয় না। অপ্রতিহত বা উন্মুক্ত ইথারেই এরূপ সম্ভব। একটি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চের সহস্র ভাগের এক ভাগ এবং অপরটি শত সহস্র মাইল, অথচ উভয়েরই দ্রুততা সমান। ইহা বাস্তবিকই অশ্রুতপূর্ব্ব ও অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। এরূপ বলিলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, মানবের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা ইথার গঠনে এবং প্রকৃতিতে অধিকতর জটিলতাশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন, এবং সর্ব্বত্র সম নিবিড়তাবিশিষ্ট। অথবা যদি ইথার গঠনে কুত্রাপি অসমনিবিড়তাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলেও ইহার কণাগুলি এত ক্ষুদ্র ও এত সূক্ষ্ম যে, আলোক তরঙ্গ ও তড়িৎতরঙ্গের পক্ষে, অর্থাৎ শত সহস্র মাইল ও এক ইঞ্চির সহস্রাংশের এক অংশ এই উভয় তরঙ্গেরই পরিমাণ বস্তুতঃ এক শ্রেণীর আয়তনভুক্ত। কাজেই ইথার অতিদীর্ঘ ও অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নির্ব্বিবাদে একইভাবে গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তড়িৎ বিক্ষোভ, প্রসারণ বা অন্য যত কিছু সমস্ত বিষয়ে এই কাল্পনিক ইথারই সর্ব্বপ্রধান মার্গস্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

কাজের জিনিষ।

মারবেল পরিষ্কার করিবার উপায়।—সোডা ২ ভাগ, পিউমিস ষ্টোন চূর্ণ ১ ভাগ, খড়ি চূর্ণ ১ ভাগ। মিহি চালনার দ্বারা চালিয়া লও। উপযুক্ত পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত কর। মারবেলের উপরে রীতিমত ঘসিতে থাক। তৈলাক্ত দাগ উঠিয়া যাইবে, পরে সবান ও জলের দ্বারা রীতিমত ধৌত করিয়া ফেল। মারবেল পরিষ্কার হইবে।

এন্টিমনি ট্রাইক্লোরাইড ও ১ কোয়ার্ট জলে ২ আউন্স অক্জালিক এসিডের দ্রাবণ এবং মিশ্রিত করিয়া উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ময়দা দিয়া কাদার মত কর। মারবেলের যে স্থানে কালির দাগ পড়িয়াছে, সেই স্থানে উক্ত পদার্থ চাপা দিয়া কয়েক দিন রাখিলেই কালীর দাগ উঠিয়া যাইবে।

চিতি বা ছ্যাতা নষ্ট করিবার উপায়।—স্যাঁতা স্থানে কাপড় চোপড় থাকিলে অনেক সময়ে কাপড়ে ছ্যাতা পড়ে ও ভুমো গন্ধ ছাড়ে। ইহাতে কাপড় চোপড় ও পুস্তক ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। একটা পাথরের বাটীতে বা মাটির সরাতে পাথুরে

চূণ রাখিয়া আলমারিতে বা কাপড়ের বাক্সতে রাখিয়া দাও; অবশ্য চূণ ঢাকা দিয়া রাখিবে, নতুবা ইতস্ততঃ ছড়াছড়ি হইবে। ও কাপড়ে চোপড়ে লাগিয়া জিনিষ পত্র নষ্ট করিয়া ফেলিবে। কিছুদিন রাখিবার পর চূণ গুলি গুড়া হইয়া যাইলেই আবার নূতন চূণ দিবে। চূণ রাখিয়া দিলে ছাতা ত পড়েই না অধিকন্তু পোকা ইত্যাদিতে কাপড় চোপড় কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে না। রেশমের কাপড়ে ছ্যাতা ধরিয়া যাইলে, একটু ফ্ল্যানেল হুইস্কিতে ডুবাইয়া ঐ স্থানে লাগাইয়া দাও পরে রেশমের উল্টা পিটে একটা ভিজে ন্যাকড়া চাপা দিয়া ইস্ত্রি করিয়া দাও। দেখিবে রেশম অত্যুজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মৎস্য ধরিবার জাল রক্ষা করিবার উপায়।—এক পাউণ্ড পরিষ্কার শিরিস শীতল জলে ফেলিয়া নরম করিয়া লও। ১০ গ্যালন জলে $\frac{১}{২}$ পাউণ্ড সাধারণ বারসোপ গুলিয়া উক্ত জল গরম করতঃ ঐ শিরীস গুলিয়া লও। প্রথমতঃ জলে উত্তমরূপে জাল খানি ধৌত করতঃ উক্ত শিরীসের জলে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল ফুটাইতে থাক। পরে সমস্ত রাত্রি হাওয়ায় মেলিয়া দাও। পর দিন ৫ গ্যালন জলে ২ পাউণ্ড ফটকরি ফেলিয়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া দাও, জল যখন বেশ ফুটিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহা নামাইয়া জালটি তাহাতে তিন ঘণ্টা আন্দাজ ডুবাইয়া রাখ। পরে জাল নিংড়াইয়া, সাধারণতঃ জালে যেরূপে কস লাগাইতে হয় অর্থাৎ গাব ফলের কসে ডুবাইয়া লও। এই প্রক্রিয়ায় জাল অনেকদিন পর্য্যন্ত শক্ত থাকে, শীঘ্র পচিয়া যায় না। অনেকে প্রথমে সুতা এই উপায়ে প্রস্তুত করিয়া শেষে সেই সুতাতে জাল প্রস্তুত করে; ইহাতে জাল আরও ভাল হয়।

পুস্তক হইতে ছ্যাতার দাগ নষ্ট করিবার উপায়।— ১ পাইট জলে ১ আউন্স জিলাটিন কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ডুবাইয়া রাখ। আর ১ পাইট জলে মাখিবার সাবান ১ আউন্স গুলিয়া লও। এই দুই পাইট জল মিশ্রিত করতঃ অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগ কর। বেশ মিশ্রিত হইয়া যাইলে উত্তাপ বন্ধ কর। ২ আউন্স জলে ১ ড্রাম ফটকিরি গুলিয়া উক্ত সাবান ও জিলাটিনের জলে ঢালিয়া দাও। যখন এই মিশ্রিত জল ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে তখন আস্তে আস্তে শুধু জলীয় অংশ টুকু পাত্রান্তরে রাখ। একটা শক্ত পালকে করিয়া উক্ত জল দাগ ধরা স্থানে লাগাইয়া দাও। যদি অনেক দিনের দাগ হয়, তাহা হইলে ৩।৪ বার উপরি উপরি লাগাইলেই দাগ বিদূরিত হইবে। এই জলে অল্প পরিমাণ—স্পিরিট অফ ওয়াইন ঢালিয়া দিলে, ইহা অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) ফেব্রুয়ারি, ১৯১২। (২য় সংখ্যা।

চা।

(TEA.)

আজ কাল আমাদের দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে, চায়ের যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইহার উৎপত্তি ও গুণাগুণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, বোধ হয়, কাহারও অপ্রীতিকর হইবে না।

কিছুদিন হইল, আমি দার্জ্জিলিং ভ্রমণ করিতে যাইয়া একটী চা-বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম। ঐ চা-বাগানটী "ব্লুমস্‌ফিল্ড্ টী এষ্টেট্" নামে পরিচিত এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিকসম্প্রদায় মেসার্স ফিন্‌লে মিউয়র্ কোম্পানি উহার সত্বাধিকারী। সেখানে চা-গাছের চাষ কিরূপ ভাবে করা হয় এবং যে চায়ের পাতা আমরা ব্যবহার করি, তাহা কিরূপে প্রস্তুত করা হয়, তাহাই প্রধানতঃ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বর্ণনার বিষয়।

কোন্ সময়ে চায়ের ব্যবহার মানব-সমাজে প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। অনেকের বিশ্বাস এই যে, খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে চায়ের অস্তিত্ব কেহ অবগত ছিল না; কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, চীন দেশীয় ধর্ম্ম প্রচারক কনফুসিয়সের গ্রন্থে (খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী) চায়ের গুণ সম্পন্ন কোন বৃক্ষপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তবে উহা যে চা, তৎসম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। যাহা হউক, যাঁহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, চায়ের ব্যবহার চীন দেশেই প্রথম প্রচলিত

ইতিহাস।

হইয়াছিল। ৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বোধিধর্ম্ম নামক একজন বৌদ্ধ সাধু ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে গমন করেন এবং তিনিই প্রথমে তথায় উহার প্রচলন প্রবর্ত্তন করেন। এ সম্বন্ধে জাপান দেশে নিম্ন লিখিত অদ্ভুত গল্পটী প্রচলিত আছে :—

বোধিধর্ম্ম সংসারবিরাগী ও অতিশয় কঠোর-আচার-নিরত সাধু পুরুষ ছিলেন; এমন কি, তিনি একবারে বীতনিদ্র হইয়া তপস্যা আচরণ করিতেন। এক দিন তিনি অনিচ্ছা সত্বেও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং পুনর্ব্বায় যাহাতে চক্ষু নিমীলিত না হয়, তজ্জন্য চক্ষুর দুইটী পাতা শাণিত ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং প্রবাদ এই যে, তাহা হইতেই চা বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। পরে এই বৃক্ষের পত্র তিনি সেবন করিয়া দেখেন যে, উহা দ্বারা তাঁহার শরীরে নব বলের সঞ্চার ও চিত্তের একাগ্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিকট এই বৃক্ষের অদ্ভুত গুণ বর্ণনা করেন, এবং ক্রমশঃ এইরূপে চীন দেশে জন-সাধারণের মধ্যে চায়ের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

এই গল্পটীর অলৌকিক অংশ পরিত্যাগ করিলেও ইহার দ্বারা এরূপ অনুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না যে, ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে চায়ের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চীন দেশ হইতে প্রথমতঃ জাপানে, তৎপরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে চায়ের ব্যবহার বিস্তার লাভ করিয়াছে।

চীন দেশের সরকারী কাগজ পত্রে ৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বৎসরে চীন গভর্ণমেণ্ট্ চায়ের উপর একটী শুল্ক স্থাপন করেন।

ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে চায়ের ব্যবহার কেহই জানিত না। ঐ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত কতিপয় গ্রন্থে চায়ের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন উচ্চপদস্থ ২।১ জন ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই চা ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অংশে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব্বদেশ হইতে চা সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে লইয়া যান। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম অংশে চা প্যারিস্ সহরে প্রথমে নীত হয় এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার অধিপতি রুষিয়ার সম্রাটকে তাঁহার দূত দ্বারা ২০০ শত পুরিয়া চা উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। রুষিয়ার দূত এই অকিঞ্চিৎকর উপ-হারের প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু যখন সেই চা রুষিয়াতে আসিয়া পৌছিল, তখন সম্রাট ও তাঁহার পারিষদগণ উহা ব্যবহার করিয়া এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত দেশে জন সাধারণের মধ্যে চায়ের ব্যবহার শীঘ্র প্রচলিত হইয়া পড়িল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংলণ্ডে চায়ের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়; কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা চা ইংলণ্ডে প্রথমে নীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, হলণ্ড্ হইতে ইংলণ্ডে চা প্রথমে নীত হইয়াছিল। ক্রমওয়েলের রাজত্ব কালে একজন ইংরাজ চা-বিক্রেতা চায়ের গুণ ব্যাখা করিয়া এক খানি পুস্তক প্রচার করেন। তাঁহার

পুস্তকে লিখিত আছে যে, এক পাউণ্ড চা তখন ৯০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। সুতরাং কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে রাজ পরিবার ও উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই উহা ব্যবহার করিতে পারিত না। তখন উহা ভিন্ন-দেশীয় রাজন্যবর্গকে মহামূল্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইত। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের আদেশানুসারে চায়ের উপর একটী শুল্ক স্থাপিত হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অধিপতি দ্বিতীয় চার্লসের সহিত পোর্টুগীজ্ রাজকুমারী কাথারিনের বিবাহ হয়। তদুপলক্ষে রাজকবি ওয়ালার ইংলণ্ডের নূতন রাণী, চা, পোর্টুগীজ্‌দিগের সাহস ও বৈদেশিক বাণিজ্য-বিস্তারের সুখ্যাতি করিয়া যে একটী কবিতা রচনা করেন, তাহার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> "The best of queens and the best of *herbs* we owe
> To the bold nation who the way did show
> To the far region where the sun doth rise,
> Whose rich productions we so greatly prize."

বোধ হয় নিম্নলিখিত বাঙ্গালা অনুবাদটী মোটামুটী কবির ভাব প্রকাশ করিবে :—

> বালাকণ-দীপ্তি যথা প্রথম প্রকাশ,
> যে দেশের ধনরত্ন জগতের আশ,
> যে জাতি দেখাল' পথ সে দেশে যাইতে,
> লক্ষ্মী রাণী, সেবা গাছ, পেয়েছি তাহ'তে।

ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যাংশে প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পোর্টুগীজ্-দিগের দ্বারা চা ইংলণ্ডে প্রথমতঃ নীত হইয়াছিল।

সুবিজ্ঞ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আসামের বন্য চা-বৃক্ষই (Thea Assamica) পৃথিবীস্থ সমস্ত চা-বৃক্ষের আদি পুরুষ। আসাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে বন্য চা গাছ দৃষ্ট হয় না। যে চায়ের পাতা আমরা ব্যবহার করি, তাহার বৃক্ষ সাধারণতঃ ৩ ফিট হইতে ৬ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং পাতা গুলি ৩।৪ ইঞ্চ লম্বা হইয়া থাকে। আসামের বন্য চা-গাছ ১৫ হইতে ২০ ফিট উচ্চ এবং উহার পাতা ৯ ইঞ্চের অধিক লম্বা হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার কিড্ (Kyd) ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কলিকাতার উদ্যানে চীন দেশীয় চা-গাছ প্রথম রোপণ করেন। তখন ওয়ারেন হেষ্টিংশ্ ভারত-বর্ষের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। কিড্ সাহেবের স্মৃতি-স্তম্ভ শিবপুরের বাগানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা যাবা দ্বীপে চায়ের বাগান প্রতিষ্ঠিত করেন। উহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেজর ব্রুস্ নামক একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী (সম্ভবতঃ ১৮১৯ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) প্রথমে আসামে চা-বৃক্ষের আবিষ্কার

করেন। তিনি সোসাইটী অব্ আর্টস্ হইতে এই কার্য্যের জন্য একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। যখন তিনি জোড়হাটে অবস্থিতি করিতেন, তখন তত্রত্য জনৈক পার্ব্বত্য দলপতিকে একটী বাদ্যযুক্ত নস্যদান উপহার দিয়া কয়েকটী চা-গাছ সংগ্রহ করেন। তৎপরে সার্ জোসেফ্ ব্যাঙ্কস্, চার্ল্টন্, স্কট্, ব্রুস্, প্রভৃতি অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ আসামে যাঁহাতে বিস্তৃত ভাবে চায়ের চাষ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিস্তর চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্বে চীন হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চায়ের আমদানি হইত; তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চীনের সহিত ব্যবসা করিবার একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই অধিকার ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে লোপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চা সংগ্রহ করিবার অসুবিধা ঘটিবে বিবেচনা করিয়া উক্ত কোম্পানী যাহাতে ভারতে চায়ের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে ও উদ্যোগে ভারতবর্ষে চায়ের চাষের সূত্রপাত হইয়াছিল। লর্ড উইলিযম্ বেণ্টিঙ্ক্ এ বিষয়ের তদন্তের নিমিত্ত একটী কমিসন্ বসাইয়াছিলেন। বিখ্যাত উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ওয়ালিচ্ (Wallich) এই কমিসনের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁহারা আসামে গমন করিয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পর প্রকাশ করেন যে, আসামের জল, বায়ু ও ভূমি চায়ের চাষের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত। অতঃপর চীন দেশ হইতে চায়ের বীজ আনিয়া শিবপুরের বাগানে রোপণ করা হয় এবং চারা জন্মিলে উহাদিগকে আসামে প্রেরণ করিয়া তথায় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্যের নিমিত্ত লণ্ডনে একটী যৌথ-কারবার স্থাপিত হয়। তদবধি আসামে চায়ের চাষ যেরূপ বিস্তৃত ভাবে চলিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি তদ্রূপ নহে। অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও বিপুল মূলধনের সাহায্যে এই ব্যবসায়ে অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং চা ভারতের একটী মহামূল্য কৃষিসম্পদে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই চায়ের চাষ হইতেছে। আসাম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্রাম, হাজারিবাগ, রাঁচি, দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ঢাকা কুমায়ুন, গড়োয়াল ডেরাডুন, সিমলা পাহাড়, কাঙ্গরা, উপত্যকা, নীলগিরি, মদুরা, মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, বিশাখাপত্তন, টঙ্গু, আকায়াব, টাভয়, প্রভৃতি সকল স্থানেই চায়ের চাষ অল্প বিস্তর হইতেছে; তবে আসামে চায়ের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। আসামে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একার্ (১০ লক্ষ বিঘা) জমিতে চায়ের চাষ হইতেছে, ভারতের সমস্ত প্রদেশের চায়ের চাষের জমির মোট পরিমাণ প্রায় ৫,০০,০০০ একার্। আসামে প্রতি একারে ৪০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালা দেশে তদপেক্ষা কিছু কম। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রতি একারে ২০০ হইতে ২৫০ পাউণ্ডের অধিক চা উৎপন্ন হয় না। সমস্ত ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২৪ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়; ইহার মধ্যে প্রায় ১৬ $\frac{১}{২}$ কোটী পাউণ্ড

চা শুদ্ধ আসাম প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। চায়ের মূলধন প্রায় সমস্তই বিলাতী; দুই চারি জন ভারতবাসীর সামান্য অর্থ এই কার্যের জন্য নিযুক্ত আছে।

* আসামের চা-বাগানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী প্রায় ৮ লক্ষ লোক মজুরের কার্য্য করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে; সুতরাং চায়ের চাষ শ্রমজীবি ভারতবাসীর অন্ন-সংস্থানের যে একটী বিশিষ্ট উপায়, ইহা সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখা উচিত। পূর্ব্বে আসামের চা-বাগানের জন্য অধিকাংশ মজুরই আড়কাটি (Cooli contractors) দ্বারা সংগৃহীত হইত। এক্ষণে এই শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা বিস্তর কমিয়া গিয়াছে। এখন অধিকাংশ মজুর ইচ্ছাপূর্ব্বক চা-বাগানে কাজ করিতে গমন করে। আসামের চা-বাগানের ১৯১০ সালের কার্য্যবিবরণীর উপর পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, ঐ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৬৩,২৩৯ জন মজুর চা-বাগানে কাজ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ২০,৮৬৯ জন মজুর আড়কাটিদিগের দ্বারা সংগৃহীত হয়, বাকী মজুরগণ স্বেচ্ছায় চা বাগানের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ১৯০৩ সালে আড়কাটি মজুরের সংখ্যা ৮৪,৩০০ এবং ১৯০৯ সালে ২৬,৭৭৮ জন ছিল, সুতরাং এই শ্রেণীর মজুরের সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। আড়কাটি প্রথা প্রচলিত থাকিলে নানারূপ অত্যাচার ঘটিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট সাহেব এই প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আগামী বৎসর হইতে এই প্রথা রহিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এসম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মন্তব্য হইতে কয়েক পংক্তি পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"It is for the planting community to decide whether they can do without the contractor, and while not desiring to anticipate their decision, the Lieutenant-Governor cannot but hope that it will be in favour of the abolition of this System of recruitment. ... ..."

"It is difficult to avoid the gratifying conclusion that the gradual substitution of *free* for *indentured* labour is tending to remove the prejudice against Assam and to increase the supply of labour."

আসামের চা-বাগানের মজুরদিগের স্বাস্থ্য গত বৎসর বেশ ভাল ছিল—মৃত্যু সংখ্যা হাজারকরা ২৮ জনেরও কম ছিল। কলিকাতা সহরে অনেক সময়ে ইহা অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আসামের চা, চীনের চা'কে কিরূপ স্থানচ্যুত করিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী পাঠ করিলে প্রতীত হইবে:—

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যত চা খরচ হইত, তাহার মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগ চীন দেশ হইতে আমদানি হইত; শুদ্ধ শতকরা ৪ ভাগ মাত্র আসামের চা ভারতে

ব্যবহৃত হইত। ক্রমে আসামের চা শতকরা ৪ ভাগ হইতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ১৯০৬ সালে শত করা ৫১ ভাগে দাঁড়াইয়াছে এবং চীনের চা শতকরা ৯৬ ভাগ হইতে ক্রমে ৩ ভাগে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। বাকী অংশ সিংহল ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন চা দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।

আমি যে চা-বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে ৫৮০ একার্ (১৬৪০ বিঘা) জমিতে চা'য়ের আবাদ হয়। এখানে পাহাড়ের গায়ে ঢালু জায়গায় চা-গাছ রোপণ করা হয়। চায়ের বীজ ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বপন করা হয়। চারা গাছ উৎপন্ন হইলে সে গুলি ১ $\frac{১}{২}$ বৎসর কাল নার্সারীর (Nursery) মধ্যেই থাকে। তৎপরে তাহাদিগকে পাহাড়ের গায়ে ৪ ফিট অন্তর একটি করিয়া রোপণ করা হয়। গাছে জল দিবার প্রয়োজন হয় না, তবে জমিতে মধ্যে মধ্যে সার দিতে হয়। মাষ কলাইয়ের গাছ রেড়ির খোল, গোবর, পাতা-পচা-মাটী প্রভৃতি পদার্থ চা গাছের সার রূপে ব্যবহৃত হয়। চা গাছ সহজে মরে না। যে বাগান আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে ৩০ বৎসর বয়স্ক গাছ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এখনও তাহা হইতে পাতা সংগ্রহ হইতেছে। শীত কালে মাঝে মাঝে গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয়। গাছটী তিনি বৎসরের হইলেই উহা পাতা সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত হয়। চা-গাছ সমতল ভূমি হইতে ৬০০০ ফিট উচ্চে ভাল রূপে জন্মে না; ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চস্থানে ইহা বেশ ভালরূপে জন্মে। তবে যে কেবল পার্ব্বত্য ভূমিতেই চা জন্মে, তাহা নহে, উচ্চ সমতল ভূমিতেও চা বেশ হয়,—যেমন আসাম, তেরাই প্রদেশ, জলপাইগুড়ি, ইত্যাদি। তবে সমতল ভূমিতে চা-গাছের বাড় খুব বেশী ও অনেক পাতা হয়, কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমিতে চা-গাছ ছোট হইলেও উহার সুগন্ধ খুব বেশী, এই জন্য ইহার আদরও অধিক।

চা গাছের চাষ ও পাতা সংগ্রহ।

যে জমিতে অধিক উদ্ভিদ্ বা জীবজ পচনশীল পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে চা-বৃক্ষ সুন্দররূপে জন্মে। অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু বা অত্যন্ত শীতল বায়ু চায়ের চাষের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। বৎসরে ৮০ হইতে ১০০ ইঞ্চ বৃষ্টিপাত হইলে চায়ের পক্ষে হিতকর।

ব্লুমফিল্ড্ চা-বাগানে প্রায় ৫০০ মজুর চায়ের পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা সকলই আছে। প্রত্যেকের পৃষ্ঠে এক একটী বেতের ঝুড়ি ঝুলান আছে; ঝুড়িটী দড়ি কিম্বা ফিতা দিয়া কপালে আটকান থাকে। এ দেশের লোকে, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই এইরূপ ভাবে মোট বহিয়া থাকে। মোটের নীচের দিকে একটী দড়ি লাগাইয়া ঐ দড়িটী কপালে আটকাইয়া দেয় এবং এইরূপে মোট পৃষ্ঠে বহন করিয়া পার্ব্বত্যপথে অনায়াসে আরোহণ করিয়া থাকে। এদেশে স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই অতিশয় বলিষ্ঠ; ইহাদিগের শারীরিক

গঠন ও সামর্থ্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহারা এখানে "পাহাড়ী" নামে পরিচিত, এবং জাতিতেই হিন্দু। আমাদের ন্যায় দুর্গা পূজা ইহাদেরও জাতীয় উৎসব।

চা-বাগানে যে সকল মজুর কাজ করে, তাহারা বয়স ভেদে স্বতন্ত্র বেতন পাইয়া থাকে। বালক বালিকা দিগের মাসিক বেতন ৩৲, স্ত্রীলোকদের ৪৷৷০, পুরুষের ৫৲। প্রত্যেককে দিবসে দুই বার করিয়া বাগান হইতে চা'র পাঁতা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। সকালে বাগানে যাইয়া বেলা ১২ টার সময় পাতা লইয়া আইসে; তৎপরে আহারাদি শেষ করিয়া বাগানে যাইয়া বেলা ৫ টার সময় পুনরায় পাতা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আইসে। প্রত্যেক বারে পাতা ওজন করিয়া লওয়া হয়। এক এক জন মজুরকে অন্ততঃ ৪ সের পাতা প্রত্যেকবারে সংগ্রহ করিতে হয়। মজুরদিগকে সাবধানের সহিত কচি পাতা সংগ্রহ করিতে হয়; দুইটী কচি পাতা এবং তন্মধ্যে যে একটী ক্ষুদ্র পত্র-মুকুল থাকে, তাহাই এক সঙ্গে ছিঁড়িয়া লইতে হয়। পাকা পাতা বা বড় পাতায় কোনও কাজ হয় না। আমরা প্রায় বেলা বারটার সময় বাগানে গিয়াছিলাম; তখন মজুরেরা পাতা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিল। তাহাদের ঝুড়িতে যে পাতা ছিল, তাহা আমরা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, যেটী খুব বড় পাতা, তাহা দুই ইঞ্চের অধিক লম্বা নহে এবং ছোট পাতা গুলি লম্বায় এক ইঞ্চেরও কম; সকল গুলিই খুব কচি।

চা-গাছ এক জাতীয় নহে। আমরা যে বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাতেই তিন চারি রকমের চা-গাছ রহিয়াছে। প্রথমতঃ চীনের চা, যাহা চীন দেশে জন্মায়; দ্বিতীয়তঃ আসামের চা, উহা আসামে জন্মিয়া থাকে। আসামের চা আবার দুই প্রকারের, দেশজ (Indigenous) ও বর্ণ-শঙ্কর (Hybrid)। এই বাগানে চীনের চা-গাছই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। আসামের চা-গাছ হইতে অধিক পরিমাণে পাতা সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু উহা চীনের চা হইতে গুণে অপকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন নামের চা বাজারে বিক্রয় হইতে দেখি—যেমন Flowery Pekoe, Pekoe, Pekoe Souchong ইত্যাদি,—তাহাদিগের সকলগুলিই একই চায়ের পাতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেবল পাতা সরু মোটা ভেদে এবং উহার সহিত যে মুকুলের অংশ মিশ্রিত থাকে, তাহার পরিমাণ ভেদে উহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন ভিন্ন দাম হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে চা-গাছ ক্যামেলিয়া থীয়া (Camellia Thea) নামে পরিচিত, ইহা ৫।৬ ফিটেরও অধিক উচ্চ হইয়া থাকে। এক একটি গাছ এক একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ন্যায়, বিস্তর ডাল পালা ও অসংখ্য পাতার দ্বারা পরিবৃত। গাছ গুলি পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজান থাকে; দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দর। চা-গাছ গুলি হঠাৎ দেখিলে গন্ধরাজ গাছের মত মনে হয়। পুরাতন পাতা গুলি খুব মোটা ও শক্ত এবং উহা

দিগের রং গাঢ় সবুজ; ধার গুলি করাতের দাঁতের মত কাটা। কচি পাতা গুলি নয়ন প্রীতিকর হরিদ্বর্ণের, অতি কোমল ও পাতলা। গাছের ডাল গুলি খুব শক্ত এবং পাতা গুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট। গাছ গুলি ৫।৬ বৎসরের হইলে ফুল হয়। ফুল গুলি অনেকটা বাতাবি লেবুর ফুলের মত; ভিতরে ৫ হইতে ৯ টী সাদা পাবড়ি এবং বাহিরে তিনটী ঈষৎ হরিদ্বর্ণের পাবড়ি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। ফুলের মধ্যে একটি লম্বমান বীজ-কোষ ও তাহার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক হরিদ্রাবর্ণের পরাগ-কোষ বিদ্যমান থাকে। যথাকালে ফুলে সামান্য মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। চা-পাতা, গাছ হইতে তুলিয়া হাতে রগড়াইলে তাহাতে চায়ের গন্ধ কিছু মাত্র পাওয়া যায় না। চায়ের ফল গুলি এক

চা-গাছ।

একটি সুপারির মত কিন্তু গোল নহে, ত্রিশির। ভাঙ্গিলে ভিতরে পাটলবর্ণের তিনটি বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। বীজ গুলি দেখিতে অনেকটা গোলাপ জামের বীজের মত। এই বীজ বপন করিলে চা-বৃক্ষ জন্মায়।

শুকান (Withering)।—চায়ের পাতা পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে সংগৃহীত হইলে প্রথমতঃ উহাকে রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহযুক্ত স্থানে আপনা আপনি শুকাইবার জন্য বৃহদাকারের ডালাতে বিছাইয়া রাখা হয়। বর্ষা কালে উহাকে গৃহের মধ্যে গরম বাতাসে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। একটি বিস্তৃত গৃহে পর পর অনেক গুলি

কাঠের সেল্‌ফ্‌ সাজান' থাকে। আমরা যে ঘরে গিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ১৫ টি সেল্‌ফ্‌ ছিল। প্রত্যেক সেল্‌ফে অনেকগুলি তাক থাকে এবং তাকের তল-দেশ সূক্ষ্ম-লৌহ-জাল-বেষ্টিত ও উহা দুই ধারে গড়ান'। এই লৌহ জাল Hessian cloth নামে পরিচিত। তাকের উপর কাঁচা পাতা সাজাইয়া রাখা হয় এবং যন্ত্র-বিশেষের সাহায্যে ঘরের এক প্রান্ত হইতে ক্রমাগত ঈষদুষ্ণ বায়ু গৃহমধ্যে প্রবাহিত করা হয়। এইরূপে উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে চায়ের পাতা গুলি প্রথমতঃ নরম হইয়া পড়ে, সুতরাং গুটাইবার সময় ভাঙ্গিয়া যায় না; তৎপরে কিয়ৎ পরিমাণে শুষ্ক হইলে পর উহাদিগকে আড়াআড়ি ভাবে গুটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। একটী দ্বিতল গৃহের মধ্যে পাতা শুকান হয়; শুষ্ক পত্রগুলি লম্বমান কাপড়ের থলির মধ্যে পুরিয়া মেঝের মধ্যস্থিত একটি ছিদ্র দ্বারা নিম্ন-তলে গুটাইবার জন্য ফেলিয়া দেওয়া হয়।

চায়ের পাতা প্রস্তুত করণ।

গুটান (Rolling)।—কখন কখন হস্ত দ্বারা পাতা গুটান হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর যে যন্ত্রের দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার নাম Rolling machine। এই যন্ত্রের নিম্ন প্রদেশে এক খানি পুরু কাঠের তক্তা আছে; ইহার উপর যেমন পাতা গুলি আসিয়া পড়িতে থাকে, অমনি উক্ত যন্ত্র সংলগ্ন নোড়ার মত কয়েকটি গোলাকার পেষণী দ্বারা তক্তার উপর পাতা গুলি পিষ্ট হইতে থাকে এবং উহারা আড়াআড়ি ভাবে গুটাইয়া যায়। পাতা গুলি অর্দ্ধঘণ্টা এই ভাবে পিষ্ট হইলে পর আপনা আপনি যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া পড়ে। পেষা পাতাতে সামান্য পরিমাণ সুগন্ধ পাওয়া যায় মাত্র। পাতা পিষিবার সময় উহা হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, ঐ রস পাতার মধ্যেই শুকাইয়া লওয়া হয়। গুটাইবার সময়, অনেক পাতা একত্রে জড়াইয়া যায়, এজন্য যন্ত্র হইতে বহির্গত হইলে, হাত দিয়া একটী একটী করিয়া পাতা গুলি ছাড়াইয়া লওয়া হয়। যে পাতা গুলি ভাল গুটান হইয়াছে, তাহাদিগকে লৌহ-জাল-নির্ম্মিত ঝুড়িতে পৃথক্ করিয়া রাখা হয়; অপর পাতা গুলি পুনরায় Rolling Machine এর মধ্যে ফেলিয়া ভাল করিয়া গুটাইয়া লওয়া হয়।

গাঁজান' (Fermenting)।—পাতা গুলি গুটান হইলে তাহাতে জলের আছড়া দিয়া শীতল গৃহের মধ্যে কাপড়ের থলের, ভিতর কয়েক ঘণ্টা কাল রাখিলে উহারা গাঁজিয়া উঠে। রীতিমত গাঁজিয়া উঠিলে উহাদিগের রং বদলাইয়া যায়; তখন পাতাগুলি আর সবুজ দেখায় না, উহাদিগের রং তামার মত হয়।

শুকান (Drying)।—পাতা গুলি গাঁজিয়া উঠিলে পর, উহাদিগকে উত্তাপ সংযোগে একেবারে নীরস ও শুষ্ক করা হয়। এই কার্য্য যন্ত্র বিশেষ দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের মধ্যে বিস্তর তাক থাকে, তাহার উপর পাতা গুলি বিছাইয়া দেওয়া হয়। যন্ত্র চালাইলে এই তাক গুলি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। নিকটে অনেক গুলি

উনান জ্বালান হয় এবং তন্মধ্য হইতে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ু এই যন্ত্রের মধ্যে সঞ্চালিত করা হয়। উষ্ণ বাতাসের তাপ-মাত্রা ২৪০° হইতে ২৬০° পর্য্যন্ত রাখা হয়। উত্তাপ ও উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে চায়ের পাতা গুলি কৃষ্ণ-বর্ণ ধারণ করে, এবং সম্পূর্ণ নীরস হইয়া মড়্ মড়ে হয়। ঐ বাগানে যে যন্ত্রে পাতাগুলি শুষ্ক করা হইতেছে, তাহার নাম Viotoria Drying Machine.

যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অনেক সময়ে হাতে করিয়া পাতা শুকান হইয়া থাকে। একটি উনানের উপরিভাগে উপর্য্যুপরি অনেক গুলি কাঠের তাক এরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখা হয় যে, হাত দিয়া সেগুলি সহজে নাড়া চাড়া করা যায়। এই সকল তাকের উপর পাতা রাখিয়া ১৮০° হইতে ২০০° তাপ-মাত্রায় পাতা শুকান হয়।

কাটাই (Cutting) ।—পাতা গুলি এইরূপে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে যন্ত্রবিশেষ দ্বারা উহাদিগকে সমভাবে কর্ত্তন করা হয়। এই রূপে কর্ত্তিত হইলে পাতা গুলি ছোট ও এক মাপের হইয়া থাকে।

বাছাই (Sorting) ।—শুকান পাতার সঙ্গে অনেক সময় গাছের ছোট ছোট ডালপালা ও অন্য প্রকার আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা হস্ত দ্বারা ইহাদিগকে একটি একটি করিয়া বাছিয়া ফেলিয়া দেয়।

এই বার মোটা ও সরু পাতা পৃথক্ করিবার প্রয়োজন হয়। আমরা যে বিভিন্ন নামের চা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা একই পাতা হইতে প্রস্তুত হয়, কেবল মোটা ও সরু ভেদে এবং যে পরিমাণ মুকুল (Leaf bud) পাতার সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহার পরিমাণ-অনুসারে উহাদিগের গুণ ও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। যে পাতা যত সরু হয় এবং তাহাতে যত অধিক পরিমাণে মুকুল মিশ্রিত থাকে, তাহা ততই উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। যে যন্ত্রে সরু ও মোটা পাতা বাছাই করা হয়, তাহা দেখিতে এক একটা ঢাকের মত, তবে তাহার চতুর্দ্দিকই সূক্ষ্ম লৌহ-জালের দ্বারা বদ্ধ। এই লৌহজাল চালুনির কার্য্য করে। কলের দ্বারা অনেক গুলি ঢাক এক সঙ্গে ঘুরান হয়। শুষ্ক চায়ের পাতা তন্মধ্যে স্থাপন করিয়া যন্ত্র ঘুরাইলে সরু পাতা ও মুকুলের সূক্ষ্ম-অংশগুলি ছাঁকনির বাহিরে আসিয়া পড়ে। সকল ছাঁকনির ছিদ্র সমান নহে—কোন ছাঁকনির ছিদ্র খুব সূক্ষ্ম, অপর কয়েকটার তদপেক্ষা স্থূল এবং অন্যগুলির ছিদ্র আরও স্থূল। ছিদ্রের পরিমাণ অনুসারে বিভিন্ন প্রকার সরু ও মোটা চা পৃথক হইয়া বাহিরে পতিত হয়।

বাক্সবন্দি (Packing) ।—সরু, মোটা চায়ের পাতা এইরূপে বাছা হইলে পর বিক্রয়ের স্থানে পাঠাইবার জন্য ছোট ও বড় কাঠের বাক্সে পুরিয়া ফেলা হয়। বাক্সে পুরিবার পূর্ব্বে চায়ের পাতা গুলি পুনরায় উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয় এবং গরম থাকিতে থাকিতেই উহাদিগকে বাক্সবন্দি করা হয়। ১০ পাউণ্ড হইতে ২০০

প্যাউণ্ড পর্য্যন্ত চা কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা যায়। এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট টিনের বাক্সেও অল্প পরিমাণ চা রক্ষিত হয়। আমরা যাঁহাদের চা'য়ের বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম, তাঁহাদের চা এদেশে বিক্রীত হয় না, সমস্তই বিলাতে চলিয়া যায়।

সচরাচর দুই প্রকারের চা দেখিতে পাওয়া যায়, সবুজ ও কাল। এই দুই প্রকারের চা এক গাছেরই পাতা হইতে উৎপন্ন হয়, কেবল প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভেদে উহাদের বর্ণের পার্থক্য উৎপন্ন হয়। যদি চায়ের পাতা সংগ্রহ করিবার পরই উহাকে অতি শীঘ্র শুকাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহার স্বাভাবিক সবুজ বর্ণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না; এই চা, সবুজ চা (Green tea) বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু যদি চায়ের পাতা কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া অল্পে অল্পে শুষ্ক করা হয়, তাহা হইলে সেগুলি গাঁজিয়া যায়। এই চা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইলে পর উহার বর্ণ কৃষ্ণ হয়; ইহাই কাল চা (Black tea) বলিয়া বিক্রীত হয়। সবুজ চা অপেক্ষা কাল চায়ের ব্যবহার অধিক বিস্তৃত।

সবুজ চা ও কাল চা।

বর্ণ ব্যতীত এই দুই প্রকার চায়ের মধ্যে গুণ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। চা উষ্ণ জলে ছাড়িয়া দিলে পাতার রং, গন্ধ ও স্বাদ জলে সংক্রামিত হয়। চায়ের প্রকারভেদে জলের বর্ণের প্রভেদ হইয়া থাকে। সবুজ চায়ের জল ঈষৎ হরিদাভ পীত বর্ণ হয়, কাল চায়ের জল রক্ত বর্ণ হইয়া থাকে। গন্ধ উভয়েরই সমান, তবে সবুজ চায়ের জলে বোধ হয় চায়ের সুগন্ধ একটু বেশী থাকে, কিন্তু আস্বাদনে কাল চা সবুজ চা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চায়ের মধ্যে এক প্রকার তৈল সামান্য পরিমাণে থাকে, উহা দ্বারাই চায়ের সুগন্ধ হয়।

যে সকল নামে কাল এবং সবুজ চা বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—

কাল চা—ফ্লাওয়ারি পিকো, অরেঞ্জ পিকো, পিকো, পিকো সাউচাং, সাউচাং, কঙ্গাব, বোহিয়া।

সবুজ চা—গন্ পাউডার, ইম্পিরিয়াল্, হাইসন্, ইয়ং হাইসন্, হাইসন্ স্কিন্, জেনার।

চা খাইবার উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারা শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া ঈষৎ উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি জন্মে, এজন্য পরিশ্রমের পর চা খাইলে শরীর উত্তেজিত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। পূর্ব্বে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, চা শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে, সুতরাং চা ব্যবহার করিলে, যথা পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের আবশ্যক হয় না এবং এইরূপে চা গৌণভাবে খাদ্যের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এ বিশ্বাস এখন ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ডাক্তার-স্মিথ্ বলেন যে চায়ের দ্বারা শরীরের ক্ষয় নিবারিত না হইয়া বরং উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কারণ চা উত্তেজক বলিয়া উহার ব্যবহারে শ্বাস-ক্রিয়া দ্রুত

চায়ের গুণাগুণ।

ভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে, সুতরাং শারীরিক দহন-ক্রিয়া অধিকতর ক্ষিপ্র-ভাবে সম্পাদিত হয় বলিয়া শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। তবে তিনি বলেন যে, ইহা ভুক্ত দ্রব্যকে সহজে শরীর মধ্যে গৃহীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে, সুতরাং যদি উপযুক্ত পরিমাণ সারবান খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে চা পান করিলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। কিন্তু যদি সারবান খাদ্যের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত না হয়, তাহা হইলে চা দ্বারা শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা মনে করেন যে, চা খাইলে সাময়িক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় বলিয়া উহা আহার্য্য বস্তুর স্থান অধিকার করিতে সমর্থ, তাঁহাদের ধারণা ভ্রম শূন্য নহে। চা প্রকৃত পক্ষে খাদ্য নহে।

অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়। চায়ের মধ্যে ট্যানিন্ (Tannin) নামক একটী ধারক (Astringent) পদার্থ আছে ; ইহা দ্বারাই কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণ উপস্থিত হয়। চা যত অধিক "কড়া" হয়, ততই ট্যানিন্ অধিক পরিমাণে উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, এই জন্য "কড়া" চা খাওয়া কোন মতেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। যাঁহাদের কোনরূপ হৃদ্‌রোগ আছে অথবা হৃৎস্পন্দনে কষ্ট পান অথবা যাঁহারা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগে আক্রান্ত, চা তাঁহাদের পক্ষে অনিষ্টকর। কফি বীজের মধ্যে যেমন কেফিন্ (Caffeine) থাকে, সেইরূপ চায়ের পাতার মধ্যে টীন্ (Thein) নামক একটী উত্তেজক সার-পদার্থ (Stimulant) আছে ; ইহাই চায়ের উত্তেজনা গুণ প্রদান করে। যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না, তথায় অল্প পরিমাণ চা জলে ফেলিয়া ঐ জল ফুটাইলে জলের অনেক দোষ কাটিয়া যায়।

অতিশয় পাতলা চা পান করাই প্রশস্ত। ফুটন্ত জল চায়ের উপর ঢালিলে যে অল্প লাল রংএর জল হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ ছাঁকিয়া পান করিলে কোন দোষ হয় না। আহার করিবার সময় (বিশেষতঃ মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির সহিত) চা পান করা উচিত নহে। এ সময়ে "কড়া" চা পান করিলে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

চা ভাল কি মন্দ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কতকগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে—ইহারা টি-টেষ্টার্ (Tea taster) নামে পরিচিত। নানা প্রকারের চা গরম জলে অল্পক্ষণ ফেলিয়া সেই জল পান করিয়া, কোন্ চা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্টী নিকৃষ্ট তাহা তাহারা সহজে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। প্রত্যেক চা ব্যবসায়ীর অধীনে এই কার্য্যের জন্য এক বা ততোধিক সুদক্ষ টি-টেষ্টার্ নিযুক্ত থাকে।

শ্রী চুনী লাল বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্।

তাম্বূল।

আমাদের সভ্যতার ও আতিথ্যের প্রধান উপকরণ তাম্বূল। ভারতের অতি দরিদ্রেরও পান ব্যতীত দিন অতিবাহিত হওয়া বড়ই কষ্টকর। পান ভারতের সভ্যতার, আন্তরিকতার, বা যত কিছু সৌজন্যের বন্ধন-স্বরূপ হইয়া, ভারতবাসীকে এরূপে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, পান ব্যতীত ভারতবাসীর কোন কিছুরই অস্তিত্ব বোধ হয় অসম্ভব। পানের পাতা, দেখিতে সেরূপ বর্ণ রঞ্জিত, কিম্বা কোনরূপ সুমিষ্ট গন্ধ-বিশিষ্ট নহে। তথাপি পান ভারতের ধনী দরিদ্র, সকলেরই পরম উপাদেয় নিত্য-ভোগ্য পদার্থের প্রধানতম হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় কবিগণের প্রধান গ্রন্থের কোন না কোন স্থলে পানের উক্তি অবশ্যম্ভাবী। রমণীর পরম আদরের বস্ত পান। পান-রস-সিক্ত মুখে কথা কহিবার সময় ভারতের নরনারী যেরূপ আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা এক ভারতবাসী ভিন্ন কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কবিরাজের নানাবিধ বটিকার অনুপান পান-রস। হাকিমি চিকিৎসক, ভোজনের অব্যবহিত পরেই, পান চর্ব্বণ করিবার জন্য রোগীকে উপদেশ দেন। হিন্দুর নৈবেদ্যের প্রধান উপাদান— পান। হিন্দুর বিবাহ বা যত কিছু মাঙ্গলিক ক্রিয়া কলাপ, পান ব্যতীত কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এমন কি আমাদের দেশের ইতর লোকের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসও আছে যে, পানের শক্তি দ্বারা ভূত প্রেত বশীভূত করিয়া, লোকে অপরের ইষ্টানিষ্ট পর্য্যন্ত সংসাধিত করিতে পারে। তাহাদের মতে পান বশীকরণের প্রধানতম যন্ত্র-স্বরূপ। শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের নিকট পান অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। একটা পান খাইতে পাইলে, তাহাদের দুই ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রমের ক্লান্তি নষ্ট হয়। এই কারণে পানের ব্যবসা চালাইয়া কলিকাতার অনেক দরিদ্র ব্যক্তি জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। অতি দরিদ্র গৃহস্থের আলয়ে ধনবান কোন লোক উপস্থিত হইলে, আর কিছু না হউক দরিদ্র ধনীকে পান দিয়াও আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। পান বাস্তবিকই আমাদের একরূপ সামাজিক বন্ধন, পান বিতরণ মান্য প্রদর্শনের পথ-স্বরূপ। হিন্দুরাজ সভায় "গুয়া পান"ই অভ্যর্থনার প্রধান অঙ্গ ছিল।

পানের বহুল প্রচলনের ফলে নানাবিধ অনিষ্টপাতও হইয়া থাকে! টেঁপে পান খাওয়াইয়া জ্ঞানহীন করতঃ কত দস্যু লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে। ভারতের ইতিহাস-অভিজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে, সূর্য্যমল্লের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পরেই পৃথ্বীরাজ তাঁহার নিকট হইতে পান গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুন্দীর রাজ্যের উর্শিরাণ),

শালুখিয়ার অধীশ্বরের প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়িলে, তাহার বিদায় কালে তাহাকে তাম্বুল গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন; তিনি বাধ্য হইয়া পান খাইলেন বটে, কিন্তু তিনি জানিতেন যে পান হলাহল-পূর্ণ ছিল। সেই জন্য বলিলেন —আমার এই তাম্বুল গ্রহণ হয়ত, আপনার ও আপনার বংশের সকলেরই কণ্টকস্বরূপ হইয়া পড়িবে।

পান প্রথম কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আজ পর্য্যন্তও নির্ণীত হয় নাই। ভারতে পান বহুকাল হইতে প্রচলিত। গ্রীক পণ্ডিত ডায়সকোরাইড্‌সও পানের ব্যবহার জানিতেন। কালীদাস বর্ণনা করিয়াছেন যে, রঘুর সৈন্যগণ পান-পত্রে সুরা পান করিয়াছিল। হিন্দুর প্রধান গ্রন্থ "সর্ব্ব-কর্ম্ম-পদ্ধতি"তে পানের বারম্বার উল্লেখ রহিয়াছে। এরূপ নানা কারণে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতেই পান প্রথম আবিষ্কৃত হয়; পরে অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্বুল। পারসীকগণও ইহাকে তাম্বুলী নামে অভিহিত করে।

পানের জন্য আর একটি অতি প্রয়োজনীয় শিল্পও এ দেশে পরিচালিত হইয়াছে। সেটি পানের ডিবিয়া বা পানের কৌটা। সুবর্ণ রজত, পিত্তল, হস্তি-দন্ত, ইত্যাদি নানা প্রকার পানের কৌটা বৎসর বৎসর রাশি রাশি প্রস্তুত হয়। গোটা পান ও মসলা রাখিবার ডাবর ইত্যাদিও আর একটি প্রয়োজনীয় শিল্প। ডাবর সাধারণতঃ পিত্তলেরই হইয়া থাকে।

তাম্বুলের * ভাষা নাম। বাংলা—পান; হিন্দি—নাগরবেল; মহারাষ্ট্র—নাগবেল; গুজরাটী—নাগরবেল্ল, পান; কর্ণাটী—নাগরবল্লী, পর্ণ: তৈলঙ্গী—তামলপাকু; তামিলি—বেটিলী; ইত্যাদি। তাম্বুলের অন্বর্থ সংজ্ঞাগুলি বড়ই অর্থকরী। যথা, "মুখরাগকরী," "কামজননী," "আমোদ জননী," "শ্রম-ভঞ্জনী", "তীক্ষ্ণমঞ্জরী", "সপশিরা", "ভক্ষ্যপত্রী," ইত্যাদি। তাম্বুলের ভেদ,—ধন্বন্তরি, শুভ্র কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার তাম্বুলের উল্লেখ করিয়াছেন। নরহরি বলিয়াছেন—"সা শ্রীবাটাম্লাদিবাটাদিনানাগ্রামস্তোমস্থানভেদাদ্বি-ভিন্না। একাপ্যেষা দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কায়ে গুণে চ"। নানা দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকার গুণে তাম্বুল আকার, বর্ণ ও গুণের বিশিষ্টতা লাভ করিয়া থাকে। নরহরি সাত প্রকার তাম্বুলের উল্লেখ করিয়াছেন, —যথা শ্রীবাটী, অম্লবাটী, সতসা, গুহাগরে, অম্লসরা, পটুলিকা ও বেহসনীয়া। ইহাদের মধ্যে গুহাগরে এবং অম্লসরা,—সুগন্ধি তাম্বুল। অম্লসরা মালবে (মালোয়া), পটুলিকা অন্ধ্রদেশে (উড়িষ্যার পশ্চিম) এবং বেহসনীয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশে জন্মে। গুহাগর দেশের পানের নাম গুহা-গরে,—এই দেশে সুপারী ও পান উভয়ই প্রচুর জন্মিত। আবাদের প্রণালী ভেদে অধুনা পান দুই প্রকার। এক প্রকার পান বোরোজে পালিত হয়, অপর বৃক্ষাদি আশ্রয় পূর্ব্বক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুচবিহার ও আসাম অঞ্চলে প্রথমোক্ত জাতি বারুই পান এবং শেষোক্ত গাছ পান নামে প্রসিদ্ধ। গাছ পানের আকার প্রকার দেখিয়া অনুমান হয়,

* "বনৌষধি দর্পণ" হইতে গৃহিত।

উহা কুম্ভ্যৎকর্ষবশাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত চবিকা (৫) মাত্র। গাছ পান ক্ষুদ্রাকৃতি, নিতান্ত কটু, এবং ইহার ছিবড়ে অধিক। বরজে পালিত পান নানা প্রকার, নরহরি যথার্থই বলিয়াছেন, "দেশমৃৎস্নাবিশেষান্নানাকারং যাতি কায়ে গুণে চ।" অধুনা বঙ্গে নানা স্থানে পানের আবাদ হয়—কিন্তু কুণ্টে বাঁটুল দেশের সুগন্ধি পানের তুল্য উপাদেয় পান বঙ্গের কুত্রাপি জন্মে না। শালিগ্রাম বৈদ্য ছয় প্রকার পানের উল্লেখ করিয়াছেন— "বংগলা" "মৌহুবা," "মহাবাজ্যুর", "বিলৌআ," "কপূরী" "ফুলবা"। ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র। মাত্রা স্বরস ½ হইতে ২ তোলা। বৈদ্যকে তাম্বুলের ব্যবহার —বঙ্গসেন—শ্লীপদে (শোথ রোগ) তাম্বুল—সাতটী তাম্বুল পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে তপ্ত জলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। (শ্লীপদ—চিঃ)। বক্তব্য—চারক, "দশেমানি" কিম্বা সৌশ্রুত দ্রব্য সংগ্রহণীয় অধ্যায়ে তাম্বুল পঠিত হয় নাই। চরক মাত্রাশিতীয়ে এবং সুশ্রুত "অন্নপান বিধি"তে তাম্বুলের উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চর্ব্বণার্থ তাম্বুল ব্যবহৃত হইতেছে। আহারের পরবর্ত্তী কৃত্যের উপদেশ কালে সুশ্রুত বলিয়াছেন—"তাম্বুলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্বা বিচক্ষণঃ। ভুক্ত্বা রাজবদাসীত যাবদন্নক্লমোগতঃ।" (সুঃ ৪৬ অঃ)। চারক কিম্বা সৌশ্রুত স্থাবর-তৈল-যোনিবর্গে তাম্বুল পঠিত হয় নাই। নব্যমত—পান উষ্ণ, পাচক এবং পচন-নিবারক (antiseptic)। ইহা উদাবাধ্মান, মুখ দৌর্গন্ধ, গ্রহণী, অজীর্ণ, শূল, প্রভৃতি রোগে, বিশেষতঃ চর্ব্বণার্থ ব্যবহৃত হয়। পান চোয়াইলে দুই প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যাহা ফিকে বঙ্গের, সুগন্ধি এবং উদ্বেয় (উবিয়া যায়) তাহা তাম্বুল তৈল (Betel oil), আর যাহা অতি উদ্বেয় তাহার নাম "চবিএল"। চবিএল মহান্ পচন-নিবারক। ইহা কার্ব্বলিক এসিড অপেক্ষা পঞ্চগুণ এবং এক্রিনল অপেক্ষা দ্বিগুণ তীব্রতর। পানের রসও পচন নিবারক। ইহা শ্লেষ্মা রোগে হিতকর এবং রোহিণী প্রভৃতি গলরোগে হিতকর। (আর, এন, ক্ষোবি, ২য় অঃ ৫১৬ পৃ.)। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে তাম্বুলের তৈল কফীয় পীড়া এবং গল, বাগিন্দ্রিয় ও শ্বাসনাড়ী শাখার (Bronchi) প্রদাহে বিশেষ উপকারী। ইহার পচন-নিবারণী শক্তি আছে। রোহিণীতে (Diphtheria) ইহার কবল ও ধূম গ্রহণ করান হইয়াছে। ১০০ ড্রাম অত্যুষ্ণ জলে ১ ফোঁটা তৈল দিয়া তদুত্থিত ধূম আঘ্রাত হইয়াছিল। এ দেশে ১ বিন্দু তৈলের পরিবর্ত্তে ৪ টী পানের রস দেওয়া যাইতে পারে। (ডাইমক্, ১ম অঃ ১৮৬ পৃঃ।) পান এতদ্দেশীয় গাহস্থ্য ঔষধ। শিশুর কোষ্ঠ বদ্ধে ও উদরাময়ে দাস্তের জন্য পানের বোঁটায় তৈল মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করান হইয়া থাকে। তাম্বুল পত্র শঙ্খদেশে (Temples) স্থাপন করিলে শিরঃ পীড়া প্রশমিত হয়, গ্রন্থি স্ফীতি কিম্বা প্রসূতির স্তনে স্থাপন করিলে, স্ফীতি বিলীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং স্তন্য স্রাব রোধ করে। তাম্বুল পত্রে ক্ষত আচ্ছাদিত হইলে ক্ষত শুদ্ধি হয়। (উদয় চাঁদ দত্ত, ২৪৪ পৃঃ।)"

আমাদের দেশে পান প্রধানতঃ চর্ব্বণ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার রস উষ্ণতা-গুণ-সম্পন্ন, তীব্র, উত্তেজক, পাকস্থলীতে পাচক-রস (gastric juice) বর্দ্ধিত করে, এবং খাদ্য পরিপাক কার্য্যে সহায়তা করে। ইহা অতিশয় পচন-নিবারক, মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে, রসনার লালা (saliva) বর্দ্ধিত করে, কাজেই মুখ গহ্বরস্থিত যে সমস্ত পদার্থ গলিত হইবার উপক্রম করিতেছে, তৎসমুদয়ই ধৌত করিয়া ফেলে। কেবল ওষ্ঠ রঞ্জিত করিবার জন্যই পান ব্যবহৃত হয় না, কেননা অনেক স্থলে ওষ্ঠের স্বাভাবিকই বর্ণই রক্তিমাভ, কিন্তু দন্তের মধ্যগত খাদ্যকণা সমূহ দূরীভূত করিবার জন্য—কাজেই মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করিবার জন্য—পান চর্ব্বণ অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সহযোগে এই সমস্ত দন্তগত খাদ্য পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে নানা প্রকার রোগের লক্ষ লক্ষ জীবাণু নয়ন গোচর হইবে। অনেকে দন্তে এবং ওষ্ঠে একরূপ দাগ ধরে বলিয়া পান চিবাইতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু পান চর্ব্বণের পর মুখ কুলি করিয়া ধুইয়া ফেলিলে দন্ত কিম্বা ওষ্ঠ রঞ্জিত হয় না। অথচ পান খাওয়ার উপকারিতা সর্ব্বপ্রকারে পাওয়া যাইয়া থাকে। পানের লাল রং স্থায়ী নহে, শীঘ্র ধৌত হইয়া যায়। পানের পাতা গরম করিয়া ও খাঁটি সরিসার তৈল লাগাইয়া শিশুর বক্ষঃস্থলে স্তরে স্তরে প্রয়োগ করিলে অতি কষ্ট কফ সরল হইয়া যায়। কফ ও ডিস্‌পেপসিয়া প্রভৃতি রোগে ডাক্তার ওয়ারিং (ভারত ভৈষজ্যের একজন প্রধান মর্ম্মজ্ঞ) পান ব্যবহার করিয়া অতিশয় সুফল পাইতেন। পানের উপরি ভাগে গরম গব্য ঘৃত মাখাইয়া ফোড়ার মুখে দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। চুণের সহিত পানের রস মিশ্রিত করিয়া গলদেশে লাগাইলে অতি কষ্ট-দায়ক কাশিতে অত্যন্ত আরাম হয়। লোকের বিশ্বাস পান অধিক চিবাইলে জিহ্বাতে ঘা হইয়া থাকে। কিন্তু আসাম অঞ্চলের খাসিয়া এবং অন্যান্য জাতি শৈশব কাল হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত প্রতিদিন অনেক গুলা পান চর্ব্বণ করে, এবং ক্বচিৎ মুখ ধৌত করে, তাহাদের মুখে বা জিহ্বায় কোনরূপ ঘা দেখিতে পাওয়া যায় না। (Statesman, February 16, 1893)

অধিক পান-চর্ব্বণ করা বাস্তবিকই উচিত নহে। কেননা তাহাতে পরিপাক শক্তি দুরীভূত হয়; এবং ক্রমাগত দন্তের কার্য্য হইতে থাকে বলিয়া দন্তও শিথিল হইয়া পড়ে। পান উত্তেজক পদার্থ—উত্তেজক পদার্থের ক্রমাগত ব্যবহার কখনই যুক্তি সঙ্গত, ও স্বাস্থ্যানুমোদিত হইতেই পারেনা। কিন্তু নিয়মিত পান চর্ব্বণ বস্তুতঃই স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে।

পান পাইপারাসি (Piperaceae) নামক উদ্ভিদ বিভাগের অন্তর্গত এই বিভাগের অন্য গাছ হইতে আমরা গোল মরিচ, পিপুল ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রাপ্ত হই।

Piperaceae উদ্ভিদ বিভাগের সাধারণ ধর্ম্ম—উদ্ভিদগুলি প্রায়ই ওষধি (herb) বা গুল্ম বিশেষ (shrub)। সাধারণতঃ একরূপ সুমিষ্ট গন্ধ থাকে। উদ্ভিদের প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি পাতা (alternate) বা পরস্পর বিভিন্নমুখী দুইটি পাতা (opposite) কিম্বা বহু পাতা

সজ্জিত (whorl) থাকে। পাতা গুলি প্রায়ই রস-পূর্ণ-গ্রন্থি-সঙ্কুল (gland-dotted), পত্র-বৃন্তের নিম্নস্থ উপপত্র (stipules) কোন কোন বৃক্ষে দুইটি থাকে, অথবা আদৌ থাকে না। এই উপপত্র গুলি হয় পরস্পর সংলগ্ন অথবা পত্র বৃন্তে সংলগ্ন থাকে। একই পুষ্পে পরাগ-কেশর ও বীজ কোষ থাকে (hermaphrodite) অথবা এই দুইটির কোন একটি বর্ত্তমান থাকে (unisexual)। ফুলগুলি শাখার গ্রন্থি-কোণেও উৎপন্ন হয় (axillary) অথবা শাখার প্রান্তে হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় দোদুল্যমান থাকে। এই পুষ্প গুচ্ছের পুষ্পগুলি বৃন্তহীন (sessile *i. e.*, spike)। পুষ্প-দণ্ডের প্রারম্ভে বা নিম্নে ঢালের ন্যায় একটি পুষ্প-পত্র (peltate bract) থাকে। পুষ্পে পুষ্পচ্ছদ (calyx) বা পুষ্পদল (corolla) থাকেনা। পরাগ-কেশরের (stamens) সংখ্যা ২ হইতে ৬, কচিৎ ৭ টি কিম্বা ৮ টি দৃষ্ট হয়, সমস্ত গুলিই বীজ-কোষের নিম্ন হইতে উৎপন্ন (hypogynous)। পরাগ কোষগুলি (anthers) প্রায়ই পরাগ-দণ্ডে (filament) দৃঢ় সংযুক্ত এবং প্রকোষ্ঠ (cells) দুইটি সম্মিলিত হইয়া প্রায়ই একটি হইয়া যায়; এবং পরিপক্ক হইলে কোষগুলি লম্বালম্বি ফাটিয়া যাইয়া পরাগ নির্ম্মুক্ত হয়। বীজ-কোষের সংখ্যা প্রায়ই ৩ অথবা ৪, পরস্পর বিযুক্ত অথবা তলদেশে সংযুক্ত। কখনও কখনও বীজ কোষ গুলি একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের উপর অবস্থিত (stipitate) থাকে, অথবা সম্পূর্ণ দণ্ড শূন্য হয় (sessile)। প্রত্যেক বীজ কোষে অনেকগুলি বীজ থাকে এবং প্রত্যেক বীজ কোষ এক একটি প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট (1-locular)। ফল গুলি অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি। ইত্যাদি। (Indian Botany, *Prain*)

পান একরূপ লতানে গাছ, নিকটস্থ আশ্রয় জড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। পান পাতা অর্দ্ধ ডিম্বাকৃতি, বৃন্তের উপরি ভাগ হৃৎপিণ্ডের আকারের ন্যায়। ডগা অত্যন্ত লম্বা। পাতার প্রধান শিরের দুই পার্শ্বের অংশ প্রায়ই সমান নহে, একটু ছোট বড় হইয়া থাকে। পাতা ৩ হইতে ৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। বোঁটা $\frac{১}{২}$ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এক এক গ্রন্থিতে এক একটি পাতা সজ্জিত (alternate)। ফল গুচ্ছাকারে দোদুল্যমান থাকে, এক হইতে পাঁচ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। সাধারণতঃ পানের গাছের অংশ কাটিয়া লইয়া চারা করা হইয়া থাকে। অধিকাংশ গাছই স্ত্রীপুষ্প বিশিষ্ট; এই পান বরজেই উৎপন্ন হয়। সিকিম, আসাম, নিম্ন বঙ্গ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশ, মালাক্কা, মালয়-দ্বীপ-পুঞ্জে, সিংহলে আর এক প্রকার পানের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কখনও কখনও স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয় বা আবাদ হইয়া থাকে। ইহার ডগা বরজ পানের ন্যায় লম্বা হয় না। আর এক প্রকার পান সিমলা হইতে হিমালয়ের পুর্ব্বাংশে উৎপন্ন হয়। ৫০০০ ফুট উচ্চ ভুমিতেও এই পান হইয়া থাকে। আসাম, খাসি, নীলগিরি, অনামালী, শিবগিরি ইত্যাদি নানা পর্ব্বতীয় স্থানে এই পান প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই পানের পাতাগুলি কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি। (Indian Trees, *Brandis*)।

পান প্রস্তুত করিবার জন্য আমারা সাধারণতঃ চূণ, খদির ও সুপারী ব্যবহার করি। এতদ্ব্যতীত নানারূপ মসলা, পিপারমেণ্ট, কর্পূর, ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। সুরতি বা, কোকেন বা দোক্তা বা জরদা পানের সহিত ব্যবহার করা আদৌ উচিত নহে। ইহাতে মস্তিকের ও পাকস্থলীর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। কোকেনের ন্যায় নিদারুণ বিষ আর নাই। অনেকে বলেন দোক্তা খাইলে দন্ত দৃঢ় হয়। এ কথার সত্যাসত্য চিকিৎসকগণ বলিতে পারেন। দন্ত দৃঢ় হইতে পারে বটে, কিন্তু পাকস্থলীর কার্য্য দোক্তা ব্যবহারে অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়। রচিত পানে পানের অংশ অধিক থাকাই ভাল। খদির, চূণ বা সুপারী যত অল্প হয় ততই ভাল। নানারূপ মসলা-রচিত পান চর্ব্বণ করায় উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

পান চাষের ন্যায় লাভ-জনক ব্যবসা বোধ হয় আর নাই। আমাদের দেশে এক মাত্র বারুইগণই পান চাষ অবগত আছে। কাজেই সাধারণের জানিবার জন্য পান চাষের বিবরণ লিখিত হইতেছে। পান প্রধানতঃ তিন প্রকার—যথা, দেশী, সাঁচী এবং মিঠা। এতদ্ব্যতীত আরও নানা প্রকার পান রহিয়াছে—যথা, হুন্টেবাটুল, উজানি (বাখরগঞ্জ), মাঘাই, কর্পূরকথ ইত্যাদি। যাহারা অত্যন্ত পান চর্ব্বণ করিতে ভালবাসে, তাহারা আরও নানারূপ পানের কথা জানে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে. হুন্টেবাটুলের ন্যায় উৎকৃষ্ট পান পৃথিবীতে কুত্রাপি উৎপন্ন হয় না। এই পান সাধারণতঃ উলুবেড়িয়া, এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথী (Contai) সাবডিভিসনে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পান চাষের জন্য উচ্চভূমী প্রয়োজন। বন্যার জল বা পাহাড় জল জমীতে যেন আদৌ প্রবেশ করিতে না পারে। যে জমীতে বর্ষার জল আটকায় বা জমা হয় বা পচা জল আসিয়া পড়িতে পারে, এরূপ জমীতে পান আদৌ হয় না। যে মাটি কৃষ্ণ-বর্ণ, ঝুরো, আদৌ এঁটেল নহে, গভীর পুষ্করিণীর পাঁকের ন্যায় এবং যাহাতে যথেষ্ট জান্তব সার বর্ত্তমান, সেই মাটীই সাধারণতঃ পান চাষের জন্য আবাদ করা হয়। কিন্তু বাঁটুলের পান সাধারণতঃ ঈষৎ লাল, হাল্কা মাটীতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমী উচ্চ হইলেও সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে ভিজিয়া থাকা প্রয়োজন। বাখরগঞ্জের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানের কোন কোন বরজে বর্ষার প্রবল জোয়ারের সময় জমীতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রবলতর বন্যা হইলে পানের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে।

চাষ বা আবাদ বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহা বাস্তবিক পানের জন্য প্রয়োজন হয় না। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে " বিনা চাষে পান " অর্থাৎ পানের জন্য জমীতে ক্রমাগত চাষ দিবার বা রীতিমত ভাবে মাটীর "পাট" করিবার প্রয়োজন হয় না। এক একটি পান-লতা বহু কাল জীবিত থাকে। ভিজা মাটি, প্রচুর সার, আওতা বা আবরণের মধ্যে, বর্ষায় লতা রোপণ করা হইলে এবং গ্রীষ্মের সময় জল সেচন করিলে, প্রচুর পান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পানের একটা বরজ

একবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে পারিলে, ১০ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত পান পাওয়া যাইতে পারে।

বরজের নিমিত্ত স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া সেই জমীতে যত কিছু আগাছা বা জঙ্গল আছে, সমস্তই মূলোৎপাটন করিয়া ধ্বংস করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট জমীর চারিদিকে গড় কাটিয়া সেই মাটী জমীতে ছড়াইয়া উচ্চ করিয়া লইতে হয়। মোটের উপর চারি পার্শ্বের জমী হইতে পানের জমী উচ্চ হওয়া প্রয়োজন এবং গ্রীষ্মে জল সেচনের জন্য নিকটেই জলাশয়ও আবশ্যক। বাঁটুলের বারুইগণ ১ হাত গভীর করিয়া মাটী কোপাইয়া লয়। মাটী গুঁড়াইয়া একবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে, পরে উত্তমরূপে জমী সমতল করে এবং সর্ব্বশেষে জমি ছাইয়া ফেলে। জমির চারিদিকে ও উপরিভাগে যে বেড়া দেওয়া হয়, তাহাতে পরিবদ্ধ-জমিতে সর্ব্বত্র উত্তাপ সমান থাকে। ঝড় বা প্রবল বাতাস পান গাছগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারেনা। আর বস্তুতঃই উত্তাপ ও ঝড় হইতে গাছ রক্ষা করিতে না পারিলে চাষে আদৌ ফসল হয় না। জমী হইতে ৫ হাত উচ্চ বাঁশের বা বাঁখারীর হাল্কা মাচান করিয়া তাহার উপর পাট কাঠি বা ধঞ্চে বা উলুখড় বিছাইয়া দিলেই বরজের চাল নির্ম্মিত হয়। বরজের চারিদিকেও এইরূপে বেড়া দেওয়া উচিৎ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পান গাছ কাটিয়া গাছ চারাইতে হয়। এক সারির দুইটি চারা গাছের পাশা পাশি ব্যবধান ৬ ইঞ্চ রাখিলেই যথেষ্ট। দুই বৎসরের গাছ হইতে চারা করিবার গাছ কাটিয়া লইতে হয়। এই কর্ত্তিত অংশ ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চ হইলেই ভাল হয় এবং প্রত্যেকটিতে ৫।৬ টি গাঁইট থাকা আবশ্যক। এই গাঁইটগুলির অন্ততঃ দুইটি গাঁইট মাটিতে পুঁতিয়া এবং উপরের অংশটি মাটিতে লতাইয়া দিতে হয়। যত দিন গাছ গুলির শিকড় বহির না হয় এবং নূতন কচি পাতা উৎপন্ন না হয়, ততদিন খেজুর পাতা চাপা দিয়া, প্রয়োজন হইলে, সকাল সন্ধ্যায় দুইবেলা জল দিতে হয়। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্তই এইরূপ চারা করিবার সময়। অনেকে এক-বারে বরজেই চারা করে, আবার অনেকে অন্যত্র চারা করিয়া বরজে লাগাইয়া দেয়। দুই সারের গাছের মধ্যে এমন স্থান রাখা আবশ্যক, যেন একটি লোক অনায়াসে চলা ফেরা করিতে পারে। গাছ গুলি অল্প বড় হইলেই ধঞ্চে বা পাটকাঠী পুঁতিয়া তাহাতে গাছ গুলি খড় বা ঐরূপ কোন দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। অবশ্য এই কাঠী গুলি চাল স্পর্শ করে এরূপ লম্বা হওয়া প্রয়োজন। যখন গাছ গুলি চালে ঠেকে, তখন আপনা আপনিই নিম্নমুখে বাঁকিয়া পড়ে, এবং পুনরায় মাটিতে ঠেকিয়া জমি দিয়া অল্প লতাইয়া যাইলেই আবার ডগা পাট কাঠীতে বাঁধিয়া উচ্চ-মুখী করিয়া দিতে হয়। এইরূপে উচ্চ-মুখী করিবার পূর্ব্বে মাটিতে সংলগ্ন-অংশে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এইরূপে ক্রমাগত উচ্চ মুখ ও নিম্ন মুখ হইয়া এক একটি গাছ ৩০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে গাছ ৩ বার এইরূপে উচ্চ ও নিম্নাভিমুখী হয়। যতবার গাছগুলিকে এইরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হয় ততবার যে স্থান হইতে গাছ বক্র হইয়াছিল সেই স্থান হইতে পূর্ণায়তন ৩।৪ টি পাতা উঠাইয়া লওয়া হয়। গাছে মাটী চাপা দিবার জন্য দুই সারের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে মাটী লওয়া হয়। কাজেই গাছগুলি আইলের উপর উচ্চতর স্থানে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং চলাচলের পথ নালা হইয়া যায়। পুষ্করিণীর ঝুরা মাটী, গোময় চূর্ণ, বা খইল চূর্ণ প্রত্যেকবার মাটী চাপা দিবার সময় প্রয়োজন হয়। বারুইগণ বলিয়া থাকে যে রেড়ীর খইল প্রয়োগ করিলে পান গাছের অনিষ্ট হয়। সাধারণতঃ সরিসার খইল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইষ্টক চূর্ণও সারের কাজ করে। গ্রীষ্ম বা শীতকালে ক্রমাগত বরজে জল ঢালিতে হয়। তবে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন বরজে কোন স্থানেই জল দাঁড়াইয়া না থাকে।

লাউ, কুমড়া, শসা, ঝিঙ্গা ইত্যাদি নানাবিধ তরি তরকারীর গাছ বরজের চারি পার্শ্বে লাগাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে লাভ হয় অথচ পান গাছ ঝড় ও উত্তাপ হইতে রক্ষা পায়। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর চাল ও পাশের বেড়া বদলান দরকার।

নানাপ্রকার ছাতা, পোকা, কীট, শম্বুক, গুগ্‌লি ইত্যাদি পানের যথেষ্ট ক্ষতি করে। পোকা এবং গুগ্‌লি গুলি হাতে করিয়া নষ্ট করা উচিত। গাছে ছাতা ধরিলে গন্ধকের ধুম দিলে উপকার হয়। পতঙ্গ ইত্যাদি নষ্ট করিতে গোময়-পিষ্টকের ধুম দেওয়া হইয়া থাকে।

আষাঢ় মাসে চারা রোপণ করিলে আশ্বিন মাসে পাতা তুলিতে পারা যায়। কিন্তু আশ্বিন মাসে গাছ চারাইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে পান পাওয়া যায় না। পাতা একবার তুলিবার পর মাসে দুইবার পাতা তোলা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ২, ৩, কিম্বা ৪ টি পাতা প্রত্যেকবারে পাওয়া যায়। বর্ষায় ৫, ৬, কিম্বা ৭ টি পর্য্যন্ত পাতা তোলা হইয়া থাকে। বর্ষায় পান প্রচুর উৎপন্ন হয়। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে— "আষাড়ের পান চাষাড়েয় খায়।" পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে গাছ বাঁকিয়া লতাইয়া পড়িলেই লতানে অংশ পাটকাঠিতে বাঁধিয়া মাটী চাপা দিতে হয়, এই মাটী চাপা অংশ হইতে শিকড় উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিলেই গাছের পুরাতন অংশে যত পাতা থাকিবে, তাহা তুলিয়া লওয়া হয়। এক বিঘা জমীতে এক বৎসরে প্রায় ২৬ হইতে ৩০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত সময়ে সময়ে গাছের ডাল বাহির হইয়া পড়ে, ডাল বড় হইবার পূর্ব্বেই পান তুলিয়া লইয়া ডালগুলিকে কাটিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ পানের সংখ্যাও অল্প নহে, তবে সেগুলি ক্ষুদ্রকায় এবং অপরিণত। কাজেই সেগুলির তত বিক্রয়াধিক্য নাই। এই সমস্ত অপকৃষ্ট পান বাদ দিয়াও ২৬ হইতে ৩০ লক্ষ পান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পান রীতিমত উৎপন্ন হয়, পরে অল্প হইতে থাকে। পাতাগুলি

ঝুড়িতে করিয়া আনিয়া দিলে গৃহের স্ত্রীলোকগণ ভাল পান বাছাই করিয়া ফেলে এবং গণনা করিয়া পানের গোছ (৩২টা) বাঁধিয়া ফেলে।

পান চাষে আয় ব্যয়ের তালিকা দেওয়া হইল :—

জমী তিন বিঘা।

১ম বৎসর—

বাঁশের এবং জেওল খুঁটি (৭ হাত লম্বা) চাল খাড়া করিবার জন্য ৫০০ ...	৪০৲
বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি	৭৲
বাঁশের বাঁখারী	৫০৲
ধঞ্চে বা পাট কাঠী	২৫৲
উলুখা খড়	১৫৲
চারা গাছ ২৷৷০ টাকা হাজার	৫০৲
১২ মণ সরিসার খইল	১৫৲
ঝুড়ি	১৲
খইল কুটিবার ঢেঁকী	৩৲
জমীতে আইল ও নালা কাটা	৫৲
জমী কোপান 'ও মাটি গুঁড়ান'	৬৲
চারা রোপণ, চাল ছাওয়ান, বেড়া বাঁধা ইত্যাদি	৩৬৲
পাতা তুলিবার মজুরী, মাটি দেওয়া, ও সার দেওয়ার মজুরী ...	২৮৮৲
খাজনা	১০৲

২য় বৎসর—

বাঁশ, খুঁটি, পাটকাঠী	১০০৲
দড়ি	৪৲
৩৬ মণ খইল	৪৫৲
উলু	২০৲
পাতা তোলা, মাটী দেওয়া ইত্যাদি	২৮৮৲
খাজনা	১০৲

৩য় বৎসর—

৭ হাত লম্বা ১৫০টি বাঁশের খুঁটি	৬৲
বাঁখারী	৫০৲
দড়ি	৩৲
	১০৭৭৲

জের						১,০৭৭৲
উলু	...	...	...	.	...	৩৲
খইল ৩৬ মন	...	...	...	.	...	৪৫৲
পাতা তুলিবার ইত্যাদি মজুরী		...	...	.	...	২৮৮৲
খাজনা	...	...	...	.	...	১০৲
					মোট ৩ বৎসরে—	১,৪২৩৲

প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে ব্যয় অধিক হয়; কেননা মায় গাছ বরজ পরিষ্কৃত করিতে হয়। দশ বৎসরের মোট খরচ ৪,৬০০৲ টাকা, অর্থাৎ প্রতি বৎসরে ৪৬০৲।

তিন বিঘা জমীতে ৮০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। ১৲ টাকায় ৩০০০৲ পান ধরিলে বৎসরে ৮০ লক্ষ পানের দাম ২,৫০০৲। ইহার অর্দ্ধেক কীট পতঙ্গ গুলিতে নষ্ট করিলেও খরচ খরচার সহিত মোট আয় ১৩০০ টাকা সচ্ছন্দে হইতে পারে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা আজ পর্য্যন্ত ইথার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি যে, ইথার গঠনে এবং প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ জটিলতাশূন্য, নিরবচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্র সমনিবিড়তাবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত অধিক চাপ প্রয়োগ করিলেও আদৌ সঙ্কুচিত হয় না; সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও, ইহাকে বিভিন্ন করা যাইতে পারে না; কিম্বা ইহা অন্য কোনরূপ মৌলিক পদার্থেও বিশ্লিষ্ট হয় না। বাস্তবিকই ইহা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া অবিভিন্ন এবং অদ্বিতীয়। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থই অণুপরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু ইথার অণুপরমাণুর সমষ্টি নহে; কাজেই আমাদের পরিচিত কোন পদার্থই ইহার সদৃশ নহে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অন্য সমস্ত সাধারণ পদার্থ হইতে ইথারের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই সমস্ত কারণে ইথার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লওয়া বড়ই কষ্টকর। পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই অণুপরমাণুর সমষ্টি, কাজেই সূক্ষ্ম-রন্ধ্র-সমাকুল (porous); আমাদের সুপরিচিত এই সমস্ত পদার্থ যে রন্ধ্র-সমাকুল, একপ ধারণা করাই কষ্টকর; পরন্তু সমস্ত স্থান-ব্যাপক, নিরবচ্ছিন্ন,

অথচ ছিদ্রশূন্য ইথারের ধারণা করা যে অধিকতর কষ্টকর, তাহার আর সন্দেহ কি? ইথারের কাঠিন্য বা দৃঢ়তার পরিমাণ করিতে যাইয়া, ইহাকে পণ্ডিতগণের কেহ কেহ কখনও বায়বীয় পদার্থের ন্যায়, কখন তরল পদার্থের ন্যায়, কখনও কঠিন পদার্থের ন্যায়, কখনও বা আবার জেলীর ন্যায় কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু মানবের ভাষায় কোন কথাই ইথারের প্রকৃত প্রকৃতি বা ধর্ম্ম নির্দ্দেশক নহে। এই সমস্ত বিভিন্ন মতের জন্য ইথারের প্রকৃতি অনুমান করা আরও কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তবে ইথারের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লইতে হইলে, ইহাই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ইহা নিরবচ্ছিন্ন এবং অবন্ধুর; এবং কোন রকমে বুঝিয়া ফেলিতে হইবে যে, ইহা সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন, অতিশয় সূক্ষ্ম এবং অনমনীয়, ও সমস্ত ব্যোমপথ, এমন কি পদার্থের অণুদ্বয় মধ্যস্থিত স্থানেও পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পদার্থসমূহ ইথারে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে; কাজেই সমস্ত ইহার দ্বারা সংযুক্ত। পদার্থের ক্রিয়া বা ধর্ম্মসমূহ ইথার মধ্য দিয়াই পরিচালিত হয়; এবং ইথারই গতি বা প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহ পরিবাহিত হইবার মার্গ। উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আলোক ইথার মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়।

পদার্থের পরমাণু সমূহ শব্দ তরঙ্গ পরিবাহিত হইবার পথ, এবং এই পরমাণু সমূহের ঘন-সন্নিবেশই শব্দ তরঙ্গ ব্যাপ্তির একমাত্র কারণ। কিন্তু আলোক তরঙ্গ অণুপরমাণুর সহযোগে ব্যাপ্ত হয় না; কেননা ইহার গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের কণিকা-সমূহ-সহযোগে যতরূপ গতি বা তরঙ্গের পরিব্যাপ্তি সম্ভব, সেই সমস্ত অপেক্ষা আলোকের গতি অত্যধিক ক্ষীপ্রতর। শব্দ তরঙ্গ অতি স্থূল পদার্থ-কণিকার ঘাত প্রতিঘাতে পরিব্যাপ্ত হয়। আলোক তরঙ্গ, তড়িৎবিক্ষোভ-সঞ্জাত তরঙ্গ সমূহ, অতিশয় সূক্ষ্ম, কাজেই ইহাদের পরিব্যাপ্তির জন্য অতি সূক্ষ্ম ইথারের প্রয়োজন। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে, যদি বায়ু-মণ্ডলকে অত্যন্ত বিরলীকৃত করা হয়, অথবা যে স্থানের বায়ু স্বভাবতঃই অত্যন্ত লঘু, সেই স্থানের বায়ুর মধ্য দিয়া তড়িৎ ও আলোক তরঙ্গ পরিবাহিত হইতে পারে,—কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে এই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ পরিবাহিত ও পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য ইথারের প্রয়োজন। কাজেই ইথার বায়ু হইতে পৃথক্ পদার্থ। গ্রহ উপগ্রহ বা সৌর জগৎ সমূহের মধ্যবর্ত্তী মহাকাশেও বায়ুর অস্তিত্ব সম্ভব। যদি সেই মহাকাশে বায়ুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ইথারের তুলনায় সেই বায়ুর ঘনতা অতি সামান্য। ইহা পরিমিত হইয়াছে যে, পৃথিবী হইতে ৪০০০ মাইল ঊর্দ্ধদেশে বায়ু মণ্ডলের ঘনতার পরিমাণ এত সামান্য যে দশমিক বিন্দুর পর ১২৭টি শূন্য বসিলে তবে ১, ২, ৩ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পড়ে। পক্ষান্তরে সূর্য্য কিরণের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য পুইলের (Pouillet) প্রদত্ত বিষয় সহায়তায় ও আলোক-তরঙ্গ-কম্পনের

বিস্তারের স্থায়-সঙ্গত অনুমান দ্বারা সার উইলিয়াম টম্‌সন্ (Sir William Thomson) ইথারের ঘনতার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইথারের ঘনতা দশমিক বিন্দুর পর ১৭টি শূন্য বসিলে তবে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা পড়ে। কাজেই মহাকাশের বায়ু এত সামান্য ঘন, যে তাহাকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে; এবং তথাকার বায়ুর তুলনায় ইথারের ঘনতা অত্যন্ত অধিক। যাহা হউক, পণ্ডিতগণের এই অভিমত স্বচ্ছন্দে পরিপোষিত হইতে পারে যে, ইথার সর্ব্বস্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; এবং ইহা সর্ব্বত্র সমনিবিড়তা-বিশিষ্ট। এইরূপ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, প্রাচীন কালের দার্শনিকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কোন স্থান একবারে পদার্থ শূন্য হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বৈব যুক্তিযুক্ত। এই ব্যোম-জড়-জগৎ (mat-etherial world) বাস্তবিকই পদার্থ ও ইথারেরই সমষ্টি। জগতে ইথারই শক্তি, এবং কেহই পদার্থ হইতে শক্তির পৃথক্ কল্পনা করিতে পারে না। কেননা শক্তির অভাবে পদার্থ অসম্ভব, ও পদার্থ না থাকিলে শক্তির বিকাশ বা উৎপত্তি কোথায়? সার অলিভার লজ (Sir Oliver Lodge) এ সম্বন্ধে একটি অত্যুৎকৃষ্ট অভিমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত এই পদার্থগত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা সম্বন্ধে মানবোদ্ভাবিত যত কিছু অভিমত কল্পিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সরল এবং অনায়াস-বোধ্য সেইটিই বুঝাইবার জন্য সার অলিভার লজ চেষ্টা করিয়াছেন। সে অভিমতটি এইরূপ,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা সৃষ্ট সমস্ত পদার্থ মাত্রই, সর্ব্বত্র সমনিবিড়তা-বিশিষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ জটীলতাবিহীন কেবল একটি মাত্র পদার্থ সঞ্জাত। এই পদার্থ মানবের জ্ঞানগম্য মহাকাশের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই অদ্বিতীয় পদার্থের কোন অংশ নিষ্কম্প বা সুস্থির রহিয়াছে, অথবা কোন অংশ কম্পিত হইতেছে। এই শেষোক্ত অংশও আবার দুই বিভিন্ন প্রকার কম্পিত হইতেছে। প্রথমতঃ কোন অংশের কম্পন একেবারে আবর্ত্তন শূন্য অর্থাৎ হয় লম্বভাবে অথবা শায়িত সরলরেখাক্রমে কম্পিত হইতেছে, এই কম্পন দ্বারাই আলোক বা তড়িততরঙ্গ পরিবাহিত বা পরিব্যাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন অংশের কম্পন সম্পূর্ণ আবর্ত্তনপূর্ণ, অর্থাৎ এই কম্পিত অংশ একই স্থানে ক্রমাগত বিঘূর্ণিত হইতেছে; কাজেই এই অংশ, এই আবর্ত্তন জন্য, অন্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই আবর্ত্তন বা বিঘূর্ণিত অংশেরই অপর নাম মানবের "ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ"। এই কম্পনই কম্পিত বা বিক্ষুব্ধ অংশকে কাঠিন্য প্রদান করে; এবং তাহা হইতে পদার্থ সমূহ সংগঠিত। এইরূপ কল্পনায় কি সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে! এই অনন্ত বিশ্ব, সৃষ্টির অনন্ত ঘটনা, প্রকৃতির অনন্ত শক্তি এক অদ্বিতীয়, অবিভক্ত পদার্থ হইতে সমুদ্ভূত। এই অদ্বিতীয় পদার্থই ইথার। প্রকৃত পক্ষে এই অচিন্তনীয় ধারণার মূলে একেশ্বরত্বের (monism) ধারণা নিহিত রহিয়াছে। ফ্লামেরিয়ন (Flammarion) এই মতের পোষকতা করেন। তিনি বলেন যে, অননুভবনীয়

অপরিদৃশ্য, পরমাণু সমূহ পদার্থের বাহ্যাবয়ব-উপলব্ধি-শক্তি সম্পন্ন মনের পক্ষে অচিন্তনীয় বা অপরিজ্ঞেয় হইলেও, এই পরমাণু সমূহ হইতেই বাস্তবিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যাহাতে পদার্থ এই সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই আর কিছুই নহে, কেবল পরমাণু সমূহের তীব্রগতি জনিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর যে একটা ক্রিয়া সংক্রামিত হয়, তাহারই প্রতিক্রিয়া বা ফলমাত্র।

এই সমস্ত উক্তি ও অভিমত সম্যক আলোচনা করিলে এই টুকু মাত্র ধারণা হয় যে, পদার্থের শক্তি যেরূপ একরূপ গতি দ্বারা প্রকটিত হয়, সেইরূপ পদার্থ গুলি নিজেও একটা বিভিন্নরূপ অনির্ব্বচনীয় গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি এই গতি নিবারিত হয়, যদি শক্তি বিধ্বংশ হয়, যদি উত্তাপ সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হয়, তাহা হইলে আমরা যাহাকে পদার্থ বলি, অথবা যাহারা আমাদের নিকট "পদার্থ" এইরূপ সংজ্ঞা পাইতে পারে, তৎসমুদায়ের অস্তিত্বও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

এইরূপ কল্পনা বাস্তবিকই অর্থ সঙ্গত ; অথবা এই ব্যোম জড়-ব্রহ্মাণ্ড (mat-etherial world) যে কেবল মাত্র অপরিদৃশ্য ও অচিন্তনীয় পরমাণু সংসৃষ্ট এরূপ কল্পনা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায় সঙ্গত বা যুক্তি সঙ্গত কল্পনা উপলব্ধ হইতে পারে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা বিশিষ্ট গতির ফলস্বরূপ। ভগবানই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা স্বরূপ। আমার মনে হয়, সৃষ্টির শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, একই অদ্বিতীয় তপন আলোকে অসংখ্য পৃথিবী আলোকিত ও অনুপ্রাণিত হইবে, একই নির্ঝরের পীযূস ধারায়, শান্তি সুষমায়, ধরণী শস্যশ্যামলা হইয়া হাসিবে, এবং একই হইতে অনন্ত বিশ্ব মুকুলিত হইবে, তাই সংখ্যাতীত দেহে একই প্রাণ, অসংখ্য বিশ্বে একই গান, তাই একই তানে জগৎ মোহিত, একই আলোকে এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভাসিত।

পরিশেষে ইথার সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইথার একটি নিরবচ্ছিন্ন পদার্থ এবং ইহা সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহাই স্পন্দিত হইয়া আলোক উৎপন্ন করে। ইথারই আবর্ত্তিত ও স্পন্দিত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থে পরিণত হয়, এবং এই পদার্থ সঞ্জাত বিভিন্ন রূপ শক্তি, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, ইত্যাদি সমস্তই ইথার দ্বারা পরিবাহিত ও পরিব্যাপ্ত হয়। এই পরিব্যাপ্তির সময় ইথার বিচ্ছিন্ন হয় না, অর্থাৎ ইথার অবিচ্ছিন্নতা বিনষ্ট হয় না, অথবা শব্দ তরঙ্গ যেরূপ পরমাণু সমূহের ঘাত প্রতিঘাতে পরিবাহিত হয়, ইথারে সেরূপ ঘাত প্রতিঘাত সহযোগে তরঙ্গ পরিবাহিত ও পরিব্যাপ্ত হয় না। ইহাই ইথারের প্রকৃত ধর্ম্ম ও অবয়ব নির্দ্দেশক এবং এই অভিমতই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

বিবর্ত্তনবাদ।

অধুনাতন পণ্ডিতগণ প্রাণিমাত্রেরই উৎপত্তির বিবর্ত্তনবাদ (evolution) স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বিবর্ত্তন বাদ কি? কিরূপে জীবিত প্রাণী সত্তায় উপনীত হইয়াছে, এই বিশেষ অর্থে বিবর্ত্তনবাদ হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে, কি জান্তব, কি উদ্ভিজ্জ সমস্ত জীবিত প্রাণীই অতি ক্ষুদ্র, জটীলতা-শূন্য, মৌলিক অথবা অতি পুরাতন কোন কিছু প্রাণ-বিশিষ্ট-অবয়ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদে ইহাও প্রতীত হয় যে, রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া জীবজগৎ ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইয়াছে (descent by modification)। এস্থলে অবতরণ অর্থে—পিতৃ পুরুষ হইতে ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইয়াছে, এইরূপই বুঝায়। পিতামহ হইতে পৌত্র অবতীর্ণ হইয়াছে বলিলে অবতীর্ণ কথার যেরূপ অর্থ হইতে পারে, বিবর্ত্তনবাদের অবতরণে সেইরূপ অর্থই প্রকটিত হয়। অবতরণ কথার সাধারণ অর্থ নিম্নগমন বিবর্ত্তনের অবতরণে প্রযোজ্য নহে। অবতীর্ণ স্থলে উন্নত বা উর্দ্ধগত বলিলে বিবর্ত্তনবাদের অর্থ সুস্পষ্ট হইত। কেননা অতি ক্ষুদ্র ও হীন বা হীনাবস্থাপন্ন প্রাণী হইতেই উচ্চ শ্রেণীর জীবজগৎ উদ্ভূত হইয়াছে; অথবা প্রচীন জীবজগৎ হইতে অধুনাতন জীবজগৎ উন্নত হইয়াছে। কিন্তু পিতামহ হইতে পৌত্র উর্দ্ধগত বা উন্নত হইয়াছে, সাধারণতঃ এরূপ বাক্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, কাজেই বিবর্ত্তনবাদে অবতীর্ণ কথার প্রয়োগই অর্থ-সুসঙ্গত। রূপান্তর বলিলে সাধারণতঃ একটা পরিবর্ত্তন বুঝায়। অতএব বিবর্ত্তনবাদে ইহাই প্রকটিত হয় যে, জটীলতা-শূন্য, প্রাণ-বিশিষ্ট কোন মৌলিক অবয়বই রূপান্তরিত বা সর্ব্বথা পরিবর্ত্তিত হইয়া, আধুনিক অবয়ব-বিশিষ্ট প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। কেমন করিয়া পরিদৃশ্যমান জীব-জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা মৌলিক প্রাণী কিরূপে রূপান্তরিত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিবর্ত্তনবাদ তাহাই প্রকাশ করে। বিবর্ত্তনবাদকে সময়ে সময়ে "ডারউইন-বাদ" (Darwinism) বলা হয়, কেননা প্রথমতঃ মহামনা চার্লস্ ডারউইনই (Charles Darwin) বিবর্ত্তন-বাদের ধারাবাহিক প্রণালী জন-সাধারণকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করেন।

পদার্থ-বিদ্যা হইতে আমরা শিক্ষা করিয়াছি যে, আমাদের এই পৃথিবী যে যে উপকরণে গঠিত, অন্তরীক্ষ-বিক্ষিপ্ত অন্যান্য রাশি রাশি নক্ষত্র-সমূহ বা সূর্য্য-সমূহও, সেই সেই উপকরণে গঠিত। বিবর্ত্তনবাদে আমাদের পরিচিত প্রত্যেক পদার্থের ও পদার্থ-নিহিত-শক্তির প্রাচীন ইতিহাসও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। স্বয়ং প্রকৃতি ও যে যে পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, সেই সেই পদার্থের

চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয়-সমূহই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তনের কারণ। আমার আভ্যন্তরিক সমস্ত বিষয় ভিন্ন সমস্তই আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয় এবং অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বিষয়ই আমার স্বভাব বা আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি। অবশ্য যদিও বিবর্ত্তনবাদের অর্থই এই যে, প্রাচীন, মৌলিক, অজটীল, হীনাবস্থাপন্ন প্রাণী বা পদার্থ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইয়া অধিকতর উন্নত-অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলেও প্রাণী যে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এরূপ বুঝায় না। যদি চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থের কোন পরিবর্ত্তন সংসাধিত না হয়, তাহাহইলে সেই সমস্ত পদার্থ বা ব্যাপার বা শক্তি পরিবেষ্টিত জীবেরও কোন পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে না এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া জীব একই অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিবে। এই বিষয়টী উত্তমরূপে বোধগম্য করা উচিত, কেননা যাঁহারা বিবর্ত্তনবাদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা প্রায়ই এরূপ ভুল করেন যে, জীব বোধ হয় ক্রমাগতই রূপান্তরিত বা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ডারউইন, স্পেনসার এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া উন্নতি-অভিমুখে জগতের ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন পরির্ত্তন বিবর্ত্তনবাদের সম্যক্ অর্থ নহে।

যে দিন জগতে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই জীবন-সংগ্রামও আরম্ভ হইয়াছে। প্রাণ-রক্ষার জন্য অবিরত চেষ্টাই—জীবন-সংগ্রাম। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে জীবন-সংগ্রামে জেতাই স্থায়ী হয়, পরাজিতই একবারে ধ্বংশ হইয়া যায়। অধুনাতন অবস্থায় জীবন-রক্ষা-চেষ্টার প্রণালী অতি প্রাচীন কালের আদৌ অনুরূপ বা অনুকূল ছিলনা। অথবা প্রাচীন-কালের প্রণালী অধুনাতন কালের আদৌ উপযোগী নহে। দেহান্তর্গত কোন যন্ত্র-বিশেষ অতি প্রাচীন কালে যে কার্য্য সম্পন্ন করিত, হয়ত সেই যন্ত্র এখন সর্ব্বথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অথবা পরিবর্ত্তিত না হইলেও সেই যন্ত্র পূর্ব্বে যে কার্য্য করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে, এখন তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন কার্য্য করিতেছে। এই জীবন-রক্ষার প্রণালী ও দেহান্তর্গত প্রাণ-রক্ষোপযোগী যন্ত্র-বিশেষের কার্য্য সর্ব্বদাই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছে। 'The Origin of Species" নামক ডারউইনের শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জীবন-সংগ্রামে জয়দ্বারা ও জীব-দেহ-গত-যন্ত্র-সমূহের বিশেষ প্রয়োজন-নির্দ্দেশের এক এক যুগের এক একরূপ আদর্শ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, অধুনাতন জীব-দেহ প্রাচীন জীব-দেহ হইতে অবিসংবাদী উন্নত। পৃথিবীর প্রাচীন জীব-জন্তু-বিষয়ে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণও ইহাই স্বীকার করেন। কাজেই এই অভিমত অতিকষ্টে প্রমাণিত হইলেও, সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন যুগের নানাবিধ প্রাচীন জীব প্রস্তরীভূত হইয়া ন্যস্ত রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ স্তরে স্তরে সজ্জিত, এবং এক এক যুগে এক একটি স্তর উৎপন্ন হইয়াছে। যে যে যুগে পৃথিবীতে যে যে প্রাণিসমূহ বর্ত্তমান ছিল, তাহারা প্রস্তরীভূত

হইয়া সেই সেই স্তরে ন্যস্ত রহিয়াছে। ব্রাকিপোড (Brachipodes) নামক এক প্রকার জীবের অতি প্রাচীন প্রস্তরীভূত দেহ ও বর্ত্তমান দেহ দেখিলে মনে হয় যে, বর্ত্তমান ব্র্যাকিপোড অতীত ব্র্যাকিপোড হইতে আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় নাই বা অতি সামান্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেইরূপ শম্বুক জাতীয় কতকগুলি জলচর জীব, তাহাদের অস্তিত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় একই অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে। ডাক্তার কারপেণ্টার বলেন যে, কোন বিশেষ দুর্ব্বিপাক বশতঃই যে এই শম্বুক জাতীয় জীব অনুন্নত রহিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু কতকগুলি জীব অনুন্নত জীবন-রক্ষার কার্য্য-প্রণালী নির্ব্বাহের জন্য উৎপত্তি কাল হইতে একই অবস্থায় থাকিতে পারে। ব্রাকিপোড উৎপত্তির সময়ে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন অবশ্যই সেরূপ নাই। কাজেই চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা বা ঘটনা-সমূহ দ্বারা পরিচালিত বা অনুপ্রাণিত বা প্রণোদিত হইয়া, প্রাথমিক ব্রাকিপোড যেরূপভাবে জীবনের কার্য্য প্রণালী সম্পাদন করিত, এখন সেরূপভাবে কিছুতেই সম্ভবপর নহে; সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রাকিপোডেরও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল। যদি ডাক্তার কারপেণ্টারের অভিমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে বিবর্ত্তনবাদের কিয়দংশ ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কেননা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিবর্ত্তনবাদের অর্থই এই যে পরিবর্ত্তন ও উন্নতি। কেবল মাত্র পরিবর্ত্তন কিম্বা কেবল মাত্র উন্নতি বিবর্ত্তন-বাদ অভিমতে অসম্ভব। শুধু তাহাই নহে, যদি পূর্ব্বোক্ত ব্র্যাকিপোড বা অন্যান্য অতি ক্ষুদ্র-জীব সমূহ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বা তাহার অব্যবহিত-স্তর-উৎপত্তি-কালে সৃষ্ট হইযাছে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও বিবর্ত্তনবাদ অভিমতে অনেক গোলযোগ আসিয়া পড়ে। কেননা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর প্রথম-স্তর-উৎপত্তির পর জীব সৃষ্ট হইয়া সেই কালোপযোগী পূর্ণাঙ্গ পাইবারও অবসর পায় নাই। কিন্তু আমরা পৃথিবীর বাস্তবিক বয়ঃক্রম কত বা পৃথিবীর কোন অবস্থায় প্রাণিসমূহ প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্থির নিশ্চয় করিতে পারিনা বলিয়া এইরূপ অভিমতসমূহের মূল্য অত্যন্ত অল্প। এই সমস্ত আদিম জীবসমূহ যে কালেই উৎপন্ন হউক না কেন, সেই কালের চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা উন্নতি লাভ করিয়া, নূতন নূতন যুগে নূতন নূতন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাহ্যতঃ বা অনায়াসবোধ্য নূতন উন্নতি লাভ না করিলেও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের গঠনের কতক পরিবর্ত্তন বা যন্ত্র সমূহের শক্তি ও ক্রিয়ার কতক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কাজেই প্রতিযুগে বাহ্যতঃ একই অবয়ব-বিশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকই ধরিতে গেলে সেই জীব-সমূহের নিশ্চয়ই যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বিবর্ত্তনবাদ অভিমত অনুসারে প্রথম হইতে অধুনা পর্য্যন্ত জীব আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কোনও জীব প্রথমে সৃষ্ট হইল, পরে লোপ পাইল, পুনরায়

উন্নত হইয়া আবির্ভূত হইল এরূপ সম্ভব নহে। প্রত্যেক পদার্থ অন্য কোন পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যাবতীয় জীব এক প্রকাণ্ড পরিবারের অন্তর্গত। আমাদের প্রকাণ্ড পৃথিবীও অসংখ্য সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-রাশি-পরিবেষ্টিত প্রকাণ্ডতর পরিবারের একটি,অতি ক্ষুদ্র-বিভাগ। আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র পদার্থ-কণাও এক অনবচ্ছিন্ন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পদার্থ রাশির অতি ক্ষুদ্র অংশ।

বিবর্ত্তনবাদ বাস্তবিক কিরূপ তাহা স্পষ্ট বুঝিবার জন্য একটা সাধারণতঃ মোটামুটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক ঃ—

মনে করুন আপনি একটা বাইসাইকল্ (Bicycle) ক্রয় করিবেন। আপনি কোন সুদূর পল্লীতে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আবদ্ধ ছিলেন। কাজেই দোকানদারের নিকটে যাইয়া আপনি আপনার বাল্যকালে যেরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন, সেইরূপ যন্ত্র ক্রয় করিবারই ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন। আদিম তিন হাত ব্যাস-বিশিষ্ট-চক্রের একটা দ্বিচক্র-যান চাহিলে দোকানদার কিরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন, তাহা সহজেই অনুমেয়! আর দোকানদারও আপনাকে এরূপ যান বিক্রয় করিতেও সক্ষম হইবেন না। দোকানদার ও আপনি এক মাস ক্রমাগত ঘুরিলেও বোধ হয় সেরূপ যন্ত্র পাইবেন না। সেরূপ গাড়ী পাইবার জন্য আপনি ক্রমাগত জেদ করিলে, দোকানদার হয় আপনাকে পাগল মনে করিবে, না হয় বুঝাইয়া দিবে যে, সম্মুখের প্রকাণ্ড চক্রেও যেরূপ কার্য্য হইত বর্ত্তমান অল্পতর উচ্চ-চক্রেও সেই একরূপ কার্য্য হইয়া থাকে; প্রথমে লোকে চক্রের পরিধি বেষ্টন করিয়া রবারের পেটী আটিয়া দিত, বর্ত্তমানে রবারের নল তৈয়ারী করিয়াও বায়ুর সাহায্যে তাহাকে স্ফীত করিয়া পরিধিতে আটিয়া দিতেছে; এখনকার যন্ত্রে হাতল নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, গিয়ারিং সংশোধিত হইয়াছে, ফ্রী হুইল উদ্ভাবিত হইয়াছে, অতি অল্প-নিম্নমুখে গমন করিতে হইলে আর পা চালাইতে হয় না; আর এক প্রকার বৈদ্যুতিক দ্বিচক্র-যান আছে, তাহাতে আদৌ পা চালাইতেই হয় না, ইত্যাদি; এই সমস্ত উন্নতি একজন লোকের দ্বারা বা এক সময়ে হয় নাই, শত শত লোকে বৎসর বৎসর নানারূপে গাড়ীর উন্নতি করিয়া বর্ত্তমানে এইরূপ করিয়াছে। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত কি কি রূপে উন্নত হইয়াছে, কখন্ কোন্‌টি উন্নত হইয়াছে, কোন্‌টির পর কোন্‌টি উন্নত হইয়াছে, প্রত্যেক উন্নতিতে গাড়ীই বা কি রকম হইয়াছে, তাহা দেখান বা বোঝান দোকানদারের পক্ষে অসম্ভব। মধ্যাবস্থার গাড়ীগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার একটিও নাই শুনিলে আপনার হয়ত দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু দোকানদার বলিবে, এই অপদার্থ গাড়ীগুলা রাখিবার স্থান কোথায়, যেমনই গাড়ীর কোন অংশ উন্নত হইল অমনই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গাড়ী কোথায় লোপ পাইল কে তাহার নির্ণয় করিবে; শুধু তাহাই নহে,

লোকে সে গাড়ীর কথা একবারে ভুলিয়াই গিয়াছে; আজকালকার অনেকে যে সেরূপ গাড়ী ছিল তাহা স্মরণই করিতে পারেন না; ইহাকেই ইংরাজিতে বলে—"Survival of the fittest" যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী তাহাই রক্ষিত হয়।

অকিঞ্চিৎকর হইলেও এই উদাহরণ হইতে বিবর্ত্তনবাদের একটা মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সামান্য ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই এক দ্বিচক্রযানের এত পরিবর্ত্তন ও এত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে যে, একজন সাধারণ লোকে কিছুতেই এই উন্নতি-শৃখলের পর্ব্বগুলি মনে রাখিতে বা বুঝিতে সক্ষম নহেন। তাহা হইলে কোটি কোটি বৎসর ব্যাপিয়া অসংখ্য জীবরাশির উৎপত্তি ও বর্ত্তমান উন্নতির অগণনীয় শৃঙ্খল-পর্ব্বের যদি অর্দ্ধেকগুলিও বুঝিতে বা ধারণা করিতে না পারা যায়, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। যদি ত্রিশ বৎসরেব মধ্যেই ক্রমশঃ উন্নত দ্বিচক্র-যানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সুদৃঢ় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধুলিসাৎ হইযা যাইতে পারে, তাহাহইলে কোটী কোটী বৎসরের ক্রমশঃ উন্নত জীবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সুকোমল ও দুর্ব্বোধ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব ও পরিবর্ত্তন-সূচক-সূক্ষ্ম-চিহ্ন-সমূহেব সম্যক জ্ঞান দূরের কথা তাহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমান করাও যে কিরূপ কষ্ট-সাধ্য তাহা অতি সহজ-বোধ্য।

সভ্যতা, সাধারণের মনোজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তা অপকৃষ্টতর অবস্থার গাড়ীগুলিকে ধ্বংশ করিয়াছে। মানুষের সৃষ্ট পদার্থগুলি নষ্ট হইবার এই তিনটিই প্রধান কারণ। জগতেও নিষ্ঠুর নিয়তির একটি নিয়ম রহিয়াছে। সেই নিয়মানুসারেই অপকৃষ্ট জীব যেমনই উৎকৃষ্টতর জীবের সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হয়, অমনই অপকৃষ্টতর জীব কোথায় ধ্বংস হইয়া যায়, তাহার স্থিরতাও থাকে না। উৎকৃষ্টতর জীব বলিলে কেবল বলবান এরূপ বুঝায় না। বরং বলবান না হইয়া যদি সেই জীব তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থায় স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিবার উপযোগী হয়, এবং স্বজাতীয় জীব সমূহের অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে, সেই জীব, বলবানই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, অন্য অবস্থাপন্ন সমস্ত জীবেরই ধ্বংশের কারণ হইবে।

নিষ্ঠুর জগতের এই নিয়ম বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর। পদার্থ-রাশির সূক্ষ্ম পরমাণুই হউক কিম্বা জীব-জগতের প্রকাণ্ড প্রাণীই হউক, কেহই এই নিয়মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রাণীই রক্ষিত হইবে, অবশিষ্ট বিলুপ্ত হইবে! চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার অসীম শক্তি বলিতেছে "জীব, তোমাকে আমার উপযুক্ত করিয়া লও, অথবা ধ্বংশ হও।" এইরূপে নিজকে উপযুক্ত করাই উন্নতি, চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার পরিবর্ত্তনই এই উন্নতির কারণ। এই নিয়মের দুর্লঙ্ঘ্য শক্তিতে, উন্নতির এই প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে কত সংখ্যাতীত অবয়ব, ক্রমোন্নতির লক্ষ লক্ষ চিহ্ন, জীব রাশির অঙ্গ

প্রত্যঙ্গের কোটী কোটী সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন-চিহ্ন চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু চেতন ও অচেতন পদার্থের উন্নত অবয়ব পরীক্ষায় যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম জীবিত প্রাণি-শরীরেও তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কোন না কোন চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। যদি বর্ত্তমান কোন প্রাণীর পূর্ব্ব পুরুষের চারিটি পা ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান প্রাণি-শরীরেও চারিটী পা থাকিবে, তবে পদের যথেষ্ট রূপান্তর বা পরিবর্ত্তন হইতে পারে। অথবা যদি এরূপ হয় যে কোন জীবের পূর্ব্ব পুরুষ সলিল অভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত ও উন্নত জীব-শরীরেও সেই সমস্ত উপাদান-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিবে। প্রত্যেক জীবেই তাহার বংশ বিবরণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতি প্রাচীন পূর্ব্ব পুরুষ হইতে ধারাবাহিকত্ব নির্ণীত হইতে পারে না, এরূপ কোন জীব নাই, এরূপ কোন উদ্ভিদ নাই, এমন কি এরূপ কোন কার্য্য বা চিন্তার সম্ভাবনাও অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমানে কোন পদার্থই পূর্ব্ব কোন কিছু হইতে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন, নূতন, ও সর্ব্বথা পৃথক এরূপ কল্পনা করাও অসম্ভব। বর্ত্তমানে পণ্ডিতমণ্ডলী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যতটুকু পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছেন, তাহার সর্ব্বত্রই একই নিয়ম বা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে দেখিয়াছেন। অনন্তের কোন স্থানেই আমাদের জগতের অপরিচিত কোন মৌলিক পদার্থ নাই, অথবা কুত্রাপি সম্পূর্ণ অভিনব বা সম্পূর্ণ পৃথক-শক্তি-বিশিষ্ট সম্পূর্ণ একক জীবও অসম্ভব।

যদি এরূপ সম্ভব হইত যে, কোন গৃহস্থের চিত্রপুস্তকে মৌলিক পিতৃপুরুষ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের বংশানুক্রমিক সমস্ত লোকের নির্ভুল প্রতিকৃতি রহিয়াছে তাহা হইলে, মানব কিরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আধুনিকত্বে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত। মনে করুন কোন গৃহস্থের লোকের ভ্রূতে গুটী কয়েক শুভ্র বর্ণের লোম-সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাহা হইলে তাহাদের ছয় পুরুষ পূর্ব্বের লোকের ভ্রূতে অধিক সংখ্যক শ্বেত লোম দেখিতে পাইতেন; আরও ছয় পুরুষ পূর্ব্বে ভ্রূর অর্দ্ধাংশ শ্বেত লোমময় দেখিতেন, আর ত্রিশ পুরুষ পূর্ব্বে হয়ত তিন সহোদরের সম্পূর্ণ ভ্রূই শ্বেত-লোম-বিশিষ্ট দেখিতেন। ইহা হইতে ইহাই ধারণা করা বা সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-সঙ্গত যে, এই গৃহস্থের ভ্রূতে শ্বেত লোমের অস্তিত্বই একটা বিশেষত্ব। সেই সঙ্গে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইত যে, এই বিশেষত্ব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। আবার মনে করুণ সেই প্রাথমিক তিন সহোদরের যাবতীয় বংশাবলীর এরূপ ২০০ চিত্র পুস্তক থাকিলে হয়ত কোন কোন স্থলে দেখিতেন যে, শ্বেত লোমের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক বংশধরগণ বিবাহ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা, ইত্যাদির শক্তি দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষগণ হইতে এত

পরিবর্ত্তিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তাহারা পরস্পর বা সকলে যে একই বংশ-সম্ভূত তাহা স্থির করাই কঠিন হইয়া পড়ে। এক্ষণে প্রকৃতিই বস্তুতঃ আমাদের বংশাবলীর চিত্র-পুস্তক, এবং চিত্র-রাশি আমাদের নিম্নভাগে এবং চতুষ্পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

বিবর্ত্তন-বাদ অভিমত সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিতে হইলে, বর্ত্তমানে যাবতীয় জীবিত-প্রাণী সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু তাহাই নহে, এই জীব-রাশির পরস্পরের মধ্যে কি সৌসাদৃশ্য এবং প্রকাশ্যই হউক বা সুগুপ্তই হউক কিরূপ বিশেষ-ভাবে তাহার সম্বন্ধ তাহার জ্ঞানও বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইরূপে বর্ত্তমান জীবিত প্রাণীর জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, অবশেষে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ প্রস্তরসমূহ খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, প্রস্তর-স্তরে ন্যস্ত অসভ্য অতি হীন,—পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে কিরূপে এক এক জীব-পরিবার উদ্ভুত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে। সৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত জীব মানবে এখনও এই সমস্ত পূর্ব্বপুরুষের অসভ্যতা বা রুঢ়তা পরি-পুষ্ট রহিয়াছে। সামান্য অস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই লোকে বিবর্ত্তন-বাদ অভিমত গ্রহণ করিতে এখনও অস্বীকৃত হন, বা ইহাতে আদৌ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন না। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে এই অভিমতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোনই প্রয়োজন হয় না। ইহাকে পরিষ্কাররূপে বোধগম্য করাই প্রয়োজনীয়। এই অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে নানারূপ প্রমাণ প্রযুক্ত হইলে আমাদিগকে প্রথমে স্থির করিয়া লইতে হইবে যে, এই অভিমত যুক্তি সঙ্গত কিনা; এবং নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ যদি ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে জীবিত প্রাণীর উৎপত্তির বা বিনাশের হেতুবাদ এই অভিমত দ্বারাই স্পষ্ট, পরিষ্কার ও সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় এবং অন্যান্য সমস্ত অভিমতই বিবর্ত্তনবাদ অভিমত অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও অধিকতর ভ্রমসঙ্কুল হয়, তাহাহইলে আমরা বিচার-শক্তি-সম্পন্ন জীব বলিয়াই আমাদের এই বিবর্ত্তনবাদে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ঘোটককে উদাহরণ স্বরূপ লইয়া আমরা বিবর্ত্তনবাদ বুঝিতে চেষ্টা পাইব। ঘোটক দেখেন নাই এরূপ লোক অতি অল্পই আছে। আমরা জানি ঘোটকের একটী অখণ্ড ক্ষুর বা অঙ্গুলি। কিন্তু রাশি রাশি প্রমাণ উপস্থাপিত করা যাইতে পারে যে, ইহার সর্ব্বকালেই এরূপ ছিলনা। জুলিয়াস্ সিজারের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে অনেক ঘোটকের একাধিক ক্ষুর বা অঙ্গুলি বর্ত্তমান ছিল, এরূপ বহুশত প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এক্ষণে ঘোটকের পূর্ব্ববর্ত্তী বংশাবলীর আলোচনা করা যাউক।

প্রকাণ্ড ক্ষুর সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মধ্যাঙ্গুলীর নখর বিস্তৃত হইয়াই এরূপ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আর চারিটী অঙ্গুলী বা ক্ষুর একবারে বিলুপ্ত হইয়া

গিয়াছে। সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণীর অগ্রবর্ত্তী দুইটী পদ মানবের হস্তের ন্যায়। এই হস্তে কফোনির (কনুই) নিম্নে দুইটি অবিভক্ত অস্থি-দণ্ড রহিয়াছে। একটির নাম আল্না (ulna) এবং অপরটি রেডিয়াস (radius)। অশ্বের ঐ অংশে একটি মাত্র অস্থি রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, এই একই অস্থি-খণ্ডের উপরের অংশ, আল্নার (ulna) উপর অংশ বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। এই অংশের প্রধান অস্থিই রেডিয়াস। কাজেই আল্না রেডিয়াসে সম্পূর্ণ সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। তবে এই সংযোগের চিহ্ন অনেক দূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং অল্পে অল্পে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ অশ্বভ্রূণ-শরীরে এই আল্নার চিহ্ন, রেডিয়াসের কেবল ঊর্দ্ধাংশে নহে, পরন্তু নিম্ন অংশেও পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রমাত্মক নহে যে, মানবের হস্তের ন্যায় অশ্বের অগ্রবর্ত্তী পদদ্বয়ে দুইটি অস্থি-খণ্ড বর্ত্তমান ছিল।

অশ্বের ক্ষুরের অব্যবহিত উপরের অংশই মানবের মণিবন্ধের অনুরূপ। মানবের হস্ততালুর অব্যবহিত ঊর্দ্ধস্থ পঞ্চ-অস্থি-খণ্ডের মধ্যখণ্ড অশ্বের ক্যানন্ বোনের (cannon bone) সমতুল্য; এবং আমাদের মধ্যাঙ্গুলীর পর পর পর্ব্বগুলি অশ্বের প্যাসটার্ণ (pastern) করোনারী (coronary) এবং কফিন (coffin) অস্থির সমতুল্য। এই মধ্যাঙ্গুলীর নখর অতি-বিস্তৃত হইয়াই অশ্বের ক্ষুরে পরিণত হইয়াছে। যদি এরূপ হয় যে, আমাদের হস্ত তালুর মধ্যাঙ্গুলীর অংশ অশ্বের ক্ষুরের অনুরূপ, তাহা হইলে আর ৪টি অঙ্গুলীর অস্তিত্ব কোথায়? দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অঙ্গুলীর অনুরূপ দুইটি সরু অস্থি-খণ্ড নিম্নমুখে ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, তবে তাহাতে পর্ব্ব-চিহ্ন নাই। এই দুইটি সরু অস্থি-খণ্ডের পার্শ্বদেশে অস্থিময় দুইটি ছোট গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই অস্থি-গ্রন্থি দুইটিই আমাদের প্রথম ও পঞ্চম অঙ্গুলীর অনুরূপ। অশ্বের অস্থি-পঞ্জরের যে অংশ মানবের হস্তের অনুরূপ, সেই অংশে মধ্যাঙ্গুলীর ন্যায় অতি-বিস্তৃত পূর্ব্বোক্ত অস্থিখণ্ড-পার্শ্বে অপরিণত দুইটি ক্ষুদ্র অস্থি-খণ্ড, এবং তাহাদের পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত দুইটি অস্থি-গ্রন্থি রহিয়াছে। এইরূপ পশ্চাৎবর্ত্তী পদদ্বয়েও মানবের অঙ্গুলীর অনুরূপ অস্থি-সমূহ বর্ত্তমান। অশ্বের দন্ত-সমাবেশেও মানবের দন্তের ন্যায়।

আবিষ্কারের পরেই আমেরিকায় আদৌ অশ্বের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যে কোন কারণেই হউক অশ্বের এই পুরাতন আবাস-স্থলে অশ্ব সমূহ বিলুপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার মৃত্তিকা-স্তরে জীব-জন্তুর কঙ্কাল অতি উৎকৃষ্টরূপে রক্ষিত রহিয়াছে। অধ্যাপক মার্শ (Marsh) এই সমস্ত জীবজন্তুর কঙ্কাল-আদর্শ Yale Museum এ সংরক্ষিত করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তর-উৎপত্তি-কালে বিভিন্ন জীব জন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল। যে স্তর উৎপত্তি কালে স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি হয় তাহার

নাম Tertiary Period বা পৃথিবীর স্তরের তৃতীয়-যুগ। এই তৃতীয়-যুগ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের নাম ইওসিন (Eocene) বা প্রথমাংশ, অর্থাৎ নিম্ন অংশ—শঙ্খাদির প্রথম আবির্ভাবের স্তর। দ্বিতীয় মাইওসিন (Miocene) বা মধ্যাংশ। তৃতীয় প্লাইওসিন (Pliocene) বা অন্তিমাংশ বা উচ্চ অংশ।

Yale Museum এ সংরক্ষিত অশ্ব-কঙ্কাল হইতে পৃথিবীর স্তরের তৃতীয়-যুগের (Tertiary Period) প্রথম হইতে তৃতীয়-অংশ পর্য্যন্ত অশ্ব কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়-অংশের প্রারম্ভের অব্যবহিত উপরের স্তরেই অধুনাতন পূর্ণাঙ্গ অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরেই তৃতীয়াংশের (Pliocene) অশ্ব। বর্ত্তমান অশ্ব-শরীর হইতে এই তৃতীয়াংশের অশ্ব-শরীরে অতি সামান্য মাত্র প্রভেদ। এই তৃতীয়াংশের আরও নিম্ন স্তরে যে অশ্ব-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অশ্ব-ক্ষুরে একটি প্রকাণ্ড অঙ্গুলী এবং পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র অঙ্গুলি বিদ্যমান। এই তৃতীয়াংশের নিম্নতম-স্তরের অশ্ব-কঙ্কালে তিনটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গুলি এবং কনিষ্ঠ অঙ্গুলির সামান্য চিহ্ন বর্ত্তমান। মধ্যাংশের (Miocene) অল্প নিম্ন স্তরের অশ্বে সম্মুখবর্ত্তী এবং পশ্চাদ্বর্ত্তী পদে তিনটী পূর্ণাঙ্গ অঙ্গুলী এবং একটি অনতিদীর্ঘ অস্থি-খণ্ড বর্ত্তমান, এবং আল্না (ulna) এবং রেডিয়াস (radius) অবিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান। প্রথমাংশের (Eocene) অশ্বের সম্মুখবর্ত্তী পদে পাঁচটী অঙ্গুলি ও পশ্চাৎবর্ত্তী পদে তিনটি অঙ্গুলী বর্ত্তমান। একটা সাধারণ বণ্ডের অপেক্ষা এই অশ্ব সমূহ প্রকাণ্ডতর নহে। অধ্যাপক মার্শ এই প্রথমাংশের নিম্নস্তরে যে অশ্ব-কঙ্কাল পাইয়াছেন, তাহা একটা শৃগাল অপেক্ষা দীর্ঘ নহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রথম অংশের অশ্বেরই অনুরূপ, তবে পশ্চাদ্বর্ত্তী পদে প্রথম অঙ্গুলীর চিহ্ন বর্ত্তমান। অশ্বের অধিকতর পুরাতন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইলে হয়ত তাহা খরগোসের অনুরূপ হইবে, এবং তাহার পদচতুষ্টয়ে হয়ত পঞ্চ অঙ্গুলীই সমাবিষ্ট দৃষ্ট হইবে। (American Journal of Science, Nov. 1876 and April 1892).

অশ্বের এই আবিষ্কার বাস্তবিক বিজ্ঞানের নিকট অতিশয় মূল্যবান। বিবর্ত্তনবাদে যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই এই আবিষ্কারে দৃঢ় প্রমাণিত হইবে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া অশ্ব-সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, অশ্ব ক্রমাগত রূপান্তরিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপ কোন এক জাতীয় জীবের উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাসের নাম ফাইলোজেনী (Phylogeny) এবং সেই জাতীয় জীবের একটী বিশেষ জীবের গর্ভাবস্থায় উৎপত্তি ও শেষ-পরিণতির ইতিহাস অণ্টোজেনী (Ontogeny)। পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, গর্ভে প্রথম উৎপত্তি হইতে সম্পূর্ণ পরিণতি পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীব তাহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রত্যেক অবস্থায় উপনীত হইয়া শেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। গর্ভাবস্থায় অশ্বশাবকের তিনটি অঙ্গুলী দেখিতে পাওয়া যায়, তখন অশ্বভ্রূণ তৃতীয়াংশের (Pliocene) অশ্বের অনুরূপ। বর্ত্তমান অশ্ব পাঁচটী অঙ্গুলী-বিশিষ্ট-পুরাতন-অশ্বের শেষ

পরিণতি। হয়ত ক্রমে ক্রমে এত শিশু অশ্বভ্রূণ আবিষ্কৃত হইবে, যে তাহাতে পাঁচটি অঙ্গুলিই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এক জাতীয় জীব যে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত ও উন্নত হইয়া বর্ত্তমান জীবে পরিণত হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বোধগম্য হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, বিভিন্ন জীব-জাতির সহিত পরস্পরের কিরূপ ভাব সম্বন্ধ। এ বিষয়ে সম্যক গবেষণা করিতে হইলে, বর্ত্তমানে মানবের পরিচিত সমস্ত জীবজাতীর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয় এবং পরস্পরের সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে হইলে, কেবল বাহ্যতঃ কঠিন শারীরিক-গঠন পরীক্ষা করাই যথেষ্ট নহে, পরন্তু চর্ম্মের নিম্নে কঙ্কাল-রাশির পর্য্যালোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শুধু তাহাই নহে, বর্ত্তমান জীব-ভ্রূণ পরীক্ষাও আবশ্যক। কেননা বিভিন্ন বয়সের ভ্রূণ-শরীরে পূর্ব্ব পুরুষের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে।

যদি পৃথিবীর সম্পূর্ণ অপরিচিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও জ্ঞান সম্পন্ন কোন মানব এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর জীব জন্তুর অসংখ্যতা ও বিভিন্নতা দেখিয়া নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইতেন। যদি তিনি এই সমস্ত জীব জন্তুর কোন বিবরণী লিখিতেন, তাহা হইলে প্রথমেই তিনি বিভিন্ন জাতীয় জীব জন্তুর সৌসাদৃশ্য ও প্রভেদ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইতেন। ইহা হইতেই তিনি এই সমস্ত জীব-জন্তুকে সারমেয়, বিড়াল, গো, বানর, ইত্যাদি এক একটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ফেলিতেন। প্রথম দৃষ্টিতে এই সমস্ত শ্রেণী পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিভিন্ন মনে করিতেন বটে, কিন্তু পুনরায় ইহাদিগকে মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট ও মেরুদণ্ড-হীন এইরূপ দুইটি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া ফেলিতেন। এই দুই অংশের জীব জন্তুর শারীরিক গঠনে এত অধিক পার্থক্য যে, এক জাতীয় জীব হইতে অন্য জাতীয় জীবকে পৃথক্ করিতে তাঁহাকে আদৌ চিন্তাই করিতে হইবে না। পুনরায় তিনি সারমেয়, বিড়াল, গো, বানর, ইত্যাদি প্রথমোক্ত বিভাগের বিভিন্ন জাতীয় জীব সমূহকে চতুষ্পদ, দ্বিপদ, দ্বিগর্ভ (marsupials) ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত করিতেন। পরে লক্ষ্য করিতেন যে, সমস্ত জীবেরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম আছে। তাহারা সকলেই চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার উপযুক্ত, সকলেই খাদ্য গ্রহণ করে এবং সকলেই স্ব স্ব জাতীয় সন্তান উৎপাদন করে।

এই সমস্ত দেখিয়া তিনি নিশ্চয়ই মনে করিতেন যে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব একই পরিবারের অন্তর্গত। এইরূপ অনুমান করিবার কারণও তিনি যথেষ্ট লক্ষ্য করিতেন, কেননা সমস্ত জীবিত প্রাণীর উৎপত্তি একই নিয়মের অন্তর্গত,—অণু-প্রমাণ, মৌলিক, সূক্ষ্ম জীব-কোষ (cell) বিভক্ত হইয়াই জীবিত প্রাণীর অবয়ব আরব্ধ হয়।

হস্তী, ভেক, শশক, মকর,—সমস্ত প্রাণীই মাতৃগর্ভে প্রথমে একই অবয়ব প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জাতীয় জীব-ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থার পার্থক্য অনুধাবন করিবার উপায় আছে কি না অথবা কোন পার্থক্যই আছে কি না আজও পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। সমস্ত

মেরুদণ্ডী প্রাণীই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে জরায়ু উৎপন্ন হয়, এবং উৎপত্তির প্রথম মুহূর্ত্তে সকলেরই আয়তন সমান,—ব্যাসের পরিমাণ প্রায় $\frac{১}{১২০}$ ইঞ্চ।

সকল প্রাণীই যে একই পরিবারের অন্তর্গত ইহাই তাহার প্রধান উদাহরণ। ভেক, সরিসৃপ, মৎস্য ইত্যাদি জীব মাতৃগর্ভে যে যে অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, যদি স্তন্যপায়ী মানবাদি সমস্ত জীবও সেই সমস্ত অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে মূলতঃ এই সমস্ত জীব যে একই পিতৃপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান ন্যায় সঙ্গত হইয়া পড়ে, কাজেই তিনি জীব রাশি কিরূপে এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার জন্য এবং পরিবর্ত্তনের পর পর পর্ব্বগুলি অনুধাবন করিবার জন্য স্বতঃই চেষ্টা করিবেন।

(ক্রমশঃ)—

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

কৃত্রিম বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত।

পাশ্চাত্যজগতে নানাবিধ বিজ্ঞানের বহু বিষয়ের অশেষ প্রকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। আজকাল তড়িৎ সাহায্যে প্রায় সকল প্রকার কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে। তড়িৎ আয়ত্ব মধ্যে থাকিলে, উপযুক্ত যন্ত্রাদি দিয়া তাহাকে যে কার্য্য বলিবে তাহাই তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের ন্যায় সুচারু-রূপে সংসাধিত করিবে। দূর দেশে সংবাদ প্রেরণ (Telegraph), দূরস্থিত বন্ধুর সহিত কথোপকথন (Telephone), আলোক প্রজ্জলন পাখা সঞ্চালন, ঘরের ধূলি সম্মার্জ্জন, ঘরের ধূম নিষ্কাসন, রন্ধন ও কাপড় ইস্তিরি করান ইত্যাদি আরও অনেক রকম কার্য্য যে তড়িৎদ্বারা সম্পন্ন হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত তার-বিহীন (wireless) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আধুনিক জন-সমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছে। কোথা হইতে, কোন্‌দিক হইতে, কোন্ সময়ে, কে কাহাকে সংবাদ প্রেরণ করিল অন্য কেহ তাহা জানিতে পারিলনা, শুনিতে পাইলনা, বাধাদিতে পারিলনা, অবাধে নিঃশব্দে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল,—ফলে স্ত্রীহন্তা, নরপিশাচ, ছদ্মবেশধারী ডাক্তার ক্রিপেনের (Crippen) ন্যায় মহাপাপী আণ্টওয়ার্প নগর (Antwarp) হইতে শত শত মাইল দূরে সমুদ্রপথে জাহাজেই ধরা পড়িল, ইহা কি অল্প আশ্চর্য্যের বিষয়! আবার ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিবে, তারের কোন প্রয়োজন নাই; আলোক ইচ্ছামত প্রদীপের ন্যায় এক ঘর হইতে

অন্ত ঘরে লইয়া যাইতে পারা যায়, যেখানে ইচ্ছা রাখা যায়, তৈল নাই, হাত অপরিষ্কৃত হইবে না, ফিতা বা পলিতা কাটিতে হইবে না, গৃহের এক কোণে একটী সুক্ষ্ম switch টিপিয়া দিলেই, যেখানে যত আলোক থাকিবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল গুলি জ্বলিয়া উঠিবে, অথচ কোন আলোকই তারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে না কি অভিনব আবিষ্কার! ইহা প্রথমে নিকোলা টেস্‌লা (Nichola Tesla) নামক একজন বিখ্যাত তড়িৎবিৎ আবিষ্কার করেন। টেস্‌লা কেবলমাত্র এই বিষয় লইয়াই আমাদের নিকট পরিচিত নহেন এবং এই আবিষ্কারই তাঁহার প্রথম আবিষ্কার নহে, ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার তড়িৎ পরীক্ষাগারে বিদ্যুৎ এবং বজ্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আমরা সাধারণ
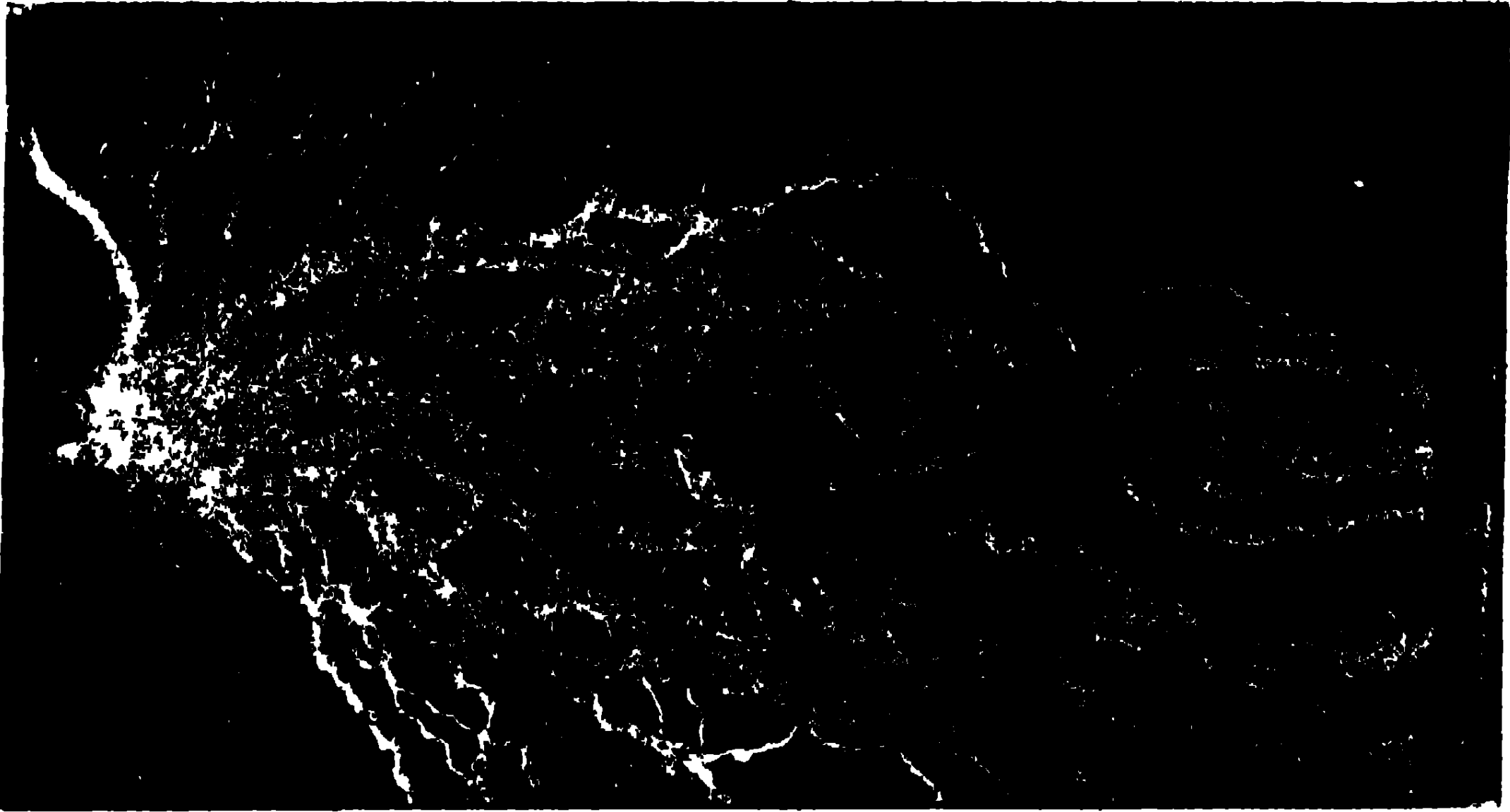
কৃত্রিম বিদ্যুৎ।

যন্ত্র সাহায্যে সচরাচর যেরূপ তড়িৎস্ফুলিঙ্গ দেখিয়াছি তাহার তুলনায় এই তড়িৎ নিস্রাবকে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ নামে অভিহিত করা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যখন তাঁহার যন্ত্র হইতে বায়ু বিদীর্ণ করিয়া তড়িৎ নিস্রাব বাহির হইতে থাকে তখন তাহার শব্দ যে কিরূপ শ্রবণ-বিদারক ও ভীতি-প্রদ তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তড়িৎ নিস্রাবটির আকার আমরা কতকটা এই চিত্র দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারি, এই চিত্রের ঐ তড়িৎ-নিস্রাব দৈর্ঘ্যে ৩০।৩২ ফুটের কম হইবেনা। এখন আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব যে, ঐরূপ তড়িৎ-নিস্রাব উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়া বিখ্যাত তড়িতবিৎ টেস্‌লা (Tesla) কি অপূর্ব্ব বিজ্ঞান-কৌশল ও পরীক্ষা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা জানি যে ০·৬২ ইঞ্চ তড়িৎস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিতে ১১৩৩০ ভোল্ট (volt) বৈদ্যুতিক চাপের প্রয়োজন এবং একটী বুনসেন তড়িৎ-কোষ (Bunsen Battery) যাহা সচরাচর গিল্টিওয়ালারা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার বৈদ্যুতিক

চাপ ১·৯ ভোল্ট; অতএব একটু গণনা করিলেই বুঝা যাইবে যে ঐরূপ আকারের-তড়িৎ-নিস্রাব উৎপন্ন করিতে কত বৈদ্যুতিক চাপের প্রয়োজন, এবং কতগুলি বুনসেন, তড়িৎ-কোষ লাগিবে এবং সেই সমস্ত আয়োজন করা কতদূর কষ্ট-সাধ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে অল্প-আয়াসেই ঐরূপ বৈদ্যুতিক চাপ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

টেস্‌লার কৃত্রিম বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে এই তড়িৎ-স্রাব অনায়াসেই গ্রহণ করিয়া শরীর মধ্যে চালিত করিতে পারা যায়, কেবল এইটুকু দেখিলেই হইবে যে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ যেন শরীরের ঠিক অনাবৃত চর্ম্মের উপর না লাগে, সেই অনাবৃত স্থানে এক টুকরা লৌহ অথবা অন্য কোনও ধাতুখণ্ড দিয়া ঢাকিলেই সেই ভয়াবহ বজ্রাঘাৎ শরীরে লাগিবামাত্র নিঃশব্দে অজ্ঞাতসারে শরীরেই লীন হইয়া যায়।

শ্রীআশুতোষ দে।

কাজের জিনিষ।

কিরূপে ব্যবহৃত ও পুরাতন অয়েল ক্লথকে নূতনের ন্যায় সুদৃশ্য করা যাইতে পারে —৩ সের তারপিন তৈলে ১০$\frac{১}{২}$ সের প্যারাফিন অল্প উত্তাপে গলাইয়া ফেল এবং গরম থাকিতে থকিতেই অয়েল ক্লথে লাগাইয়া দাও। উহা লাগাইয়া ২৪ ঘণ্টা ফেলিয়া রাখ; পরে ফ্লানেল দিয়া রীতিমত ঘসিলেই অয়েল ক্লথ উজ্জ্বল হয়। দেখা গিয়াছে যে, যে অয়েল ক্লথ ৪ বৎসর ক্রমাগত ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাও উক্ত দ্রাবণ ব্যবহারে নূতনের ন্যায় হইয়াছে।

আরসুলা তাড়াইবার সহজ উপায়— সোহাগা গুড়াইয়া বা খুব গাঢ় করিয়া উত্তপ্ত জলে দ্রব করিয়া যে স্থান আরসুলার আবাস ভূমি তথায় ছড়াইয়া দিলে বা লাগাইয়া দিলে আরসুলা নিশ্চই দুরীভূত হয়। সোহাগা ব্যবহার আদৌ অনিষ্টজনক নহে।

চিতি পড়া মুক্তা —মুক্তা-বিজড়িত অলঙ্কার অনেকদিন ধরিয়া ব্যবহার করিলে একরূপ চিতি পড়িয়া হীনপ্রভ হইয়া যায়। শসার জলে মুক্তাগুলি একটী কোমল বুরুশ দ্বারা ধৌত করতঃ পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলিলে মুক্তার ময়লা অপহৃত হয়।

মৃদু-বিরেচন —পরিষ্কার এবং সুপক্ক তেঁতুল একটা পাথর-বাটীতে একটু গাঢ় করিয়া গুলিয়া লও; অতঃপর দেড়পোয়া আন্দাজ দুধ উনানে চাপাইয়া ফুটাইতে থাক, যখন দুগ্ধ গাঢ় হইতে আরম্ভ করিবে, সেই সময়ে উক্ত তেঁতুলের জল দুই চামচ আন্দাজ উক্ত দুগ্ধে ঢালিয়া দাও, দুধ তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ছানা হইয়া যাইবে; এইরূপ হইবার পর ক্রমাগত ফুটাইতে থাক। যখন জল মরিয়া আসিবে, তখন ইচ্ছানুরূপ চিনি মিশ্রিত করিয়া উক্ত ছানা ও ছানার জলকে হালুয়ার মত করিয়া লও। শীতল হইলে উক্ত দ্রব্য খাওয়া উচিত। উহা অতি মুখরোচক অধিকন্তু মৃদু বিরেচক। ইংরাজিতে ইহাকে (Tamarind whey) বলে।

গোদুগ্ধ বৃদ্ধি করিবার উপায়ঃ—

১। মাসকলাই সিদ্ধ—আধ সের; ভাতের মাড়—আধ সের; লালিগুড়—১ পোয়া; পিপুলের গুঁড়া—১ তোলা; লবণ— ১ ছটাক; একত্র মিশ্রিত করতঃ প্রতি সন্ধ্যায় কিয়ৎদিন উপর্য্যুপরি গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ-পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

২। বাঁশপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেইজল খাওয়াইয়া দিলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়; সেইজলের সহিত জোয়ান আধ ছটাক ও কিছু ইক্ষুগুড় মিশাইয়া দিলে অধিকতর সুফল হয়।

৩। রেড়ির কচি কচি পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেইজল খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি পায়। গাভীর স্তনে দুগ্ধ দোহন করিবার কিছু পূর্ব্বে গরম রেড়ির পাতা চাপা দিয়া ও ন্যাকড়া বাঁধিয়া রাখিয়া একটু পরে সেগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দুগ্ধ দোহন করিলে, দুগ্ধ-পরিমাণ প্রায়ই অধিক হয়, অবশ্য পাতা যেন বেশী গরম না হয়।

ধাতব পাত্রে নাম লিখিবার সহজ উপায়।—অনেক সময়ে ধাতব পাত্রে নাম লিখিবার জন্য পাত্র-খোদাই-কারককে দিতে হয়। অবশ্য সেরূপ করিলে অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু অযথা মূল্য দিতে হয়। নিম্নের উপায়ে বেশ পরিষ্কার লেখা যায়। ধাতব পাত্রের যে স্থানে নাম লিখিতে হইবে, সেই স্থানটি অগ্নির উত্তাপে অথবা স্পিরিট ল্যাম্পে গরম করিয়া লও। সেই উত্তপ্ত স্থানে মোম আস্তে আস্তে ঘসিতে থাক। দেখিবে মোম গলিয়া যাইতেছে ও পাত্রের গায়ে লাগিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ পাতলা এক "পোঁচ" মোম লাগাইয়া দিয়া পাত্রটি রাখিয়া দিবে। যখন পাত্র শীতল হইবে, তখন একটা সরু-মুখ সূচ বা ঐরূপ কোন যন্ত্র দ্বারা সেই মোম লাগা স্থানে নাম লিখিবে; এরূপ জোরে লিখিতে হইবে যে, মোম ভেদ করিয়া ধাতব পাত্রের গায়ে সূচের অগ্রভাগ স্পর্শ করে। পরে একটি পাথর বাটীতে একটু (প্রায় অর্দ্ধ ছটাক) নাইট্রিক এসিড রাখ এবং তাহাতে ঐ এসিডের $\frac{১}{৪}$ অংশ জল ঢালিয়া দাও। একটা সরু কাঠিতে একটু তুলা জড়াইয়া তুলির মত কর। পরে ঐ তুলির দ্বারা ধাতব পাত্রের গায়ে মোমের উপর লিখিত স্থানে ঐ জল-মিশ্রিত নাইট্রিক এসিড

লাগাইতে থাক। ৬।৭ মিনিট এইরূপে লাগাইবার পর পুনরায় উত্তপ্ত করতঃ ঐ মোম মুছিয়া ফেলিবে। দেখিবে সুন্দর নাম লেখা হইয়া গিয়াছে। এক পয়সার নাইট্রিক এসিড ও দুই পয়সার মোম হইলে প্রায় ৫০।৬০ খানা পাত্রে নাম লেখা যায়। এসিড যেন পাত্রের অন্যত্র কুত্রাপি না লাগে, তাহা হইলে সে স্থানটিতে একটা গর্ত্ত হইয়া যাইবে।

জুতার কড়া।—কসা জুতা পরিয়া পায়ের অঙ্গুলীতে বড়ই কদাকার কড়া পড়ে। এই কড়া নষ্ট করিতে হইলে প্রথমতঃ কড়ার উপরে তুলা দিয়া জুতা পায়ে দেওয়া উচিত। জুতার ঘসড়ানি যতই কম লাগিবে ততই কড়াও কম হইবে। নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে কড়া একেবারে দূর হইতে দেখা গিয়াছে:—স্যালিসিলিক এসিড—১০ গ্রেন, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (ইণ্ডিয়ান হেম্প) ৫ গ্রেন, বেড়ির তৈল—$\frac{1}{2}$ ড্রাম, কলোডিয়ান—$\frac{1}{2}$ আউন্স। পদার্থ কয়েকটি মিশ্রিত করতঃ সন্ধ্যায় ও সকালে কড়ার উপরে লাগাও। পরে নাতিশীতোষ্ণজলে পা বেশ করিয়া নিমজ্জিত কর এইরূপে পা অন্ততঃ ১০ মিনিট রাখা উচিত। যদি জল ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবে সামান্য গরম জল মিশ্রিত করিয়া দিয়া জলের উষ্ণতা সমান রাখা কর্ত্তব্য। এইরূপ ৫।৬ দিন নিয়ম মত করিলেই কড়ার দাগ বিদূরিত হইবে। উক্ত ঔষধ বড়ই উবিয়া যায়। এই জন্য শিশিতে করিয়া বেশ করিয়া ছিপি আটিয়া রাখা উচিত।

অন্য উপায়। লিকুইড এন্টিমনি টারক্লোরাইড—২ ড্রাম, টিংচার আয়োডিন—২ ড্রাম; আইরন প্রোট আইওডাইড—৭ ড্রাম, মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছিপি আঁটিয়া শিশিতে রাখিয়া দাও, ৫।৬ বার লাগাইলেই কড়া সরিয়া যায়। ইহা সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। কড়ার স্থান অতিক্রম করিয়া নীরোগ চামড়ার লাগিলে ঘা হইবারও সম্ভাবনা আছে। ইহা কড়ার ঔষধ বলিয়া বাজারে বিক্রিত হয়।

সর্দ্দি।—গলায় বসিয়া যাইলে বা কফ অতি শক্ত ও আঠাল হইলে, সন্ধ্যায় একটা ন্যাকড়ায় আধপোয়া আন্দাজ মিছরি বাঁধিয়া একপোয়া আন্দাজ পানীয় জলে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া দাও, প্রাতে সেই মিছরির সরবত গরম করিয়া শুধু পেটে খাইয়া ফেল। দেখিবে কফের উপশম হইতেছে, এবং গয়ের বা কফ নরম হইতেছে; এইরূপ ৬।৭ দিন করিলে সাধারণ সর্দ্দি নির্ব্বিবাদে আরোগ্য হয়।

কলিকাতা ৫১ নং পাঁথারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীশকানন্দ সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞান

১ম বর্ষ।)　　মার্চ্চ, ১৯১২।　　(৩য় সংখ্যা।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাচীন বৈজ্ঞানিক-পুরাবৃত্ত গবেষণায় বুঝিতে পারা যায় যে, তড়িৎ-বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কার ও ক্রমিক অভ্যুদয় ইত্যাদি যাহা কিছু সমস্তই অত্যন্ত আধুনিক। প্রাচীন মনীষিগণের এই প্রাকৃতিক-শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা অতি মাত্র অল্প ছিল। কিন্তু তড়িৎ-বিজ্ঞান স্বীয় ক্ষীপ্র গতির ন্যায় অতি অল্প সময় মধ্যে বাল্যাবস্থা হইতে যৌবনাবস্থায় উপনীত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমানে তড়িৎ-বিজ্ঞান পরিপক্ক-অবস্থা প্রাপ্ত না হইলেও, গুরুত্ব এবং কার্য্য-কারিত্বের তুলনায় কোন বিজ্ঞানই তড়িৎ-বিজ্ঞানের সহিত তুলিত বা ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

পৃথিবীর আদিম অর্দ্ধসভ্য অধিবাসী যাযাবর-জাতিগণই তড়িতের অতি সাধারণ কয়েকটি মাত্র প্রাকৃতিক ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল। বিদ্যুৎ, তৎসহজাত বজ্র নির্ঘোষ, বজ্র-পতন অথবা কেশ বা পশুলোম সহ ঘর্ষণজাত তড়িৎ-ফুলিঙ্গ উৎপাদনই প্রাচীন সুধীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

খৃষ্টের আবির্ভাবের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রথম পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন গ্রীসের সপ্ত রত্নের অন্যতম রত্ন মিলেটাসবাসী (Miletus) মহামতি থেলিস (Thales) স্থির করিয়াছিলেন যে, তৃণমণি (amber) ঘর্ষিত হইলে লঘু পদার্থ সমূহকে আকৃষ্ট করে। ইহার ৩০০ শত বৎসর পরে থিওফ্রাস্টাস্ লক্ষ্য করেন যে,

কোন বিশেষ স্ফটিক পদার্থও উত্তপ্ত হইলে লঘু পদার্থ সমূহকে আকর্ষণ করে। তিনি এই স্ফটিক পদার্থের "লিনকাবিষাম" (Lyncurium) এইরূপ নাম-করণ করেন। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে ইহাই আধুনিক "তুরমালিন" (Tourmaline)। কিন্তু তৃণমণিও যে এইরূপ আকর্ষণ-ধর্ম্ম সম্পন্ন ইহা প্রথম লক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, মণির গ্রীক নাম "ইলেক্‌ট্রন" (Electron)অনুসারে, তড়িতের শৈশবাবস্থায় ইহার "ইলেক্‌ট্রিসিটি" (Electricity) এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

তড়িৎশক্তিসম্পন্ন টরপিডো (Torpedo) নামক এক প্রকার মৎস্যও এইরূপে আক্রান্ত জীবের শরীরে স্নায়বিক আক্ষেপ সঞ্জাত করিতে পারে, ইহা প্লিনি (Pliny) নামক জনৈক পণ্ডিত প্রথমে লক্ষ্য করেন। এই মৎস্যকে সময়ে সময়ে "ক্রাম্প" (Cramp) বলে। কিন্তু এই মৎস্য-বিশেষের এইরূপ শক্তি তৃণমণি বা তুরমালিনের আকর্ষনী-শক্তিরই অনুরূপ ইহা গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দীতে ইউসটেথিয়াস্ (Eustatheus) লিখিয়া গিয়াছেন যে, কারামুক্ত কোন টাইবেরিয়াস (Tiberius) বাসীর বাতব্যাধি এই মৎস্য প্রদত্ত স্নায়বিক বিক্ষোভ দ্বারা নিবারিত হইয়াছিল। চিকিৎসার্থে তড়িৎ-প্রয়োগের ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে গথ নৃপতি ওলিমার (Wolimar) তাঁহার গাত্র হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে পারিতেন। এইরূপ কয়েক জন দার্শনিক পণ্ডিতও কেশ বিন্যাসের সময় তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করিতে পারিতেন। ইহার পর ১২০০ বৎসর যাবৎ আর তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা বা ইহার উন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ডাক্তার গিল্‌বার্ট এই বিস্মৃত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "ডি ম্যাগনেট" (De Magnete) নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আরও কয়েকটী নূতন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, তৃণমণি এবং তুরমালিন ব্যতীত মূল্যবান প্রস্তর সমূহ, কাচ, গন্ধক, চাঁচগালা, রজন ইত্যাদিও, তৃণমণি এবং তুরমালিনের সম-ধর্ম্ম সম্পন্ন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, বায়ুপ্রবাহে জলীয় বাষ্পের অভাবই তড়িৎ ক্রিয়ার অনুকূল। পক্ষান্তরে জলকণা-সিক্ত বা দক্ষিণ বাতাস এইরূপ ক্রিয়ার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। গিলবার্টের এই নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের পর ৬০ বৎসর আবার তড়িৎ আলোচনা অন্ধকারে পড়িয়াছিল। ইহার পর বয়েল (Boyle) তড়িৎ-সম্বন্ধে পুনর্ব্বার আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন। গিলবার্ট-সম্পাদিত তড়িৎ-ক্রিয়া গুলির পুনঃ সম্পাদন করতঃ তাঁহার উক্তির সমর্থন করেন। প্রত্যুতঃ তিনিই তড়িৎ-সম্ভূত-আলোক-আবিষ্কার-গৌরবের প্রকৃত অধিকারী। তবে তাঁহার ক্রিয়াবলী বা মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী এতই অস্পষ্ট যে, তাঁহাকে তড়িৎ আলোকের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া কিছুতেই নির্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রায় এই সময়েই ম্যাগ্‌ডিবার্গের বিচারপতি (Burgomaster of Magdeburg), বায়ু-নিষ্কাশন-যন্ত্রের

আবিষ্কর্ত্তা, স্বনাম-খ্যাত আটো ভন গেরিক (Otto Von Guericke) তড়িৎ-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘর্ষিত বস্তুর স্থানে কাঁচ-দণ্ড, রজন বা গন্ধক-দণ্ড এবং ঘর্ষকের স্থানে হস্ততালু এবং পশম এই সমস্তই তড়িৎ-তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসুগণের নিকট তড়িৎ-উৎপাদনের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কাজেই উৎপন্ন তড়িৎ পরিমাণ যে অতি সামান্যমাত্র হইত, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! অটো ভন গেরিক সর্ব্ব প্রথম বৈদ্যুতিক যন্ত্র উদ্ভাবন ও গঠন করেন। এই যন্ত্রের প্রধান উপাদান অর্থাৎ ঘর্ষিত বস্তু একটি গন্ধকের গোলক, এবং ঘর্ষক হস্ততালু। এই গন্ধক-গোলকটি অক্ষদণ্ডে বিঘূর্ণিত হইত। এই অতি অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত যন্ত্র সাহায্যেও তিনি দণ্ড-ঘর্ষণ-জাত তড়িৎ অপেক্ষা অধিকতর তড়িৎ উৎপাদিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই অধিক পরিমাণ তড়িৎ হইতে আলোকের অধিকতর দীর্ঘ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইযাছিল; এবং স্ফুলিঙ্গ-নির্গম-কালীন যে প্রকার শব্দ উত্থিত হয় তাহাও শুনিতে পাইযাছিলেন। তিনি এই সমুদয় হইতেই তড়িতের আলোক উৎপাদনকারী ক্ষমতার অবিসংবাদী মীমাংসা করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তড়িতের বিকর্ষণ-শক্তিও প্রথম আবিষ্কার করেন।

তড়িৎ-বিজ্ঞানে মহামতি স্যার আইজ্যাক নিউটন তত মনোনিবেশ করেন নাই। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র স্থির করেন যে তড়িতের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ শক্তি কাঁচের চাদর ভেদ করিযাও প্রসারিত হয়: এবং যদি এক খানা কাঁচের চাদরের এক দিকে তড়িৎ উৎপাদিত হয, সেই তড়িৎ অপর পৃষ্ঠেও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে।

তৃণমণি ঘর্ষণে অসংখ্য মৃদু শব্দ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক রেখা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাক্তার ওযাল (Dr. Wall) সর্ব্ব প্রথম বিদ্যুৎ এবং বজ্রপতনের সহিত তড়িৎ ক্রিয়ার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল—"This light and cracklings seem in some degrees to represent thunder and lightning"। ইহার পর ৪০ বৎসর আর কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয নাই। ১৭২৯ খৃঃ অঃ ষ্টিফেন গ্রে (Stephen Grey) সর্ব্ব প্রথম তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই তড়িৎ অপরিবাহক পদার্থের সহিত তড়িৎ পরিবাহক পদার্থের বিভিন্নতা আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। তিনি কোন সময়ে অল্পদূরে তড়িৎ পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করেন এবং সাধারণ সূত্রে ধাতব তার ঝুলাইয়া এই পরিবাহণ পথ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু সূত্র তড়িৎ বাহক বলিয়া তাঁহার চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার পরীক্ষার সহকারী হুইলার (Wheeler) অনুমান করিলেন যে, সূত্র গুচ্ছ অপেক্ষাকৃত স্থূল হইয়াছে বলিয়া তড়িৎ অতি ত্বরিত গতিতে পরিবাহিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। কাজেই তিনি ওয়ার্ডকে অতি সূক্ষ্মতম সূত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন; তিনি বুঝাইলেন

যে অতি সূক্ষ্ম সূত্র বাহিয়া তড়িৎ ত্বরিত-গতিতে স্বস্থানভ্রষ্ট হইতে পারিবে না। রেশম সূত্র সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবিয়া রেশম সূত্র ব্যবহার করিলে, তাঁহারা পরীক্ষায় কৃত-কার্য্য হইলেন। তাঁহারা সূক্ষ্মতাই কার্য্য সিদ্ধির উপায় ভাবিয়া এবং সূক্ষ্ম-ধাতব-তার ব্যবহার করিলে আরও কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে ভাবিয়া, তার ব্যবহারে পুনরায় পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হইলেন। এবারে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইলেন বলিয়া রেশম এবং তারের মধ্যে এবং তাহাদের প্রত্যেকের তড়িৎ-পরিবাহণ-ক্ষমতার মধ্যে কি পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা স্থির করিলেন, যে কতকগুলি পদার্থ তড়িৎ-পরিবাহক এবং কতকগুলি তড়িৎ পরিবাহণ-পথরোধক। তাহারা এই দুই বিভিন্ন-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট পদার্থের একটি তালিকাও প্রস্তুত করিলেন। অবশেষে তাঁহারা মীমাংসা করিলেন, যে ঘর্ষণ বা এইরূপ কোন উপায়ে উদ্রিক্ত করিলে যে সমস্ত পদার্থ তড়িৎ-পূর্ণ হয়, তাহারাই তড়িৎ অপরিবাহক এবং যাহারা উদ্রিক্ত হইলেও কিছুতেই তড়িৎ-পূর্ণ হয় না, তাহারাই তড়িৎ পরিবাহক।

প্রায় এই সময়েই ফরাসি রাজকীয় উদ্যানের তত্ত্বাবধারক জনৈক ডু ফে (Du Fay) দুই বিভিন্ন জাতীয় তড়িতের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ইহাও আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। একখণ্ড সুবর্ণ-পত্রিকা (কাগজের অপেক্ষাও পাতলা এবং লঘু পেটা-সোনা) উদ্রিক্ত কাঁচদণ্ড দ্বারা বিকর্ষিত হইলে, ডু ফে অন্য একটি উদ্রিক্ত গাঁচ-গালাদণ্ড দ্বারা পুনঃ বিকর্ষিত করিবার মানসে উক্ত পত্রিকার নিকট গালাদণ্ড লইয়া আসিলে পত্রিকা বিকৃষ্ট না হইয়া তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইল দেখিয়া ডু ফে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি এইরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, বিভিন্ন-পদার্থ-উদ্রিক্ত তড়িৎ বিভিন্ন-ধর্ম্ম-সম্পন্ন। অতঃপর বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে তিনি এই দুই বিভিন্ন তড়িতের একটির নাম কাচোৎপাদিত তড়িৎ অপরটি রেজিন উৎপাদিত তড়িৎ এইরূপ নাম করণ করিলেন (vitrious and resinous)।

প্রায় এই সময়েই গ্রে (Grey) নামক জনৈক পণ্ডিত তড়িৎ-অপরিবাহক পদার্থ দ্বারা মৃত্তিকা হইতে পৃথকীকৃত আসনে স্থিত মানব-দেহ হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত করাইয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিলেন। এইরূপে তড়িৎ-পরিবাহক-পদার্থকে অপরিবাহক পদার্থ দ্বারা পৃথকীকৃত করার ইংরাজী নাম ইনসুলেশন (Insulation) এবং এইরূপে স্বতন্ত্রস্থিতপদার্থকে, ইনসুলেটেড (Insulated) পদার্থ বলে। ইহার পর হইতে তড়িৎ ক্রিয়া বা তাহার ধর্ম্মপরীক্ষা কালে বা তড়িতের কোন কিছু কার্য্যোপলক্ষে ইনসুলেটেড টুল (insulated stool) ব্যবহৃত হইতে লাগিল। খৃষ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্ম্মান দেশীয় পণ্ডিতগণ তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ গবেষণা আরম্ভ করিলেন। উইটেনবর্গের দর্শন-শাস্ত্র-অধ্যাপক এম বোজ (M. Boze) নামক জনৈক পণ্ডিত একটি তড়িৎ-উৎপাদক-যন্ত্র গঠন করিলেন, ইহাতে তড়িৎ পরিরাহিত

হইবার জন্য ধাতব পরিবাহক সংযুক্ত করিলেন, অধিকন্তু গন্ধকের গোলকের পরিবর্ত্তে তিনি কাচ-গোলক ব্যবহার করিলেন।

বার্লিন নগরের পণ্ডিত ডাক্তার লুডলফ্ (Ludolph) সর্ব্বপ্রথম স্পিরিট, ফস্‌ফরাস, বারুদ প্রভৃতি সহজ দাহ্য পদার্থ ইনস্যুলেটেড টুলের উপর বা রজনপিণ্ডকের উপর দণ্ডায়মান মানব-অঙ্গুলি-নিঃসৃত-তড়িৎ-সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলন করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিলেন।

১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লিডেন (Lyden) নগরের পণ্ডিত এম কিউনিয়াস (M. Cuneus) কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ লিডেন বোতল (Lyden Jar) আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এবং অতীতের অন্য সমস্ত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের ন্যায় ইহাও আকস্মিক এবং দৈব-ঘটিত। তৎকাল-প্রসিদ্ধ-পণ্ডিতগণ-অভিহিত এই "তড়িৎ বাষ্প" (electric fluvium) একই স্থানে বা একই পাত্রে পরিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত অধ্যাপক মুসেনব্রোক (Muschenbrœk) উদ্ভাবিত কোন এক সুসংস্কৃত পরীক্ষার পুনঃ সম্পাদন কালে এম কিউনিয়াস লিডেন বোতল নির্ম্মাণ পন্থা উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মুসেনব্রোক অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, যদি অপরিবাহক পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত কোন পরিবাহক পদার্থকে তড়িৎ পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে, তড়িৎ-শক্তি নিশ্চয়ই সর্ব্বদিকে অনায়াসে বিকীরিত হইবার তত সুবিধা পাইবেনা। কাজেই ইহা একই স্থানে বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকিবে। এইরূপ যন্ত্র গঠিত করিতে হইলে তিনি স্থির করিলেন যে, জলকে কাচের বোতলের মধ্যে পূরিয়া বোতলের ছিপি মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট ও জললগ্ন একটি লোহ কীলক দ্বারা সেই জল এবং তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের মূল এবং প্রধান তড়িৎ-পরিবাহক-দণ্ড (Prime Conductor) পরস্পর সংযুক্ত করতঃ জলকে তড়িৎ-পূর্ণ করিলেই তড়িৎ জলে সঞ্চিত থাকিবে; এবং কাচ অপরিবাহক বলিয়া তড়িৎ বিকীরিত হইয়া পড়িবেনা। কিন্তু এইরূপ চেষ্টায় কোন ফল হইল না। কাজেই অধ্যাপক মুসেনব্রোক সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কিউনিয়াস এইরূপে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিবার কালে দৈবাৎ বোতলটি এক হাতে ধরিয়া অন্য হস্ত দ্বারা কীলকটি প্রাইম কণ্ডাকটার হইতে অপসারিত করিতে যাইয়া বাহু অভ্যন্তরে মুহূর্ত্ত-মধ্যে একটা তীব্র স্নায়বিক বিক্ষোভে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। মুসেনব্রোক পুনরায় এই পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাঁহারও ভয়ঙ্কর স্নায়বিক বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। এই স্নায়বিক বিক্ষোভ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কারণ, এইরূপ বিবৃত করিয়া এম রোমারকে (M. Reaumur) এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে লেখা ছিল যে, তিনি বাহু, স্কন্ধ এবং বক্ষঃস্থলে তীব্র আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই তীব্র আঘাতের যন্ত্রণা ও আকস্মিক বিপদ-পাতের ভীতি তাঁহাকে দুই দিন পর্য্যন্ত কাতর করিয়া রাখিয়াছিল। অধিকন্তু তিনি আরও লিখিয়াছিলেন

যে, সমগ্র ফরাসিরাজ্য লোভেও পুনরায় আর একবার ওরূপে পেশীর আকুঞ্চন গ্রহণ করিবেন না।

তাঁহার পরবর্ত্তী অনেক লোকে এইরূপে লিডেন বোতল হইতে স্নায়বিক আকুঞ্চনীয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম আঘাতেই এম আল্লামেণ্ডের (Allamend) কিয়ৎকালের জন্য শ্বাস প্রশ্বাস স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। লিপ্‌সিকের (Lipsic) তড়িৎ-তত্ত্ববিৎ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক উইনক্লার (Winokler) লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রথম আঘাতেই তাঁহার শরীরের শোণিত প্রবাহে ভয়ঙ্কর আক্ষেপ উপস্থিত হইল; ইহাতে তিনি মনে করিলেন যে, তিনি কষ্টদায়ক জ্বরাক্রান্ত হইবেন, এমন কি জ্বরনিবারণার্থে তাহাকে জ্বরোপশমক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। আরও দুই এক সময়ে আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল, যে তাঁহার নাসিকা হইতে শোণিত নিঃসৃত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ আমেরিকার দার্শনিক ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন (Dr. Franklin) লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি আঘাত পাইবার পরেই মনে করিলেন যে, যেন তাহার আপাদমস্তক চারি দিক হইতে তীব্র প্রহারে আহত হইয়া পড়িল। অব্যবহিত পরেই তাঁহার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; এই কম্পন ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি এত ত্বরিৎ গতিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার সমস্তই গোলমাল হইয়া পড়িল। যে প্রাইম কণ্ডাক্‌টার হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাঁহার হস্ত-পৃষ্ঠে আঘাত লাগিয়াছিল, সেই প্রাইম কাণ্ডক্‌টারে তাঁহার দৃষ্টি দৃঢ় সন্নিবিষ্ট থাকিলেও, কোন্ মুহূর্ত্তে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ তাঁহাকে আঘাত করিল তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি তড়িতের প্রবেশ কালীন শব্দও শুনিতে পান নাই, অথচ চতুর্দ্দিকের দর্শকবৃন্দ শুনিয়াছিল, যে শব্দ বাস্তবিকই উচ্চতর। আঘাতটাও যে তিনি বিশেষরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও নহে, অথচ সেই আঘাতে আহত স্থানটি রীতিমত ফুলিয়া উঠিয়াছিল। দিবসের অবশিষ্ট অংশ তাঁহার বাহু ও গলদেশের পশ্চাৎ অংশের কতকটা অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল। কোনও স্থান ঘর্ষিত হইলে যেরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহার বক্ষঃ অভ্যন্তরেও সেইরূপ যন্ত্রণা ও বেদনা এক সপ্তাহ ছিল। এইরূপ আঘাত প্রদানের পর শরীরের কি কি বিপর্য্যয় সম্ভব, তৎসমুদায়ের তিনি বহুবিধ বিভিন্ন পরীক্ষা করেন, অবশেষে তিনি স্থির করেন, যে বজ্রাঘাতে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও যন্ত্রণাশূন্য। পূর্ব্বে অনেকেই তড়িৎ সংযোগে ইস্পাতের তারকে চুম্বক-ধর্ম্ম-সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ভালরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি লিডেন বোতল তড়িৎ পূর্ণ করিয়া, সেই তড়িৎ সংযোগে ইস্পাতের তারকে রীতিমত চুম্বক ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

লোকে এম কিউনিয়াসকে লিডেন-বোতলের আবিষ্কারক ভাবিয়া গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, কিন্তু পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্যানসিন ক্যাথিড্রালের ডিন্, এম ভন ক্লিষ্ট (M. Von Kliest, Dean of Cathedral of Cancin) বাস্তবিক উক্ত যন্ত্রের প্রকৃত আবিষ্কর্তা। এইরূপ কথিত আছে যে, ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে ক্লিষ্ট তাহার আবিষ্কারের সবিশেষ বিবরণ বার্লিনের তৎকাল প্রসিদ্ধ ডাক্তার লিবারকুলামকে (Dr. Lieberculum) লিখিয়া পাঠান। বার্লিনের একাডেমিতে এই বিবরণ বিজ্ঞাপিত হইলে, একাডেমির কার্য্যবিবরণীতে ইহা এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—"যদি কোন লৌহ কীলক বা মোটা পিত্তল তার একটি ক্ষুদ্র শিশিতে রাখিয়া তাহাতে তড়িৎ উদ্রিক্ত করা হয়, তাহা হইলে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। এই শিশি পরিবিশুদ্ধ এবং উত্তপ্ত হওয়া প্রয়োজন। আমি খড়ি চূর্ণ দিয়া বোতলটিকে হাতে রাখিয়া রীতিমত ঘর্ষণ করি, এই শিশিতে যদি স্পিরিট বা পারদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কার্য্য আরও সুন্দররূপে সংসাধিত হয়। এই শিশি এবং কীলক প্রাইম কণ্ডাকটার বা তড়িৎ পূর্ণ কাচদণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার অব্যবহিত পরেই ইহা হইতে এরূপ দীর্ঘ অগ্নি কিরণজাল সমাকীর্ণ হইতে থাকে, যে এই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে লইয়া আমি আমার গৃহের বহির্দ্দিকে ৬০ পদ চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহাকে আরও অধিকতর তড়িৎপূর্ণ করিয়া আমি কক্ষান্তরে প্রবেশ করতঃ তথায় স্পিরিট প্রজ্জলিত করিয়াছি। ইহাকে তড়িৎপূর্ণ করিবার কালে যদি আমি অঙ্গুলি দ্বারা কীলকটি স্পর্শ করি, অথবা হস্তে সুবর্ণ দণ্ড লইয়া সেই দণ্ড লৌহ কীলকে সংলগ্ন করি, তাহাহইলে আমার স্নায়ু মণ্ডলে একটা বিষম আক্ষেপ উপস্থিত হয়; এবং আমার স্কন্ধ প্রদেশ ও বাহুদ্বয় অসাড় হইয়া পড়ে। একটি টিনের নল, বা কোন মানব যদি ইন্সুলেটেড টুলের উপর দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে, সাধারণ প্রণালী অপেক্ষা এই প্রণালীতে অধিকতররূপে তড়িৎপূর্ণ হইয়া থাকে। যখন আমি ১৫ ফিট লম্বা একটা টীনের নলে এই শিশি ও কীলক সংলগ্ন করিয়াছিলাম, তখন এই নল যে কিরূপ অধিক পরিমাণে তড়িৎপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা না দেখিলে কিছুতেই অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। দুই টুকরা পাতলা কাঁচখণ্ড এই তড়িৎ আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারের মধ্যে এই টুকুই অসাধারণ যে, যদি এই কীলক ও শিশি পরস্পর তড়িৎ পরিবাহক বা তড়িৎ অপরিবাহক কোনরূপ পদার্থ দ্বারা সংলগ্ন থাকে, তাহা হইলে শরীরে কোনরূপ তীব্র আঘাত লাগে না। আমি ইহা কাষ্ঠখণ্ডে, কাঁচখণ্ডে, গালায় এবং অন্য ধাতব পাত্রে সংলগ্ন করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। সেই জন্য মনে হয় মানব শরীরের সহিত ইহার কোন বিশেষ রহস্য সংলিপ্ত রহিয়াছে। আমার এই মত সমর্থনের জন্য আমি কেবল এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিতে চাই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমি এই শিশি

হস্তদ্বারা ধারণ করি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা কিছুতেই স্পিরিটে অগ্নি প্রজ্জলিত করিতে পারে না।”

যাহা হউক এম কিউনিয়াসের সময় হইতে সকলেই, এই বোতল তড়িৎপূর্ণ করিতে হইলে, হাতে করিয়া ধরিতেন, কিন্তু এরূপ করিবার কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেন না। অবশেষে মহামতি ফ্রাঙ্কলিনের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনিই প্রথমে মীমাংসা করেন যে শিশির ভিতরে এবং বাহিরে এক জাতীয় তড়িৎ থাকে না, পরন্তু দুইটাই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন একটী বোতলকে তড়িৎপূর্ণ করিবার সময় বোতলের ভিতরে যতটুকু তড়িৎ প্রবিষ্ট করান হয়, বাহির হইতে ততটুকু তড়িৎ বিনির্গত হইয়া যায়। এই জন্যই তড়িতের ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য পথ স্বরূপ হস্ত কিম্বা অন্য কোন পরিবাহকের প্রয়োজন হয়।

১৭৪৭ খৃঃ অব্দে ডাক্তার ওয়াটসন, (Dr. Watson) লর্ড সি ক্যাভেণ্ডিস (Lord C. Cavendish) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিঃক্রুত-তড়িত কত ত্বরিত গতিতে প্রবাহিত হয়, তৎ-অবধারণার্থে টেম্‌স্ নদীর উপর দিয়া ২ মাইল তার সংযোগে ও সুটার্শহিল (Shooter's Hills) নামক নীরস ২ মাইল পার্ব্বত্য ভূমিতে পরীক্ষা করেন। এই দুই স্থানেই অতি ত্বরিত গতিতে তড়িৎ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত পরীক্ষা আধুনিক তড়িৎ-তত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণের নিকট অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়া পড়িয়াছে। এই পরীক্ষার ফল অনুধাবন করিয়া এবং পৃথিবীর তড়িৎ-পরিবাহন-ক্ষমতা অবলোকন করিয়া পণ্ডিতগণ টেলিগ্রামে গমন-প্রত্যাগমনের জন্য দুইটী বিভিন্ন তার যোজনা না করিয়া, কি স্থলে, কি জলে সর্ব্বত্রই একটি তারে কার্য্য চালাইতেছেন, অন্য তারের কার্য্য পৃথিবীর দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। ইহাতে যে কোটী কোটী টাকা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ফ্রাঙ্কলিন সাহেবই প্রমাণ করেন যে, লিডেন বোতলে, তড়িৎ ধাতব-আচ্ছাদনে অবস্থান করে না, পরন্তু বোতলের গাত্রে অর্থাৎ কাঁচ অংশে অবস্থিতি করে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি বোতলের গাত্র হইতে ধাতব আবরণ খুলিয়া ফেলিবার ও পুনঃ সংযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। অতঃপর তিনি বোতলটিকে তড়িৎপূর্ণ করতঃ ধাতব আচ্ছাদনটীকে অপসারিত করিলেন। ইহাতে তড়িতের পরিমাণ কিছুই হ্রাস প্রাপ্ত হইল না।

ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিনের পুর্ব্বেই ডাক্তার ওয়াল তড়িৎ-নিঃক্রুত হইবার কালীন স্ফুলিঙ্গ ও মৃদু শব্দ শুনিয়া ইহার সহিত বজ্র ও বিদ্যুতের একই সম্পর্ক স্থির করিয়াছিলেন [illegible]লিডেন বোতল আবিষ্কৃত হইবার পর তড়িৎ ক্রিয়া পরীক্ষকগণ ক্ষুদ্র অনুপাতে [illegible] ও বিদ্যুতের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হপকিন্‌সন (Hopkinson) [illegible] কোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ডাক্তার

...লিন মেঘমণ্ডল হইতে তড়িৎ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হপকিন্সন (Hopkinson) বৃহৎ তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ পাইবার প্রত্যাশায় একটি বৃহৎ লৌহগোলকে একটি সূচ্যগ্র দণ্ড প্রোথিত করিলেন। তিনি অনুমান করিলেন যে, এই বৃহৎ গোলক তড়িৎ-পূর্ণ হইলে, স্ফুলিঙ্গ, মাত্র সূচ্যগ্র দণ্ড দিয়া নিঃসৃত হইবে বলিয়া, নিশ্চয়ই বৃহৎ হইবে। কিন্তু বিপরীত ফল হইল, লৌহগোলককে তিনি তড়িৎপূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি ইহার সমস্ত বিবরণ ফ্রাঙ্কলিন সাহেবকে শুনাইলেন। তিনি এই ব্যাপারের তথ্য নির্ণয়ে মনঃসংযোগ করিয়া এই পরীক্ষাটি পুনর্বার সংসাধন করিতে যাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এইরূপ সূচ-প্রোথিত থাকিলে গোলকটিকে তড়িৎপূর্ণ করাই যে কষ্টকর তাহাই নহে, পরন্তু যদি এইরূপ সূচ্যগ্র দণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকে, এবং একটি তড়িৎপূর্ণ গোলক তাহার নিকটে লইয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে গোলক হইতে ধীরে ধীরে তড়িৎ বিকীরিত হইয়া গোলক তড়িৎ শূন্য হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে মেঘমণ্ডল হইতে বিদ্যুৎকে অনায়াসে এবং নির্ব্বিবাদে উচ্চভূমি প্রোথিত কোন সূচ্যগ্র দণ্ড দ্বারা পৃথ্বীতলে নীত করা যাইতে পারে। ইহা হইতেই বিদ্যুৎ-পরিচালক দণ্ডের অঙ্কুর উপ্ত হইল। তিনি তাহার পরীক্ষাবলী গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করতঃ তড়িৎবিৎগণকে উক্ত প্রণালীতে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করায়, পৃথিবীস্থ-তৎকালীন যাবতীয় দার্শনিক ঐ সকল পরীক্ষা সম্পাদন করিলেন। অনেকেই "ঘুড়ি" নির্ম্মাণ করিয়া মেঘমণ্ডল হইতে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করিতে যাইয়া তড়িতের দ্বারা আহত হইলেন। এম, ডি, রোমাস্ (Romas) এই উদ্দেশ্যে যে এক ঘুড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার দৈর্ঘ্য ৭ ফিট এবং প্রস্থে ৩ ফিট। তিনি সাধারণ সূত্রের পরিবর্ত্তে ইন্সুলেটেড্ তার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৫৩ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহার ঘুড়ি উড্ডীয়মান করেন। ঘুড়ি ৬০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। পরীক্ষাকালীন তিনি অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দের ২৬ শে আগষ্ট তারিখে এইরূপ পরীক্ষাকালীন সেণ্ট পিটার্সবার্গ নিবাসী অধ্যাপক রিচম্যানের (Richman) মৃত্যুতে জন সাধারণ ভয়-চকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বজ্রপূর্ণ মেঘমণ্ডলের, (কাহারও কাহারও মতে বায়ু-মণ্ডলস্থিত তড়িতের) ক্রিয়াবলী পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। তিনি এই যন্ত্রটিকে "বৈদ্যুতিক শঙ্কু" (Electrical Gnomon) এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। উক্ত দিনে প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইলে এবং চারিদিক ভীষণ মেঘপূর্ণ হইয়া উঠিলে যখন বজ্রের কড় কড় নিনাদে দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে অধ্যাপক রিচম্যান এম সলোকাউ নামক এক জন তাঙ্করের সমভিব্যাহারে বৈদ্যুতিক শঙ্কুর দিকে মস্তক অবনত করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এম সলোকাউ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার মুষ্টির ন্যায় একটী প্রকাণ্ড হরিৎ অগ্নি গোলক নোমন হইতে

চকিতে বিনির্গত হইয়া এক ফুট দূরে অধ্যাপকের মস্তক অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। এই স্ফুলিঙ্গ আঘাতে নিমেষ-মধ্যে রিচম্যান গত-জীবন হইলেন। এম স... এরূপ হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার নিজের উপর এই তড়িতের ... ভালরূপ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, সেই গৃহমধ্যে একরূপ বাষ্প স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহাতেই তিনি স্পন্দহীন, অসাড় ও হতজ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কাজেই স্ফুলিঙ্গ-নির্গম কালীন তড়িৎ নির্ঘোষ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। সেই গৃহমধ্যে তড়িৎ ক্রিয়া বড়ই অসাধারণ হইয়াছিল। গৃহ-দ্বারের "চৌকাট" ইত্যাদি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং কপাট কব্জা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

অধ্যাপক রিচম্যানের দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা গেল, যে তাঁহার কপালে একটা লোহিত দাগ ও তথাকার লোমকূপ হইতে কয়েক বিন্দু শোণিত নিস্রুত হইয়াছে। কিন্তু গাত্র চর্ম্মে কোনরূপ ছিদ্র হয় নাই। বামপদের পাদুকা পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং পদ-তালুতে একটি নীল দাগ পড়িয়াছিল। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বিদ্যুৎ কপালে প্রবিষ্ট হইয়া, এবং সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে বামপদ দিয়া বিনির্গত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত গাত্রেও অনেকগুলি কাল ও লোহিত দাগ হইয়া গিয়াছিল। বাম পদের পাদুকা ভিন্ন পরিহিত-বস্ত্রের কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। মৃত্যুর চব্বিশ ঘণ্টা পরে শরীর ব্যবচ্ছিন্ন হইলে দেখা গেল যে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে, এবং করোটী বা মস্তকের খুলিও সম্পূর্ণ অনাহত রহিয়াছে। শ্বাসনালী পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ত্বক্‌সমূহ অত্যন্ত পেলব হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অতি সামান্য নাড়াচাড়াতেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পাকস্থলী ও গলনালীর অধোভাগের গর্ত্ত সমূহে অতিস্রাবিত শোণিত সঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রন্থি ও অন্ত্র সমূহ অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছিল। দেহ অত্যন্ত শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করিল; এবং মৃত্যুর দুই দিন পরেই এরূপ গলিয়া গিয়াছিল যে, অতিকষ্টে শবাধারে ন্যস্ত করিতে হইয়াছিল।

ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ লইয়া যতরূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই তিনি লক্ষ্য করিলেন, যে বিদ্যুৎ পরিচালক দণ্ডগুলি বি-সম তড়িৎ ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া পড়ে। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন যে, মেঘ-সমূহ সর্ব্বদাই বি-সম তড়িৎ সম্পন্ন। কাজেই বজ্র, ঝড় বৃষ্টির সময়ে, মেঘ হইতে পৃথিবীকে আঘাত করেনা, পরন্তু পৃথিবীর বিদ্যুৎই মেঘমণ্ডলকে আঘাত করে। অবশ্য তাঁহার এ যুক্তি ভ্রমাত্মক। তাঁহার এই ভ্রান্ত অভিমত পরে কাণ্টন (Canton) তড়িতের ইণ্ডাক্‌শন্ (Induction) ধর্ম্ম আলোচনা করিবার সময় সংশোধন করিয়া লন। উক্ত পণ্ডিতই সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ করেন, যে ঘর্ষণে কোন এক ঘর্ষিত বস্তুতে যে জাতীয় তড়িৎ উৎপাদিত হয়, ঘর্ষক

পরিবর্ত্তিত করিয়া অথবা ঘর্ষিত বস্তুর উপরিভাগের অবস্থান্তর করিয়া একই বস্তুতে বিপরীত জাতীয় তড়িৎ উৎপাদিত হইতে পারে। সাধারণতঃ মসৃণ কাঁচ দণ্ডে রেশম ঘর্ষণ করিলে সম-তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিড়াল লোম ঘর্ষণ করিলে বা কাঁচের উপরিভাগ বন্ধুর বা অমসৃণ করিয়া দিলে বি-সম তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

এম, এপিনাস (Epinus) এবং অনারেবল্ এইচ ক্যাভিণ্ডিস্ (Cavendish) তড়িতের আকর্ষণ বিকর্ষণের গণিতমূলক কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার চেষ্টা করেন। এই তত্ত্ব পরীক্ষায় ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে এম কুলোম (Coulomb) বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি ইহার জন্য যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার নাম "টরসন্ ব্যালান্স" (Torsion Balance)। এই যন্ত্র সাহায্যে এক গ্রেনের ২,০০,০০,০০০ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ বলও (Force) নির্ভুল পরিমিত হইতে পারে। এই যন্ত্র সাহায্যে তিনি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নির্দ্ধারিত করেন।

(১) দুই বস্তু একই জাতীয় সম-পরিমাণ-তড়িৎপূর্ণ হইলে পরস্পরের বিকর্ষণ হয়। এই বিকর্ষণ-বল বস্তুদ্বয়ের দূরতা বৃদ্ধির সহিত সম-অনুপাতে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(২) দুইটি বস্তুর একটীতে যত পরিমাণ তড়িৎ থাকিবে, সেই বস্তু অন্য বস্তুটিকে তাহার তড়িৎ পরিমাণের সম-অনুপাতে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করিবে। দুইটি বস্তুর একটীতে যত পরিমাণ তড়িৎ থাকিবে, সেই বস্তু অন্য বস্তুটিকে উভয়ের দূরতার বি-সম-অনুপাতে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট করিবে।

এতদ্ব্যতীত কুলোম স্থির করিলেন যে, তড়িৎপূর্ণ কোন ইনস্যুলেটেড (insulated) পদার্থ হইতেও তড়িৎ অল্পে অল্পে ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু রাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই বায়ু মণ্ডল অবশ্য কখনই জলকণা শূন্য নহে, তবে জলীয় অংশ কখন অধিক বা কখন অল্প থাকে।

টরসন্ ব্যালান্স উদ্ভাবিত হইবার কয়েক বৎসর পরেই ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে এম ভল্টা (M. Volta) ইলেক্ট্রোফোরাস (Electrophorus) নামক আরও একটি তড়িৎ যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাভইসিয়ার (Lavoisier) এবং ল্যাপলাস (Laplace) তড়িৎ সম্বন্ধীয় অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া তড়িৎ-বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হইবার সময়, কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত হইবার সময়, পদার্থের অকস্মাৎ অবয়ব পরিবর্ত্তনের সময় এবং পদার্থ দ্বয়ের তীব্র রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় যে তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহা উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ই নির্ণয় করেন।

ইটালীর অন্তর্গত পেভিয়ার (Pavia) শারীর-স্থান-বিদ্যার-অধ্যাপক গ্যালভানী (Galvani) খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তড়িতের আর একটি নূতনতর শাখা

আবিষ্কার করেন। আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে এই শাখা বিজ্ঞানের নাম গ্যালভানিজম্ (Galvanism) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই আবিষ্কারের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বিবরণ পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে ইহাও সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং দৈব-ঘটিত। তাঁহার স্ত্রী ও জনৈক ছাত্র লক্ষ্য করিলেন যে, একটি তড়িৎ যন্ত্রের নিকটস্থ একখানি ছুরিকার দ্বারা ভেকের ব্যবচ্ছিন্ন দেহ স্পৃষ্ট হইবামাত্র ভেকের স্নায়বিক আক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। গ্যালভ্যানীর পত্নীই এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিবার অবসর পাইয়াছিলেন; কেননা তিনি পীড়িত ছিলেন বলিয়া তাঁহারই পথ্য তৃপ্তিদায়ক করিবার জন্য ভেকটি আনীত হইয়াছিল।

যাহা হউক "ইন্সটিটিউট্ অফ্ সাএন্স" নামক সভার ব্যবহারার্থে এই আবিষ্কারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া বোলোনা (Bologna) হইতে ১৭৯১ খৃঃ অব্দে তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন, ইহাতে লেখা আছে যে তিনি একটি টেবিলের উপর একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের সন্নিকটে একটি ভেকের অঙ্গচ্ছেদ করিতে করিতে তাহার জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক ছুরিকা দ্বারা ভেকের উরুদেশীয় স্নায়ু স্পৃষ্ট হইবামাত্র ভেকটির স্নায়বিক আক্ষেপ উপস্থিত হইল। ঠিক এই সময়ে নিকটস্থ তড়িৎ যন্ত্র হইতে একটা স্ফুলিঙ্গ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়া পুনঃ পুনঃ সম্পাদিত হইতে লাগিল, এবং প্রত্যেক বারেই তাঁহারা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন যে, স্নায়ুর সহিত কোন তড়িৎ পরিবাহক ধাতব পদার্থ স্পৃষ্ট হইলেই এইরূপে পেশী আক্ষিপ্ত হয়, নতুবা কিছুই হয় না। গ্যালভানী পূর্ব্বে অনুমান করিতেন যে, পেশীর ক্রিয়া হইতেই তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে; কাজেই এই ব্যাপারকে তাঁহার অনুমানের পরিপোষক মনে করিয়া এই তথ্যের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সবিশেষ মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। এইজন্য তিনি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র, ইলেক্ট্রোফোরাস ইত্যাদি কৃত্রিম যন্ত্র সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া নানারূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; এবং তিনিও প্রত্যেক পরীক্ষায় একরূপ কৃতকার্য্যও হইলেন। তিনি বায়ু মণ্ডলস্থিত বিদ্যুতের ক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটা উষ্ণ শোণিত জীবের ও ভেকের পদ একটা বিদ্যুৎ পরিচালক সূচ্যগ্র দণ্ডে গ্রথিত করিয়া উক্ত দণ্ড গৃহের ছাদে সন্নিবিষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিলেন যে প্রত্যেক বার বিদ্যুৎ চকিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জীবের পা দুইটি তীব্রবেগে আক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আবার ঐরূপ ক্রিয়া বজ্রাঘাত সহ ঝড় বৃষ্টি ভিন্ন অন্যসময়েও পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তবে ওরূপ তীব্র আক্ষেপ উপস্থিত হয় নাই। এইরূপ নানাবিধ গবেষণাকালীন তিনি কতকগুলি ভেকের মেরুদণ্ডে ধাতব হুক বিদ্ধ করিয়া তাঁহার বাগানের লোহার রেলিংএ টাঙ্গাইয়া দিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, লোহার রেলিংএ হুক স্পৃষ্ট হইবামাত্রই সর্ব্বঋতুতে ও সর্ব্ব সময়েই ঐরূপ আক্ষেপ চলিতে থাকে। ইহা লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করিলেন যে সাময়িক ঋতুর কোনরূপ

পরিবর্তন ব্যতিরেকেও এরূপ ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। তাঁহার গৃহে পুনরায় ভেক লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বহিঃ পেশীর সহিত উরুদেশীয় স্নায়ু ধাতব তড়িৎ পরিবাহক দ্বারা স্পর্শ করিলেই ঐরূপ আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই সমস্ত ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে এই স্নায়বিক আক্ষেপের একমাত্র কারণ জান্তব তড়িৎ; এবং তিনি অনুমান করিয়া লইলেন যে, পেশী ও স্নায়ু একটি তড়িৎপূর্ণ লিডেন বোতলের বহিঃ এবং আভ্যন্তরিক আবরণের ন্যায় কার্য্য করে এবং ধাতব দণ্ডটি দুই তড়িতের পরিবাহক স্বরূপ।

ভল্টা, গ্যালভানির অভিমতের বিরুদ্ধবাদী হইলেন। তিনি তর্ক করিতে লাগিলেন যে, এই স্নায়বিক বিক্ষোভের একমাত্র কারণ ধাতব সংস্পর্শন; জান্তব তড়িতের ইহার সহিত কোন সংশ্রব নাই। তাঁহার উক্তি এবং অভিমতের সমর্থন-স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিলেন যে ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এম সুলজার এইরূপ সংস্পর্শন জন্যই, একখণ্ড তাম্র ফলক ও একখণ্ড দস্তা ফলক জিহ্বার উপর স্থাপন করায় তাঁহার একপ্রকার অভাবনীয় অনুভূতি হইয়াছিল। ভল্টা অনুধাবন করিলেন, যদি একখণ্ড তাম্র ফলকের উপর একখণ্ড জলসিক্ত ন্যাকড়া স্থাপন করতঃ পুনরায় একখণ্ড রজত ফলক স্থাপন করা যায় বা ঐরূপে অনেকগুলি স্তবক একত্র স্তূপীকৃত করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তড়িৎ-শক্তি সঞ্চিত হইবে; এবং তিনি এইরূপে কৃতকার্য্যও হইলেন। এই সময় হইতেই ভল্টার স্তম্ভ (Volta's Pile) নামক আর একটি তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্র বিনির্ম্মিত হইয়া তড়িৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রাগার পরিবর্দ্ধিত করিল। ইহাতে তড়িৎ উৎপাদনের নানারূপ অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রণালী অবলম্বনে আর একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন; তাহার নাম—'করোন ডি ট্যাসেস্' (Couronne des tasses) বা 'ক্রাউন অফ কাপ্স্' (Crown of Cups) (মুকুটাকারে সজ্জিত পানপাত্র সমষ্টি)। এই যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী এইরূপ:—একটি তাম্র ফলকের সহিত তার দ্বারা অন্য একটি দস্তা ফলক সংযুক্ত করতঃ দুইটি সাধারণ লবণ মিশ্রিত জলপূর্ণ কাঁচপাত্রের একটিতে দস্তা এবং একটিতে তাম্র ফলক নিমজ্জিত করিয়া এইরূপে অনেকগুলি পাত্র পরস্পর সংলগ্ন করিলেই ক্রাউন অফ কাপ্স্ নির্ম্মিত হয়। এই প্রণালী দ্বারা ভল্টা প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেন। এম ভল্টা তড়িৎ উৎপাদানের এই নূতন প্রথা ১৮০০ খৃঃ অব্দে উদ্ভাবন করিলেন, এবং উদ্ভাবকের নমানুসারে ইহার "ভল্টেইক তড়িৎ" এইরূপ নাম করণ হইল।

ভল্টার স্তূপের তাম্র ও দস্তা ফলকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ড্‌ লাক তড়িতের দাহিকা-শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জ্যাম্বোনী (Zamboni) এই যন্ত্রের সম্যক উন্নতি সংসাধন করেন। তিনি তাম্র ও দস্তা ফলকের পরিবর্ত্তে অন্য দুইটী পদার্থ সন্নিবিষ্ট করিলেন। তিনি মোটা কাগজের টুকরার এক পৃষ্ঠা দস্তা ফলক দ্বারা

আবৃত করিয়া অন্য পৃষ্ঠায় মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (manganese dioxide) লেপন করিয়া দিলেন এবং এই কাগজের দস্তা-অংশ উপরের দিকে রাখিয়া কাগজের টুকরাগুলি উপরি উপরি সজ্জিত করিলেন ; এবং সজ্জিত কাগজের টুকরা গুলি একটি কাঁচের বা ইবনাইটের নলের মধ্যে সংরক্ষিত করিলেন। ১০,০০০ টুকরা কাগজের নির্ম্মিত এইরূপ যন্ত্র হইতে প্রতিনিয়ত সম পরিমাণ তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে। 'গোল্ডলিফ তড়িৎ নির্দ্দেশক' (Goldleaf electroscope) নামক এক প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব নির্দ্দেশক যন্ত্র এই তড়িৎ সাহায্যে তড়িৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু ইহা হইতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে, এবং লিডেনজার ও তড়িৎ পূর্ণ করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক প্রতিরোধ (internal resistance) অত্যন্ত অধিক। কেন না কাগজ খণ্ড গুলির আর্দ্রতাই তড়িৎ পরিবাহক। কিন্তু ইহার ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স (Electromotive force) অত্যন্ত অধিক বলিয়া এই সমস্ত কাগজ খণ্ডের বিশুষ্ক স্তম্ভ বেশ তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এইরূপ কথিত আছে যে অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের ক্যারেণ্ডন নামক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে এইরূপ তড়িৎ উৎপাদক কাগজের স্তম্ভ রহিয়াছে। ইহার দুইটি পোল (তড়িৎ নির্গম পথ) দুইটি ধাতব ঘণ্টা নির্ম্মিত। এই দুই ঘণ্টার মধ্যস্থলে একটি পিত্তল গোলক দোদুল্যমান রহিয়াছে। এই গোলক ঘণ্টা দুইটীর আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্য ক্রমাগত দুলিতেছে। কাজেই স্তম্ভ সঞ্জাত তড়িৎ ক্রমাগত নিঃসৃত হইয়া যাইতেছে। এই ঘণ্টা দুইটি ঐ গোলক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আজ ৫০ বৎসর কাল ক্রমাগত শব্দিত হইতেছে।

ভল্টা অনুধাবন করিলেন যে, ভল্টেইক তড়িৎ কোষ (battery) হইতে তড়িৎ উৎপত্তির কারণ দুই বিভিন্ন ধাতুর পরস্পর সংস্পর্শন ; এবং যে তরল পদার্থে ধাতব পাত্র নিমজ্জিত করা হয়, তাহা তড়িতের পরিবাহক স্বরূপ কার্য্য করে। কিন্তু উলাস্টন্ (Wollaston) এইরূপ অভিমত ভ্রমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং তিনি প্রকাশ করেন যে ধাতব পাত্র সংস্পর্শন জন্য তড়িৎ উৎপাদিত হয় না, পরন্তু পাত্রদ্বয়ের উপর রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যই তড়িৎ উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই রাসায়নিক ক্রিয়াই তড়িৎ উৎপত্তির একমাত্র কারণ। সার হাম্ফ্রি ডেভিও্ (Sir Hamphery Davey) এই মতের সমর্থন করেন। তিনি নানারূপ পরীক্ষা দ্বারাও এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেন। রয়াল সোসাইটিতে ভল্টার অভিমত-বিবরণ পঠিত হইবার দুই মাস পূর্ব্বে নিকল্‌সন্ এবং কারলাইল, ভল্টেইক তড়িৎ কোষ দ্বারা জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলেন। সার হাম্ফ্রি ডেভি এই প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়া জলকে তড়িৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করতঃ হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক দুই বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থে পরিণত করিতে সক্ষম হইলেন। যে যন্ত্র সাহায্যে জল এই দুই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে পরিণত হইল তাহার নাম ভল্টামিটার (voltameter) রাখা হইল। তিনি পরে আরও অনেক যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া

ফেলিলেন। তাঁহার এইরূপে বিশ্লেষণ কার্য্য সম্পাদন কালীন তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, গন্ধক কিম্বা ধাতব পদার্থের সহিত অক্সিজেন সম্মিলিত হইয়া যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদিগকে তড়িৎ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট করিলে, গন্ধক কিম্বা ধাতু নেগেটিভ পোলে (negative pole) এবং অক্সিজেন পজিটিভ পোলে (positive pole) সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই ভল্টেইক তড়িৎ কোষ উদ্ভাবিত হইলে ডেভি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে, ভবিষ্যতে এই শক্তি নূতন রাসায়নিক তথ্যানুসন্ধানে বিশেষ সহায়তা করিবে। তিনি তাঁহার নোট বুকে ১৮০০ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন "I cannot close this notice without feeling grateful to M. Volta, Messrs. Nicholson and Carlyle, whose experience has placed such wonderful and important instrument of Analysis in my power"। পরে তিনি পটাশ (potash) বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ হইতেই এমন একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিলেন, যে ইহা জলের সংস্পর্শে আসিলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া পড়ে। তিনি আরও অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরুতর অন্যান্য বিষয়ের বহুবিধ তথ্য আবিষ্কার করেন; তাঁহার অধিকাংশ আবিষ্কারই ভল্টার তড়িৎ কোষ সাহায্যে। এইরূপ কথিত আছে যে যখন মহাবীর নেপোলিয়ান শ্রবণ করিলেন যে, একজন ইংরাজ দার্শনিক ক্ষার-যৌগিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পারিস ইন্সটিটিউটের পণ্ডিত বর্গকে ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ফ্রান্স দেশে কেন এই সমস্ত আবিষ্কার সম্পাদিত হইল না। ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, প্রচুর ক্ষমতাপন্ন একটা তড়িৎ কোষের অভাবেই তাঁহারা কোন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ একটি তড়িৎ কোষ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন: এবং এই যন্ত্র বিনির্ম্মিত হইলে, তিনি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ইন্সটিটিউটে গমন করিলেন; সম্রাট তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কার্য্য-সম্পাদন-ক্ষিপ্রকারিতায়, পারিষদবর্গ নিষেধ করিবার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই, তড়িৎ কোষের দুইটি পোল জিহ্বার উপর স্থাপন করিলেন। তড়িৎ আঘাতে তিনি প্রায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন, এবং আঘাত হইতে সুস্থ হইবা মাত্রই যতটুকু সম্ভব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া তিনি যন্ত্রাগার হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তড়িৎ কোষের ক্ষমতার পুনঃ পরীক্ষার আবশ্যক বোধ করিলেন না। তিনি আর কখনও এই বিষয়ের পুনরুল্লেখ করেন নাই। যদিও ফ্রাঙ্কলিন এবং সমসাময়িক তড়িৎবেত্তাগণ তড়িৎ যন্ত্র দ্বারা ইস্পাতের তার চুম্বক ধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন তথাপি ১৮১৯ খৃঃ অব্দে নূতন ভাবে এবং নূতন প্রথায় ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিজম্ (electromagnetism) আবিষ্কৃত হওয়ায় তড়িৎ বিজ্ঞান অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

ক্রমোন্নতিশীলতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কাল যদিও অবতরণবাদ সত্য অভিমত বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুগে মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রধানতম রত্নে পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি জীব-জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আজিও সকল বিষয় পরিস্ফুট ও সুমীমাংসিত হয় নাই; তবে বৈজ্ঞানিকগণের জন্য একটা গভীর গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এখনও যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে, বা যে সমস্ত বিষয় বুঝিতে হইবে, সেই সমস্ত বিষয়ে, অথবা যে বিবর্ত্তনবাদ-অভিমতের নিয়মানুসারে জগতে অসংখ্য প্রকার জীব সমাবিষ্ট হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও স্থূল। কাজেই এই মতের পরিপোষকগণের এ বিষয়ে গর্ব্বিত হইবার কিছুই নাই; তবে ক্রমবিকাশের অপরিহার্য্য অভিমত মানিয়া লওয়ায়, তাঁহারা যে মহৎ সত্যের অভিমুখে এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, তজ্জন্য যথেষ্ট আনন্দিত হইতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃই জীবনের প্রারম্ভ-নির্ণয়ও সৌর জগতের মূল-নির্ণয়ের ন্যায় অস্পষ্ট।

তবে আমরা জীব-জগতে পরস্পরের সহিত অসংখ্য প্রকার বিস্ময়জনক সম্পর্কের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। সে কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এক পিতৃপুরুষ হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি, এবং জীবের চতুষ্পার্শ্বস্থ-অবস্থায় জীবিত থাকিতে উপযোগী হইবার ক্ষমতা। লোকে যে অবস্থায় বর্ত্তমান প্রাণি-জগৎ দেখিতে পাইতেছে, তাহা কোন্ কোন্ নিয়ম বা উপায়ের সম্মিলিত ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হইয়াছে, আমরা তাহার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে পারি।

কি কারণের জন্য বিবর্ত্তনবাদ অভিমত গ্রহণ করায়, জ্ঞানের সম্যক স্ফূর্ত্তির পথে মানব এক পদ অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সম্যক আলোচনা প্রয়োজন। বিবর্ত্তনবাদ কেবল মাত্র প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহা নহে, যাবতীয় বিজ্ঞানেই ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। পৃথিবীতে জীবিত প্রাণীর ক্রমবিকাশ-অভিমত একটি নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানে পরিবদ্ধ থাকিতে পারে না, পরন্তু সমস্ত বিজ্ঞানেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং আমাদের চিন্তা-শক্তিতে এক অভূতপূর্ব্ব [illegible] বিস্তার করিয়াছে। প্রকৃতি সঞ্জাত অসংখ্য ঘটনাকে পূর্ব্বে আমরা প্রহেলিকা বলিয়া মনে করিতাম, সেগুলির মীমাংসা করিবার উপায় অনুসন্ধান করিয়া পাইতাম না, কিন্তু ক্রমবিকাশ অভিমত সেই কুহেলিকা অপসারিত করিয়াছে, এবং প্রাণ-শক্তি সঞ্জাত সমস্ত ঘটনাকে প্রকৃতির একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছে।

এখন সকলেই বুঝিতে পারেন যে, জড়-রাজ্যে শূন্য হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। অনন্ত-কাল ব্যাপিয়া শক্তি এবং পদার্থ চলিয়া আসিতেছে, অনন্ত-কাল শক্তি ও পদার্থ বর্ত্তমান থাকিবে। পদার্থ বা শক্তি বৃদ্ধি করা যায় না, অথবা তাহাদের হ্রাসও অসম্ভব; তবে পদার্থ বা শক্তি অথবা শক্তির ক্রিয়া পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, উত্তাপ—যন্ত্র-পরিচালন-শক্তিতে, আলোকে, তড়িতে বা অন্য কোন কিছুতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আধুনিক মানব বা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, দেব-রাজ পাপীর মস্তকে বজ্র নিক্ষেপ করেন না। পাপ বা পুণ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যেখানে তড়িৎ অল্পতর, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য অধিকতর চাপ-যুক্ত তড়িৎ উপস্থিত হইবেই, এবং গমনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ব্যবহিত পথই অনুসরণ করিবে। তাহাতে পাপীই বিধ্বংশ হউক অথবা পুণ্যাত্মাই বিধ্বংশ হউক, পর্ব্বতই ভগ্ন হউক অথবা শিল্পকলার আদর্শ অট্টালিকাই চূর্ণ হউক, তড়িৎ কোন কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত হইবে না। ক্রমোন্নতি-শীলতার জন্য মানবের চিন্তার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই কাহারও খেয়ালের জন্য বা ইচ্ছা প্রনোদনে সংঘটিত হইতে পারে না। অথবা পরমেশ্বরের মহান আদেশের বলেই কোন কিছু না থাকিলেও অমনই জীব-জগৎ বিকশিত হইল, আলোক অন্ধকার বিভিন্ন হইয়া গেল, এরূপ আদৌ সম্ভব-পর নহে। কিন্তু প্রকৃতির চিরন্তন শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা বহুবিধ শক্তির সম্মিলন-ফলেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে এবং মানবের চিন্তা প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পদার্থ এবং শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার প্রত্যেক ঘাত প্রতিঘাতে পদার্থের যে স্থানে, যে কালে এবং যে অবয়বে উৎপন্ন হওয়া উচিত, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে, এখনও তাহাই হইতেছে, অনন্ত-কাল তাহাই হইবেও। শক্তি ও নিয়মের সহিত প্রকৃতির যে সম্পর্ক তাহাই বিবর্ত্তনবাদ-অভিমতের ভিত্তি। এই বিবর্ত্তনবাদই প্রকৃতিকে বোধগম্য ও আয়ত্ত করিবার পথ। জাগতিক যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, এই বিবর্ত্তনবাদই তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করে। এই বিবর্ত্তনবাদেই প্রকটিত হয় যে, বর্ত্তমান অতীতের ফল এবং ভবিষ্যতের কারণ।

কেন সাধারণ-লোকে বিবর্ত্তনবাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত তাহার কারণ অনেক। মানবের চিরপোষিত-অন্ধ-বিশ্বাসের মূলে বিবর্ত্তনবাদ কুঠারাঘাত করিতেছে; কাজেই এই অভিমত অতি সত্য বলিয়া জানিলেও, বহু দিনের পরিপোষিত-সংস্কারের বশে আমরা ঠিক করিয়া ফেলি যে, বিবর্ত্তনবাদ কিছুই নহে! পিতৃ-পিতামহ সমস্ত পূর্ব্ব পুরুষ যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়া গিয়াছেন, আমরা কেমন করিয়া তাহাতে বীত-শ্রদ্ধ হইব, এই ভাবিয়া, যথেষ্ট যুক্তি ও ন্যায়-সঙ্গত কারণ থাকিলেও অন্ধ-বিশ্বাসের প্রতি মন চুপি চুপি ছুটিয়া যায়। বিবর্ত্তনবাদের সমস্ত অংশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াও, "মানবের

জ্ঞান-বুদ্ধি ইতর প্রাণী হইতে উদ্ভূত হইয়াছে," লোকে এই কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। মানবের জ্ঞান, মানবের নৈতিকতা, মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি নীচ জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বিশ্বাস করা, ভয়ানক কষ্টকর। আমরা যে মানবের মানবত্ব, পশুত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে ;— প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সে প্রভেদ কেবল পরিমাণের। ইতর প্রাণীর যে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে, তাহাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া মানব-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ক্যাণ্ট, লাপলাস, ডারউইন প্রভৃতি মনীষি-গণের পাণ্ডিত্য, র‍্যাফেল, মোজার্ট প্রভৃতি চিত্রকরগণের সৌন্দর্য্যের প্রতি হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ, সেক্সপীয়র প্রভৃতি চিন্তাশীলগণের চরিত্র অঙ্কনের সুনিপুণ তূলিকা, কালীদাস প্রভৃতি মহাকবিগণের কবিত্ব-উচ্ছ্বাস, ইঁহাদের এই মনুষ্যত্ব সুদূর অতীতের নিকৃষ্টতর পশুর শক্তির সহিত সম্পৃক্ত, এরূপ কল্পনা করিতে যাইলেও মানসিক বৃত্তি বিদ্রোহাচরণ করিতে থাকে, তবে কেমন করিয়া সত্য বলিয়া স্থির নিশ্চয় করা সম্ভব। আবহমানকাল ধরিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, অথবা যে ধারণা বাস্তবিকই আমাদের প্রকৃতি-গত, বিবর্ত্তনবাদ-অভিমত সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ; কাজেই সাধারণ-লোকে সুশিক্ষিত হইলেও যে এই অভিমতের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই ; কেননা বিবর্ত্তনবাদের অসীম-শক্তি তাঁহাদের অপরিচিত। শুধু তাহাই নহে, যে সমস্ত জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণের উপর এই অভিমত ন্যস্ত, তাহা তাঁহারা আদৌ অবগত নহেন। মানব, ইতর পশুরই পরিবর্ত্তিত অবস্থা বা মানবের পূর্ব্ব-পুরুষ ইতর পশু, এইরূপ বলিলে সাধারণ লোকে মনে করে যে. মানবের গৌরব অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত, সাধারণের এরূপ ধারণায় কখনই হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিবেন না। কেননা স্তন্যপায়ী জীবের সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম অবস্থাপন্ন-প্রাণী অপেক্ষাও হীনতর হইয়া মানবের প্রত্যেকে জন্ম-পরিগ্রহ করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দর্শনীয় য়্যামিবা (amoeba) নামক একটী মাত্র কোষে সম্পূর্ণ-দেহ (unicellular) এক প্রকার জীব আছে। ইহার কোনরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে এরূপ ধারণাও করা যাইতে পারে না ; এবং খাদ্য চিনিয়া লওয়া এবং ভক্ষণ করাই ইহার মানসিক বৃত্তির শ্রেষ্ঠশক্তি। মানব জন্ম-গ্রহণ কালে শারীরিক গঠন এবং মানসিক গঠন উভয় বিষয়েই এই য়্যামিবার সম্পূর্ণ সমতুল্য। প্রথমতঃ একটী কোষ-বিশিষ্ট জরায়ু-অণ্ড (ovum) হইতেই ক্রমে ক্রমে রাশি রাশি কোষ বিনির্ম্মিত বা উৎপাদিত হইতে থাকে, এই সমস্ত কোষ বিভিন্ন হইয়া. নানাবিধ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে, ক্রমশঃ আরও বিভিন্ন হইয়া পূর্ণাঙ্গ মানব বিনির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক মানব-অঙ্গের আদি ও পূর্ণতার নিয়মই এইরূপ। ইহা হইতে এইরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হয় যে, অতি নিকৃষ্ট জীবাবস্থা হইতে অতি ক্ষীপ্র গতিতে উন্নত-অবস্থা-প্রাপ্ত

হইয়াই, মানব দেহ বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা এরূপ ধারণায় বাস্তবিকই অনভ্যস্ত।

মানব-সমাজ, বিবর্ত্তন বা ক্রমোন্নতি-বাদ অভিমত স্বীকার করিয়া লইতে এত অনিচ্ছুক তাহার একমাত্র কারণ এই যে, এই অভিমত পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্মত অভিমতেরই বিপরীত। কিন্তু ধর্ম্মের মূল কোথায় উদ্ভূত তাহা আমরা অনুধাবন করি না। আমার মনে হয়, বিকাশোন্মুখ-জ্ঞান আদিম-মানব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া, অথচ প্রাকৃতিক শক্তি ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতিকে বুঝিবার জন্য,—মানব অথবা অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তির অনায়াস-বোধ্য আপাতঃ-সন্তোষকর কতকগুলি কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সেই কারণ গুলিই আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। আমরা ধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ এইরূপ বুঝিলেও, বহু সহস্র বর্ষ ব্যাপী সংস্কার বশতঃ আমরা মনে করি যে, ঐ গুলিই ধর্ম্মের অপরিহার্য্য বিষয়। কাজেই ঐ গুলি নিশ্চয়ই সত্যানুমোদিত। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদ-অভিমত যে অতি সত্য, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে, ও শত শত বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্ব্বল ধর্ম্মই, যাহা অসার তাহা পরিত্যাগ করিয়া এবং সারবান ব্যাপার গ্রহণ করিয়া, মানব-মনের পূর্ণতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বিবর্ত্তনবাদ প্রতিষ্ঠিত মহৎ-সত্যের উপযোগী করিয়া লইতে পারিতেছে না। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ-সমূহ পরিভ্রমণ করিতেছে, এই মহৎ-সত্যের প্রতিও খৃষ্টান-ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এবং গ্যালিলিকে (Galilei) তাঁহার অভিমত প্রতিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে নিরস্ত হয় নাই, এবং আজ কাল যদি কোন ব্যক্তি, এই অভিমতে আস্থা স্থাপন করিতে না পারেন, তাহা হইলে হয় তিনি মানসিক দুর্ব্বল, অথবা উন্মাদ। আমার মনে হয়, অতি শীঘ্রই এরূপ দিন আসিবে, যখন ধর্ম্ম-প্রাণ সমস্ত ব্যক্তিই বিবর্ত্তনবাদ-অভিমতের বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত হইবেন, এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহ-সমূহ পরিভ্রমণ করায় ধর্ম্মের যেরূপ কোনই হানি হইতেছে না, সেইরূপ বিবর্ত্তনবাদ-অভিমত গ্রহণ করায়ও ধর্ম্মের কোনরূপ হানি হইবে না।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

রসায়ন-শাস্ত্র।

রসায়ন-শাস্ত্রই সমস্ত বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রের ভিত্তি এবং ইহার পরিসর বহুদূর বিস্তৃত। অস্‌ওয়াল্ড (Ostwald) ইহার এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—"বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ-সমূহের এবং তাহাদের ধর্ম্মাবলী, ও তাহাদের যে যে পরিবর্ত্তন হইতে পারে, সেই সেই পরিবর্ত্তনের গবেষণাই রসায়ন শাস্ত্রের পরিসর"। উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, জড়-জগৎ, সৌর-জগৎ, মহাশূন্যের নক্ষত্র-সমূহ প্রজ্জ্বলিত নভঃস্তূপ, এমন কি মহাব্রহ্মাণ্ডের সামান্য ধূলি-কণাও রসায়ন-শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। আমাদের এ পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনের মূলেও রসায়ন। যে বায়ু-প্রবাহ আমরা গ্রহণ করি, যে জল পান করি, যে খাদ্যে শরীরের পুষ্টি-সাধন করি, যে যে পদার্থ নির্ম্মাণে আমাদের শক্তি নিয়োজিত করি, এবং আমাদের বাণিজ্যের দ্রব্য-সম্ভার— এক কথায় যাবতীয় পদার্থই রসায়ন-শাস্ত্রের সহিত সম্বদ্ধ।

যে ধরিত্রী-বক্ষে আমরা সঞ্জীবিত রহিয়াছি, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট। মানব-বংশের প্রতি পুরুষের নিকটেও ইহা বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, কিন্তু মানব-বংশের সর্ব্বাপেক্ষা শেষ পর্য্যায়, আমরা—আমাদের নিকট বসুধার ধনরত্ন-ভাণ্ডারের দ্বার যেরূপ উন্মুক্ত হইয়াছে, এবং দ্বারের পরিসর যেরূপ বিস্তৃত হইয়াছে, এরূপ কোন যুগের বা কোন বংশের কোন মানবের নিকটেই হয় নাই। বহিঃ-সৌন্দর্য্যে অন্ধ বা উপভোগে অক্ষম, যষ্টি-ধারী, মন্থর-গমনশীল জন্মান্ধের ন্যায়, জ্ঞানান্ধের নিকটেও জ্ঞানমন্দির-বিক্ষিপ্ত, আধুনিক, বিশাল নগরী-সমূহ কেবল বিভিন্ন-কার্য্য-সম্ভূত কোলাহল-পূর্ণ ও পরিমিত স্থানে বসবাসের আদর্শস্থল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট প্রত্যেক নগরী অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানালোক-মালায় বিভূষিত বলিয়া প্রতীয়মান,—সেখানে আলোক ও ছায়ার সুন্দর সমাবেশে চক্ষুষ্মানের মন মুগ্ধ হইয়া উঠে, প্রতি পদক্ষেপে তাহার চিত্ত উন্নতির দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। প্লাইমাউথ পর্ব্বত-শিখর, অন্ধের নিকট প্রকৃতি অবস্থাপিত অপ্রয়োজনীয় একটা কঙ্কর-স্তূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, কিন্তু যাঁহারা ইহার ইতিহাসে অভিজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, যে সাধনা বলে আজ আমেরিকা সমস্ত সভ্য-জগতে বৈজ্ঞানিক বলিয়া বিখ্যাত, ইহা তাহারই শান্ত-মূর্ত্তি নিদর্শন। তোমার আমার নিকট "আলকাতরা" জঘন্য, দুর্গন্ধ-পূরিত, কালিমা-আধার অপদার্থের ন্যায় বিবেচিত, কিন্তু একজন রাসায়নিকের নয়নে ইন্দ্র-ধনুর সপ্ত-বর্ণের প্রধান ভাণ্ডার বলিয়া গণনীয়।

এইরূপ বহুবিধ ব্যাপার একজন রাসায়নিকের নিকট যেরূপ আদরণীয় রসায়ন-শাস্ত্র অনভিজ্ঞের নিকট তাহাই অতি অবহেলার বস্তু। সাধারণ লোকে না বুঝিলেও

একজন জ্যোতির্ব্বিদ যেরূপ নক্ষত্র সমূহের গতি হইতে নক্ষত্র-রাশির পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ বা নক্ষত্র-সমূহ কোন শ্রেণীতে বিভক্ত, বা তাহারা কিরূপে সুব্যবস্থিত, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহা হইতে মানবের অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় উপায়-সমূহের মীমাংসা করিয়া ফেলেন, সেইরূপ যৎপরোনাস্তি ক্ষুদ্রতম পদার্থের জ্যোতির্ব্বেত্তা বা রাসায়নিক, পদার্থের পরমাণুর গতিবিধি ও পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে অণু-সমূহের গঠন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া ফেলেন। অথবা জ্যোতির্ব্বেত্তা ব্যোমপথের কয়েকটি নক্ষত্র দ্বারা যেরূপ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ পরিগ্রহ করেন, সেইরূপ রাসায়নিকও অণু হউক, পরমাণু হউক, আয়ন হউক (ion) অথবা ইলেক্‌ট্রোন্ (electrones) হউক, পদার্থের শেষ-পরিণতির মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে প্রয়াস পান। বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের প্রাচুর্য্যে ও তাহাদের নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্ত্তনে সমগ্র-জগৎ গঠিত হইয়াছে। সেইজন্যই পদার্থের ধর্ম্মাবলী ও যে যে পরিবর্ত্তনে পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ব্যাপার আমাদের জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক অবসরে অতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

আমরা বায়ু-সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছি। প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮ বার বায়ু-গ্রহণ করিয়া থাকি। বায়ুর গুণ, উত্তাপ, চাপ, বায়ু-মণ্ডলে বাষ্প-কণার অনুপাত এবং বায়ু-স্থিত দূষিত পদার্থকণার ন্যূনতা বা আধিক্য আমাদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাস্থ্যের উপর নানারূপ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রাণ-রক্ষায় অবশ্য-প্রয়োজনীয় আলোক, উত্তাপ এবং শক্তির জন্য যে যে পদার্থ আমাদের সহায়তা করে, আমাদের খাদ্য-কণা বিশোধিত করিয়া বায়ু আমাদের অস্তিত্ব রক্ষায় তদপেক্ষা অল্পতর সহায়তা করে না। মানবের জ্ঞান-বিকাশের সূত্র-পাত হইতে আজ পর্য্যন্ত আবহমানকাল ধরিয়া লোকে বায়ু-মণ্ডলের প্রকৃতি পর্য্যালোচনার জন্য অনবরত আয়াস ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু রসায়ন শাস্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সে চেষ্টায় কোন ফল প্রসূত হয় নাই।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দেই আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্র উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বায়ু-মণ্ডলের কি সম্পর্ক তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টাই ইহার উন্নতি-প্রারম্ভের অব্যবহিত কার্য্য। অধ্যাপক র‍্যামজে (Ramsay) বলেন যে, বায়ু-মণ্ডল সম্বন্ধে মানবের ধারণার উন্নতির ধারাবাহিক বিবরণ রসায়ন-শাস্ত্র এবং পদার্থ-বিদ্যার ইতিহাসের একটা প্রকাণ্ড অধ্যায়। এই বায়ু-মণ্ডলের ব্যাপার আমাদের সময়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উন্নতি-লাভ করিয়াছে। কেননা প্রায় ১০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্র-সাহায্যে বাতাসকে তরলীকৃত করিয়া অর্থাৎ সুদূর ব্যোমপথের উত্তাপে পরিবর্ত্তিত করিয়া বায়ুর ধর্ম্ম আলোচনা করা যাইতে পারে।

অল্প দিন হইল র‍্যামজে, র‍্যালে (Raleigh) এবং অন্যান্য রাসায়নিক পণ্ডিতগণ যে বায়ু আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তাহাতে আরও ৫টি বায়বীয় পদার্থের আবিষ্কার

করিয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক, অথবা অন্যথা অপ্রাপ্য ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। এই ৫টি বায়বীয় পদার্থের অন্যতম নিয়নই (nion) চির অমীমাংসিত সুমেরুছটার (Aurora Borealis) কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হয়ত এমন দিন আসিবে, যখন "নিয়ন"-এই-বায়বীয়-পদার্থ-পূর্ণ কাচের নল, অধুনাতন বা পূর্ব্বতন মোম-বর্ত্তিকার ন্যায় প্রতি গৃহস্থে আলোক প্রদান করিবে। তড়িৎ পরিবাহিত হইলে এই "নিয়ন"-পূরিত নল নয়ন-তৃপ্তিকর স্নিগ্ধ সুবর্ণ বর্ণের আলোক প্রদান করে।

যদি মহামনা ডেভি স্বনামবিখ্যাত "ডেভী ল্যাম্প" আবিষ্কার না করিতেন, তাহা হইলে খনির মজুরগণের কষ্টকর জীবন কি ভয়াবহ হইয়া উঠিত! আজ রসায়ন-শাস্ত্রের শক্তি বলেই খনির কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে, খনিতে বিপদের সূত্রপাত মুহূর্ত্ত মধ্যে দিকে দিকে প্রচারিত হইয়া বিপদের আমূল ধ্বংশ হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট খনিজ স্ফোটনশীল-পদার্থ-নিষ্কাসনের আইন বিধিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। রঙ্গমঞ্চ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, আবাস-ভূমি, সভাগৃহ ইত্যাদিতে আজ কাল যেরূপ উন্নত প্রণালীতে বায়ুচলাচলের পথ বিস্তৃত করিয়া রাখা হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ রসায়নশাস্ত্রের উন্নতি। কেননা রাসায়নিক পণ্ডিতই কোন্ কোন্ কারণে এবং প্রতি কারণ হইতে কত পরিমাণ কারবন-ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) উৎপন্ন হয়, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। গন্ধক বিমিশ্রিত গ্যাস আলোক জ্বালিলে, সেই গ্যাসে যতটুকু গন্ধক থাকা বিপদ-শূন্য গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণই রাসায়নিকের দৃঢ় এবং অনবরত পরিশ্রম।

বিংশ বৎসর পূর্ব্বে যুক্ত-রাজ্যের মাসাচুসেট-প্রদেশের শিল্প-বিদ্যালয়ে ড্রাউন (Drown) ও শ্রীমতী রিচার্ডস্ (Mrs. Richards) পানীয় জলের রাসায়নিক ও জীবাণু সম্বন্ধে রীতিমত চর্চ্চা ও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। পানীয় জলের দোষ নিবারণ-কল্পে তাঁহারা প্রাণ-পাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, তাই আজ সমগ্র জগতের অসংখ্য নরনারী দূষিত জল পান জন্য অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছেন। জল দূষিত হইবার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা এত অধিক আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং দোষ এতদূর নষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আনন্দে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, টাইফয়েড জ্বরের আক্রমণের কারণ কোন লোকের অসাবধানতা, কাজেই প্রত্যেক আক্রমণের হেতুভূত সেই লোকের ফাঁসী হওয়া উচিত। আজ রসায়ন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা বলেই বাষ্পস্থালীতে কিরূপ জল ব্যবহার করা উচিত, কাগজ, সুরা, নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ ও অশেষ প্রকার শিল্প-জাত পদার্থ কিরূপে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা লোকে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিতেছে। পানীয়ের দুর্গন্ধ, পানীয়ের বিস্বাদ, পরিশ্রুত করিবার যন্ত্র দ্বারা ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ নষ্ট করিবার

নানাবিধ প্রণালী দ্বারা দূষিত জল বিদূরিত হইয়া যে সাধারণ-জল সুপেয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ রসায়ন-শাস্ত্র।

জীবনের দৈনিক প্রয়োজনীয় পদার্থের মধ্যে খাদ্য সম্বন্ধেই রসায়ন-শাস্ত্র অধিক উপকার করিয়াছে। আমাদের দেশে না হউক বিদেশে কৃষকগণ নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য-সহযোগে কত প্রকার সার প্রস্তুত করিয়া জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে। এই সমস্ত দ্রব্যের ইয়ত্তা নাই। আজ রসায়ন-শক্তি বলেই ধরণী কোটী কোটী সন্তান অনায়াসে পালন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইউরোপ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মহাদেশে রাসায়নিক-গণের সুতীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানেই সার প্রস্তুত হইতেছে। কৃষকগণ তাহাদের কথায় একান্ত বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া, সেই সমস্ত সার-প্রয়োগে জমীর দিন দিন উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে। আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের রাসায়নিকগণ নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায়ে নানাবিধ সার উৎপাদন করিয়া দেশের যে মহৎ কল্যাণ-সাধন করিতেছেন, ওয়াশিংটন নগরের অসংখ্য রাজনীতিকগণ তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারিতেছেন কিনা তাহা বাস্তবিকই জিজ্ঞাসার বিষয়।

উদ্ভিদের সমস্ত খাদ্যের মধ্যে সোরাজানই (nitrogen) প্রধান। উদ্ভিদের শরীর পুষ্টির জন্য উক্ত খাদ্যের যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অতি অল্প অংশই জান্তব মলমূত্র বা জীব-দেহ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কাজেই বহুকাল যাবৎ কৃষকগণ এই সোরাজানের জন্য চিলির (Chilli) সোরাজান-খনির মুখাপেক্ষী হইয়াছিল। এই অত্যাবশ্যক সারের জন্য সুদূর দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকা, প্রকৃত উন্নতিকামী কৃষকের পক্ষে যে কি কষ্ট দায়ক ও অসুবিধাকর ছিল তাহা আমরা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। কিন্তু যখন পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আর বিংশ বৎসরের মধ্যেই এই সোরা-জানের খনি নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখন বস্তুতঃই কৃষক-রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। আজ যদি তাহাদিগকে চিলির সোরাজানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে হয়ত আর কিছু দিন পরেই অনাহার-বশতঃ পৃথিবীর জন-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়িত। কিন্তু রাসায়নিকগণ জন-সাধারণকে এই বিভীষিকার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, প্রতি একার জমীতে বায়ুমণ্ডলস্থ সোরাজানের চাপ ৩৩,৮০০ টন। এই সোরা-জানের অসীম-ভাণ্ডারের যতটুকু পৃথিবীর আবশ্যক তাঁহারা ততটুকু গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং যে প্রণালীতে তাঁহারা এই চির-অক্ষুণ্ণ-ভাণ্ডারের সম্পৎ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ক্যাভেণ্ডিস (Cavendish) রয়াল সোসাইটি (Royal Society) নামক ইংলণ্ডের প্রধান বিজ্ঞান-মন্দিরে একটি মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বুঝাইলেন যে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ-প্রয়োগে বায়ুমণ্ডলস্থ সোরাজান

নাইট্রিক-দ্রাবক উৎপাদিত করে। তাহার ১০০ বৎসর পরে ব্রাডলি (Bradly) এবং লাভজয় (Lovejoy) নায়াগ্রা (Niagra) জল-প্রপাতের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, প্রতি মিনিটে ৪০০,০০০ বৈদ্যুতিক আর্ক (Arcs) প্রজ্বলিত ও নির্ব্বাপিত করা যাইতে পারে, এবং এই উপায়ে বায়ু সংশ্লিষ্ট সোরাজানকে নাইট্রেটে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব। নরওয়ে প্রদেশের বার্কল্যাণ্ড সাহেব (Birkland ও ইটালির রসি সাহেব (Rossy) নানারূপ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা নাইট্রেট উৎপাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সমস্ত নাইট্রেট চিলির খনিজ নাইট্রেটকে মূল্যে পরাস্ত করিতে সক্ষম হইল না; এবং বর্ত্তমানে যদিও মূল্যের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা রহিয়াছে, তথাপি চিলির নাইট্রেট নিঃশেষিত হইলে, পৃথিবীর তাবৎ লোক যে এই অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থের জন্য রাসায়নিকগণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্থির থাকিতে পারিবে, তাহার সূচনা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার ফ্র্যাঙ্ক (Frank) লক্ষ্য করিলেন যে, য়্যাসিটিলিন্ আলোকের মসলা ক্যালসিয়াম কারবাইড্‌কে সোরাজানে দগ্ধ করিলে, কারবাইড্ বিশ্লিষ্ট হইয়া ক্যালসিয়াম সাইনামইড্ (Calcium Cyanamide) নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত পদার্থটিতে জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করিলে, ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া য়্যামোনিয়া (Ammonia) এবং চা খড়ীতে (Carbonate of lime) পরিণত হয়। ডাক্তার ফ্রাঙ্ক আরও লক্ষ্য করিলেন যে, উক্ত সাইনামাইড্ মাটিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে, অতি ধীরে ধীরে পদার্থদ্বয়ে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই য়্যামোনিয়ার সোরাজান উদ্ভিদ-সমূহ অতি সহজে শরীর পুষ্টির জন্য গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্যালসিয়াম কারবাইট প্রস্তুত করিবার প্রণালীও অতি সহজ সাধ্য। চূণ এবং কোক কয়লা এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই কারবাইড প্রস্তুত হয়।

কৃষি-কার্য্যে রসায়ন-শাস্ত্র যে কিরূপ সহায়তা করিতেছে, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই অতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত খাদ্যের প্রতি বিভাগে রসায়ন-শাস্ত্র অপরিহার্য্য। আজ রসায়ন বলেই লোকে খাদ্য প্রস্তুত করিবার বিভিন্ন উপাদানের বর্জ্জনীয় অংশ হইতে খাদ্য ভিন্ন আরও নানাবিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করিয়া খাদ্যের মূল্যের হ্রাস করিতে সক্ষম হইতেছে। রাসায়নিকগণই বিভিন্ন খাদ্যে শরীরে যতটুকু শক্তি উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা নির্ণীত করিয়াছেন, কর্ম্মশীল দেহে যতটুকু শক্তি প্রয়োজন তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টায় জগতের প্রতি দেশে বিশুদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বে কারকফ্ (Kirchhoff) খাদ্যের শ্বেতসার যে গ্লুকোজ (Glucose) নামক শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা আবিষ্কার করেন। সেই আবিষ্কারের ফলে আজ আমেরিকা প্রতি বৎসর ৩০,০০০,০০০ টাকা লাভ করিতেছে।

স্থূল দৃষ্টিতে আমাদের পরিধেয় সামগ্রীর সহিত রসায়নের সম্পর্ক খুঁজিয়া পাই না। বস্তুতঃ পরোক্ষভাবে বস্ত্রের সহিত রসায়নের দৃঢ় সম্বন্ধ। বহুল পরিমাণে কার্পাস উৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রে কি কি সার প্রয়োজন হয়, ও সেই সেই সার কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা কৃষকগণ রাসায়নিকের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছে। আবার ব্যবসায়িগণ কার্পাস-বীজ হইতে তৈল উৎপাদন করিতে সক্ষম হইতেছে, এবং তৈল-হীন-কার্পাস-খইল গোজাতির অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কার্পাস বীজের গাত্রে যে অতি নিকৃষ্ট আঁশ-বশিষ্ট তুলা লাগিয়া থাকে, ব্যবসায়িগণ তাহার দ্বারাও নানারূপ পদার্থ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, কার্পাস বৃক্ষ গুলিকে বৃথা নষ্ট না করিয়া তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইতেছে।

পশম-ব্যবসায় রসায়ন-শাস্ত্র ব্যতিরেকে আজ কাল কিছুতেই প্রতিযোগিতায় স্থান পাইতে পারিত না। শিল্পিগণ রাসায়নিকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াই সংগৃহীত পশম-স্থিত নানাবিধ জঞ্জাল দূরীভূত করিয়া বিশুদ্ধ অংশ বাহির করিয়া লইতেছে, পশমের পরিহার্য্য অংশ হইতে ওলিক দ্রাবক (oleic acid), সাবান, যন্ত্রে লাগাইবার তৈল, পটাশ এবং আমোনিয়ার লবণ (salts) ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

নক্ষত্রের সংখ্যা-গণনা।

মানব-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলেই অনন্ত আকাশের নৈশ সৌন্দর্য্যে চমৎকৃত হইয়া আসিতেছেন। পরে জ্ঞানবিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে নক্ষত্র-সমূহের সংখ্যা-নির্দ্ধারণের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রাচীন মনীষিগণের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল বলিয়া, আজ পর্য্যন্তও অনেকের ধারণা এই যে, নক্ষত্রের সংখ্যা নাই। সমুদ্র-তীরের বালুকা-কণার ন্যায় নক্ষত্র গণনাও অসম্ভব। এমন কি কোন বিষয়ের অসংখ্যত্বের তুলনা করিতে হইলে আমরা নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া থাকি। কিন্তু পরিষ্কৃত আকাশে অতীব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন মানবে এককালে যত গুলি নক্ষত্র দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহাদের সংখ্যা অগণ্য নহে। একবারে দুই সহস্র বা তিন সহস্রের অধিক নক্ষত্র নয়নগোচর হয় না। ইহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত ক্ষীণ আলোক-বিশিষ্ট,

অমাবস্থার নির্ম্মল রজনী ভিন্ন স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। অতএব মোটের উপর দর্শন-যোগ্য প্রায় সহস্র নক্ষত্রই আকাশে উদিত হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র (Telescopes) উদ্ভূত হইবার পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ আকাশ-মণ্ডলে এই সহস্র নক্ষত্রের স্থান নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে টাইকো ব্রাহি (Tycho Brahe) যে নক্ষত্র-চিত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে নক্ষত্র সংখ্যা ১,০০৫ টি। দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের এই চিত্রটিই প্রায় নির্ভুল। তিন শতাব্দী পূর্ব্বে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রযুক্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo) যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র আবিষ্কার করেন, তাহাই আজ-কালকার অপেরা গ্লাস বা বাইনকুলার (Opera Glass or Binoccular)। পরবর্ত্তি-কালে আবিষ্কৃত বর্ত্তমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় ইহা তত তীক্ষ্ণশক্তি-সম্পন্ন নহে। ইহার দ্বারা বহুদূরস্থিত নক্ষত্র-রাজি আদৌ নয়ন-গোচর হয় না। কিন্তু এই অপেরা-গ্লাস-যন্ত্র-সাহায্যেই প্রায় ১,০০,০০০ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরে যতই দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের উন্নতি হইতে লাগিল, ততই নক্ষত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশ্য এক্ষণে বস্তুতঃই বলা যাইতে পারে যে, নক্ষত্রের সংখ্যা নাই। কিন্তু নয়নের শক্তিতে দর্শনীয় নক্ষত্রের সংখ্যা অসংখ্য নহে।

আমেরিকার বিখ্যাত লিক-দূরবীক্ষণ-যন্ত্র (Lick Telescope) সহযোগে প্রায় ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটী নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত নক্ষত্রের কতক-গুলি আমাদের সূর্য্যের ন্যায় বৃহৎ, কতকগুলি বৃহত্তর, এবং কতকগুলির তুলনায় সূর্য্য অতি ক্ষুদ্র। আবার ইয়ার্‌কিস্ দূরবীক্ষণে (Yearkes Reflector) কিম্বা লর্ড রোজ (Lord Rosse's Reflector) ও মেলবোর্ণের (Reflector at Melbourne) দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সহযোগে উক্ত সংখ্যা অপেক্ষাও অধিকতর সংখ্যক নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বিদগণ সময়ে সময়ে এই সমস্ত নক্ষত্রের অবস্থিতির স্থান-নিরূপণ করিয়া চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে হিপার্‌কাশ (Heppar-chus) সঙ্কলিত চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহা প্রায় ১৫০ পূঃ খৃঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল। এইরূপ লিখিত আছে যে, একটি নূতন নক্ষত্র দৈবাৎ আকাশে উদিত বা পরিদৃষ্ট হইলে, তিনি এই চিত্র-তালিকা সঙ্কলন করিতে সচেষ্ট হয়েন। এইরূপ চিত্র থাকিলে পরবর্ত্তি-পণ্ডিতগণ এই সমস্ত নক্ষত্রের স্থান বা আয়তন সম্বন্ধে কোন-রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় তিনি চিত্র-সঙ্কলন সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার চিত্র তালিকার মূল কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিত, 'আলমাগেষ্ট' (Almagest) নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা টলেমি (Ptolemy) এই চিত্র-তালিকার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এই পরিবর্ত্তিত চিত্রই আমরা প্রাচীনতম বলিয়া মানিয়া লই। টলেমির সময় হইতে ১৫০০ শত বৎসর উক্ত আলমাগেষ্ট জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রধানতম গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। দশম খৃঃ অব্দে পারস্য দেশীয় পণ্ডিত অল্ সুফি আর একটি নূতন নক্ষত্র-চিত্র সঙ্কলন করেন। তৎপরে তাইমুর লঙ্গের পৌত্র উলাঘ বেগ স্বয়ং যে সমস্ত নক্ষত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। উলাঘ বেগের মানমন্দির সমরখন্দে স্থাপিত ছিল। তিনি টমেলি-সঙ্কলিত চিত্রের সহিত নিজ অঙ্কিত চিত্র তুলনা করিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, টলেমি লিখিত চিত্রের মধ্যে কেবল ২৭ টি নক্ষত্র সমরকন্দ হইতে সুদূর দক্ষিণে নয়নগোচর হইয়া থাকে, এবং অবশিষ্ট আটটি আদৌ নয়নগোচর হয় না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৫৮০ খৃঃ অব্দে টাইকো ব্রাহি একটি নক্ষত্র-মানচিত্র প্রস্তুত করেন। পরে স্বনামধন্য জ্যোতির্ব্বিদ মহামতি হেলি (Halley) উক্ত মানচিত্রের পরিশিষ্ট স্বরূপ আর একটা নক্ষত্র-তালিকা সংযুক্ত করেন। তাঁহার তালিকাভুক্ত নক্ষত্র পৃথিবীর উত্তরাংশে দৃষ্ট হয় না, কেবল দক্ষিণাংশে দৃষ্ট হয়। তিনি ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে আফ্রিকার পশ্চিমাংশে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে গমন করিয়া যে যে নক্ষত্র লক্ষ্য করেন, তাহাই এই পরিশিষ্টে যোজিত হইয়াছিল।

অধুনাতন যুগে নক্ষত্র-তালিকার অভাব নাই। কেননা বর্ত্তমানে মানমন্দিরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রত্যেক মানমন্দিরেই স্বতন্ত্র নক্ষত্র-চিত্র-পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। আজ কাল নক্ষত্র-তালিকা এরূপ পরিশুদ্ধ ও নির্ভুল হইয়াছে যে, এই সমস্ত নক্ষত্রের অবস্থানকে মূলস্থান ধরিয়া নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু প্রভৃতি আরও অন্যান্য রাশি রাশি জ্যোতিষ্ক পদার্থের স্থান, উদয় কাল, অবস্থিতি কাল, পরিবর্ত্তন কাল ইত্যাদির নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমেরিকার ন্যাশনাল মানমন্দির হইতে যে সমস্ত নক্ষত্র-তালিকা রচিত হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিশোধিত। জর্ম্মান দেশীয় মানমন্দির হইতে যে সমস্ত চিত্র-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অপেরাগ্ল্যাস সাহায্যে যে সমস্ত নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের স্থান অতি বিশুদ্ধরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই চিত্র-পুস্তক-সঙ্কলনে পৃথিবীস্থ তাবৎ মানমন্দিরের অঙ্কিত চিত্র-পুস্তক হইতে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, জর্ম্মাণ দেশের এই মানচিত্রই প্রায় পূর্ণাঙ্গ। ইহাতে এককালে দৃষ্ট প্রায় ১,০০,০০০ এক লক্ষ নক্ষত্রের স্থান নির্ভুল অঙ্কিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সমস্ত নক্ষত্র মান-চিত্র প্রস্তুত হইবে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, নক্ষত্রের স্থান পরিবর্ত্তন বা অন্য যা কিছু পরিবর্ত্তন হইবে তৎসম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সকল বুঝিতে পারা যাইবে। যে উপায়ে এই সমস্ত নক্ষত্র মানচিত্র প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অতীব পরিশ্রম-সাধ্য। প্রত্যেক নক্ষত্রকে বহুবার ধরিয়া লক্ষ্য করিতে হয়। পৃথিবীর উপরিস্থ কল্পিত নিরক্ষাস্তরবৃত্ত ও দ্রাঘিমার তুঙ্গী হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট কালে কোন এক নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র

কতটা অবনমিত হয় তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হয়। ট্রানজিট (Transit) যন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই যন্ত্র দ্বারা গ্রহ বা নক্ষত্র-সমূহের মস্তকোর্দ্ধ রেখা অতিক্রম দৃষ্ট হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন এক নিরূপিত সময়ে তাহাদের পরস্পরের দূরতার হিসাব করিয়া মান-চিত্রে সম-পরিমাণে অঙ্কিত করিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পণ্ডিত আরগেল্যাণ্ডার (Argelander) তাঁহার সহকারিগণের সহায়তায় প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ৩,২৪,০০০ তিন লক্ষ চতুর্বিংশ সহস্র নক্ষত্রের স্থান নিরূপণ করেন। উত্তর-গোলকার্দ্ধে যত নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন কি অন্তরীক্ষ-বিষুব-রেখার দক্ষিণ ২ ডিগ্রি নিরক্ষান্তর-বৃত্ত পর্য্যন্ত যত নক্ষত্র আছে, প্রায় সমস্ত গুলিরই মান-চিত্র নির্ভুল অঙ্কিত হইয়াছে। অবশেষে পৃথিবীর তাবৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত সমস্ত নক্ষত্রেরই এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মান-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অবশ্য সমস্ত নক্ষত্রের স্থান-নির্দ্ধারণ নির্ভুল না হইলেও ধূমকেতু বা অন্যান্য ক্ষুদ্র গ্রহ বা উপগ্রহ বা নক্ষত্রপুঞ্জকে এই সমস্ত নক্ষত্র চিত্র সহায়তায় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপের মান-মন্দির হইতে তৎকালীন উদিত প্রকাণ্ড ধূমকেতুর আলোক-চিত্র গ্রহণ কালে পণ্ডিতগণ অভিনব উপায়ে নক্ষত্র মান-চিত্র প্রস্তুত প্রণালী লক্ষ্য করেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, আলোক-চিত্রণের প্লেটে (Photographic Plate) কেবল ধূমকেতুর চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু অতি ক্ষীণ আলোক-বিশিষ্ট নক্ষত্রের চিত্রও অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কৃতকার্য্য হইবার পরেই উক্ত অন্তরীপে নক্ষত্রের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিবার জন্য এক সমিতি স্থাপিত হয়। পরে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে প্যারিস নগর হইতে য্যাস্ট্রোগ্র্যাফিক্ নাম দিয়া একটি নক্ষত্র চিত্র প্রকাশিত হয়। সার ডেভিড গিল এবং তাঁহার সহকারিগণ দক্ষিণ গোলকার্দ্ধে গমন করিয়া অনেক আলোক-চিত্র গ্রহণ করেন, এবং নক্ষত্র সমূহের স্থান নিরূপণ করিবার জন্য তিনি নিজেই একরূপ যন্ত্র উদ্ভাবিত করেন। এই সমস্ত আলোক-চিত্র ১৮৮৭ হইতে ১৮৯১ খৃঃ অব্দের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরে গ্রনিন্‌জেনের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা অধ্যাপক ক্যাপটিন প্রায় ৫০,০০,০০০ পঞ্চাশ লক্ষ নক্ষত্রের স্থান ও আয়তন নিরূপিত করেন। তাঁহার অঙ্কিত মান-চিত্র ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপে যে সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্দেশ্য ছিল যে, আরগাল্যাণ্ডার যে নক্ষত্র মান-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহারই পরিশিষ্ট ভাগ অঙ্কিত করিবেন। ফলতঃ উহা পরিশিষ্ট না না হইয়া প্রধান হইয়া পড়িল, কেননা ইহাতে নক্ষত্রের সংখ্যা অধিক ছিল, এবং তাহাদের স্থান নিরূপণে অতি অল্পই ভুল ছিল। ইতি মধ্যে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ডাক্তার গিল প্রস্তাব করিলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে দূর অন্তরীক্ষের আলোক-চিত্র

গ্রহণ করিতে হইবে, এবং এরূপভাবে কার্য্য সমাধা করিতে হইবে যে, অতি ক্ষীণ আলোক-বিশিষ্ট নক্ষত্র সমূহও চিত্রিত হইবে। ইহার জন্য পরবর্ত্তী বৎসরে প্যারিস নগরে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের এক সভা হয়। তাহাতে ১৭ টী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ৫৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্যারিস মান-মন্দিরের অধিনায়ক নৌসেনা-পতি মোসেজ্ এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পণ্ডিতগণ স্থির করেন যে, সমস্ত আকাশের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হইবে। প্রত্যেক প্লেটের আয়তন ১০ বর্গ ইঞ্চ। দুই প্রকার প্লেট সাহায্যে চিত্র গ্রহণ করা হইবে। অতিক্ষীণ আলোক-বিশিষ্ট নক্ষত্রের জন্য একরূপ এবং তদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর নক্ষত্রের জন্য অন্য একরূপ। তাঁহারা অনুমান করিয়া লইলেন যে, অতি ক্ষীণ আলোকের নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০,০০০ দুই কোটী, এবং অপরগুলির সংখ্যা প্রায় ১২,৫০,০০০ বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইবে, এবং তদনুযায়ী আয়োজন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ টী মান-মন্দির এই কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইল। অনতি-বৃহৎ দূরবীক্ষণ-যন্ত্র-সুহযোগে এই সমস্ত চিত্র গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। কেননা হেন্‌রী নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উপদেশানুসারে নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সহায়তায় অতি উৎকৃষ্ট চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই যন্ত্র দ্বারা উক্ত হেন্‌রী, প্লিয়েড (Pleiades) নক্ষত্র-পুঞ্জের উৎকৃষ্ট চিত্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হন। এমন কি এই নক্ষত্র-পুঞ্জকে বেষ্টন করিয়া যে নভঃস্তূপ বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্ব প্রথমে এই চিত্র দ্বারাই বোধগম্য হইয়াছিল। কাজেই এইরূপ দূরবীক্ষণ সহায়তায় কার্য্য করিলেই সুফল পাওয়া যাইবে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। এই সমস্ত দূরবীক্ষণের অবজেক্ট গ্ল্যাসের (Object glass)* ব্যাস প্রায় ১৩ ইঞ্চ এবং ফোকাল লেংথ (Focal length)† ১১ ফিট। অবজেক্ট (object) গ্ল্যাসগুলি রাসায়নিক-রশ্মি হইতে (Actinic Rays)‡ পরিশোধিত। প্রত্যেক দূরবীক্ষণে আর একটী ক্ষুদ্রকায় দূরবীক্ষণ সংযোজিত থাকে। এই ছোট যন্ত্রটীর সাহায্যে আকাশের অনেক দূর দৃষ্ট হয় কিন্তু দৃষ্ট পদার্থ তত বৃহদায়তন হয় না, এবং এই ছোট যন্ত্রটি এরূপ ভাবে প্রধান যন্ত্রে সংলগ্ন যে, কোন বস্তু ইহার মধ্যস্থানে দৃষ্ট হইলে সেই বস্তু প্রধান যন্ত্রেরও মধ্যস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ছোট যন্ত্রটী লাগাইবার উদ্দেশ্যই

---

* (১) Object glass—দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যে প্রান্তে চক্ষু সংলগ্ন করিতে হয় তাহার বিপরীত প্রান্তে বৃহত্তর কাচ-পুটকের (lens) নাম অবজেক্ট গ্ল্যাস।

† ফোকাল লেংথ—কাচ-পুটকের সহযোগে অধিশ্রয়নে সংগৃহীত সূর্য্যরশ্মির দূরতা।

‡ পরিশুভ্র আলোক বিশ্লিষ্ট হইলে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোক উৎপাদন করে। এই সাতটির কতকগুলি উত্তাপ প্রদান করে (Thermal), কতকগুলি আলোক প্রদান করে (luminous) এবং কতকগুলির রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া প্রবল (actinic)।

এই যে যদি আলোক-চিত্র গ্রহণ কালে নক্ষত্র-সমূহ কোনরূপে স্থানভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে অনায়াসে ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সহযোগে পুনরায় নক্ষত্রটিকে স্বস্থানে আনয়ন করা যাইতে পারে। প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল যে, বোধ হয় প্রত্যেক প্লেটে অন্ততঃ একঘণ্টা একস্‌পোজার* দিতে হইবে। কিন্তু ক্রমশঃ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া, এখন আর এতকাল একস্‌পোজার দিবার প্রয়োজন হয় না। সমস্ত আকাশের জন্য প্রায় ১১০০০ হাজার প্লেট প্রয়োজন হইবে এইরূপ অনুমান হইয়াছিল। প্রত্যেক প্লেটেই অবশ্য পূর্ব্বকালের চিত্রিত নক্ষত্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিবে, কাজেই ইহাদের অবস্থিতি-বিন্দু নির্ভুলরূপে নিরূপিত হইবে, এবং এই সমস্ত নক্ষত্রের স্থান অবলম্বন করিয়া অন্যান্য নক্ষত্রের অবস্থান-বিন্দু সহজেই নিরূপিত হইবে। ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পূর্ব্বকালে ইহাতে ২,০০,০০,০০০ দুই কোটি নক্ষত্র সমাবিষ্ট বলিয়াই লোকে মনে করিত। কিন্তু আলোক-চিত্রণ-প্লেটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমিত হইল। সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই বিস্তৃত কাণ্ড ৫ বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু নানা কারণে আজ প্রায় ২২ বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু এবারে অতি শীঘ্রই সমাধা হইবে। কেননা যে সমস্ত মান-মন্দির সেরূপ ক্ষীপ্রতা ও ধীরতার সহিত কার্য্য করে নাই, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে; এবং তাহাদের স্থলে নূতন নূতন মান-মন্দিরের উপর কার্য্য-ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। গ্রীনউইচ এবং অক্সফোর্ড মান-মন্দিরদ্বয়ই কার্য্যতৎপরতায় শ্রেষ্ঠ। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে উত্তমাশা-অন্তরীপের মান-মন্দিরে আলোক-চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হয়, এবং ১৮৯৭ খৃঃ অব্দেই ১৫১২ খানা প্লেট একস্‌পোজ করা হইয়া যায়। অন্তরীক্ষের ৪০ ডিগ্রি হইতে ৫২ ডিগ্রি দক্ষিণ নিরক্ষান্তর রেখা পর্য্যন্ত উক্ত মান-মন্দির হইতে আলোক চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৯০০ খৃঃ অব্দে সার ডেভিড গিল দক্ষিণ মেরুর ২ ডিগ্রি নিরক্ষান্তর বৃত্ত পর্য্যন্ত নক্ষত্র-সমূহের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

বর্ত্তমানে অনেক স্থানে নক্ষত্র মান-চিত্র সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে পুনরায় আকাশের এই সমস্ত স্থানের আলোকচিত্র গ্রহণ করিলে, এবং ভবিষ্যতের সেই সমস্ত চিত্র তালিকার সহিত বর্ত্তমানে সম্পাদিত এই সমস্ত চিত্র-তালিকা মিলাইলে নক্ষত্রের গতিবিধি, আয়তন, নূতন নক্ষত্রের উদয়, অথবা যে সমস্ত নক্ষত্র এই কালের মধ্যে অস্তমিত বা ধ্বংশ হইবে, তৎসম্বন্ধে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক তথ্য সংগৃহীত হইবে। ইতিমধ্যেই নানারূপ অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। উত্তমাশা অন্তরীপে যে সমস্ত আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা [illegible] করিয়া অধ্যাপক ক্যাপটিন বুঝিতে পারিলেন যে, অতি ক্ষীণ আলোক-বিশিষ্ট

* একস্‌পোজার—আলোকচিত্র লইবার জন্য প্লেট দৃশ্য-নিঃসৃত আলোকে উদ্ঘাটিত করার নাম।

নক্ষত্রেরও প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নক্ষত্র অতীতের কোন মান-চিত্রে বর্ত্তমান নাই। অন্যান্য প্লেট পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, কোন কোন নক্ষত্রের পূর্ব্বে যে স্থানে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত নক্ষত্রের অবস্থিতির সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে, নক্ষত্রের একরূপ গতি আছে। এই গতির বিষয় পূর্ব্বে লোকে জানিত না। এই গতির বাৎসরিক পরিমাণ, বৃত্ত-পরিধির ৯ সেকেণ্ড* মাত্র। কোন কোন নক্ষত্রের সমস্ত আকাশ পরিভ্রমণ করিতে প্রায় ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর আবশ্যক হয়। একজন মানুষের জীবনে এই নক্ষত্রের স্থান-বিভিন্নতার পরিমাণ কত অল্প তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টিশক্তিতে এই সমস্ত নক্ষত্রের স্থানচ্যুতি আদৌ লক্ষ্য হয় না। কাজেই সমস্ত নক্ষত্র গতিশীল বুঝিয়াও আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, ইহারা আকাশের একই স্থানে স্থির ও নিশ্চল। এমন কি এই সমস্ত নক্ষত্রের গতি পৃথিবীর গতির তুলনায় অতিশয় ক্ষীপ্রতর। কিন্তু পৃথিবী হইতে এই সমস্ত নক্ষত্রের নিকটতম নক্ষত্রের দূরতাও এত অধিক যে, তাহা কল্পনাতেও আনয়ন করা বড় সহজ নহে। কাজেই শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া যাইলেও বাস্তবিকই ইহাদের স্থান পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না। মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি আর কিছুই নহে, কেবল কতকগুলি নক্ষত্র পুঞ্জ। সেই সমস্ত নক্ষত্র-পুঞ্জকে বুঝিবার ও চিনিবার সুবিধা করিবার নিমিত্ত নক্ষত্রগুলিকে পরস্পরের সহিত নানারূপ কল্পিত রেখার দ্বারা সংযুক্ত করিয়া আমরা মনে মনে একটা চিত্র-কল্পনা করিয়া লইয়াছি। এই সমস্ত নক্ষত্র-পুঞ্জের নক্ষত্রেরও গতি রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি শতাব্দীর পরেও সেই সমস্ত কল্পিত-চিত্রের অবয়বের পরিবর্ত্তন না হইবার কারণ এই যে, এই সমস্ত নক্ষত্র অতিদূরে অবস্থিত। প্রাচীনতম যুগের আর্য্য ঋষিগণ যদি আজ পৃথিবীতে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই সমস্ত নক্ষত্র-পুঞ্জকে যেস্থানে ও যেরূপ অবয়ব অবলোকন করিয়াছিলেন, এখনও সেরূপ দেখিতেন।

সমস্ত নক্ষত্রেরই গতি রহিয়াছে. কেহই স্থির নিশ্চল নহে। আমাদের সূর্য্যও প্রতিনিয়ত তীব্র গতিতে ছুটিয়া চলিতেছে। এই সমস্ত নক্ষত্র তালিকা যত নির্ভুল হইবে, এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি যতই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ততই আমরা আমাদের সূর্য্যের সহিত তথা-কথিত নিশ্চল নক্ষত্রের কি সম্পর্ক, ছায়া-পথ কেবল মাত্র আমাদের এই জগৎ হইতেই পরিদৃষ্ট হয় বা অন্যান্য নক্ষত্র হইতেও পরিদৃষ্ট হয়

* সমস্ত বৃত্ত-পরিধিকে ৪ ভাগে ভাগ করিলে, প্রত্যেক ভাগের নাম বৃত্তের ৪র্থাংশ। এই এক এক অংশকে ৯০ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম ডিগ্রি, এক ডিগ্রিকে ৬০ ভাগে ভাগ [illegible] এক এক ভাগের নাম মিনিট, এক মিনিটকে ৬০ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগের নাম সেকেণ্ড।

অথবা প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের এক একটী সৌর জগৎ স্ব স্ব প্রধান বা অতি-প্রধান কাহারও সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বা তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন, এই সমস্ত বিষয় ততই আমরা স্পষ্ট এবং সুন্দররূপে বুঝিতে পারিব।

প্রথমে সকলেই মনে করিতেন পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্যাদি গ্রহ উপগ্রহ সমস্ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এখন পৃথিবীর স্থান সূর্য্য কাড়িয়া লইয়াছে। সার জন হার্‌সেল স্থির করিয়াছেন যে, সূর্য্যের একরূপ গতি আছে এবং অনন্ত শূন্যে আমাদের ন্যায় এইরূপ অগণিত সৌর-জগৎ রহিয়াছে। আমাদের সূর্য্য আমাদের নিকট অতি প্রকাণ্ডতম বলিয়া অনুমিত, কিন্তু অনন্ত পথে অতি ক্ষুদ্র একটী নক্ষত্র মাত্র। মড্‌লার অনুমান করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্লিয়েড নক্ষত্র পুঞ্জের আলসিওয়ান সমস্ত সূর্য্যের সূর্য্য-স্বরূপ, তাহারই চতুর্দ্দিকে আমাদের সূর্য্য তাহার সৌর জগৎ লইয়া, সেইরূপ শত শত সূর্য্য নিজ নিজ জগৎ লইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এ অনুমান ভ্রমাত্মক বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন এক প্রকাণ্ডতম সূর্য্য আবিষ্কৃত হইবে এবং তাহারই চতুর্পার্শ্বে এই সমস্ত সৌর-জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছে বুঝিতে পারা যাইবে। সেই প্রকাণ্ডতম সূর্য্যের তুলনায় আমাদের সূর্য্য প্রকাণ্ড হিমালয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র বালুকণার ন্যায় প্রতিভাত হইবে।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-বিবরণী।

(১৯১০-১৯১১)

(সংক্ষিপ্ত)

অধিকাংশ জিলাতেই এবৎসর শস্যের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক। ১৯০৯-১০ সালে শস্যের যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আলোচ্য-বর্ষে যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। শস্যের মূল্য কমিয়া যাইলেও মজুরগণের বেতনের পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। কেননা শিল্প-প্রধান কেন্দ্র-সমূহে মজুরের প্রয়োজন ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। শস্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্যবশতঃ কৃষিজীবিগণ গভর্ণমেণ্টের ও স্থানীয় মহাজনগণের নিকট যে টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা আংশিক পরিশোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

১৯০৯ সাল অপেক্ষা এই ১৯১০ সালে মৃত্যু সংখ্যা অধিকতর। ১৯১০ সালে মৃত্যু সংখ্যা স্থাইল করা ৩০.৫৫, ১৯১০ সলে ৩৩.১০। পাটনা ও তিরহুট বিভাগে বিসূ-

চিকা ও প্লেগের প্রকোপই ইহার অন্যতম কারণ। তবে জন্ম-সংখ্যা মাইলপ্রতি ৩৯৭২। উড়িষ্যা-বিভাগেই জন্ম-সংখ্যা অধিক। এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সময় জন্ম-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইযাছিল।

১৯১০ সালের জুলাই মাসে চাম্পারণ, মজাফরপুর, দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে প্রবল বন্যা হইয়াছিল। নেপাল পর্ব্বতমালার পাদদেশে বর্ষা পাতই এই বন্যার কারণ। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে গণ্ডক নদীর জল যত উচ্চ হইয়াছিল, এই বৃষ্টি-পাতে তদপেক্ষা অধিকতর উচ্চ হইযাছিল। দ্বারভাঙ্গায় এই বন্যায় ক্ষতি অত্যন্ত হইয়াছিল। পথ, ঘাট, সেতু প্রভৃতির ক্ষতি হইলেও শস্যের সেরূপ ক্ষতি হয় নাই। অন্যান্য জেলা অধিক বারি-পাতে বা বৃষ্টির অভাবে সেরূপ ক্ষতি গ্রস্ত হয় নাই।

পূর্ব্ব-বৎসর অপেক্ষা এবৎসর জরীপের কার্য্য অধিক হইয়াছিল। কলিকাতার পুনঃ জরীপ-কার্য্য চলিতেছে বটে কিন্তু বড়ই পরিশ্রম-সাধ্য। গঙ্গা নদীর জরীপ-কার্য্য চলিযাছিল।

গভর্ণমেণ্টের খাস-মহল ফ্রেজারগঞ্জের পাট্টা দেওযার কার্য্য শেষ হইয়াছে। মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই পাট্টা গ্রহণ করিয়াছেন। খাজনা বাৎসরিক ১৩,৫৬৪ টাকা, যন্ত্রও, কারখানাদি বাবৎ ৬০,৮৩০ টাকা দিতে হইবে।

বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের যে শত করা ৩২ অংশ ব্যয় করিতেন, তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে বিবেচনা করিয়া যে স্থলে প্রয়োজন হইবে, তথায় সুবিধা মত ব্যয় করা হইবে।

পানীয় জলের উন্নতি বিধান-কল্পে প্রতি বৎসর ৫,০০০ টাকা ব্যয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সমূহে সারকুলার জারী করিযাছেন।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বন্দরে অধিক সংখ্যক জাহাজ আসিযাছিল।

জুলাই এবং আগষ্ট মাসে প্রবল বৃষ্টি-পাতে বিহার, নদিযা, মুরসিদাবাদ, কটক, অঙ্গুল প্রভৃতি স্থানে ভাদুই শস্যের প্রচুর ক্ষতি হইযাছিল। এই কয়স্থানে রবি শস্যের অবস্থা মন্দ এবং ধান্যের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। রবি শস্য মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

গভর্ণমেণ্টের মৎস্য উৎপাদন বিভাগ বর্ত্তমান কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টরের কর্ত্তৃত্বা-ধীনে রাখা হইযাছে। "ভেড়ী" বাঁধিয়া আলোচ্য বর্ষে মৎস্য চাষের আয়োজন হইয়াছিল। ইলিশ মৎস্যের ডিম্ব প্রসবের উপযুক্ত স্থান-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছে। তবে আজ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েরই চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

৩১৬.১০ মাইল বেসরকারী রেল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গে মোট রেল-পথের পরিমাণ, ৪,৫৮০.৫২ মাইল, ফেব্রুয়ারী ১৯১১ সালে

কালিমাটী হইতে ওলানজুরি পর্য্যন্ত বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী একটী লাইন খুলিয়াছেন। যশোহর হইতে ঝেনিদা পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ক্ষেত্র মোহন দে কোম্পানীকে গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছেন, উক্ত কোম্পানী কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইনও নির্ম্মাণ করিবেন।

ম্যালেরিয়া নষ্ট করিবার জন্য ম্যালেলিয়া কমিটি সাধারণের মধ্যে কুইনাইনের আদর বৃদ্ধি করিতে নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। পুর্ণিয়া বিভাগে যে সমস্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ১০৲ টাকা বা তাহার অল্পতর বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাদিগকে সরকার হইতে বিনা মূল্যে কুইনাইন প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বন্য জন্তুর কবলে ১৯০৯ সালে ১,০০৫ এবং ১৯১০ সালে ১,১০০ লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। খুলনা এবং ২৪ পরগণাতেই মৃত্যুর হার অধিক। উক্ত জেলা দ্বয়ে ১৯০৯ সালে ৫৭ জন কিন্তু ১৯১০ সালে ১২৬ জন মারা পড়িয়াছে। ১৯০৯ সালে প্রবল ঝড় ও বন্যার সময় অনেক হরিণ জলে ডুবিয়া মারা পড়ে। আলোচ্য বর্ষে বন্য জন্তুর এইরূপে খাদ্যের অভাব হওয়াতেই ব্যাঘ্র মানুষকে আক্রমণ করিয়াছে। এই সমস্ত জীব নষ্ট করিবার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। কেবল ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক মৃত্যু সংখ্যা সমস্ত বঙ্গে ৪৪৯, এবং নেকড়ে কর্ত্তৃক ২১৮।

সর্প দংশনে মৃত্যু সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে ৭৭৬৭, পূর্ব্ব বর্ষে ৭২০২। তিরহুট এবং প্রেসিডেন্সি বিভাগেই মৃত্যু-সংখ্যা অধিক। বর্দ্ধমান বিভাগের মৃত্যু-সংখ্যা এই বৎসর ২৩৬ জন অল্পতর, ইহার কারণ, বর্দ্ধমানে এবৎসর প্রবল বন্যা হয় নাই। বন্যার তাড়নায় সর্প-সমূহ প্রান্তর ছাড়িয়া মানুষের আবাসে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়, কাজেই মৃত্যু-সংখ্যাও অধিক হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। ২১১৯৩ সর্প এবৎসর হত হইয়াছে, গত বর্ষের সংখ্যা ২১,৯০৮।

আলোচ্যবর্ষে ২২,৩৪৮ গৃহ পালিত পশু, বন্য জন্তু কর্ত্তৃক হত হইয়াছে। গত বর্ষে ১ ৪২৭।

চাইবাসার তসরের কারখানার কার্য্যে সফলতা না হওয়ায় কারখানা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কৃষিকার্য্যালয় সমূহ রীতিমত স্থাপিত হওয়ায় কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। সম্বলপুরে বাবু রামকৃষ্ণ বেহারার প্রদত্ত জমীতে শস্যের উন্নতি বিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষা চলিতেছে। বীরভূমের সুরীতে এবং চাম্পারণের ভেটীয়াতে আরও দুইটি শস্য বিষয়ক পরীক্ষা কার্য্যালয় স্থাপিত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

১৯১০ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখে ২১ জন ছাত্র লইয়া সাবুরে বঙ্গ কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। কটক, হাজারিবাগ এবং বর্দ্ধমান স্কুল সমূহে যে কৃষি শিক্ষা প্রদান

করা হইত, তাহাতে কোনরূপ সুফল না হওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাবুর কৃষি-বিদ্যালয়ে কৃষি কার্য্য শিক্ষার জন্য যে কোন ছাত্র প্রবেশ করিতে পারে, এবং প্রবেশের জন্য সেরূপ কোন পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন হইবে না। পাঠশালার ছাত্রগণকে এখন পদার্থ বিদ্যায় এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে; এবং শিক্ষা সুচারুরূপে চালাইতে পারিলে, গুরু এবং সুশিক্ষিত ছাত্র উভয়েই পুরস্কৃত হইবে। কৃষকের সন্তানগণ কৃষি-পরীক্ষা-কার্য্যালয়ে কৃষি-কার্য্যবিষয়ে শিক্ষা পাইতেছে।

রসায়ন, উদ্ভিদ, কীটাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে। নানাবিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সকলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাবুরে বৃক্ষবাটীকা স্থাপিত হওয়ায় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানারূপ প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

বঙ্গ-দেশীয় রেশম-সমিতি রেশম ব্যবসায় ও উৎপাদন বিষয়ে রীতিমত কার্য্য করিতেছে। চিন, জাপান, ও ইটালি দেশের রেশমের ন্যায়, উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য গুটি পোকার উৎপাদন প্রণালী ও গুটি পোকার বীজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট কীট-তত্ত্ববিৎ লেফরয় সাহেবের উপদেশানুসারে রেশম-সমিতি একজন সুদক্ষের হস্তে এই সমস্ত গুটি পোকার উৎপদনের ভার অর্পণ করিয়াছে। গ্রাম্য ও বেসরকারী রেশম কার্য্যালয়ের উন্নতি বিধানের রীতিমত চেষ্টা চলিতেছে। কেননা সর্ব্বত্র উন্নতি না হইলে, একই স্থানে রেশম ও রেশম চাষের উন্নতি সম্ভাবিত নহে।

বস্তুতঃ কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছে। ৬০০০ য়্যাজোলা (Azolla) নামক উদ্ভিদের চারা বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে। এই বৃক্ষের মশক নাশের গুণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করাই এইরূপে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য। সিন্‌কোনা চাষেরও বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। প্রায় ২১,৩৯৭ মণ সিন্‌কোনা ছাল হইতে, প্রায় ৫০০ মণ কুইনাইন প্রস্তুত হইয়াছে।

আলোচ্য-বর্ষে ১৩টি সূতার কারখানা চলিয়াছে। পূর্ব্ব ৩ বৎসরে মাত্র ১২টি কারখানা ছিল। মজুরের সংখ্যা অল্পতর হইলেও কারখানায় আয়ের হ্রাস হয় নাই। বরং পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গ-দেশে দার্জ্জিলিং, রাঁচি ও হাজারিবাগ এই তিনটি প্রদেশে চায়ের চাষ হইয়া থাকে। ছোটনাগপুরে চায়ের উৎপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু দার্জ্জিলিঙ্গে অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে।

১৯১০ সালে ৪১৮টি কয়লার খনিতে কার্য্য চলিয়াছে। ১৯১০ সালে মোট ১০,৭৭৮,৫৩০ টন কয়লা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৎসরের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১১৭,৭১৯ টন অধিকতর। খনিতে মোট মজুরের সংখ্যা প্রতি দিন ৯৮,২৮১, পূর্ব্ব-বৎসরে ১,০২,২৫৩।

অভ্র খনিতে মোট উদ্ধৃত অভ্রের পরিমাণ ১৮,৩৫৭ হন্দর। পূর্ব্ব বৎসর ২২,০৮৪। আলোচ্য বর্ষে অভ্রের মূল্য ৬,৬০,২১০ টাকা। লৌহের পরিমাণ, ৪২,৬৫৩ টন ··দা-

পেক্ষা ৩০,০৫৮ মণ অল্পতর হইয়া গিয়াছে। এই লৌহের মূল্য ৯৯,২৭০ টাকা, মূল্যের পরিমাণ ১,১৭,১৯৫৲ টাকা অল্পতর।

ম্যাঙ্গানিজ, নীল, প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের উৎপত্তি ও মূল্য পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু নিশাদল ও চিনি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে, পাট, সূতা, এবং কাগজের কারখানাই প্রধান। সমস্ত কারখানাই ভাগীরথীর তীরে স্থাপিত। বাঙ্গালীর মূলধনে পরিচালিত কুষ্টিয়া (নদীয়া জেলায়) সূতার কলের কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। তাঁতের কাপড়, মুর্শিদাবাদের তসরের কাপড়ের অবস্থা ও প্রচলন মন্দ নহে। ট্যানারী, হাড় চূর্ণ করিবার কারখানা জুতা, সিগারেট, ছাতা, এবং টীনের বাক্স করিবার কারখানা বাঙ্গালীর মূলধনে বেশ চলিতেছে। ২৪ পরগণায় মাদুর, তাল-পত্রের চেটাই, টুপি, শোলার-টুপি, পিত্তলের তালা; কুষ্টিয়া, বসির-হাট, যশোহর এবং খুলনায় তাঁতের কাপড়; এবং যশোহরে, চিরুণী, বোতাম এবং মাদুর; খুলনায় এবং যশোহরে গুড় ও চিনি, প্রভৃতির কারবারে সমস্তই মূলধন। ব্যবসায়ে উন্নতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের হাওড়া জেলা ব্যতীত তসর এবং রেশমের কারখানাই অতি বিস্তৃত। হুগলি এবং হাওড়া জেলায় পাটের ও সূতার কলের প্রাধান্য আছে। বীরভূমে গালার খেলনা; হুগলি এবং হাওড়ায় দড়ি; বীরভূম এবং বাঁকুড়ায় শাঁখা ও ঐ জাতীয় পদার্থ; সমগ্র বিভাগেই ছুরী, ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্য, কাংসের তৈজস; রাণীগঞ্জে কাগজ এবং কুম্ভকারের সামগ্রী রীতিমত উৎপন্ন এবং বিক্রীত হইতেছে। মেমারী এবং বাগটিকুরীতে (বর্দ্ধমান জিলা) যে রেশম উৎপাদিত হয় তাহা অতি উৎকৃষ্ট। এই রেশম মাদ্রাজ এবং বোম্বাই প্রদেশে চালান যায়। সেখানে এই রেশমের রীতিমত কাটতি আছে। বরাকরে লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা; রাণীগঞ্জে পটারি কারখানা; ওণ্ডালে চুণের কারখানা; দুর্গাপুরে টালি ও ইটের কারখানা; রাণীগঞ্জের কাগজের কারখানা; এতদ্ব্যতীত নানাস্থানে পাট এবং সূতার কারখানা এবং হুগলির রাসায়নিক পদার্থের কারখানাই বর্দ্ধমান বিভাগে কারবার সম্বন্ধে উল্লেখ যোগ্য।

ভাগলপুর বিভাগে তামাক, গুড়, মোটা কাপড়, মিশ্রিত রেশম ও সূতার কাপড় (বাফ্‌তা) প্রধান। মুঙ্গেরে "আমেরিক্যান পেনিনসিউলার টোবাকো কোম্পানি" একটি কারখানা খুলিয়া রীতিমত সিগারেট উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু তথাপি দেশের সঙ্কুলান হইতেছে না। ঝাঝায় "বিড়ির" (পলাশ পাতায় জড়ান দেশীয় তামাক চূর্ণ) কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মুঙ্গের জেলায় অভ্রখনির কার্য্য, শ্লেট নির্ম্মাণ ইষ্টক ও চিনি প্রস্তুত, তাঁতের কাপড় ইত্যাদির কারবার চলিতেছে। ভাগলপুরে ২টি ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা রহিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার কোলগণ লৌহ গালাই করিয়া

থাকে। এই সমস্ত লৌহ চাষের যন্ত্রেও তাওয়া, কড়া ইত্যাদি গৃহস্থের লৌহ তৈজসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গুলজারে আফিংএর কারখানা ব্যতীত পাটনা বিভাগে চিনি এবং নিশাদলের কারখানাই প্রশস্ত। হস্তে প্রস্তুত কাচ; বার প্রদেশে চামেলি ফুলের তৈল; এতোয়া এবং খসরুপুরে তসর এবং দোসাতি; গয়ায় তালা কুলুপ এবং প্রস্তর ও অন্যান্য ধাতব তৈজস; সাহাবাদে দেশীয় কাপড়, চুন, এবং প্রস্তর খোদাই; নাওদা সবডিভিসনে অভ্র খনির কার্য্য ও গয়া সহরে বরফ ও অন্যান্য কলের কার্য্য বেশ চলিতেছে।

ত্রিহুতে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, নীল, নিশাদল এবং চিনি। সমগ্র বিভাগেই নীলের কারবার চলিতেছে। উৎপন্ন নীলের পরিমাণ এবং মূল্য মন্দ নহে। পল্লী অঞ্চলের উৎপন্ন চিনি পল্লী অঞ্চলেই বিক্রীত হয়। সহর অঞ্চলে দেশীয় চিনির কাট্‌তি অল্প, কেননা আমদানী চিনির সহিত প্রতিযোগীতায় দেশীয় চিনি স্থান পায় না সারানে কাঁশা, পিতলের তৈজস, কারপেট, মতিয়া নামক মোটা কাপড়, মাটীর জিনিষ; চাম্পারণ জেলায় চটীজুতা, ঝিনুকের বোতাম, কম্বল, কারপেট এবং নেওয়ার; মজাফরপুরে এড়ি, কারপেট, ঝুড়ি ও চুবড়ি, খেলনা, হুকার নলিচা, মোটা মুটি ছুরি, কাঁচি, লাঙ্গলের ফলা, কুঠার; দ্বারভাঙ্গায় পিত্তলের তৈজস এবং "কটকি" প্রভৃতি দ্রব্যের কারবারের অবস্থা মন্দ নহে।

ছোটনাগপুরের প্রসিদ্ধ উৎপন্ন খনিজ দ্রব্য পাথুরে কয়লা ইহার পরেই গালা এবং অভ্র; সিংহভুমে লৌহের কারখানা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। টাটা কোম্পানী, লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা সমধিক বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে, মানভুমে ছোট ছোট বন্দুক ও কামান, তরবারী, ছুরি, কুঠার, বর্ষা, কাঁচি; হাজারীবাগ, রাঁচি এবং সিংহভুমে পিত্তল এবং কাঁশার তৈজস ও অলঙ্কার; রাঁচি এবং হাজারিবাগে মোটা কাপড়, চা, সোপ-ষ্টোন ইত্যাদির কারবার বিশেষ উন্নতি করিতেছে।

উড়িষ্যা বিভাগে পিত্তল কাঁশার তৈজস বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং কারবারে উন্নতির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। কটকের স্বর্ণ এবং রৌপ্যের তারের অলঙ্কার ও নানাবিধ মনিহারী দ্রব্য এবং প্রস্তরের নানাবিধ সামগ্রী কেবল উড়িষ্যাদেশে নহে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সমধিক প্রসিদ্ধ। জোবরায় "উৎকল চামড়ার কারখানায়" জুতা ও বুট নির্ম্মিত হয়। সূতা এবং তসরের কাপড় সমগ্র বিভাগেই প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত মোটা এবং তত ভাল নহে। সম্বলপুরে এক প্রকার তসরের কাপড় প্রস্তুত হয়, সেই সমস্ত কাপড় মজবুত, এবং সুক্ষ্মতায় ও কারুকার্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই কাপড় বম্বে, মাদ্রাজ, এবং মধ্যপ্রদেশে বিশেষ চলিত আছে।

কাজের জিনিষ।

ম্যালেরিয়া।—ম্যালেরিয়ার বীষ নষ্ট করিবার উপায় অতি সহজ। আবাসবাটীর চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার বিষ বাতাস পরিষ্কৃত হয়। আমাদের দেশে নিম্ববৃক্ষ সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার থাকায় অনেক গৃহ প্রাঙ্গনে নিম্ববৃক্ষ লাগাইতে চাহেন না। তৎপরিবর্ত্তে ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ রোপণ করিলেও একই ফল হয়। ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ অতি সুরূপ এবং সুলভ এবং আবাসের চতুর্দ্দিকে রোপণ করিলে গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়। কলিকাতার যে কোন নরসিতে ইউক্যালিপটাসের বীজ পাওয়া যায়। চারাগাছ ক্রয় করা অপেক্ষা তৈয়ারী করায় অতি অল্প পয়সা ব্যয়িত হয়। বীজ ক্রয় করিবার সময় নর্শারির অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বীজ রোপণ করিবার নিয়ম ও সময় বলিয়া দিয়া থাকেন। গ্রামবাসী গৃহস্থগণ এ রবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বহু পূর্ব্বে সহচর নামক পত্রিকায় এই বৃক্ষের উপকারিতা সম্বন্ধে নানাকথা প্রকাশিত হইয়াছিল। কুইনাইন ব্যবহারের পরিবর্ত্তে গ্রামবাসীগণ নিম্নলিখিত পাঁচনটি ব্যবহার করিতে পারেন। একজন অভিজ্ঞ কবিরাজ এইরূপে অনেক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন ঃ—

খেজুর গাছের মাঝের কচি পাতা (শির বাদ দিয়া—১ তোলা, যৈষ্ট মধু—১ তোলা, তিন পোয়া জলে মৃদু উত্তাপে ফুটাইয়া আধাপোয়া থাকিতে নামাইবে। পরে অল্প গরম থাকিতে থাকিতেই কিছু বিশুদ্ধ মধু দিয়া, অভাবে মধু না দিয়াও সকালে খালি পেটে ও সন্ধ্যার ভোজনের তিনঘণ্টা পরে ও দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে দুইবার করিয়া খাইতে হইবে। জ্বর ভাল হইলেও ৪।৫ দিন খাওয়া প্রয়োজন। প্রতিবার ঔষধ টাটকা তৈয়ারী করা দরকার।

জ্বর জনিত মুখে দুর্গন্ধ।—উক্ত ঔষধ ব্যবহারে জ্বর জনিত মুখের দুর্গন্ধ বিদূরিত হয়।

শোষঘার (sinus) ঔষধ।—শ্বেত বেলেড়ার শিকড় বাটিয়া ঘার মুখে ও চতুঃপার্শ্বে অর্থাৎ ক্ষতের সর্ব্বস্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হইয়া যায়। শিকড় পাথরের জিনিষের উপর (খুব পরিষ্কৃত পাথরে) বাটাই ভাল। প্রতিদিন অন্ততঃ ৫ বার লাগান উচিত।

ঠোঁট ফাটার ঔষধ।—পল্লীগ্রামের অনেক পিতামহী পৌত্র পৌত্রীর ঠোঁট ফাটিয়া গেলে একখণ্ড পরিষ্কার ন্যকড়া পোড়াইয়া সেই ছাইএ খাঁটী সরিষার তৈল লাগাইয়া কর্দ্দমাক্ত করতঃ নিদ্রিত হইলে ঠোঁটে লাগাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে ফাটা নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। কিন্তু অনেক সময়ে ঠোঁট চাটিয়া ছোট ছোট ছেলেরা খাইয়া ফেলে বলিয়া অসুখ করে। আজকাল অনেকে গ্লিসারিন লাগাইয়া থাকেন। ইহাও মন্দ

নহে। অল্প জল মিশ্রিত গ্লিসারিণ দেওয়া ভাল। মাখন বা ননীর প্রলেপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক বৃদ্ধ বলেন যে, প্রতিদিন স্নানের সময় নাভিতে তৈল প্রদান করিলে ঠোঁট ফাটেনা।

ছুরিতে কাটার ঔষধ।—উপরোক্ত ছাইএর কাদা কাটায় লাগাইলে প্রায়ই আরাম হইয়া থাকে।

খোসের ঔষধ।—গন্ধকের গুঁড়া হোয়াইট বা ইয়েলো ভেসলিনে গুলিয়া কাদার মত করিতে হইবে। পরে উক্ত মিশ্রিত পদার্থ যত হইবে, তাহার প্রতি ছটাকে ১২ ফোঁটা ষ্ট্রং কারবলিক এসিড ও অতি অল্প পরিমাণ কুইনাইন দিবে। খোস বা ঐ জাতীয় ঘা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার প্রলেপ দিলে অতি আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়।

কানে পুঁজ পড়ার ঔষধ।—দুর্ব্বাঘাসের রস কানের গহ্বরে ঢালিয়া দিলে কানের পুঁজ পড়ার আরাম হয়। উক্ত রস দিলে একটু জ্বালা করে, সেই জন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের কানে অতি অল্প পরিমাণে ৬।৭ দিন দেওয়া ভাল।

চক্ষু উজ্জ্বল করিবার উপায়।—সমস্তদিনের পরিশ্রমের পর চক্ষু প্রায় হীনপ্রভ হইয়া পড়ে: বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের চক্ষু পরিশ্রমে প্রায়ই জ্যোতিঃ শূন্য হইয়া যায়। এক্ষেত্রে চক্ষুকে একটু উজ্জ্বল করিয়া লইলে মন্দ দেখায় না; অধিকন্তু চক্ষুর স্বাস্থ্যও নষ্ট হয় না। কোন ইংরাজ নিম্ন লিখিত উপায়ে চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া থাকেন, তিনি অভিজ্ঞ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছেন যে, ইহাতে চক্ষুর কোন ক্ষতি হয় না; পরন্তু দৃষ্টিশক্তি বেশ সতেজ হয়। একটা পয়সার উপর যতটুকু জিঙ্ক সালফেট ধরে ততটুকু জিঙ্ক সালফেট ১ পাইণ্ট গরম জলে গুলিয়া ছিপি আটিয়া দাও। ঠাণ্ডা হইলে ঐ জল চক্ষুতে ধীরে ধীরে ঝাপ্টা মারিলে চক্ষু উজ্জ্বল হয়। প্রতিদিন শয়ন করিবার সময়, ভ্রূতে ভেসলিন লাগাইলে আরও উপকার হয়।

সর্প-বিষ।—একজন অভিজ্ঞ রোজা বলেন যে সর্প-দংশনের পর যদি ক্ষত স্থানের উপর টানিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে, শ্বেত কণ্টকারী, রঙ্গন ফুল, কৃষ্ণ তুলসী, শ্বেত অপরাজিতা, শিরিস পুষ্প বা নিম্ব, ইহাদের কোনটার মুলের ছাল এক তোলা অর্দ্ধ পোয়া খাঁটি দুধের সহিত পরিষ্কৃত পাথরে বাটিয়া, ক্রমাগত প্রলেপ দিলে সাপের বিষ জল হইয়া যায়। প্রলেপ দিবার সময় কোন চিকীৎসককে ডাকিয়া আনা একান্ত কর্ত্তব্য। উক্ত রোজা অনেক সময়ে উক্ত দুগ্ধ মিশ্রিত ছাল খাওয়াইয়া সুফল পাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থের উপরোক্ত বৃক্ষের মুলের ছাল যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। উক্ত জিনিষগুলি দুষ্প্রাপ্য নহে।

চর্ম্ম কোমল ও চিক্কন করিবার উপায়।—সুপরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ মধু—৪ আউন্স, গায়ে মাখিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান—২ আউন্স; বড় খলে (mortar) করিয়া রীতিমত মাড়িতে থাক। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ২।৩ চামচ লাইকার অফ পটাশ ঢালিয়া দাও। যতক্ষণ না মাখনের মত হয় ততক্ষণ মাড়িতে থাক। ৩ $\frac{1}{2}$ উপাত্ত [illegible]

অয়েলে, ত্রসেন্সিয়াল অয়েল অফ আম[illegible] ড্রাম, ক্লোভ অয়েল ১ ১/২ ড্রাম, ব্যালসাম অফ পেরু ১ ১/২ ড্রাম, ঢালিয়া দিয়া রীতিমত নাড়িয়া উপরোক্ত মধু ও সাবান ঢালিয়া রীতিমত নাড়িতে থাক। অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়া প্রয়োজন, তাহা না হইলে কোনই ফল হইবে না। অবশেষে কৌটায় করিয়া রাখিয়া দাও; ইহা বাজারেও বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার চর্ম্ম পরিষ্কার করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, এই মিশ্রিত পদার্থ একটু লইয়া ও তাহাতে ২।৪ ফোটা গরম জল দিয়া দুই হাতে ঘসিতে থাক; দেখিবে সাবানের মত দুগ্ধফেননিভ ফেনা হইতেছে। ঐ ফেনা মুখে লাগাইয়া দাও, এবং অল্প পরেই নরম তোয়ালে বা গামছার দ্বারা মুখ বেশ করিয়া পরিষ্কত করিয়া লও। এই-রূপ করিলে চর্ম্মের বর্ণ অনেক পরিষ্কার হয়।

মুখে মেচেতা বা ব্রণ নষ্ট করিবার উপায়।—বাজারে যে সমস্ত ঔষধ বিক্রীত হয়, তাহাতে প্রায়ই পারদ দেওয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময়ে কুফল ফলে। নিম্ন-লিখিত ঔষধটি প্রাতে, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার পূর্ব্বে মাখিলে মুখের মেচেতা এক বারে নষ্ট হইয়া যায়। আমোনিয়াম ক্লোরাইড—১ ড্রাম। বৃষ্টির জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ৭ আউন্স, কলোন ওয়াটার—[illegible] ড্রাম।

বৃষ্টির জল বা ডিষ্টিল্ড ওয়াটার।—বড় বড় ঔষধের দোকানে উক্ত জল বিক্রীত হয়, বাড়ীতেও জল চুয়ান যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য যন্ত্রপাতি আবশ্যক। জল চুয়াইবার পরিবর্ত্তে বৃষ্টির জলেও কাজ হইয়া থাকে। ছাতের যে জল নর্দ্দমা দিয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। কিন্তু এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর চারিটী খোঁটা পুঁতিয়া একখানা ১০ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া, বা তদপেক্ষা অধিকতর লম্বা ও চওড়া বিশিষ্ট মোটা কাপড়ের চারিটি খুঁট চারিটি খোঁটার বাঁধিয়া দাও, কাপড়ের মধ্যস্থলে একটা পরিষ্কৃত ভারী পাথর রাখিয়া দাও এবং মধ্যস্থলে একটী কি দুইটী ছিদ্র করিয়া তাহার নিম্নে কাচের ফন্দিল (funnel) দিয়া বোতল রাখ। এইরূপে জল ধরিয়া রাখিলে চুয়ান জলের কাজ করে, ইহাতে খরচ অল্প অথচ রাশি রাশি জল পাওয়া যায়। কাপড়টী বেশ পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ তৈয়ারী করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই জল অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া প্রত্যেক গৃহস্থের কিছু কিছু এই জল ধরিয়া রাখা উচিত। অনেক সময়ে প্রয়োজনে লাগে।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞান

১ম বর্ষ।) এপ্রিল, ১৯১২। (৪র্থ সংখ্যা।

তড়িৎ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কোপন্‌হেগেন অধিবাসী অধ্যাপক আরষ্টেড্ Oersted তড়িৎ এবং চুম্বক ধর্ম্মের মধ্যে কি সাদৃশ্য রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আর একটি নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়া তাহার আবিষ্কার-বিবরণী ১৮০৭ খৃঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন। এই তথ্য আবিষ্কারের ১২ বৎসর পরে আরষ্টেড্ যখন একটী তড়িৎ পরিবাহিত ধাতব তারের নিকট কোনও চুম্বক দণ্ড লইয়া কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতেছিলেন সেই সময় লক্ষ্য করিলেন যে তড়িৎ স্রোত পরিবাহিত তারও চুম্বক ধর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, যে ধাতব বা অন্য বায়বীয় বা তরল যে কোন পদার্থ দিয়া তড়িৎ পরিবাহিত হউক না কেন, চুম্বক দণ্ডের পার্শ্ববিচলন deflection সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না। এবং তড়িৎ পরিবাহিত পদার্থটি চুম্বকের উপরে ধারণ করিলে যে পার্শ্বে বিচলিত হইবে, নিম্নে ধারণ করিলে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে সমপরিমাণে বিচলিত হইয়া থাকে। এই আবিষ্কারের পরেই ফ্রেঞ্চ এ্যাকাডেমির আঁপেয়ার (Ampere) এবং আরাগো (Aiago) লক্ষ্য করিলেন যে এই চুম্বক শক্তি তড়িৎ পরিবাহিত তারে স্পর্শজ্যাবৎ (tangential) কার্য্য করে। তিনি দীর্ঘ তারের কুণ্ডলী করিয়া চুম্বক শক্তিও বর্দ্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হয় যে কুণ্ডলীকৃত তার মধ্য দিয়া তড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইবে

তারেরকুণ্ডলী সর্ব্বতোভাবে চুম্বকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। এই তারের কুণ্ডলীতে একখণ্ড লৌহ প্রবেশ করাইয়া দিলে কুণ্ডলীর চুম্বক শক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর তারের ইনসুলেশান্ (insulation) প্রথা উদ্ভাবিত হইলে তার গুলি অত্যন্ত নিবিড় করিয়া জড়াইবার সুবিধা হইয়া পড়িল।

আঁপেয়ার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যদি দুইটি তার একই অভিমুখে তড়িৎ বহন করে এবং তার দুইটি ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে প্রতিবন্ধক না পায়, তাহা হইলে এই দুইটি তারের পরস্পর আকর্ষণ সংঘটিত হইবে। ফ্যারাডে এরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যে, তাহার সাহার্য্যে তড়িৎ প্রবাহিত তার-কুণ্ডলীর মধ্যে চুম্বক অথবা চুম্বক-পরিবেষ্টিত তড়িৎ-পরিবাহক বিঘূর্ণিত হইতে পারে। অধ্যাপক আরষ্টেডের চুম্বকদণ্ডের পার্শ্ব বিচলন সম্বন্ধীয় আবিষ্কার, আঁপেয়ার এবং আরাগোর তারকুণ্ডলীর শক্তি সম্বন্ধীয় আবিষ্কার, এই দুই প্রধান বিষয় লইয়া গ্যাল-ভ্যানোমিটার (Galvanometer) নামক এক অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। এই যন্ত্র সাহায্যেই তড়িৎ স্রোতের শক্তি পরিমিত হইয়া থাকে। গ্যালভ্যানো-মিটার উদ্ভাবন প্রণালী লক্ষ্য করিয়া আঁপেয়ার ১৮৩০ খৃঃ অব্দে অনুধাবন করিলেন, যে এই উপায়ে তড়িৎ সাহার্য্যে সংবাদ (telegraph) প্রেরণ করা যাইতে পারে; এবং ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এডিনবারার আলেক্জ্যাণ্ডার (Alexander) নামক জনৈক তড়িৎবেত্তা গ্যালভ্যানোমিটারের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লণ্ডন নগরে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ প্রেরণ প্রণালী প্রদর্শন করিলেন।

পরবর্ত্তী বর্ষে ডাক্তার সিবেক (Seebeck) আর এক নূতন প্রথায় তড়িৎ উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কার করিলেন। তিনি পদার্থের তাপ পরিমাণ বিশৃঙ্খল করিয়া তড়িৎ উৎপাদনে সক্ষম হইলেন। তিনি প্রদর্শন করিলেন যে, অণ্টিমানি (Antimony) এবং বিসমাথ্ (Bismuth) নামক দুইটী ধাতুর শলাকা পরস্পর ঝালিয়া দিয়া সেই জোড়ের মুখে উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এবং শলাকার অন্য প্রান্তদ্বয় শীতল রাখিলে, গ্যাল-ভানোমিটার যন্ত্র সাহায্যে তড়িৎ উৎপাদিত হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। ইহার পরে মেলনি এবং নোবিলি (Meloni & Nobili) এই দুই বিভিন্ন ধাতুর অনেক গুলি শলাকা পরস্পর সংলগ্ন করতঃ থারমো-ইলেক্ট্রিক (Thermo-electric pile) পাইল নামক এক তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক ফ্যারাডে তড়িদ্রাসায়নিক (Electro-chemical) ক্রিয়া সম্বন্ধে কতক গুলি পরীক্ষা করেন। এই সমস্ত পরীক্ষা এবং তজ্জাত ফল সমূহ রয়াল সোসাইটির ফিলজফি-ক্যাল ট্রান্জ্যাক্সন্ নামক পত্রিকায় ১৮৩৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার পরীক্ষা কালে তড়িৎ সম্বন্ধীয় তিনি কয়েকটি নূতন সংজ্ঞা-ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তাব করেন এই সংজ্ঞা গুলি এরূপ।ঃ—ইলেক্‌ট্রোড্স্

(electrodes) যে পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে, তাহার ভিতরে ও, তাহা হইতে তড়িৎ চালিত হইবার পথ। য়্যানোড (anode)যে পদার্থ দ্বারা তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়াক্রান্ত পদার্থে তড়িৎ পরিচালিত হইয়া থাকে। ক্যাথোড (Cathode) যে পদার্থ দ্বারা উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়াক্রান্ত পদার্থ হইতে তড়িৎ বিনির্গত হইয়া থাকে। এই নাম পৃথিবীর ধর্ম্মানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া তড়িৎ স্রোত প্রতিনিয়ত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া পৃথিবী চুম্বকধর্ম্ম বিশিষ্ট, এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। সেইজন্য য়্যানোড বলিলে যে পথে সূর্য্যোদয় হয় এবং ক্যাথোড বলিলে যে পথে সূর্য্যাস্ত হয়, সেই সেই পথ বুঝাইয়া থাকে। ইলেক্ট্রোলাইটস্ (electrolytes) যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ তড়িৎ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ইলেক্ট্রোলাইজ (electrolyse) অর্থে কোন যৌগিক পদার্থকে তড়িৎ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট করা বুঝায়। এই বিশ্লিষ্ট মৌলিক পদার্থ গুলির নাম আয়ন, (ion) য়্যানিয়ন্ (anion) যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ য়্যানোডে সঞ্চিত হয়। কাটিয়ন (cation) যে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়।

১৮৩২ খৃঃ অব্দে ড্যানিয়ল (Danial) প্রতিনিয়ত একই শক্তি সম্পন্ন একটি তড়িৎ কোষ উদ্ভাবন করেন। এই উদ্ভাবনের অল্প পরেই ডি লা রু (De la Rue) ইলেক্ট্রো-টাইপ প্রণালী উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ইহাতে সাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না, এবং ইহাও আপাততঃ বিশেষ কর্য্যোপযোগী হইল না। যাহা হউক ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে অনেকই এই উপায়কে বাস্তবিক কার্য্যে লাগাইতে লাগিল; এবং ধাতু দ্রাবণ হইতে ঐ উপায়ে অন্য পদার্থে সেই ধাতু পতিত হইতে লাগিল। এই কার্য্যে জ্যাকোবি, (Jacobi) স্পেন্সার (Spencer) এবং জরড্যান (Jordan) এই তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্পেন্সারের কার্য্য বিবরণী লিভারপুলে পঠিত হইল, এবং তিনি নানাবিধ ইলেক্ট্রোটাইপের নমুনা প্রদর্শন করিলেন।

আর্মষ্ট্রং (Armstrong) ১৮৪০ খৃঃ অঃ সম্পূর্ণ অভিনব আর একটী তড়িৎ উৎপাদন প্রথা আবিষ্কার করিলেন। এই আবিষ্কার সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং দৈব ঘটিত। নিউক্যাসলের নিকটবর্ত্তি সিজিল নগরে একটী বাষ্পীয় কলের বাষ্পস্থালীর (boiler) ছিদ্র (fissure) হইতে অতিবেগে প্রচণ্ড চাপ গ্রস্ত বাষ্প বহির্গত হইতেছিল। কল পরিচালক এক হস্তে নিস্কৃত বাষ্প এবং অন্য হস্তে কলের বাষ্প নিঃসরণ পথাবরণের (valve) লিভার (lever) স্পর্শ করিবা মাত্র একটা তড়িৎজাত স্নায়বিক আক্ষেপ অনুভব করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের গাত্র হইতে একটা তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখিতে পাইলেন। এই ব্যাপার আর্মষ্ট্রঙ্গের নিকট বর্ণিত হইলে, তিনি ইহার তথ্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন, এবং এই উপায়ে ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নিঃস্কৃত করিতে সক্ষম হইলেন। অতঃপর এইরূপে তড়িৎ উৎপাদনের যন্ত্র বিনির্ম্মিত

হইয়া "হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক মেশিন" (Hydro electric machine) নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই যন্ত্র সাহার্য্যে ৫।৬ ফুট দীর্ঘ তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে পারে। আর্মষ্ট্রং প্রমাণ করিলেন যে সাধারণতঃ বাষ্প স্থালীতে বি-সম তড়িৎ এবং বাষ্পে সম তড়িৎ সঞ্জাত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দে।

রসায়ন-শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বয়ন সম্বন্ধীয় কারখানায় বর্ত্তমানে যে অত্যধিক উন্নতি হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ রসায়ন-শাস্ত্র। রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলেই, কার্পাস বস্ত্র রেশম বস্ত্রের ন্যায় চিক্কণ হইয়া উঠিতেছে। বাজারে মারসিরাইজ্‌ড্‌ (mercirised silk) নামে যে বস্ত্র বিক্রীত হয়, তাহা আর কিছুই নহে সাধারণ কার্পাস বস্ত্র শুধু রাসায়নের গুণে জগৎ এই সম্পূর্ণ অভিনব তন্তু আবিষ্কার করিয়াছে। তন্তু বর্ণ-হীন করিবার প্রথা সম্বন্ধীয় ধারা-বাহিক ইতিহাস পাঠ করিলে, রাসাযনিকগণ কি অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়াছেন, কতবার অকৃতকার্য্য হইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন, আবার কতবাব সামান্য কৃতকার্য্যতার লক্ষণ অবলোকন করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া অবশেষে সফল হইয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ফরাসী দেশের লে ব্ল্যাঙ্ক নামক প্রসিদ্ধ রসায়ন বেত্তাই তন্তু বর্ণ-হীন করিবার প্রকৃষ্ট প্রথা উদ্ভাবন করেন। এই রসায়ন-পণ্ডিত দরিদ্রের গৃহে চির-বিশ্রাম লাভ করিযাছেন। কিন্তু নেপোলিয়ান যে সমস্ত দেশ ধ্বংশ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দেশের অর্থ প্রাচুর্য্য সম্যক প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, নেপোলিয়ানের স্বদেশ-বাসী লে ব্ল্যাঙ্ক অনবরত পরিশ্রমে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। আজ তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট প্রথা অবলম্বন করিয়া কেবল ইউরোপ নহে, পরন্তু অন্যান্য সকল মহাদেশেরই অসংখ্য জন-সমাজ ধনাগমের পথ বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছেন। রাসায়নিকগণ আলকাতরা হইতে বিভিন্ন বর্ণ-রাজি আবিষ্কার করিবার গৌরবাধিকারী। অধুনা সেই সমস্ত বর্ণ রঞ্জিত হইয়া বস্ত্রাদি ও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী বিলাসিতা ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার অংশ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

নকল রেশমও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত হইতেছে। কাষ্ঠের অন্যান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থের মণ্ড হইতেই এই রেশম প্রস্তুত হয়, কিন্তু চীন ও জাপানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশম

অপেক্ষা এই কৃত্রিম রেশম বহুগুণ উজ্জ্বল ও মনোরম। সেলুলোজ নির্ম্মিত চিরুণী ও অন্যান্য কেশ প্রশাধন উপকরণ আজকাল রসায়ন-শাস্ত্রের গুণেই মূল্য ও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার প্রধান উপাদান অগ্নি। কেবল আধুনিক কেন আবহমান-কাল ধরিয়া অগ্নির প্রয়োজনীয়তা পদে পদে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অগ্নি উৎপাদনের প্রাচীন প্রথা ও বর্ত্তমান প্রথা কি অদ্ভূত প্রভেদ। দীপশলাকা আমরা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু কোন্ জাতীয় বৈজ্ঞানিকের সুদৃঢ় অধ্যাবসায় ও যত্নে আজ এই অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সুলভ হইয়াছে, তাহা কয় জনে ভাবিয়া থাকে। রাসায়নিকের অভাবে দীপশলাকার সৃষ্টি অসম্ভব। দীপ-শলাকা এরূপ সুলভ না হইলে হয়ত পৃথিবীর বর্ত্তমান উন্নতি আরও দুইশত বৎসর পিছাইয়া যাইত। "বর্ত্তিকার রাসায়নিক তত্ব" (chemistry of a candle) এই বিষয় লইয়াই অমর বৈজ্ঞানিক ফ্যারাডে বালক বালিকাগণের নিকট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চকমকি, গন্ধক-কাটি, ও বর্ত্তমান প্যারাফিন দীপশলাকার ব্যবধান অত্যন্ত অধিক।

কেরোসিনের উন্নতি বিধান ও এক অদ্ভূত ব্যাপার। কথিত আছে চিকাগো প্রদেশের বিখ্যাত অগ্নিকাণ্ডের কারণ এই যে, তৎনগর অধিবাসিনী কোন এক ওলিয়ারী নাম্নী এক রমণীর গাভী একটি কেরোসিন বর্ত্তিকায় পদাঘাত করাতেই এই বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ দোষ গাভীর নহে, তৎকালে কেরোসিন এরূপ ছিল যে, সামান্য উত্তাপেই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। মাত্র ১০০ ডিগ্রি ফারণহাইট উত্তাপেই কেরোসিনে আগুন লাগিয়া যাইত। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের সময় ১১৫ ডিগ্রি ফারণ হাইট পর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। যদি আজ পর্য্যন্তও পূর্ব্বোক্ত অপরিষ্কৃত কেরোসিনের প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে কেরোসিন ব্যবহার কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হইত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেও ভীত হইতে হয়। বর্ত্তমানে কেরোসিন ব্যবহার যে অনেক পরিমানে নিরাপদ হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ অধ্যাপক চ্যাণ্ডলারের কঠিন পরিশ্রম।

বর্ত্তমানে গ্যাস আলোক নাই, এরূপ সমৃদ্ধিশালী নগরের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় যখন এই গ্যাস-আলোক প্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন সদস্যগণ ক্রমাগত গ্যাসের নল স্পর্শ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, যে নল উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে কিনা। তাঁহারা মনে করিয়া ছিলেন যে, যে নল দিয়া এরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া এবং মূল্যের আধিক্য বশতঃ এই আলোকে প্রবর্ত্তয়িতাকে কত প্রকারে উপহাস করিয়া ছিলেন। তৎকালে গ্যাসের মূল্যের সহিত বর্ত্তমান গ্যাসের মূল্য তারতম্য লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়। লোয়ে নামক একজন রাসায়নিকের

চেষ্টার ফলেই গ্যাসের মূল্য এরূপ অভাবনীয় হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকায় আজ কাল এক অভিনব উপায়ে এই গ্যাস তরলীকৃত করিয়া কেরোসিনের ন্যায় বিক্রীত হইয়া থাকে।

কলিকাতা সহরে আজ কালের গ্যাস-আলকের উপরে একরূপ শুভ্র জালের আবরণ দেওয়া হয়। এই আবরণের জন্যই গ্যাসের আলোক বিকীরণ ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ কাল গ্যাসালোক হইতে ১৬ হইতে ৬০ মোমবাতির আলোকের সমতুল্য আলোক প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আবার আলোক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া, গ্যাসের ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই। এক ঘণ্টায় মাত্র ৩ ১/২ ফুট গ্যাস পুড়িয়া থাকে। কিন্তু একজন রাসায়নিকই এই গ্যাস আবরণ আবিষ্কার করেন। ব্রেজিল প্রদেশে মোনা-জাইট নামক এক প্রকার বালুকা পাওয়া যায়। এই বালুকা ক্ষেত্র বহু দিন ধরিয়া রাসায়নিকগণের বিহার স্থল ছিল। কেননা, এই স্থানেই অনেক দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতব পদার্থ পাওয়া যাইত। এখানে পৃথিবীর সৃষ্টি-কাল হইতে যেন রাসায়নিক পদার্থের একটি ভাণ্ডার রহিয়াছে, বলিয়া অনুমিত হইত। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ডাক্তার কার্ল ভণ ওয়েল্‌স্‌ব্যাক্ নামক একজন রাসায়নিক পণ্ডিত এই সমস্ত মোনা-জাইট বালুকার কোনরূপ দুষ্প্রাপ্য মৌলিক পদার্থ আছে কিনা, তাহা আবিষ্কার জন্য অগ্নি শিখায় ঐ বালুকা নিক্ষিপ্ত করিয়া ঐ শিখা নিঃসৃত আলোক স্পেক্‌ট্রসকোপ নামক আলোক-বিশ্লেষক যন্ত্র সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যদি তিনি এক প্রকার কাপড়ের উপাদানের মধ্য দিয়া ঐ সমস্ত ধাতব পদার্থের যৌগিক আলোক শিখার উপর ছড়াইয়া দেন, তাহা হইলে আলোক অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর হয়, অথবা ধাতব পদার্থের বাষ্প অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি ধাতব যৌগিকের দ্রাবণে কাপড় খণ্ড ডুবাইয়া লইলেন, এবং আলোক-শিখার উপরে ধারণ করায় বস্ত্র-খণ্ড ভস্মীভূত হইল বটে, কিন্তু তদিয় বস্ত্র-ভস্ম হইতে অতি শুভ্র উজ্জ্বল আলোক নিঃসৃত হইতে লাগিল। এই হইতেই বর্ত্তমান গ্যাস-আবরণ আবিষ্কৃত হইল। এই আবিষ্কারের ফলে আলোক উৎপাদনের প্রণালী কিরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নগর-বাসী কোন লোকেরই অজানিত নাই।

তড়িৎ আলোক উৎপাদনে তড়িৎবিৎ অপেক্ষা রাসায়নিক অল্প সাহায্য করে নাই। প্রথমে মহামতি ডেভি অঙ্গার-শলাকার মুখে যে বৈদ্যুতিক আর্ক আলোক উৎপাদন করেন, সেই তড়িৎ উৎপাদনের মূল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। তড়িৎ-বিজ্ঞানে অতি বিস্ময়-কর আবিষ্কার বাহুল্যে ফ্যারাডের রসায়ন শাস্ত্রে কৃতিত্ব হীন প্রভ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ রাসায়নিক অতি অল্প দৃষ্ট হয়। তিনিই বর্ত্তমান কালের তড়িৎ যন্ত্র উৎপাদনের সূত্রপাত করিয়া যান। তড়িৎবিৎগণ ফ্যারাডের নামে যেরূপ গর্ব্বিত হইয়া উঠেন, এই সুপ্রসিদ্ধ নামে রাসায়নিকগণের গর্ব্বিত হইবারও যথেষ্ট কারণ

রহিয়াছে। কিন্তু তড়িৎ হইতে নির্ম্মল শুভ্র আলোক নিঃসৃত হইবার উপায় রাসায়নিক গণই উদ্ভাবন করেন। তড়িৎ আলোকের কন্দের মধ্যে যে সূত্রের ন্যায় পদার্থ উত্তাপ শুভ্র হইয়া আলোক প্রদান করে, তাহার নাম ফিলামেণ্ট। তড়িৎ আলোকের এই কন্দ হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করা হইয়া থাকে। কোন্ পদার্থে উৎকৃষ্ট ফিলামেণ্ট প্রস্তুত হইতে পারে, বা কি উপায়ে কন্দকে সম্পূর্ণ বায়ু শূন্য করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে অনেকদিন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গণকে বিব্রত হইতে হইয়া ছিল। কিন্তু এই দুইটী বিষয়ই রাসানিকগণ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ সেলুলোজকে দ্রবীভূত করিয়া, এই দ্রবীভূত সেলুলোজ সাধারণতঃ সূত্রের উপর ছড়াইয়া দিয়া, এই সেলুলোজ সিক্ত সূত্রকে অঙ্গারে পরিবর্ত্তিত করিয়া, এবং সূত্রের সর্ব্বত্র তড়িৎ স্রোত প্রতিরোধন শক্তি সমান করিবার জন্য, হাইড্রোকার্ব্বনের বাষ্প প্রজ্বলিত করতঃ সূত্রের উপর উপযুক্ত মত অঙ্গার অধঃপতিত করিয়া রাসায়নিক ফিলামেণ্ট প্রস্তুত করিলেন। পরে হুইট্‌নি এবং অন্যান্য রাসায়নিকগণ এই সমস্ত কারবণ ফিলামেণ্টের পরিবর্ত্তে নূতনতর ধাতব প্রক্রিয়ায় এবং টাঙ্গস্টেন ইত্যাদি নূতন পদার্থ ব্যবহার করিয়া আরও উৎকৃষ্টতর ফিলামেণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।

কিন্তু ফিলামেণ্ট প্রস্তুত হইলেও কন্দের ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাশন ব্যাপার কিছুতেই মীমাংসিত হইতে ছিল না। অবশেষে ম্যালিগ্‌নানি এরূপ একটি সুন্দর প্রথা আবিষ্কৃত করিলেন, যে তৎসাহার্য্যে কন্দ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বায়ু-শূন্য হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

তাপ।

একটি লৌহ শলাকা কিছুক্ষণের জন্য রৌদ্রে রাখিয়া পরে তাহা স্পর্শ করিলে আমরা একটা বিশেষ রকমের ক্লেশ অনুভব করি। তখন আমরা বলি যে ঐ লৌহখণ্ড "তপ্ত," এবং যাহার জন্য উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে বলি "তাপ"। আমাদের শরীরের ত্বক এই তাপ অনুভব করিবার ইন্দ্রিয়, এবং জন্মাবধিই তাপ অনুভূতির এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। চঞ্চল শিশু যখন দীপশিখার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া যখন হস্ত প্রসারণ করিয়া উহা ধরিতে যায়, তখন সে একটা তীব্র যাতনা অনুভব করে। তাহার পর, গরম দুধের বাটী, স্নান করিবার গরম জল, এবং রৌদ্রতপ্ত গৃহ-প্রাঙ্গণ ইত্যাদির স্পর্শে শিশুর অভিজ্ঞতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, সে বুঝিতে পারে যে এই সকল দ্রব্য স্পর্শজনিত যে অনুভূতি তাহা একই শ্রেণীর অন্তর্গত। সে পরে জানিতে পারে যে উহার নাম তাপ।

তাপের বাহ্য প্রকৃতি।—তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে কোনও পদার্থে তাপ প্রযুক্ত হইলে তাহার কিছু অবস্থান্তর ঘটে, এবং এই পরিবর্ত্তন আমরা স্পর্শদ্বারা অনুভব করিতে পারি। কোন পদার্থে তাপ অধিক এবং কোনটাতে অল্প তাহা প্রায় স্পর্শ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাই তাপের বাহ্য প্রকৃতি।

তাপের অন্তঃপ্রকৃতি।—কিন্তু এই তাপ কি একটা পদার্থ (matter)? যদি তাহাই হয় তবে কোনও সামগ্রীতে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার ভার বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। যদি এক সের জলে সহিত এক ছটাক শর্করা মিশ্রিত করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে জলটুকু একটু মিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার ভার বৃদ্ধি হইয়া একসের এক ছটাক হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ঐ মিষ্টত্বের কারণ শর্করা; এবং শর্করার নিজের একটা ভার আছে, তাই তাহার সংযোগে জলের ভারবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এক সের জল লইয়া তাহাতে তাপ সংযোগ করিলে দেখা যায় যে জলটুকু উষ্ণতর হইয়াছে মাত্র, তাহার গুরুত্বের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তাহা হইলে যে তাপের সংযোগে জল উষ্ণতর হইয়াছে তাহার নিজের কোন ভার নাই ইহাই প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু পদার্থ ভারহীন হইতে পারে না, পদার্থ মাত্রেরই একটা গুরুত্ব আছে। তাহা হইলে তাপ যে পদার্থ (matter) নহে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

বস্তুত তাপ প্রয়োগ করা অর্থে একটা বাহ্যবস্তু আনিয়া মিশাইয়া দেওয়া নহে। জলে তাপ প্রয়োগ করিলে তাহার সহিত কোনও বাহ্য বস্তুর যোগ হয় না, তাহার ভিতরে কেবল একটা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। তাপ তেজের (energy) রূপান্তর মাত্র, সকল প্রকার তেজঃই তাপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। কোনও সামগ্রীতে তেজঃ প্রযুক্ত হইলে তাহার একটা আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তন ঘটে, ভারের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন এক খণ্ড লৌহতার দুই হস্তে ধরিয়া বাঁকাইলে তাহার অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন হয়, একটা বিভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু তাহার ভারবৃদ্ধি হয় না। এস্থলে দুই হস্তের শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় তারের আকারের এই পরিবর্ত্তন। তেমনি তাপ সংযোগ করিলে ঐ তারের আর এক প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে, কিন্তু তাহাতেও উহার ভার বৃদ্ধি হইবে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে জগতের সমুদায় বস্তু যে অণু পরমাণুর দ্বারা গঠিত, সেই অণুগুলি সর্ব্বদাই চঞ্চল ভাবে নড়িয়া বেড়াইতেছে। যখন ইহাদের বেগ অধিক দ্রুত হয়, তখন সেই চাঞ্চল্য তাপরূপে বাহিরে প্রকাশিত হয়। জলের গ্লাশ বেশ স্থির-ভাবে রাখিয়া দিলে জলও স্থির হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তখনও জলের অণুসমূহ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, কেবল এই চাঞ্চল্য আমাদের স্থূল চক্ষে লক্ষিত হয় না। তাহার পর সেই জলে তাপ সংযোগ করিলে জলের আণবিক চাঞ্চল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অণুগুলির বেগ যত দ্রুত হইতে থাকে, জলও ততই উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয়। তাহা হইলে আভ্যন্তরীন অণু-সমূহের চাঞ্চল্যই, তাপের অন্তঃপ্রকৃতি।

তাপের উৎপত্তি।—(১) আমাদের পৃথিবীর পক্ষে সমুদায় তাপের আদি কারণ সূর্য্য। সূর্য্যই সমগ্র সৌরজগতের জীবন স্বরূপ, তিনিই পৃথিবী ও তাঁহার প্রতিবেশী গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলীর জীবনদাতা ও পালনকর্ত্তা। সূর্য্য কিরণে স্নাত হইয়াই আমাদের এই স্নেহময়ী বসুন্ধরা এত গৌরবান্বিতা, ও স্বচ্ছন্দে কোটি কোটি সন্তানকে বক্ষের উপরে পালন করিয়া আসিতেছেন। তপনের তপ্তরশ্মিমালায় সজ্জিত হইয়া পৃথিবীর এত শোভা, এত স্নিগ্ধতা, এত শ্যামলতা, এত উর্ব্বরতা।

(২) কিন্তু সৌরতাপই পৃথিবীর একমাত্র সম্বল নহে, তাহার নিজস্বও কিছু আছে; পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রচুর তাপ সঞ্চিত রহিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন যে পৃথিবীর অন্তস্তল এত উষ্ণ যে তত্রত্য প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি তরল অবস্থায় রহিয়াছে; পৃথিবীর আয়ুকাল সূর্য্যের তাপবিকীরণ-ক্ষমতা ও পৃথিবীর আভ্যন্তরীন তাপের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেদিন এই দুটির মধ্যে একটির অভাব হইবে, সেই দিনই পৃথিবীর মৃত্যু।

এই সৌরজগতেই তাহার উদাহরণ রহিয়াছে। আমাদের উপগ্রহ চন্দ্র আর জীবিত নাই। সুদূর অতীতে কখনও সেখানে জীবের বাস ছিল কিনা, তাহা এখন বলা সুকঠিন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যে চন্দ্র এত শোভার আধার, যাহার স্নিগ্ধোজ্জল মূর্ত্তি দেখিয়া শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে, যাহার শুভ্র কিরণে স্নাত হইয়া ধরণী সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠে, এবং কবি ও ভাবুকের নয়নে স্বর্গের ছবি ভাসিয়া উঠে, সে চন্দ্র এখন প্রাণহীন, চৈতন্যহীন, হীমশীতল জড়পিণ্ড মাত্র। প্রাণে সুখ নাই, আশা নাই, শুধু এক অলঙ্ঘ্য বিশ্বনিয়মের অনুরোধে অশ্রান্ত ভাবে ছুটীয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্র আজ মৃত, কারণ তাহার আভ্যন্তরীণ তাপ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে,—আজ তাহার ভাণ্ডার শূণ্য। কোনও এক অতিদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীরও এই শোচনীয় পরিণাম হইবে, পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

(৩) উপরে যাহা বিবৃত হইল তদ্ব্যতীত তাপ উৎপাদনের আরও কয়েকটি উপায় আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তাপ, তেজের (energy) একটা রূপান্তর, এবং সকল প্রকার তেজই তাপরূপে প্রকাশিত হইতে পারে। যে সকল উপায়ে তেজকে তাপে রূপান্তরিত করা যায় তন্মধ্যে ঘর্ষণ (friction) প্রধান। দুই খণ্ড কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তাহারা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এমন কি দুই হস্তের তালুদ্বয়ের দ্বারা পরস্পরের ঘর্ষণ করিলে যথেষ্ট তাপ অনুভূত হয়। আবার ছুরি কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্রে শান দিবার সময় এত তাপ উৎপন্ন হয় যে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। যাহাকে অনেকে তারকার কক্ষচ্যুতি বলিয়া মনে করেন, তাহা তেমন ভয়াবহ কিছুই নহে। সমস্ত বিশ্বময় যে সকল প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের সহিত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণ জনিত এত তাপ উৎপন্ন হয় যে, সেই

প্রস্তর খণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং শেষে বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশাইয়া যায়। ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় এ তথ্য মানুষ অনেকদিন আবিষ্কার করিয়াছে; প্রায় সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই দুই খণ্ড কাষ্ঠ সজোরে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপন্ন করিবার প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

(৪) সংঘট্টন (Percussion) দ্বারাও তাপ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে সেদিন পর্য্যন্ত "চকমকি" ঠুকিয়া আগুন জ্বালা হইত। ছেনী এবং হাতুড়ীর দ্বারা পাথর কাটিতে কাটিতে যন্ত্র দুইটি এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে, জল দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া না লইলে উহা লইয়া কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

(৫) চাপ প্রয়োগের দ্বারা কোন পদার্থের আয়তন হ্রাস করিলে উহার তাপ বৃদ্ধি হয়। কোন বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ প্রযুক্ত হইলেই তাপবৃদ্ধি বিশেষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ বাষ্পীয় পদার্থকেই অতি সহজে স্বল্পায়ত করা যায়। বাই-সাইকেল কিম্বা ফুটবলের ভিতর বায়ু প্রবেশ করাইবার সময় পিচকারিটি অল্প সময়ের মধ্যে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কঠিন (solid) বা তরল পদার্থের উপর চাপ প্রযুক্ত হইলেও তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু উহা এত অল্প যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অনুভব করা যায় না।

(৬) কোন কোন কঠিন পদার্থের উপর তরল বা বাষ্পীয় পদার্থ প্রযুক্ত হইলে তাহাকে শোষণ করিয়া লয়। তখন অল্প মাত্রায় তাপবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। ময়দা বা স্পঞ্জ কর্ত্তৃক জল শোষিত হইলে সামান্য তাপ উৎপন্ন হয়। কঠিন পদার্থের সহিত বাষ্পীয় পদার্থের মিলনে আরও অধিক তাপবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ডুবেরেইনারের ল্যাম্পের (Döbereiner's lamp) কার্য্য প্রণালী ইহারই উপর নির্ভর করিতেছে। একটি কাচপাত্রে দস্তা ও সালফিউরিক এ্যাসিডের ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভিতর দিয়া এই গ্যাসের ধারা বহির্গত হইয়া অল্প পরিমাণ কৃষ্ণ প্ল্যাটিনমের (platinum black) উপর পতিত হইলে (কৃষ্ণ প্ল্যাটিনম সাধারণ প্ল্যাটিনম ধাতুর রূপান্তর (allotropic modification) মাত্র) এই কৃষ্ণ প্ল্যাটিনম উক্ত গ্যাসকে শোষণ করিয়া লয়। সেই সময়ে এত অধিক তাপ উৎপন্ন হয় যে, ঐ গ্যাসের উপরাংশ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং সাধারণ প্রদীপের ন্যায় জ্বলিতে থাকে।

(৭) কোনও কোনও পদার্থ জলে দ্রবীভূত হইবার সময় উহার তাপবৃদ্ধি হয়। জলে কোনও লবণ দ্রব হইবার সময় প্রায় ইহার বিপরীত ফলই দেখিতে পাওয়া যায়, যথা যবক্ষার (Potassium Nitrate), নিশাদল (Ammonium chloride) ইত্যাদি জলে গুলিলে জল শীতল হয়। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে, বিশেষতঃ যখন দুটি তরল পদার্থ মিশ্রিত হয়, তখন তাপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জলের সহিত সালফিউরিক এসিড মিশাইলে এত অধিক তাপ উৎপন্ন হয় যে জল ফুটিতে আরম্ভ করে।

(৮) যখন কোন পদার্থের অবস্থান্তর (change of state) ঘটে, অর্থাৎ বাষ্প হইতে তরল বা তরল হইতে কঠিন হয়, তখন সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শিলীকারক মিশ্রণ (Freezing mixture) দ্বারা জল শীতল করিতে করিতে উহা ক্রমে ০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীতল হয়; এবং সেই সময়ে জল জমিয়া বরফে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। এই পরিবর্ত্তনের সময় উহার তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই তাপ নিবারণ করিবার জন্য আরও অধিক শৈত্য প্রয়োগ করিতে হয়। যে তাপ সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া পদার্থের অবস্থান্তর ঘটিবার সময় প্রকাশিত হয় তাহাকে প্রচ্ছন্ন তাপ (latent heat) বলা যায়।

(৯) কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটিবার সময়ও, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সংখ্যক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সম্মিলন (combination) বা বিশ্লেষণ (decomposition) হয়, তখন প্রায় সর্ব্বদাই তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে জলে চূণ দিলে ফুটিতে থাকে। আমরা আজ কাল দীপশলাকা ঘর্ষণ করিয়া যে অগ্নির সৃষ্টি করিয়া থাকি তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া জনিত উত্তাপ হইতেই উৎপন্ন। আমাদের শরীরে যে তাপ রহিয়াছে, যাহার অস্তিত্বই আমাদের জীবন, এবং যাহার অভাবেই মৃত্যু, তাহাও রাসায়নিক প্রক্রিয়া জনিত। আমরা যে অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ু শ্বাস গ্রহণ করি এবং যে সকল খাদ্য আহার করিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে নানা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া দিবানিশি চলিতেছে, ইহা হইতেই আমাদের শরীরে তাপের সঞ্চয় হয়।

(১০) কোন পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উহার তাপ বৃদ্ধি ঘটে। আজকাল কলিকাতার বৃহৎ সৌধরাজি যে তড়িতালোকে আলোকিত হয় তাহার উৎপত্তি এইরূপে—কাচ গোলকের ভিতর প্ল্যাটিনম ধাতুর অতি সূক্ষ্ম তার থাকে, তাহার ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ায় উহা অত্যুষ্ণ হইয়া উঠে এবং তাহা হইতে আলোক বহির্গত হয়।

তাপ উৎপত্তির প্রধান দশটি কারণ উপরে বিবৃত হইল। অতঃপর তাপের প্রয়োগে কি কি ফল হয় তাহার আলোচনা করা যাউক।

তাপ প্রয়োগের ফল।

১। তাপমাত্রা। (Temperature) বৃদ্ধি। কোনও পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরিবর্ত্তন উহার তাপমাত্রার বৃদ্ধি। * অনেকে মনে করেন যে তাপমাত্রার বৃদ্ধি তাপ প্রয়োগের ফল নহে,—উহার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন কোনও পদার্থে তাপ প্রযুক্ত হইলে তাহার তাপমাত্রা বর্দ্ধিত হয় না। বরফে তাপ প্রয়োগ করিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহার তাপমাত্রার বৃদ্ধি হয় না, যে তাপটুকু

* তাপমাত্রা কাহাকে বলে পরে তাহার আলোচনা হইবে।

প্রযুক্ত হয় তাহা বরফকে গলাইয়া তরল জলে পরিণত করিতে ব্যয়িত হয়, এবং যতক্ষণ সমস্ত বরফ গলিয়া না যায় ততক্ষণ উহার তাপমাত্রা ০°ই থাকে। যে পরিমাণ তাপ এই কার্য্যে ব্যয়িত হয় তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, সে জন্য উহাকে প্রচ্ছন্ন তাপ বলা যায়। উপরোক্ত এই প্রচ্ছন্ন তাপের উল্লেখ হইয়াছে।

২। প্রসারণ। তাপ প্রয়োগ করিলে প্রায় সকল পদার্থ প্রসারিত হয়। নিম্ন লিখিত পরীক্ষা হইতে পদার্থের প্রসারণশীলতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। ক একটি ধাতু-নির্ম্মিত গোলক (চিত্র ১) খ রিংটি উহার সমান, সুতরাং গোলকটি রিংএর ভিতর দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। এক্ষণে ঐ গোলকটি স্পীরিটল্যাম্পে উত্তপ্ত করিলে উহা আর রিংএর ভিতর দিয়া যাইতে পারিবে না উহার উপর আটকাইয়া থাকিবে কারণ এখন গোলকটি তাপ সংযোগে রিংএর অপেক্ষা বড় হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে রিংটিও গোলকের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হইবে, এবং গোলকটি শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হইবে; তখন গোলকটি রিংএর ভিতর দিয়া পড়িয়া যাইবে।
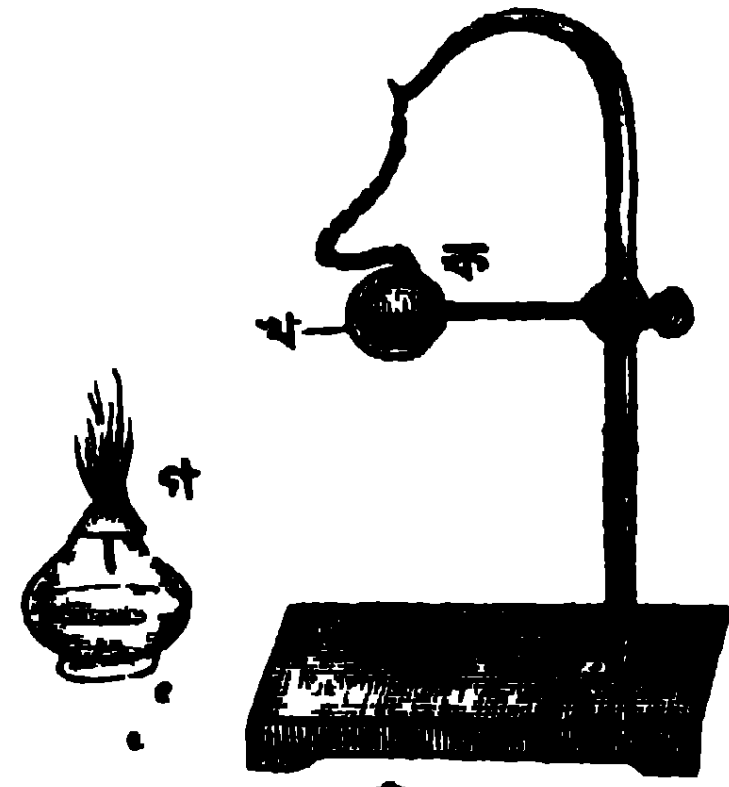
চিত্র১

তাপ সংযোগে সকল সময়ে সকল পদার্থে প্রসারণ হয় না। Antimony তাপ প্রয়োগের দ্বারা দ্রবীভূত হইলে উহার আয়তন হ্রাস পাইয়া থাকে। বরফে তাপ প্রয়োগ করিলে ৪° পর্য্যন্ত উহার আয়তনের হ্রাস হইতে থাকে, তাহার পর উহা প্রসারিত হইয়া থাকে।

৩। অবস্থার পরিবর্ত্তন। তাপ সংযোগে প্রায় সকল পদার্থেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ কঠিন পদার্থ তরল, এবং তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়। একখণ্ড গন্ধক একটি পাত্রে রাখিয়া তাপ প্রয়োগ করিলে এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গন্ধক গলিয়া লোহিতবর্ণ তরল পদার্থের আকার ধারণ করে, পরে আরও অধিক তাপ পাইলে উহা বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায়।

৪। তাপ পরিচালকতার পরিবর্ত্তন। সকল পদার্থই ন্যূনাধিক পরিমানে তাপ পরিচালক। একটি লৌহ শলাকার এক প্রান্ত হস্তে ধারণ করিয়া অপর প্রান্ত দীপ শিখার উপর ধরিলে অল্পক্ষণ পরে হস্তস্থিত প্রান্ত এত উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে আর ধরিয়া রাখা যায় না। শলাকার এক প্রান্ত দীপ শিখা হইতে যে তাপ গ্রহণ করিতেছে, তাহা অতি সত্বর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া পড়িতেছে; কারণ লৌহ এবং অন্যান্য ধাতু অধিক পরিমাণে তাপ পরিচালন করিতে পারে। কিন্তু একখণ্ড কাঠ বা কাচ এইরূপে উত্তপ্ত করিলে এত অধিক তাপ সঞ্চারিত হয় না, কারণ তাহাদের তাপ পরি-

চালকতা অতি সামান্য। তাপ পরিচালন করিবার এই ক্ষমতা সর্ব্বদা একরূপ থাকে না; উপরোক্ত লৌহ শুল্রাকা যতই অধিক তপ্ত করা যাইবে ততই উহার তাপ পরিচালন ক্ষমতার হ্রাস হইতে থাকে।

৫। আপেক্ষিক তাপের (Specific Heat) হ্রাস। উপরে যে তাপ পরিচালকতার উল্লেখ হইয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপের উপর নির্ভর করে। আপেক্ষিক তাপ একটা পদার্থের তাপ গ্রহণ বা শোষণ করিবার ক্ষমতা; তাপ গ্রহণ করিবার এই ক্ষমতাও তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পাইয়া থাকে।

৬। আলোক বিকীরণ। যে সকল কঠিন পদার্থ অধিক তাপমাত্রায় তরল হয় তাহারা তরল হইবার পূর্ব্বে আলোক বিকীর্ণ করিয়া থাকে। একখণ্ড লৌহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ক্রমে উহা উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ ও আরও অধিক তাপ পাইলে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়া তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করে।

৭। তাপজাত তড়িৎ (Thermo electricity) দুইটি বিভিন্ন ধাতু একত্র যুক্ত করিয়া সেই সংযোগ স্থলে তাপ প্রয়োগ করিলে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এক খণ্ড লৌহ ক (চিত্র ২) এবং এক খণ্ড তাম্র খ এই দুইটিকে স এর নিকট সংযুক্ত solder করা হইয়াছে, এবং দুই খণ্ড তারের দ্বারা একটি galvanometer বা তড়িৎ প্রবাহ-নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত ক ও খ এর সংযোগ করা হইয়াছে। এক্ষণে ল স্পীরিট ল্যাম্পের দ্বারা স অংশটি উত্তপ্ত করিলে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে, এবং galvanometerএ উহা প্রকাশিত হইবে।
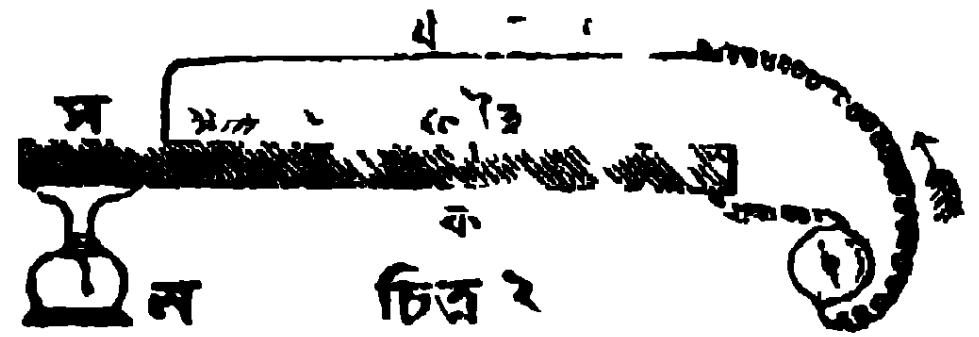
চিত্র ২

এরূপ কয়েকটি পদার্থ আছে যাহাতে তাপ প্রয়োগ করিলে তড়িৎ Pyro electricity সঞ্চারিত হয়। টুরমালিন (Tourmaline) নামক একপ্রকার প্রস্তর এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৮। তড়িৎ পরিচালকতার পরিবর্ত্তন। সকল পদার্থের যেমন তাপ পরিচালন করিবার ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ তড়িৎ পরিচালন ক্ষমতাও সকল পদার্থের আছে। তাপ প্রয়োগের সহিত এই তড়িৎ পরিচালকতার ব্যতিক্রম ঘটে। কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত হইলে উহার হ্রাস হয়; একটি তড়িতালোকের কন্দ ক (চিত্র ৩) খ একটি batteryর সহিত গ তারের দ্বারা সংযুক্ত হইলে কন্দের মধ্যস্থিত তার আলোকিত হইয়া উঠে কিন্তু যদি ল একটি স্পীরিট ল্যাম্পের দ্বারা তারের এক অংশ উত্তপ্ত করা হয়, তাহা হইলে ক্রমে আলোকের তেজ হ্রাস পাইতে থাকে। তার উত্তপ্ত
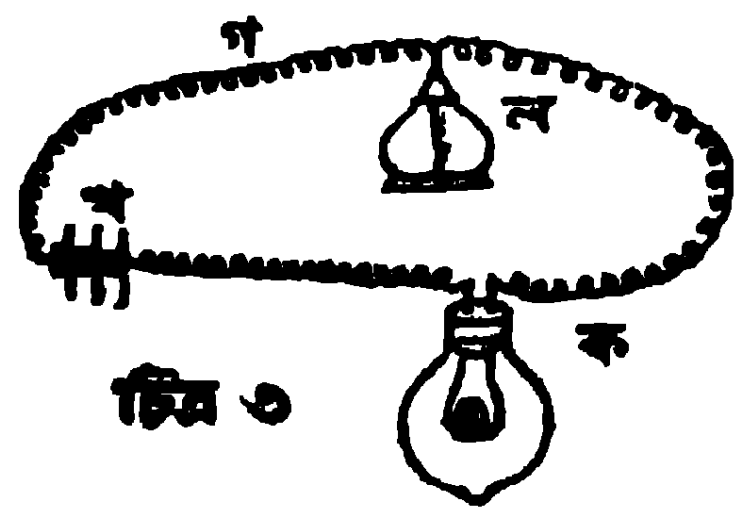
চিত্র ৩

হইলে উহার তড়িৎ পরিচালকতার হ্রাস হয়, সেজন্য তড়িৎ প্রবাহের ব্যাঘাত হওয়ায় কন্দের তার অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হইতে পারে না।

তরল পদার্থে ইহার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে, তাপসংযোগে তাহার পরিচালকতা বৃদ্ধি পায়। আবার কোনও কোনও অপরিচালক পদার্থ তাপ সংযোগে পরিচালক হয়। যথা, বরফ, কাচ প্রভৃতি তাপের প্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া পরিচালন ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

৯। চুম্বক শক্তির (Magnetisim) বিলোপ। একটী কঠিন ইস্পাত নির্ম্মিত চুম্বক শলাকা উত্তপ্ত করিলে তাহার magnetism এর বিলোপ হয় এবং শীতল হইলে উহার magnetism পুনরায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু শলাকাটি যদি অত্যন্ত উত্তপ্ত করা হয় (লাল হওয়া পর্য্যন্ত) তাহা হইলে উহার চুম্বক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১০। রাসায়নিক প্রক্রীয়া। তাপের সংযোগে অনেক স্থলে রাসায়নিক প্রক্রীয়া ঘটিয়া থাকে। লৌহ ও গন্ধক একত্র চুর্ণ করিয়া তাপ প্রয়োগ করিলে রাসায়নিক মিলন ঘটে এবং সলফাইড অফ্ আয়রন (Sulphide of Iron) নামক একটী যৌগিক পদার্থ প্রস্তত হয়। আবার নিশাদল বা ক্লোরাইড অফ্ এমোনিয়া (Chloride of Ammonia) তাপ প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট হইয়া এমোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric Acid) এই দুই গ্যাস উৎপন্ন হয়।

তাপ প্রয়োগের যে সকল প্রধান প্রধান ফল দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপরে বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতীত তাপ সংযোগে পদার্থের প্রায় সকল ধর্ম্মেরই অল্প ব্যতিক্রম ঘটীয়া থাকে।

তাপমাত্রা।

(Temperature.)

তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থের তাপমাত্রার বৃদ্ধি হয় ইতি পূর্ব্বে এ কথার উল্লেখ হইয়াছে। এই তাপমাত্রা তাপ হইতে বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা একটি উদাহরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

মনে করা যাউক যে একটি গ্রামে ১০০০ জন পুরুষের বাস, এবং প্রত্যেকের মাসিক আয় ১০ টাকা; তাহা হইলে সকলের মোট আয় মাসিক ১০০০০ টাকা। এই ১০৲ টাকা আয়ের সহিত একটা পদার্থের তাপমাত্রা এবং মোট ১০০০০৲ টাকার সহিত উহার মোট তাপের তুলনা করা যাইতে পারে। ১০০০ জনের ১০৲ টাকা আয় একত্র করিয়া গ্রামের ধন সমষ্টি ১০০০০৲ টাকা হয়; কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে গ্রামটি অত্যন্ত দরিদ্র, কারণ উহার অধিবাসীদের মাত্র ১০৲ টাকা আয় অর্থাৎ গ্রামটি "১০৲ টাকা দরের" গ্রাম। সেইরূপ যদি একটি পদার্থে ১০০০ অণু থাকে, এবং প্রত্যেক

অনুর যদি ১০ তাঁপমাত্রা হয়, তাহা হইলে পদার্থটির তাপ সমষ্টি ১০০০০ হইলেও, উহা অত্যন্ত শীতল, কারণ উহার তাপ মাত্রা ১০ মাত্র। যদি উপরোক্ত গ্রামের ২০ জন লোকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে গ্রামের ধন সমষ্টির হ্রাস হইয়া ৯৮০০৲ টাকা হইবে, কিন্তু গ্রাম খানি "১০৲ টাকা দরের" গ্রামই থাকিবে। সেইরূপ যদি উপরোক্ত পদার্থ হইতে ২০টি অনু অপসারিত হয়, তাহা হইলে উহার তাপ সমষ্টির হ্রাস হইয়া ৯৮০০ হইবে, কিন্তু তাপমাত্রা ১০ থাকিবে।

আবার যদি আর একটি গ্রামে মাত্র ১০০ জনের বাস থাকে কিন্তু প্রত্যেকের আয় ৯০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে উহার ধনসমষ্টি ৯০০০৲ টাকা হইল। এক্ষণে মোট ধনের হিসাবে এই গ্রাম প্রথম গ্রামের অপেক্ষা হীন হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই গ্রামটিই অধিক সমৃদ্ধিশালী। কারণ ইহার লোক সংখ্যা অল্প হইলেও প্রত্যেকের আয় অনেক অধিক: অর্থাৎ এ গ্রামটি "৯০৲ দরের" গ্রাম। সেইরূপ ১০০টি অনু বিশিষ্ট একটি পদার্থের প্রত্যেক অনুর তাপমাত্রা যদি ৯০ হয়; তবে উহার তাপ সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত পদার্থটির অপেক্ষা অল্প হইলেও ইহার তাপমাত্রা অধিক, ইহা অত্যন্ত উষ্ণ।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একটা পদার্থের মোট তাপ এবং তাপ মাত্রার মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। দুইটি পদার্থের মধ্যে একটির তাপ অধিক হইলেও অপরটির তাপমাত্রা অনেক অধিক হইতে পারে। একবাটী ফুটন্ত জলের অপেক্ষা এক কলসী শীতল জলে অধিক তাপ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার তাপমাত্রা অনেক কম।

অনেক বৈজ্ঞানিক জলের উপরি ভাগের (Surface) সহিত তাপ মাত্রার তুলনা করিয়া থাকেন। ইহার আলোচনা করিলে তাপমাত্রার অনেকগুলি ধর্ম্ম ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ৪র্থ চিত্রে ক একটি বড় জলের চৌবাচ্চা, খ একটি ছোট চৌবাচ্চা এবং গ একটি স্বল্প পরিসর নল।
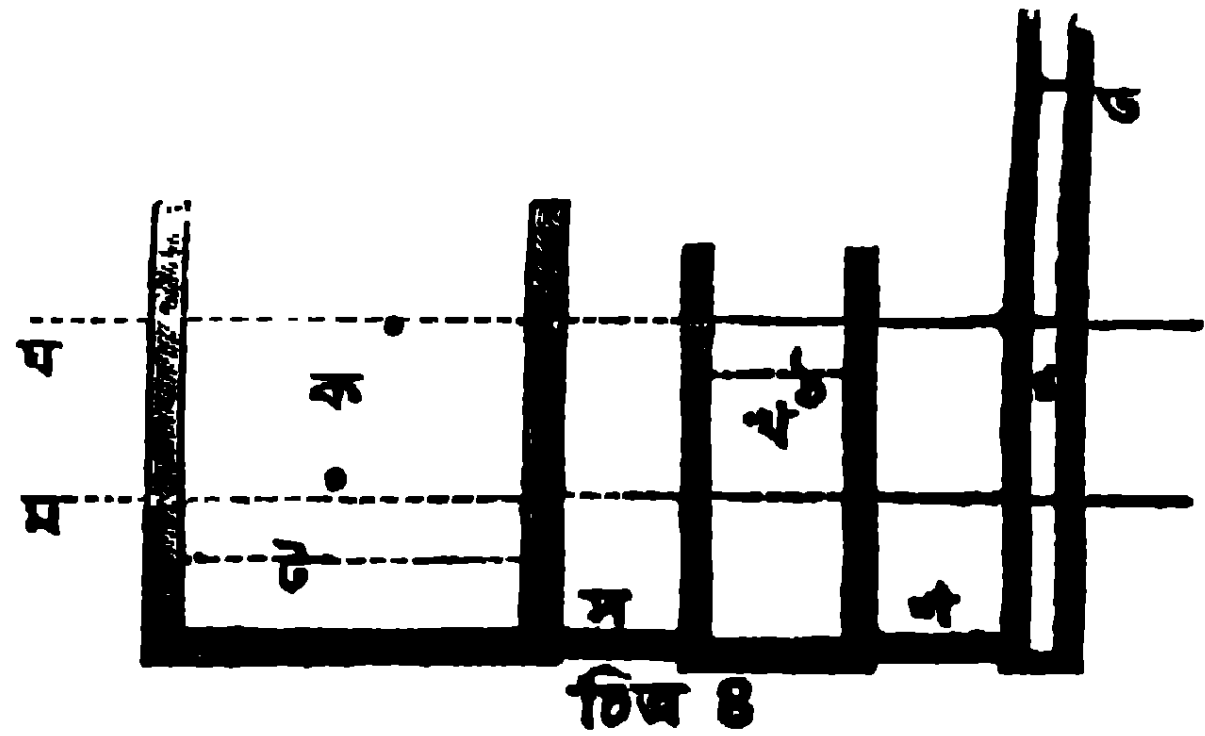
পরীক্ষা ১। যদি ক, খ ও গ, ঘ রেখা পর্য্যন্ত জলপূর্ণ করা হয়, তবে ক এর অপেক্ষা খ এ অল্প জল আছে, এবং গ এ আরও অল্প আছে। সেইরূপ যদি এই তিনটি পাত্রস্থিত জল কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রা (মনে করা যাউক ৫০০) পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়, তবে তিনটার তাপমাত্রা সমান হইলেও মোট তাপের পরিমাণ সমান নহে। যদি ক পাত্রে খ এর দ্বিগুণ গ এর চতুর্গুন জল থাকে তবে ক পাত্রের জলে খ এর দ্বিগুণ ও গ এর চতুর্গুণ তাপ সঞ্চিত হইয়াছে।

চিত্র ৪

পরীক্ষা ২। কিন্তু যদি উক্ত তিনটি পাত্রে সমান পরিমাণ (মনে করা যাউক ১০ সের) জল ঢালা হয়, তাহা হইলে ক পাত্র ট রেখা পর্য্যন্ত, খ, ঠ রেখা পর্য্যন্ত ও গ, রেখা পর্য্যন্ত জলপূর্ণ হইবে, কারণ উহাদের আয়তন বিভিন্ন। সেইরূপ যদি ক খ ও গ জলে পূর্ণ করিয়া সমান পরিমাণ (মণে করা যাউক ১০০) তাপ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ক পাত্রস্থিত জল ২০, খ এর জল ১০০ এবং গ এর জল ২৫০ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইবে।

পরীক্ষা ৩। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ট, ঠ, ড পর্য্যন্ত জল পুর্ণ করা হইয়াছে। এক্ষণে যদি স ও শ এই দুইটি নলের দ্বারা তিনটি পাত্রের যোগ করিয়া দেওয়া হয়, তবে গ পাত্রস্থিত জলের এক অংশ খ এ, এবং খ এর এক অংশ ক এ আসিয়া, ম এইরূপ একটা রেখা পর্য্যন্ত জল পুর্ণ হইয়া থাকিবে। সেইরূপ যদি তিনটি পাত্রস্থিত জলের বিভিন্ন তাপ মাত্রা ২° ১০° ২৫° হয় এবং যদি তিনটি পাত্রের যোগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাপও পরিচালিত হইয়া গ হইতে খ এ এবং খ হইতে ক এ আসিয়া সমস্ত জলের তাপমাত্রা সমান (মনে করা যাউক ৮°) হইয়া যাইবে।

এই তৃতীয় পরীক্ষা হইতে আমরা তাপের এই একটি প্রকৃতির পরিচয় পাইতেছি যে, দুইটি পদার্থের মধ্যে যদি একটির তাপমাত্রা অপরের অপেক্ষা অধিক হয়, তবে তাপ, উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট পদার্থ হইতে অল্প তাপমাত্রা বিশিষ্ট পদার্থে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ একটা শীতল পদার্থ একটা উত্তপ্ত সামগ্রীর সংস্পর্শে আসিলে স্বয়ং উত্তপ্ত হইয়া উঠে, বাটিতে উষ্ণজল বা দুগ্ধ ঢালিলে বাটীও তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া উঠে, এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। তাপের এই স্থান পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি মানবের জন্মের কারণ। যেহেতু ইহা না থাকিলে জগতের সমস্ত তাপ দুই একটি স্থানেই সঞ্চিত হইয়া থাকিত অবশিষ্টাংশ অত্যন্ত শীতল হইয়া জীব নিবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া থকিত। কিন্তু ইহাই আবার ভবিষ্যতে মানবের মৃত্যুর কারণ হইবে, যেহেতু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ তাপ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছে, এবং পুনরায় জীব নিবাসের অনুপযোগী হইয়া যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, বি, এ।

আলোক-চিত্রণ।

(Photography)

সহজে ফটোগ্রাফী শিক্ষা করা যাইতে পারে, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অত্যন্ত বিরল। অর্থের অপব্যয় না হয়, অথচ শিক্ষার্থী ফটোগ্রাফী অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই প্রবন্ধ লিখিত। যদি প্রবন্ধের কোন অংশ পাঠকের বোধগম্য না হয়, আমাকে লিখিলে, এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

ফটোগ্রাফীর প্রধান উপাদান ক্যামেরা (Camera); উহার সাইজ (size) শিক্ষার্থীর অর্থ-সঙ্গতি ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কেহ হাফ-প্লেট (half plate) সাইজ, কেহবা কোয়ার্টার-প্লেট (quarter plate) সাইজ পছন্দ করেন। শিক্ষার্থীর শেষোক্ত ক্যামেরাই ভাল; কেননা উহা অনায়াসে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়, প্লেট এবং কাগজের ব্যয় অল্প হয়, ও এনলার্জ (enlarge) করিয়া ইচ্ছানুরূপে বৃহদায়তনের চিত্রও করিতে পারা যায়। হাফপ্লেট ক্যামেরা দ্বারা কোয়ার্টার প্লেটের ছবি পর্য্যন্ত তোলা যাইতে পারে।

আজ কাল তিন প্রকারের ক্যামেরা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে হ্যাণ্ড-ক্যামেরা একটি। এই ক্যামেরা হাতে ধরিয়া ছবি তোলা যাইতে পারে; এবং ইহার অধিকাংশই কোয়ার্টার-প্লেট-সাইজ। অন্য প্রকারের ক্যামেরাকে হ্যাণ্ডক্যামেরা এবং ষ্ট্যাণ্ড (stand) ক্যামেরা দুইই করা যাইতে পারে। ইহারও অধিকাংশ কোয়ার্টার-প্লেট-সাইজ। তৃতীয় প্রকার— ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা। ইহা যে কোন সাইজের হইতে পারে।

প্রথমোক্ত হ্যাণ্ড-ক্যামেরা, যন্ত্রের উৎকৃষ্টতা অনুসারে, অতি সামান্য হইতে বহু মূল্যের পাওয়া যায়। এই প্রকার ক্যামেরাতে প্রায়ই ১২ খানি প্লেট একসঙ্গে পুরিয়া লইতে হয়। এরূপ কতকগুলি ক্যামেরার ফোকাস্ (focus) করিবার আবশ্যক হয় না। যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরাইয়া শাটার (shutter) টিপিলেই ছবি উঠে। কোন্ ছবি কতখানি উঠিবে, তাহা ভিউ ফাইণ্ডারে (view finder) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ক্যামেরাতে ক্যামেরা হইতে ৬ কিম্বা ৯ ফিট দূরে যে সকল পদার্থ আছে তাহার ফোকাস্ হয় না; ৯ ফিট হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী সমস্ত পদার্থেরই ফোকাস্ করা থাকে। কাজেই এই সমস্ত ক্যামেরায় ৯ ফিটের অধিকতর দূরবর্ত্তী পদার্থের ছবি তুলিতে হয়। অন্য প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে ছবি ফোকাস্ করা যায়। সে জন্য ক্যামেরার পার্শ্বে দাগ কাটা থাকে। স্ক্রু

ঘুরাইয়া তিন ফিট, পাঁচ ফিট প্রভৃতি ঘরের কাছে, ক্যামেরার বেলোর সম্মুখবর্ত্তী ধাতব অংশের পাদদেশে সংলগ্ন কাঁটাটিকে আনিলে তত ফিট দূরবর্ত্তী জিনিষ ফোকাসে আসে।

দ্বিতীয় প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরা— প্রায় ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার অনুরূপ। ক্যামেরার পশ্চাৎস্থিত গ্রাউণ্ড গ্লাসে (ground glass) ছবি প্রতিফলিত হয় ও স্ক্রু ঘুরাইয়া ক্যামেরার বেলো (bellow) বাড়াইয়া অথবা কমাইয়া ছবির ফোকাস্ করিতে হয়। ইহার আর এক সুবিধা এই যে, ক্যামেরার এক পার্শ্বে তিন ফিট, পাঁচ ফিট প্রভৃতি দাগ কাটা থাকে। তাড়াতাড়ি কাজ করিবার সময় বেলো-সংলগ্ন উক্ত কাঁটা এই দাগের নিকট আনিলে আর ফোকাস্ করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার অনেক গুলিতে প্লেটের পরিবর্ত্তে ফিল্ম্ (film)ও ব্যবহার করা যায়। দিবালোকেও ফিল্ম্ বাহির করা ও প্রবেশ করান যাইতে পারে। তৃতীয় প্রকার,—ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা ; ইহার বিষয় লেখা নিষ্প্রয়োজন।

ফটোগ্রাফীর দ্বিতীয় উপাদান ক্যামেরার ষ্ট্যাণ্ড (stand)। ষ্ট্যাণ্ডটী খুব শক্ত হওয়া প্রয়োজন, যেন সহজে না কাঁপে। অনেক ষ্ট্যাণ্ড প্রথম দৃষ্টিতে বেশ শক্ত অনুমান হয় ; কিন্তু উপরে ক্যামেরা বসাইলে কাঁপিতে থাকে। ক্রয় করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া লওয়া উচিত। ছোট ক্যামেরার জন্য ষ্ট্যাণ্ডকে ৪ বার মুড়িয়া ও বড় ক্যামেরার জন্য দুইবার মুড়িয়া অল্প আয়তন করিবার বন্দোবস্ত থাকিলেই ভাল হয়। ষ্ট্যাণ্ড ওজনে হাল্কা হওয়া প্রয়োজন ; যাহাতে সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায়, এই প্রকার ষ্ট্যাণ্ডই ভাল। ষ্ট্যাণ্ড, ফটোগ্রাফারের বুক কিম্বা গলা পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইলে আরও ভাল হয়। এই প্রকার উচ্চ ষ্ট্যাণ্ডের সুবিধা এই যে, ইহার উপর ক্যামেরা বসাইলে গ্রাউণ্ড গ্লাসটি ঠিক চোখের সম্মুখে থাকে, কাজেই হেলিয়া দেখিতে হয় না। ষ্ট্যাণ্ডের উপরিভাগ অর্থাৎ যেখানে ক্যামেরা বসাইয়া দিতে হয়, সেই যায়গাটা যেন প্রশস্ত হয় ; সরু হইলে ক্যামেরা বড় নড়ে। ক্যামেরা বসাইবার স্ক্রুটি ষ্ট্যাণ্ডের সহিত বাঁধিয়া রাখিলে হারাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ষ্ট্যাণ্ড ক্রয় করিবার সময় ষ্ট্যাণ্ডটি দাঁড় করাইয়া ক্যামেরা বসাইবার যায়গায় হাত দিয়া ঘা দিলে, যদি ষ্ট্যাণ্ড না নড়ে, তাহা হইলে ষ্ট্যাণ্ড প্রায় দৃঢ় হইয়া থাকে। বন্ধুর যায়গায় যাহাতে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য ষ্ট্যাণ্ডের পায়ের নীচের ভাগ টানিয়া বা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া প্রয়োজনানুরূপ ছোট বড় করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। ক্যামেরা ষ্ট্যাণ্ডে বসাইয়া তৎপরে চিত্র উত্তোলনের জন্য নিম্ন লিখিত রূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম—হ্যাণ্ড ক্যামেরা— কোয়াটার প্লেট সাইজ। প্রথমে যে প্রকার ক্যামেরা সর্ব্বদা ফোকাসে থাকে তাহার বিবরণ লিখিত হইল। ইহাতে দুইটি ভিউ ফাইণ্ডার থাকে, একটিতে লম্বা ভাবে অন্যটিতে পাশভাবে ছবি দেখায়। ক্যামেরার দুই পাশে দুইটি থাকে। ইহারা বস্তুতঃ ঠিক ছোট ক্যামেরার কাজ করে। কোন কোন ক্যামেরাতে গ্রাউণ্ড গ্লাসের উপরে ছবি পড়ে, তাহা দেখিয়া প্লেট এক্স্পোজ (expose)

করিতে হয়। হ্যাণ্ড ক্যামেরার প্রায় সকল প্রকারেই ১২ টি করিয়া স্লাইড (slide) থাকে। তাহাতে ড্রাইপ্লেট পুরিয়া ক্যামেরার ভিতর বসাইয়া দিতে হয়। ইহার সবই অন্ধকার ঘরে (dark room) করিতে হয়। রাত্রিতে ঘরের ভিতর ইহা করিলেই চলে। প্লেট পুরিবার পূর্ব্বে ক্যামেরার উপর যে নম্বরগুলি আছে তাহা ০ নম্বরে আনিতে হইবে। কয়খানি প্লেট এক্‌স্‌পোজ্‌ড্‌ হইল তাহা জানিবার জন্য সকল ভাল হ্যাণ্ড ক্যামেরার উপরে একটি ছিদ্র দিয়া নম্বর বাহির করা থাকে। ইহাতে ১২ পর্য্যন্ত নম্বর আছে। এক্‌স্‌পোজ্‌ড্‌ প্লেট বাহির করিবার জন্য ভাল হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে আরও একটি দরজা থাকে। এই দরজা কোন ক্যামেরার নিম্নে থাকে, এবং কোনটীর বা পশ্চাৎ দিকের দরজাটি দুই ভাগ করা থাকে। উপরের ভাগ দিয়া প্লেট পুরিতে হয় ও নিম্নের ভাগ দিয়া এক্‌স্‌পোজ্‌ড্‌ প্লেট বাহির করিতে হয়। কোন ক্যামেরার দরজার সম্মুখে ইনষ্ট্যাণ্টেনিয়াস (instantaneous) ও টাইম্‌ এক্‌স্‌পোজার (time exposure) দেওয়ার কল আছে, এবং অন্যান্য কতকগুলির সম্মুখের দরজা খুলিয়া তবে এক্‌স্‌পোজারের মাত্রার পরিবর্ত্তন বা ডায়াফ্রাম্‌ (diaphragm) ছোট
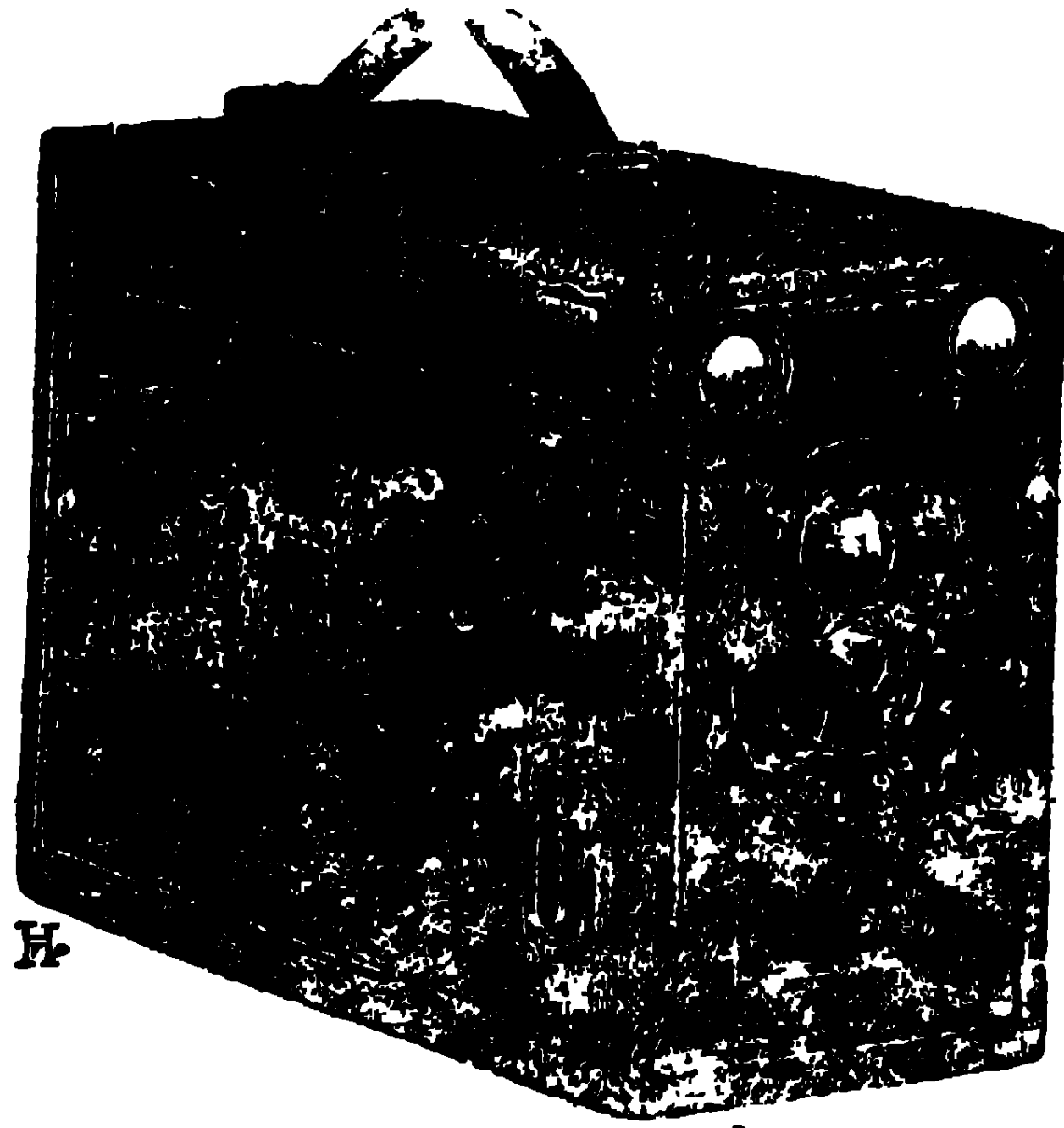
ম্যাগ্যাজিন হ্যাণ্ড ক্যামেরা।

বড় ইত্যাদি করা যায়। প্লেটে যত পরিমাণ ছবি তুলিতে হইবে, ক্যামেরা নড়াইয়া, ঘুরাইয়া, ফিরাইয়া ঠিক ততটুকু পরিমাণ ছবি গ্রাউণ্ড গ্লাসে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তাহার পর এক্‌স্‌পোজার দিতে হইবে।

দ্বিতীয়—হ্যাণ্ড ক্যামেরা। সমস্তই উপরোক্ত প্রকার, কেবল তাহাতে অল্প দুরবর্ত্তী পদার্থেরও ফোকাস্‌ করা যায়। ফোকাস্‌ করিবার জন্য ক্যামেরার পাশে একটা স্ক্রু আছে। তাহা ঘুরাইলে ক্যামেরার গাত্র-সংলগ্ন একটা ছিদ্র দিয়া ৩, ৬, ৭, ৯, ২০ ফিট প্রভৃতি

দেখা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই দূরস্থ সমস্ত জিনিষ ফোকাস করা হইয়া যায়। কোন কোন ক্যামেরাতে ৩, ৫, ৯, প্রভৃতি ফিট দূরবর্ত্তী জিনিষ ফোকাস করিবার জন্য ছোট ছোট লেন্স সম্মুখে ধরিলে ৩, ৫, ৯ প্রভৃতি ফিট দূরবর্ত্তী জিনিষের ফোকাস হয়। এই সকল হ্যাণ্ড ক্যামেরাকে ম্যাগ্যাজিন ক্যামেরা বলে। এই সকল ক্যামেরাতে প্রায়ই শ্লাইড আটকাইয়া যায়। ক্যামেরা ক্রয় করিবার সময় এই সকল দেখিয়া লওয়া উচিত। ম্যাগাজিন ক্যামেরার অধিকাংশই কোয়ার্টার প্লাইজ।
অন্য প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে ডার্ক শ্লাইড (dark slide) আছে। প্রত্যেক ছবি তুলিবার সময় নূতন প্লেটপূর্ণ ডার্ক শ্লাইড ক্যামেরার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া ছবি তুলিতে হয়।

আরও এক প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরা আছে। ইহাতে ফিল্‌ম্ দিয়া কাজ করিতে হয়। একটা কাল কাগজ জড়ান' রিলের মধ্যে ফিল্‌ম্ থাকে। এই প্রকার ক্যামেরাতে দিনের বেলাই ফিল্‌ম্ পোরা যায় ও অনেকটা সুবিধা আছে। প্রত্যেক ফিল্‌মে ছয় কিম্বা বারখানি ছবি তোলা যায়। বাহির হইতে স্ক্রু ঘুরাইলে একটি একটি করিয়া ফিল্‌ম্ নিজস্থানে আসে ও ব্যবহৃতগুলি রিলে জড়াইয়া যায়। ড্রাইপ্লেট অপেক্ষা ফিল্‌মের দাম বেশী। সর্ব্বপ্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাই ষ্ট্যাণ্ডে বসাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্থান বিশেষে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্লেট এক্‌স্‌পোজ করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে হাতে রাখিয়া এক্‌স্‌পোজ করা অসম্ভব, কেননা ক্যামেরা নড়িয়া যায়। এ কথা জানা বিশেষ দরকার যে, হাতে ক্যামেরা রাখিয়া ছবি তুলিতে হইলে কখন $\frac{1}{8}$ সেকেণ্ডের বেশী এক্‌স্‌পোজার দেওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে ক্যামেরা নড়িয়া যাইবে হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে $\frac{1}{8}$ সেকেণ্ডেরও বেশীক্ষণ এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায়; কিন্তু তাহা কি প্রকারে দিতে হইবে তাহা যত অভ্যাস হইবে ততই জানিতে পারা যাইবে। যাঁহারা বন্দুক ব্যবহারে অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, নিশানা ঠিক করিয়া নিশ্বাস লইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিলে হাত কাঁপে না। বাম হাতে জোরে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার পর বুক ভরিয়া নিশ্বাস লওয়ার পর দম বন্ধ করিয়া শাটার টিপিয়া বেশীক্ষণ এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায়। শতচেষ্টা করিলেও হ্যাণ্ড ক্যামেরায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এক্‌স্‌পোজার দেওয়া অসম্ভব। ম্যাগ্যাজিন ক্যামেরাতে এক্‌স্-পোজার দিবার জন্য স্প্রিং অথবা বল্ ও টিউব (ball & tube) সংযুক্ত শাটার থাকে। ফিল্‌ম্ ক্যামেরা সচরাচর বল ও টিউব সংযুক্ত হয়। বল ও টিউব থাকিলে এক্‌স্-পোজার দিবার সময় ক্যামেরা নড়িবার ভয় থাকে না।

ক্যামেরা ব্যবহার কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা বিক্রেতার নিকট জানিয়া লওয়া প্রয়োজন, পুস্তক দেখিয়া শিক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব।

তৃতীয়— ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা। ইহা ষ্ট্যাণ্ডের উপর বসাইয়া ব্যবহার [illegible] [illegible] কোন কোন ক্যামেরাতে শাটার থাকে, কিন্তু অধিকাংশ [illegible]

ক্যাপ [illegible]। ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা ঐ সাইজ হইতে অনেক বড় সাইজের পর্যান্ত হয়। ইহা মেহগনি বা সেগুন কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই দুই কাঠই এদেশে বেশ ব্যবহারোপযোগী। যদি পিত্তল দ্বারা বাঁধান হয় তাহা হইলে আরও ভাল হয়। ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা দুই প্রকার, প্রথম প্রকার ক্যামেরার বেলো মোটা হইতে ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় প্রকার ক্যামেরার বেলো সমান্তরাল (parallel)। প্রথম প্রকার ক্যামেরা সরু বেলো হওয়ার জন্য হাল্কা হয়; কিন্তু অনেক নির্মাতা হাল্কা
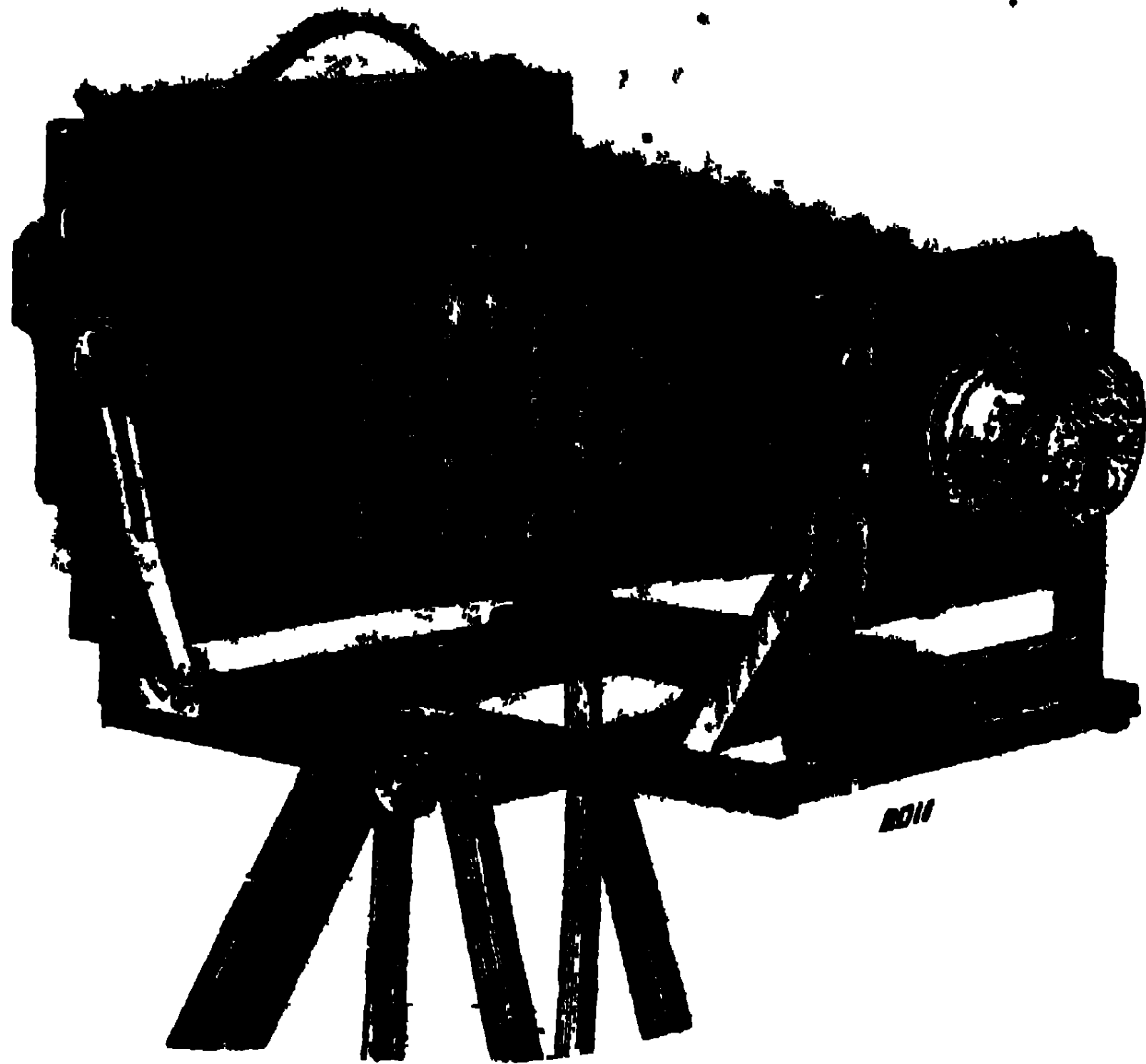
ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা।

বেলো মোটা হইতে সরু হইয়া গিয়াছে।

করিতে গিয়া অনেক সময়ে খারাপ করিয়া ফেলেন। ভাল ক্যামেরা মুড়িলে খুব ছোট হইয়া যায়, ক্যামেরা খুব দৃঢ় (rigid) অথচ হাল্কা হওয়া চাই। ক্যামেরার সম্মুখে যেখানে লেন্স লাগাইতে হয়, সেখানে বেলো উঁচু ও নীচু করিবার (rising front) ও দুই পাশে (cross front) সরাইবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। ক্যামেরার পশ্চাদ্ভাগ হেলাইবার (swing back) বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার। প্রথম— নীচের দিকটা ক্যামেরা-সংলগ্ন থাকিলে উপর দিকটা হেলান যায়। এবং দ্বিতীয়— উপর দিকটা ক্যামরা সংলগ্ন থাকিলে নীচের দিকটাও হেলান যায়। ষ্ট্যাণ্ড-ক্যামেরার পশ্চাতে গ্রাউণ্ড গ্লাস থাকে, ইহার উপর লেন্সের দ্বারা ছবি প্রতিফলিত হয়। গ্রাউণ্ড গ্লাসকে যাহাতে লম্বা ও পাশভাবে বসান যায় তাহার বন্দোবস্ত আছে, তাহাতেই [illegible] ও পাশ ভাবে ছবি উঠে। যাহাতে লং-ফোকাস্ লেন্স (long- [illegible] lens)

ব্যবহার করা যায় তজ্জন্য, ক্যামেরার বেলো দ্বিগুণ লম্বা (double extension) করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হয়। ত্রিগুণ লম্বা (triple extension) করা গেলে আরও ভাল হয়, কেননা প্রয়োজন হইলে ইহাতে টেলিফটো লেন্স (telephoto
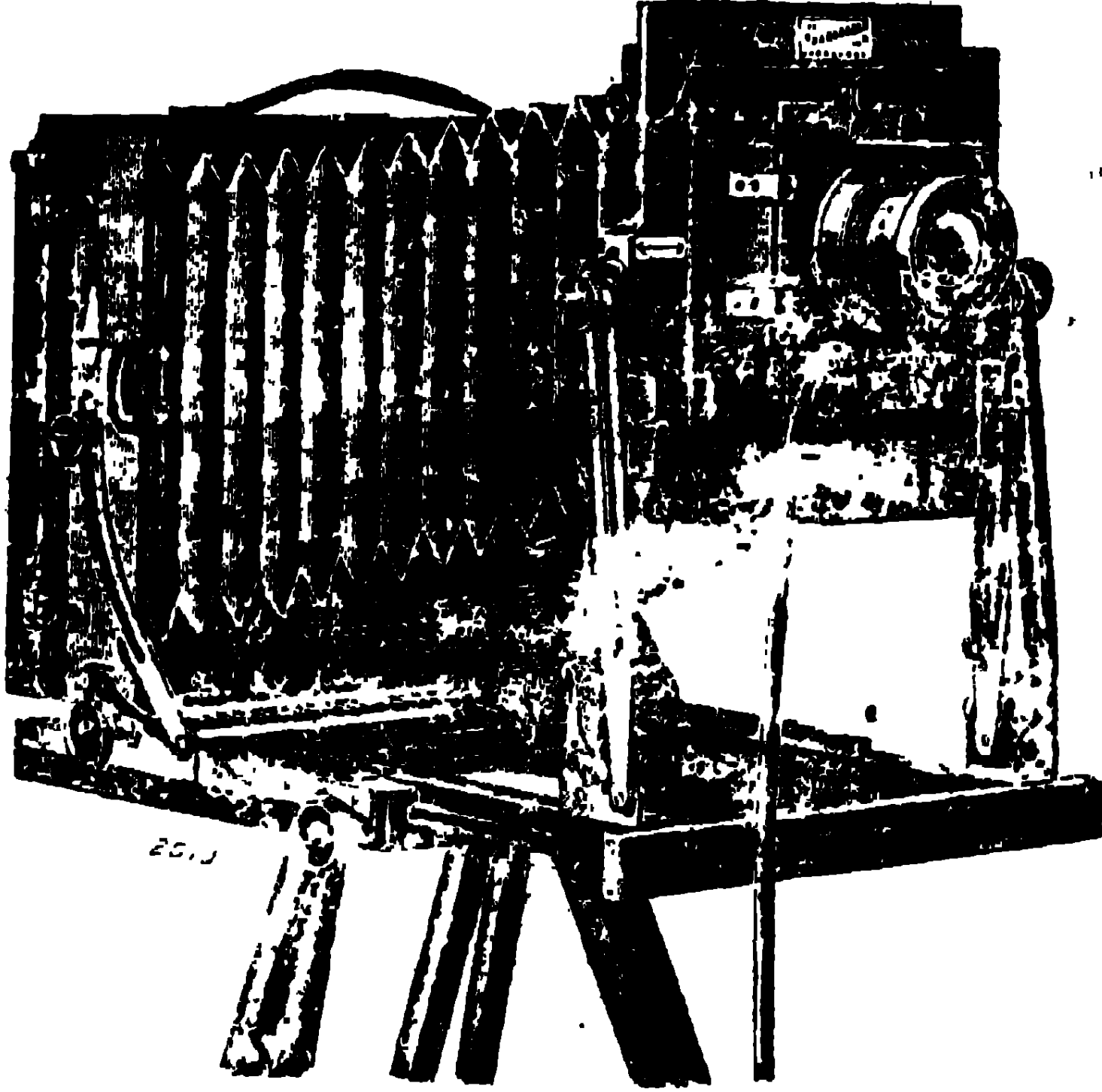
ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরা সম্মুখ উঁচু (rising front) করা হইয়াছে।

lens)ও ব্যবহার করা যাইতে পারে। বেলো দ্বারা ছবির কোন ভাগ ঢাকা পড়িয়া না যায় তাহা দেখিয়া লইতে হইবে।

ডার্কস্লাইড পুস্তকের মত বা অন্যান্য প্রকারের পাওয়া যায়। পুস্তকের মতন ডার্ক-স্লাইডে দুইখানি প্লেট দেওয়া যায়। দুই খানির মধ্যে একখানি মোটা কাল রঙের কার্ড থাকে। এক্স্‌পোজ করিবার জন্য দুইধারে দুইখানি কাঠের স্লাইড আছে, তাহা টানিয়া উঠাইলেই প্লেট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে অসাবধানতায় স্লাইড না উঠিয়া পড়ে, তজ্জন্য প্রত্যেক স্লাইডের উপরে একটী পিন থাকে ; তাহা দ্বারা আটকাইয়া দিলে আর খুলিবার ভয় থাকে না।

ক্যামেরার কোন্‌ যন্ত্র বা স্ক্রু দ্বারা কি করিতে হয়, তাহা বারবার নাড়িয়া চাড়িয়া ব্যবহার করিয়া বেশ মনে করিয়া রাখিলে, পরে কোন হাঙ্গামে পড়িতে হয় না। ফোকাস্‌ করিতে হইলে একখানি পুরু কাল কাপড় দ্বারা ক্যামেরার পশ্চাৎভাগ ঢাকিয়া লইয়া নিজের মাথাও ঢাকিয়া লইতে হয়। বাম হস্তে কাল কাপড়ের দুই পাশ চিবু-কের নীচে একত্র করিয়া নিম্নে হইতে আলো আসিবার পথ বন্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তে স্ক্রু ঘুরাইয়া বেলো বড় ও ছোট করিয়া যখন দেখা যায় যে, গ্রাউণ্ড গ্লাসে ছবিটি বেশ

স্পষ্ট হইয়াছে তখন ফোকাস্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গ্রাউণ্ড গ্লাসে ছবিটি উল্টা হইয়া পড়ে। গ্রাউণ্ড গ্লাস হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি পশ্চাৎ হইতে দেখিলেই ফোকাস্ ঠিক হইয়াছে কিনা ভাল বুঝিতে পারা যাইবে।
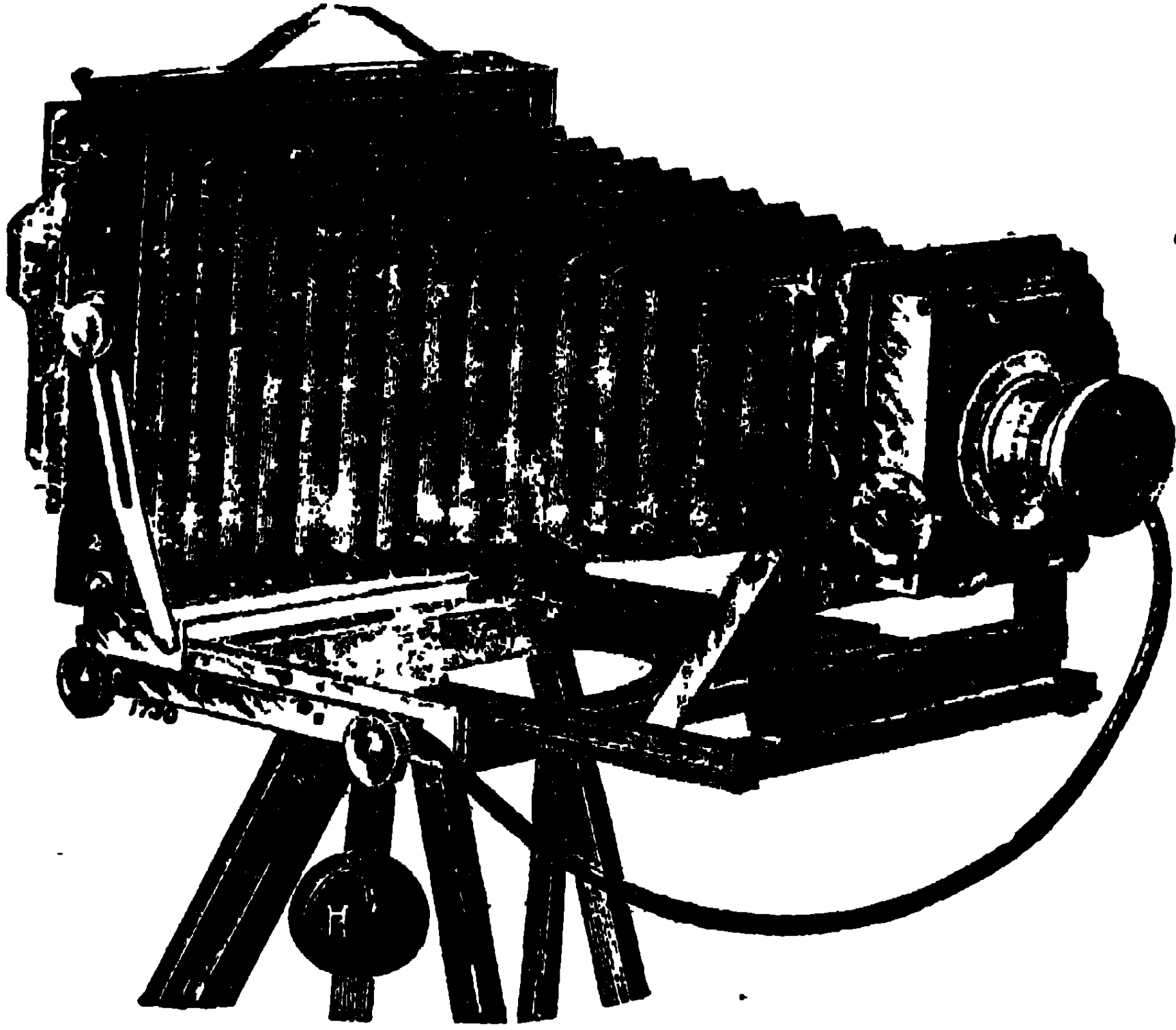
বেলো দ্বিগুণ লম্বা করা (double extension) ষ্ট্যাণ্ড
ক্যামেরা রোলার ব্লাইণ্ড শাটার সমেত।

ফোকস করিবার কাপড় দ্বারা যাহাতে সমস্ত ক্যামরাটি মুড়িয়া ফেলা যায়, এত বড় হওয়া চাই। তাহার মধ্য দিয়া যেন আলো প্রবেশ না করে। ভেলভেট্ দ্বারা প্রস্তুত জিনিষই বাজারে বিক্রয় হয়, কিন্তু দুই তিন প্রস্থ পুরু কাল টুইল্ হইলে বেশ সস্তায় হইতে পারে।

লেন্সের মুখে ক্যাপের পরিবর্ত্তে শাটার থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। কারণ হস্ত-দ্বারা $\frac{১}{২৫}$ সেকেণ্ড কিম্বা ইহা অপেক্ষা কম এক্‌সপোজার দেওয়া অসম্ভব। আজ কালকার নূতন প্রকার যন্ত্রে ৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌সপোজার দেওয়া যায় কিন্তু পূর্ব্বে আন্দাজ করিয়া টাইম্ এক্‌সপোজার দেওয়া হইত। অবশ্য দশ সেকেণ্ড কিম্বা তদূর্দ্ধ কাল ঘড়ি দেখিয়াই দেওয়া হয়।

শাটার।

শাটার অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে যে গুলির বেশী ব্যবহার হয় ও নির্দ্দোষ (accurate) সেই গুলির সম্বন্ধে লিখিব।

থরবর্টন্ পিকার্ড কর্তৃক নির্ম্মিত ভোলায়ুরাইড শাটার বেশ ভাল। ইহাতে রবারের বল ও টিউব দ্বারা কাজ করিতে হয়। ইহাতে ১ হইতে $\frac{1}{90}$ সেকেণ্ড পর্যান্ত এবং নূতন উদ্ভাবিত টাইম্ ভ্যালভ্ দ্বারা ৩ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত একস্পোজার দেওয়া যায়। ইহা লেন্সের পশ্চাতে কিম্বা সম্মুখে লাগাইয়া দিতে হয়।
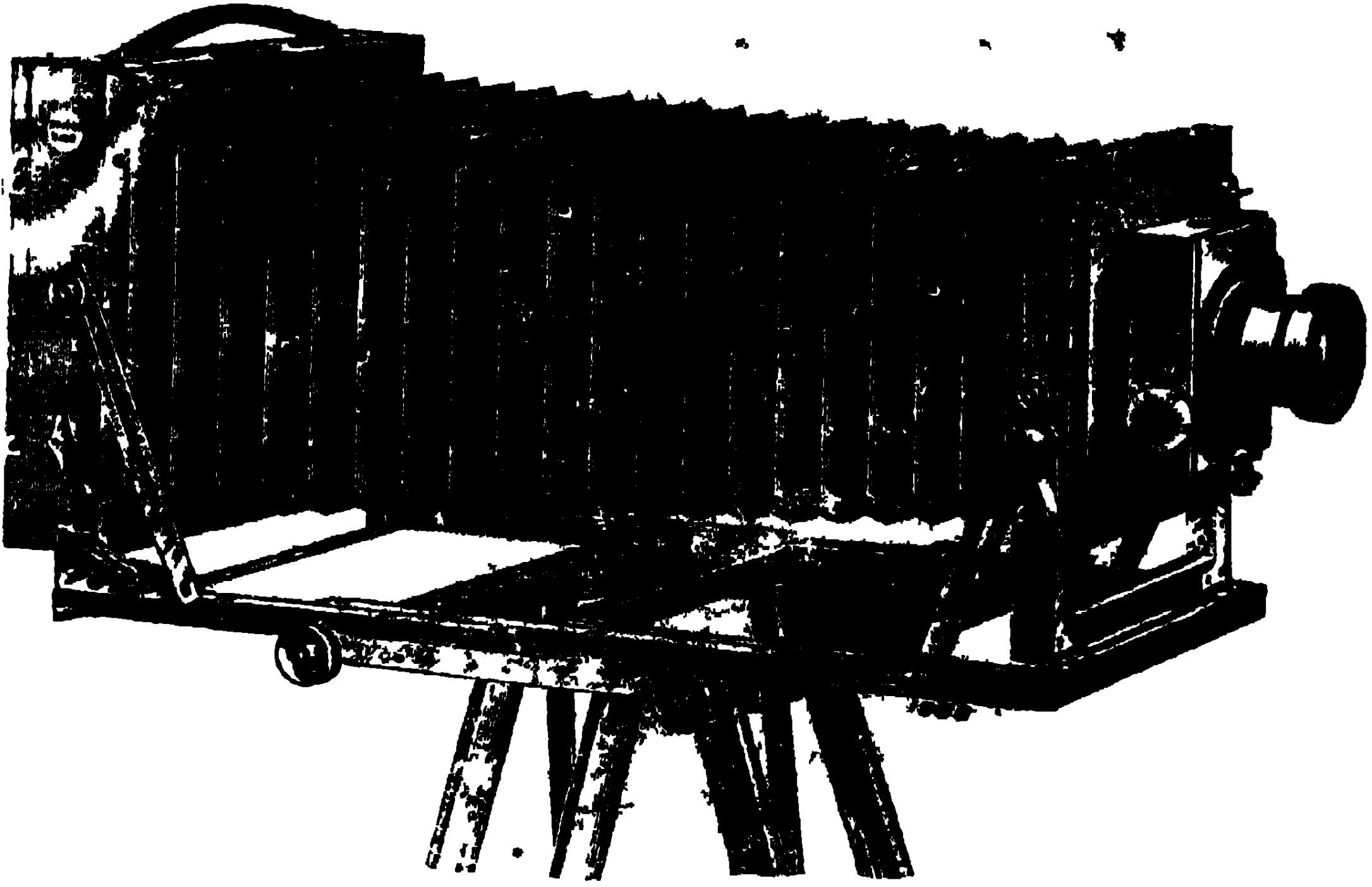
ত্রিগুণ লম্বা করা (triple extension) সমান্তরাল (parallel) বেলো ক্যামেরা।

ইউনিকম্ শাটার— এই শাটার বেশ ছোট এবং অল্প স্থানে সন্নিবেশ করা যায়। সম্মুখের ও পশ্চাতের লেন্সের মধ্যে (between lens) ইহা কার্য্য করে। ইহা কেবল ধাতু-দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত এবং ইহাতে ১ হইতে $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত একসপোজার দেওয়া যায়। বল টিউব বা হস্ত দ্বারা একটি ঘোড়া (trigger) টিপিলেই এক্সপোজার দেওয়া হয়।

অটোম্যাট্ শাটার—ইউনিকম শাটারের মতই, কিন্তু প্রত্যেকবার এক্সপোজ করিবার পূর্ব্বে ইহার স্প্রিং ঠিক করিয়া দিতে হয় না। বল টিউব বা ঘোড়া টিপিলেই এক্সপোজার হয়। ভলিউট, কৈলস, প্রভৃতি শাটার প্রায় এই রকম।

ফোকাল প্লেন শাটার—এই শাটার লেন্সের নিকট না হইয়া ড্রাই প্লেটের ঠিক সম্মুখে লাগান থাকে। ইহা কাপড়ের দ্বারা প্রস্তুত এবং প্লেট খানির মত চওড়া হয়। প্রথমে এক প্রস্থ কাপড় থাকে, তাহা গুটাইয়া ফেলিলে মধ্যের ফাঁকটি দেখা যায়। তাহার পর আর এক প্রস্থ কাপড় থাকে। মধ্যের ফাঁকটি ছোট বড় করিলেই এক্সপোজারের অনেক তারতম্য হয়। কারণ ফাঁকটি যত বড় হইবে তত বেশী আলো

প্লেটে লাগিবে এবং যত ছোট হইবে তত কম আলো লাগিবে। শাটার লেন্সের নিকটে থাকিলে ড্রাইপ্লেটে যত আলোক লাগে, শাটার লেন্সের নিকটে না হইয়া ড্রাই প্লেটের নিকটস্থ হইলে ড্রাইপ্লেটে তদপেক্ষা অধিকতর আলোক লাগে এবং তজ্জন্য আরও কম এক্‌স্‌পোজারের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য ফোকাল প্লেন শাটারে ৫ হইতে $\frac{১}{১০০০}$ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্‌স্‌পোজার দেওয়া যায়।
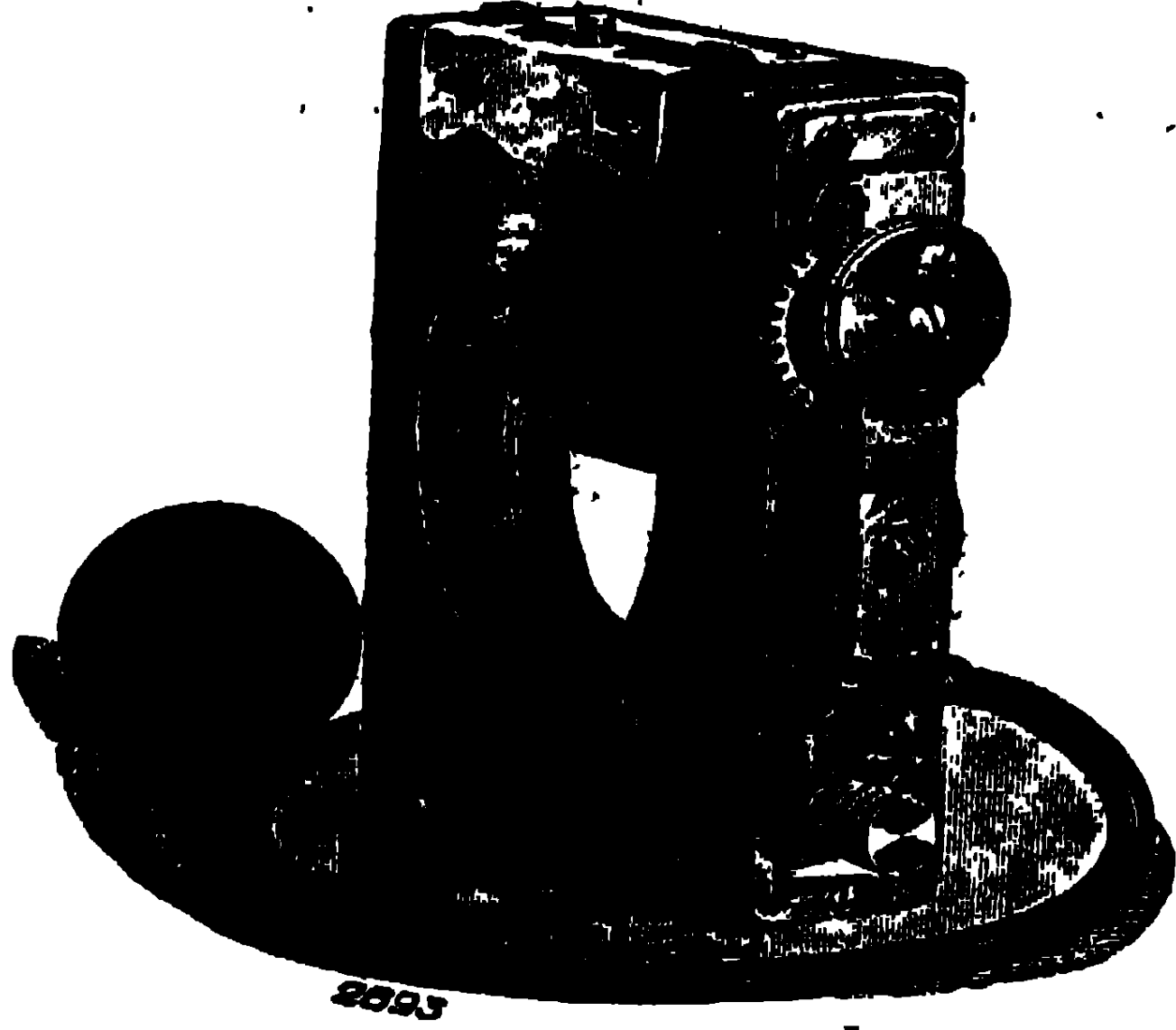
রোলার ব্লাইণ্ড শাটার।

লেন্স।

লেন্স সম্বন্ধে মোটামুটি কথা লিখিব। যে সকল ক্যামেরাতে একখানি লেন্স থাকে তাহার অধিকাংশই ভাল নয়, কারণ গ্রাউণ্ড গ্ল্যাসে দেখা যায় যে, প্রতিফলিত ছবির মধ্যস্থল ফোকাস্ হয়, কিন্তু চারিপাশ অস্পষ্ট থাকে। ডায়াফ্রাম ছোট করিয়া প্রতিফলিত ছবি ভাল করিয়া লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ডায়াফ্রাম ছোট করিলে বেশীক্ষণ ধরিয়া এক্‌স্‌পোজার দিতে হয়। কতকগুলি ক্যামেরাতে দুই তিনটি লেন্স একত্র করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করা থাকে এবং সংযুক্ত লেন্স সমষ্টি দেখিতে ঠিক একখানি লেন্সের মত হইয়া যায়। এগুলিরও অনেক সময়ে উপরোক্ত অস্পষ্টতা দোষ থাকে। পূর্ব্বোক্ত মাত্র একখানি লেন্স (single lens) দ্বারা দৃশ্য বেশ সুন্দর উঠে এবং বেশ পরিষ্কার হয়। আজকালকার একখানি লেন্সে এই দোষ অনেকটা সংশোধিত হইয়াছে।

রেক্‌টিলিনিয়ার লেন্স (Rectilinear lens)—এই লেন্সে এসকল দোষ নাই। ইহাতে দুইটি লেন্স তফাৎ বসান' থাকে। এই প্রকার লেন্স দ্বারা বাড়ী, দৃশ্য প্রভৃতি সকল প্রকার ছবিই তুলিতে পারা যায়।

পোর্ট্রেট লেন্স—ইহা দ্বারা কেবল প্রতিমূর্ত্তিই তোলা হয় এবং যে সকল পদার্থ এক সমতলে (plane) থাকে তাহাদেরই ফোকাস্ হয় এবং অন্যান্য জিনিষ ক্রমশঃ ঝাপ্সা হইয়া যায়, তজ্জন্য ছবি বেশ সুন্দর দেখায়।

টেলিফটোগ্রাফিক লেন্স—ইহা দ্বারা অতিশয় দূরের পদার্থ নিকটস্থ হয় এবং বেশ বড় দেখায়। ইহা দ্বারা অতি দূরস্থিত পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রভৃতির ছবিও বেশ কাছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যবহার করিতে গেলে বেলো খুব বাড়াইয়া দিতে হয় এবং ছবি যত বড় হইবে, ততই এক্স্পোজার অধিক দিতে হয়। মেঘ শূন্য দিবসে ইহা ব্যবহার করা
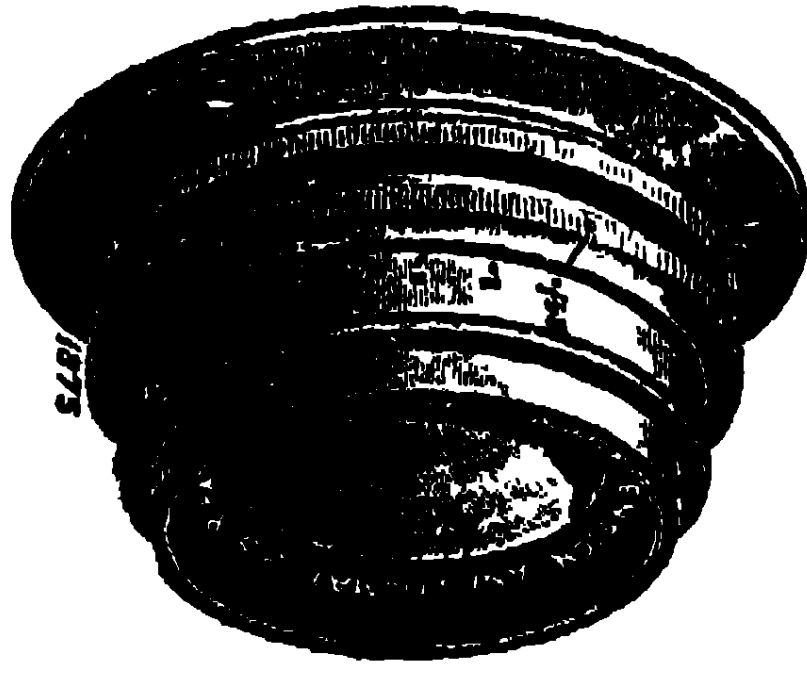
লেন্স।

উচিত। যদি আকাশ মণ্ডল মেঘাবৃত হইয়া আলোক অতি অল্প পরিমাণেও মন্দীভূত হয়, তাহা হইলে আইসোক্রোমেটীক স্ক্রিন (isochromatic screen—ইহা হরিদ্রা বর্ণের একখানি কাচ) সম্মুখে দিয়া ছবি তুলিতে হয়। অবশ্য তাহার জন্য বেশী এক্স্পোজার দিতে হয়।

ওয়াইড্ য়্যাঙ্গল্ লেন্স—ইহার দ্বারা ছবির আয়তনের অধিকাংশই প্লেটের মধ্যে আসে। বাড়ীর ছবি লইতে হইলে বেশী পশ্চাতে গিয়া ছবি লইবার যদি যায়গা না থাকে, তথায় এই লেন্স ব্যবহার করিলে খুব নিকট হইতেই সমস্ত বাড়ীর ছবিখানি গ্রাউণ্ড গ্লাসের মধ্যে আসে।

সিঙ্গল্ লেন্স অপেক্ষা রেক্টিলিনিয়র লেন্স ক্রয় করাই উচিত। গ্রাউণ্ড গ্ল্যাসের চতুস্পার্শ্বের ছবি পরিষ্কার রূপে প্রতিফলিত হইতেছে কিনা তাহা দেখিয়া লইতে হয়। লেন্স বেশ যত্নের সহিত রাখিয়া দেওয়া উচিত। শ্যাময় চামড়ার ব্যাগে শুষ্ক স্থানে রাখিলে ভাল হয়। মধ্যে মধ্যে ও ক্যামেরা ব্যবহার করিবার সময় শ্যাময় চামড়া বা রেশমের রুমাল দ্বারা লেন্স খুলিয়া মুছিয়া ফেলা উচিত, বিশেষতঃ বর্ষাকালে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার করিয়া লেন্স মুছা উচিত। বর্ষাকালে লেন্সে এক প্রকার সাদা দাগ হয়, তাহা মুছিয়া না ফেলিলে লেন্সে যে দাগ পড়ে তাহা কিছুতেই বিদূরিত হয় না। মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া মধ্যে মধ্যে মুছিলে ভাল হয়।

ক্যামেরা ও তৎসংলগ্ন যন্ত্রাদির সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা লিখিলাম। এক্ষণে কি প্রকারে কার্য্য করিতে হয় তাহা লিখিব। কেবল ক্যামেরার ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিলে প্রবন্ধ নীরস বলিয়া বোধ হইবে। অতএব কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিবরণ লিখিবার মধ্যে মধ্যে ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিব। এপর্য্যন্ত যাহা লেখা গিয়াছে তাহার পরেই ছবি তোলা সম্বন্ধীয় বিবরণ লিখিলে বোধ হয় প্রবন্ধ দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িবে না।

ইংরাজি নামের বাংলা ব্যাখ্যা।

সাইজ—নানা প্রকার মাপের ছবি তুলিবার জন্য ক্যামেরা পাওয়া যায়। যথা ৪ ১/৪ × ৩ ১/৪ ইঃ, ৬ ১/২ × ৪ ১/২ ইঃ, ৮ ১/২ × ৬ ১/২ ইঃ; কিন্তু সুবিধার জন্য উক্ত সাইজের ক্যামেরাগুলিকে যথাক্রমে কোয়াটার প্লেট, হাফপ্লেট ও ফুল প্লেট ক্যামেরা বলা হয়। ইহা অপেক্ষা বড় সাইজগুলির নাম মাপ হিসাবে হয়— যথা, ১০ইঃ × ৮ইঃ, ১০ইঃ × ১২ ইঃ, প্রভৃতি।
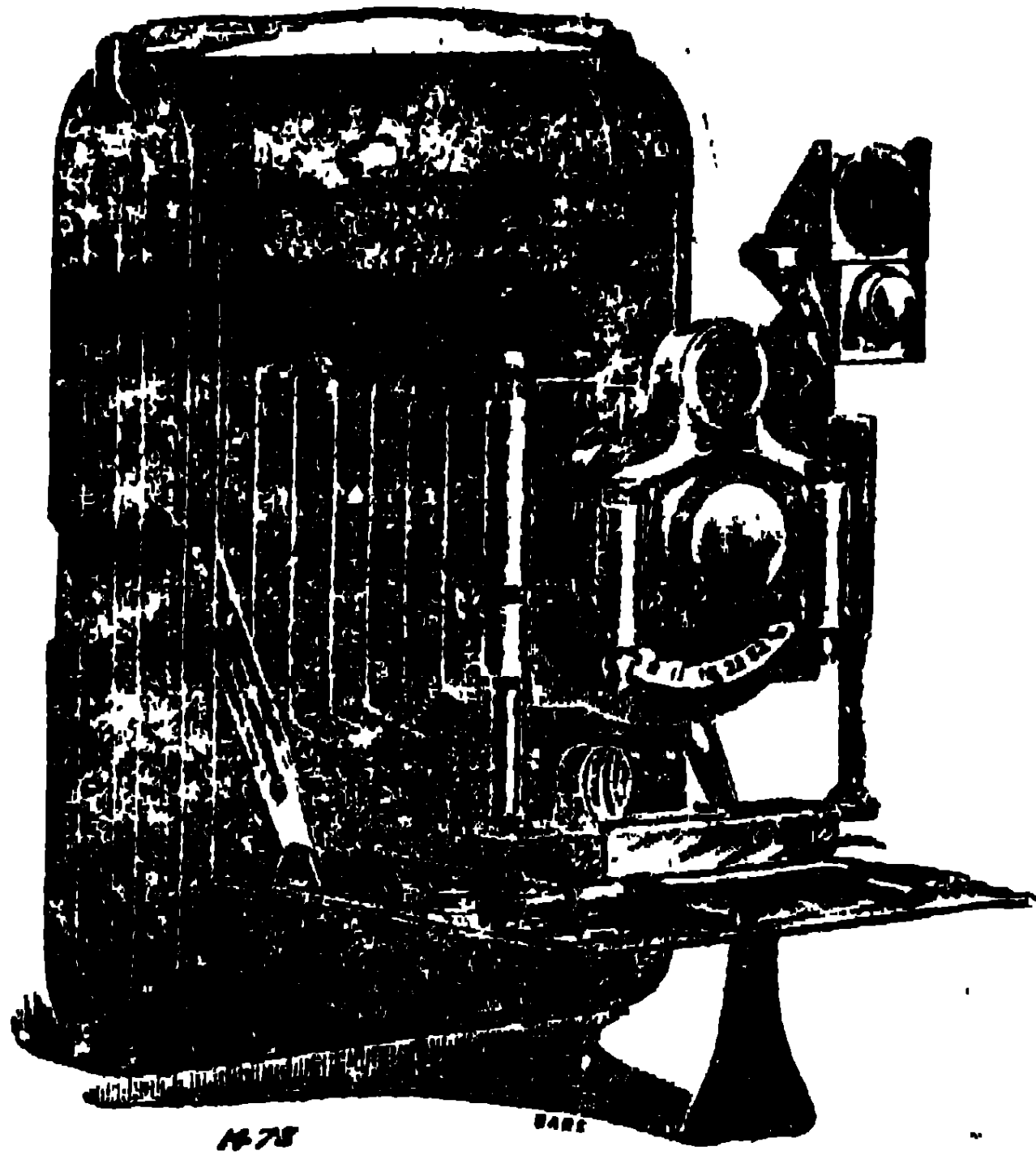
হ্যাণ্ড ক্যামেরা।

ইহাকে ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার মত ব্যবহার করা যায় এবং ইহাতে ফিল্ম্ ও প্লেট দুইই ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফোকাস্—স্ক্রু ঘুরাইয়া বেলো প্রসারিত কিম্বা সঙ্কুচিত করিয়া অর্থাৎ ক্যামেরা সংযুক্ত লেন্স, গ্রাউণ্ড গ্লাস হইতে দূরে কিম্বা নিকটে আনিয়া গ্রাউণ্ড গ্লাসে যখন ছবিখানি স্পষ্ট দেখা যাইবে তখন ছবির ফোকাস্ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শাটার—ইহা একটি যন্ত্র; ইহা টিপিলেই এক্স্পোজার দেওয়া হয়। ইহার মধ্যে ইন্স্ট্যান্টেনিয়াস্ বা টাইম এক্স্পোজার দিবার বন্দোবস্ত আছে।

গ্রাউণ্ড গ্লাস—ক্যামেরার পশ্চাৎদিকে ঘসা কাচ আছে; ইহার উপরে ছবি প্রতিফলিত হয়।

ভিউফাইণ্ডার—ইহা ছোট ক্যামেরার মত কাজ করে ; সমস্ত হ্যাণ্ড ক্যামেরাতেই ইহা লাগান থাকে। ইহার দ্বারা কতখানি ছবি প্লেটে উঠিবে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ক্যামেরায় গ্রাউণ্ডগ্লাস নাই, বা যাহাতে আন্দাজি ফোকাস্ করিয়া ছবি তুলিতে হয়, তাহাতে ইহা লাগান থাকে। সেজন্য তাড়াতাড়ি কাজের অত্যন্ত সুবিধা হয়। ইহা দুই প্রকার, এক প্রকার উপর হইতে দেখিলে ছবি দেখা যায়, অন্যপ্রকার সোজা দেখিতে হয়।

ষ্ট্যাণ্ড—ক্যামেরা বসাইবার কাষ্ঠ বা ধাতু নির্ম্মিত উচ্চ ত্রিপদ। ইহা যত হালকা ও দৃঢ় হইবে ততই ভাল।
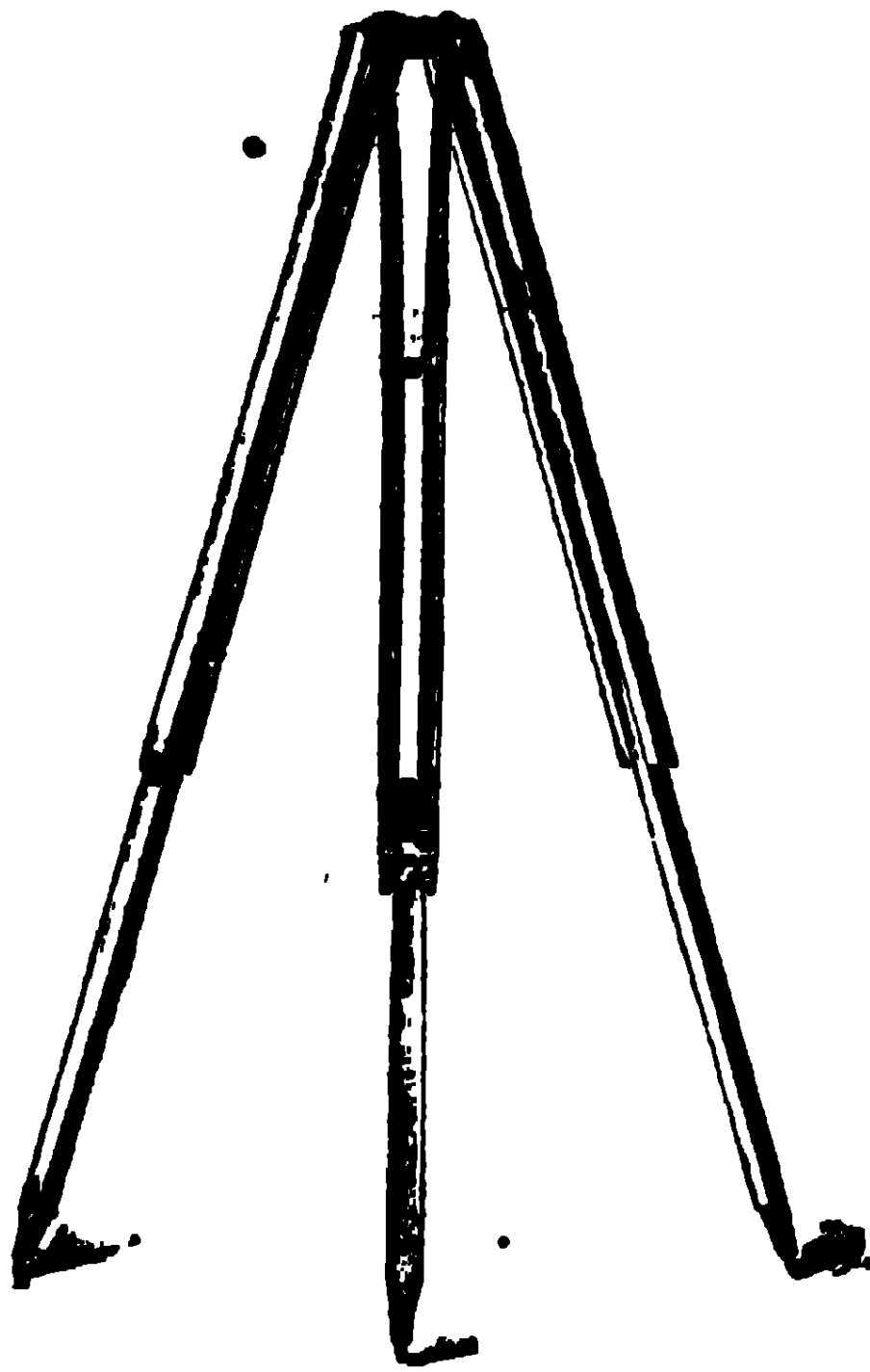
ষ্ট্যাণ্ড।

এক্স্পোজার—শাটার টিপিলে লেন্সের মুখ খুলিয়া যায়, এবং ছবি প্রতিফলিত হইয়া প্লেটে পড়ে ও প্লেটের উপরে আলোক-রশ্মির ক্রিয়া হইয়া যায়। শাটার কিম্বা ক্যাপ খুলিয়া বন্ধ করাকে ও ড্রাই প্লেটের উপর আলোক-রশ্মির ক্রিয়া সম্পাদন করাকে এক্স্পোজ করা বলে।

ড্রাইপ্লেট—জিলাটীন নামক এক প্রকার পদার্থ গরম জলে গলাইয়া সমানভাবে কাচের এক পৃষ্ঠে লাগাইয়া দিয়া, তাহার উপর সিলভার আইওডাইড, সিলভার ব্রোমাইড প্রভৃতি রৌপ্যের যৌগিক-পদার্থ প্রলিপ্ত করা থাকে, এবং তাহাতে আলো লাগিলে রাসায়নিক ক্রিয়া হয়। তাহা চোখে দেখা যায় না কিন্তু ডেভেলপ (develop) করিলে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ড্রাইপ্লেট দেখিতে হরিদ্রা বর্ণের।

ফিল্ম্—কাচের পরিবর্ত্তে সেলুলয়েড নামক পদার্থের উপর জিলাটীন লাগাইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়া করা থাকে। ইহাতে ড্রাইপ্লেটের মতই কাজ হয় এবং ইহাতে ছবি

উঠিয়া থাকে। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা পড়িয়া গেলে ভাঙ্গিয়া ছবি নষ্ট হয় না এবং ইহা খুব হাল্কা।

ইন্‌স্‌ট্যান্টেনিয়াস একস্‌পোজার—অতি অল্প সময় একস্‌পোজার দেওয়াকে ইন্‌স্‌ট্যান্টেনিয়স্ একস্‌পোজার বলে। যথা $\frac{১}{২}, \frac{১}{৪}, \frac{১}{১০}, \frac{১}{২৫}, \frac{১}{৫০}, \frac{১}{১০০}$ সেকেণ্ড ইত্যাদি।

টাইম একস্‌পোজার— ১ মিনিট, ৫ মিনিট বা তদূর্দ্ধ সময়ের একস্‌পোজারকে টাইম্ একস্‌পোজার কহে।

স্লাইড—ম্যাগাজিন হ্যাণ্ড ক্যামেরাতে টিনের খাপ থাকে, তাহার মধ্যে ড্রাইপ্লেট পুরিয়া দিতে হয়।

ডার্কস্লাইড—কাষ্ঠের কিম্বা অন্য ধাতব পুস্তকাকৃতি বাক্সের মত। ইহার মধ্যে ড্রাই-প্লেট রাখিতে হয়। ইহা বন্ধ করিয়া দিলে, ইহার মধ্যে কিছুতেই আলো প্রবেশ করিতে পারে না। একস্‌পোজার দিবার আগে ক্যামেরাতে লাগাইয়া ইহার একধার টানিয়া বাহির করিবার পর একস্‌পোজ করিলে ড্রাইপ্লেটে আলোক রশ্মি লাগে। তাহার পর বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তখন প্লেট সমেত বাহির করিয়া লওয়া যায়। এই প্রকার ডার্ক স্লাইড সর্ব্বপ্রকার ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরাতে প্রয়োজন হয়; এবং কোন কোন প্রকার হ্যাণ্ড ক্যামেরাতেও ব্যবহৃত হয়।

ক্যাপ—চামড়া দ্বারা মোড়া পেষ্টবোর্ডের তৈয়ারী গোলাকার ঢাক্‌নি ইহা দ্বারা লেন্সের মুখ বন্ধ করা যায়।

বেলো—চামড়া দ্বারা প্রস্তুত জিনিসই ভাল হয়। গ্রাউণ্ডগ্ল্যাস ও লেন্সের মধ্যের যায়গা ইহা দ্বারা বন্ধ করা থাকে। ইহা এমন ভাবে তৈয়ারী যে ইহা মুড়িয়া ফেলা খুব সহজ।

বল ও টিউব—ইহা রবারের প্রস্তুত, ইহাতে একটি রবারের বল আছে ও তাহাতে রবারের নল লাগান আছে। নলটি শাটারে লাগাইয়া বল টিপিলে বাতাসের চাপে একস্‌পোজার হয়।

টাইম্ ভ্যাল্‌ভ্— এই যন্ত্র বল ও টিউবের মধ্যস্থ নলটি কাটিয়া লাগাইয়া দিতে হয়, ইহাতে $\frac{১}{২}, \frac{১}{৪}, \frac{১}{৮}$, ১, ২ ও ৩ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত একস্‌পোজার দেওয়া যায়।

ডায়াফ্রাম্—ইহাকে এপারচারও বলে। লেন্সের মুখ যত চওড়া তাহার মাপকে ডায়াফ্রাম বলে। এক এক প্রকার লেন্সের এক এক রকম ডায়াফ্রাম্ আছে। যথা f ৮, f ১৬ প্রভৃতি। ইহাকে এই প্রকারে না বলিয়া ইউনিফরম্ সিষ্টেমেও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

যথা	f ৬	f ৮	f ১১	f ১৬	f ২২
ইউনিফরম্ সিষ্টেম্	২	৪	৮	১৬	৩২।

ডায়াফ্রাম্ যত ছোট হয় ছবি তত পরিষ্কার হয়। ডায়াফ্রাম দুই প্রকার। ওয়াটার হাউস ইহা পিতলের চাকতি, ইহার মধ্যে নানা মাপের গোল ছিদ্র করা

থাকে, ইহা লেন্সের পশ্চাতে পরাইয়া দেওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার—আইরিস। ইহা মাপ মত ছোট বড় করিবার জন্য একটি কাঁটা আছে তাহা সরাইলেই ছিদ্র ছোট বড় করা যায়। ছিদ্র যত ছোট হয় তত বেশী এক্‌স্‌পোজারের প্রয়োজন হয়। যেমন f ৮এ যত এক্‌স্‌পোজার দিতে হয় f ১১ তে তাহার দ্বিগুণ এক্‌স্‌পোজার দিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

মানবের ভবিষ্যৎ কাল।

পৃথিবীতে মানবের জীবনী-শক্তি ধ্বংশ না হইবার বহুবিধ কারণ ও উপাদান রহিয়াছে। কিন্তু যে উপাদানগুলি ব্যতীত প্রাণ রক্ষা একবারেই অসম্ভব, এরূপ অতীব প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই, হয় বায়ুমণ্ডলে নিহিত, অথবা বায়ুমণ্ডলের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত। এই সমস্ত উপাদান বা কারণগুলির পরিমাণ সর্ব্ব সময়ে একই ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারেনা। কিন্তু বিভিন্নতার পরিমাণ অতি অল্প। যে সমস্ত উপাদানে বায়ু-মণ্ডল গঠিত, তাহার কোন কোনটি অথবা প্রত্যেকটিই অনায়াসে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইতে পারে। এসম্বন্ধে কারবন্-ডাইঅক্‌সাইড (carbon dioxide) বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই বায়বীয় পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প বটে, কিন্তু বায়ু-মণ্ডল হইতে এই পদার্থ কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করা যাইতে পারে না। বায়ু-মণ্ডল-স্থিত এই বায়বীয় পাদার্থের অতি সামান্য অংশই উদ্ভিদ ও জীব-রাজ্যে প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত চেতন পদার্থই ধ্বংশ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানে বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কারবন-ডাই-অক্‌সাইড আছে, তাহার শতকরা একভাগের ৪০০ অংশের এক অংশ হ্রাস পাইলে জীবের অস্তিত্বই অসম্ভব। আবার শতকরা অতি সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মানবের ন্যায় উন্নত জীব হয় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংশ হইবে, অথবা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবিত থাকিবে। বায়ুমণ্ডলে কারবণ-ডাইঅক্‌সাইড বৃদ্ধি পাইবার সহস্র সহস্র কারণ থাকিলেও, তাহা নষ্ট করিবার কারণও যথেষ্ট বর্ত্তমান। কাজেই জগতের উপযোগী এই বায়বীয় পদার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা হইয়া আসিতেছে। আজ ৩,০০,০০,০০০ অথবা ৪,০০,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়াশীল জীব সৃষ্ট হইয়াছে। এই এত কাল যাবৎ কারবন্-ডাইঅক্‌সাইডের উৎপত্তি এবং নাশের নানাবিধ কারণ

এরূপ ভাবে পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে যে, এই পদার্থের, জীবের ধ্বংসের উপযোগী বৃদ্ধি বা হ্রাস কখনই সম্ভাবিত হয় নাই।

বায়ু-মণ্ডলের অন্যান্য পদার্থের হ্রাস বৃদ্ধির শতকরা হিসাব করিয়া জীবের বিপদ নির্ণীত করিতে হইলে দেখা যায় যে, তাহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধির পরিমাণ এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্যই নহে।

মানব-জীবনের কুশলতা বায়ু-মণ্ডলের বাষ্প-কণার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। যদি বাষ্প-কণা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে জীবনের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। বায়ু-মণ্ডলে উপযুক্ত পরিমাণ বাষ্প-কণা সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জল-রাশির প্রয়োজন। কাজেই পৃথিবীস্থ জল-রাশির বৃদ্ধি জীবন-ধারণের অতীব বিঘ্ন-স্বরূপ। পৃথিবী জলে প্লাবিত হওয়া যেরূপ বিপজ্জনক, জলের সম্পূর্ণ অভাবে পৃথিবী মরুভূমীতে পরিণত হওয়াও সম্যক বিপজ্জনক। আবার জল-রাশির গভীরতা যদি কয়েক সহস্র ফিট বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহা হইলেও জীবন সমভাবে বিপন্ন হইয়া উঠিবে, কিম্বা আমাদের পরিচিত জীবন প্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

মানব সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত একটা প্রায়-সুনির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রা অক্ষুন্ন আছে বলিয়াই, পৃথিবী মানব আবাসের উপযোগী হইয়া আছে। এই তাপ-মাত্রার পরিমাণ উর্দ্ধ সংখ্যা প্রায় ১০০-ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আকাশে কয়েক মাইল উর্দ্ধে, অথবা পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে কয়েক মাইল নিম্নে যে তাপ মাত্রা বর্ত্তমান, তাহা আমাদের জীবনের আদৌ উপযোগী নহে। উৎপত্তির আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত যে উত্তাপে প্রাণি-সমূহ জীবিত থাকিতে পারে, সেই পরিমাণ উত্তাপ এরূপ ভাবে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়া জীব অনায়াসে পুরুষানুক্রমে জীবিত থকিতে সক্ষম হইয়াছে। জীব-সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত জীব কোন কালে একবারে বিধ্বংশ হয় নাই। উর্দ্ধদেশে তাপমাত্রা অতি সামান্য, অভ্যন্তরে অত্যন্ত অধিক, তথাপি জীবনের উপযোগী উত্তাপের পরিমাণ পৃথিবীর উপরিভাগে অক্ষুন্নই রহিয়াছে। পৃথিবীর উত্তাপের এই অক্ষুন্নতার কারণ সূর্য্য। বায়ু-মণ্ডলই এই উত্তাপ পরিমাণকে মানব-জীবনের উপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। যদি বায়ু-মণ্ডল না থাকিত, তাহা হইলে সূর্য্যের দারুণ উত্তাপে পৃথিবী পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। বায়ু-মণ্ডল সূর্য্য-রশ্মির প্রয়োজন মত অংশ শোষণ করিয়া লইলে, অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীতে পতিত হইয়া মানব-জীবন রক্ষার উপযোগী হইতেছে।

এইরূপে দেখা যায় যে, জীবন-রক্ষা করিবার শত শত কারণ রহিয়াছে। প্রত্যেক কারণের হ্রাস বা বৃদ্ধি জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। এই সমস্ত কারণের হ্রাস বা বৃদ্ধির পথও বহু সংখ্যক এবং প্রশস্ত। কিন্তু হ্রাস বা বৃদ্ধির শত শত উপায় থাকিলেও সে

গুলির সামঞ্জস্য নির্ব্বিবাদে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে সমস্ত কারণে ইহাদের সামঞ্জস্য কোনরূপে নষ্ট হইতে পারিতেছে না, তাহাদের অর্থ সম্যক উপলব্ধ করিতে হইলে, সময়ের একটা সুস্পষ্ট পরিমাণ-নির্দ্দেশকের প্রয়োজন হয়; অর্থাৎ পৃথিবীর কোন্ স্তর-উৎপত্তি কালে প্রকৃত জীব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্তরের উৎপত্তি ও স্থিতি কালের পরিমাণ কত, ইত্যাদি বিশেষরূপে অবগত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা সেই সমস্ত বিষয়ের স্থির নিশ্চয় করিতে পারি না, একটা মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লই। তবে এই মোটা-মুটি আন্দাজ অনেক বিষয়ে প্রায় নির্ভুল হইয়া থাকে। আমরা যে কালে বা যে স্তরে জীবের অস্তিত্বের পরিচয় পাই, সেই কালের বহু পূর্ব্বে জীব-সৃষ্ট হইয়াছিল। কেননা সেই সমস্ত জীব দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা মৌলিক জীব যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। সেই কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১,০০,০০০ ফিট পলি পতিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ এই পলি-স্তরের গভীরতা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর মনে করেন; কিন্তু এই ১০০,০০০ ফিটই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতর গভীরতা। ভূভাগ ধীরে ধীরে ধৌত হইয়া আসিয়া এই পলি পতিত হইয়াছে। এই পলিস্তর অধঃস্থ হইবার কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ৫,০০,০০,০০০ বা ১০,০০,০০,০০০ বৎসর ধরিয়া এই স্তর নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা মোটামুটি ৭,৫০,০০,০০০ ধরিয়া লইতে পারি। ইহাকে ১৫ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগ যাহা হয়, তাহাকেই ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূস্তর-নির্ম্মাণের এক এক যুগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ১৫টি যুগ রহিয়াছে। অতএব এই এক এক যুগের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ বৎসর।

পৃথিবীর তাবৎ জল-রাশি ক্রমাগতই বাষ্পীভূত হইতেছে। বাষ্পের পরিমাণ সর্ব্বকালে সমান থাকে না, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়। জল-রাশি বাষ্পীভূত হয় বলিয়াই পৃথিবীর স্তর বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। যত অধিক জল অল্প সময়ে বাষ্পীভূত হইবে, ততই স্তরের গভীরতাও বৃদ্ধি পাইবে। যদি কোনও সুবৃহৎ ভূভাগে নানাবিধ খনিজ পদার্থের যৌগিক, খড়ী মাটি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রচীন কালের এই সকল স্থানে যে জলীয় অংশে ঐ সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত বা মিশ্রিত ছিল, সেই জল অতি ত্বরিত বাষ্পীভূত হইয়াছে। বায়ু-মণ্ডলের নির্ম্মলতার অনুপাতে জল বাষ্পীভূত হয়। বায়ু-মণ্ডল যত অধিক নির্ম্মল হইবে, জলও তত অধিক বাষ্পীভূত হইবে। কাজেই খড়ী মাটী ইত্যাদি খনিজ যৌগিকের প্রাচুর্য্য দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে এই স্থানের বায়ুমণ্ডল নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল। এই সমস্ত খনিজ যৌগিক, জল বাষ্পীভূত হইবার কালে অধঃস্থ হইলে, দানা বাঁধিয়া অধঃস্থ হয়। বিভিন্ন যৌগিকের দানার আকৃতিও বিভিন্ন। যদি উক্ত ভূভাগে খনিজ যৌগিক দানা বাঁধিয়া অধঃস্থ হইয়া রহিয়াছে দেখা যায়, এবং প্রচুর খনিজ লবণের প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে

পারে, এরূপ চেতন পদার্থ বর্ত্তমান থাকে অথবা জীবিত পদার্থ অত্যন্ত অল্প বা একবারেই অবর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ভূভাগের আকাশ অতীব নির্ম্মল।

পূর্ব্বোক্ত পৃথিবীর স্তর নির্ম্মাণের ১৫টী যুগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম যুগের নাম ক্যামব্রিয়ান্ যুগ। ভারতবর্ষের সল্টরেঞ্জ পর্ব্বত মালার অভ্যন্তর-দেশে উক্ত ক্যামব্রিয়ান্ যুগের স্তরে প্রচুর খড়ী-মাটি ও লবণ নিহিত রহিয়াছে। এই সমস্ত খনিজ পদার্থ পণ্ডিত-গণের নির্দ্ধারিত উক্ত প্রাচীনতম যুগের স্তরে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া, সেই প্রচীন কালে বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ এই স্তরের এই সমস্ত পদার্থের সন্নিবেশ হইতেই পণ্ডিতগণ ৭,৫০,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, তখন সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবী গাঢ় বাষ্পময় আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু এরূপ বাষ্পময় আবরণ থাকিলে ভারতে কখনই এত প্রকাণ্ড মরুভূমী সম্ভাবিত হইত না।

প্রাচীন কালের দুইটি যুগ অতীত হইলে তৃতীয় যুগের নাম সিলিউরিয়া যুগ। এই যুগে আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের সেণ্ট লরেন্স নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এবং তাহার পশ্চিমাংশের অভ্যন্তরের স্তরে বহু সহস্র ক্রোশ ব্যাপিয়া লবণ খড়ী, মাটী ইত্যাদি খনিজ যৌগিক নিহিত রহিয়াছে। এই স্তরের কোন কোন অংশে জীবিত পদার্থের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান নাই, কোন কোন অংশে অতি অল্প সংখ্যক, এবং কোন অংশে লবণ ও ঐ জাতীয় পদার্থের প্রভাব-সহন-শীল চেতন পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই স্থানের বায়ু-মণ্ডল তৎকালে বিশুষ্ক ছিল। সেই জন্যই প্রচুর জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হইত, ইহারই ফলে উক্ত খনিজ যৌগি-কের লবণ অধঃস্থ হইয়াছে। কেননা আকাশ-মণ্ডল নির্ম্মল ও পরিশুষ্ক না হইলে জল বাষ্পীভূত হয় না; জল বাষ্পীভূত না হইলে দ্রবীভূত খনিজ যৌগিক অধঃস্থ হইতে পারে না। ভারতের সল্টরেঞ্জ এবং আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের আভ্যন্তরিক স্তর হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে পৃথিবী গাঢ় বাষ্পের আবরণে আচ্ছাদিত ছিল, এই অভিমত ভ্রমাত্মক।

পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে তখনকার পৃথিবীর অবস্থা মরুভূমীর ন্যায়। তবে এই অভিমত পোষণের তত সুচারু প্রমাণ নাই। মনটানা, মিসিগান, নোভা স্কসিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অঙ্গার স্তরের অব্যবহিত নিম্নস্তরে খনিজ লবণ, চা খড়ী প্রভৃতি ধাতব যৌগিক-পদার্থের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তম ও অষ্টম যুগের নাম পারমিয়ান্ এবং ট্রিয়াসিক্ যুগ। এই যুগদ্বয়ে যে সমস্ত স্তর বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে কি পূর্ব্ব, কি পশ্চিম উভয় গোলার্দ্ধেই বহুদূর নিরক্ষান্তর-বৃত্ত পর্য্যন্ত

খনিজ লবণ প্রভৃতি পদার্থ সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার বায়ু-মণ্ডল শুষ্ক এবং মেঘ-শূন্য ছিল। জীব সংখ্যার অল্পতা এবং জীবনের ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার বায়ু-মণ্ডল অতিশয় বিশুষ্ক ছিল। এই সমস্ত প্রমাণের বলে ইহা অনুমান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই যে, তখনকার বায়ু-মণ্ডল বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিকতর জল-কণা শূন্য এবং বিশুষ্ক ছিল, কিম্বা এই বিশুষ্কতা বর্ত্তমান বিশুষ্কতা অপেক্ষা অধিকতর না হইলেও সমান বটে। তবে এই বিশুষ্কতা পৃথিবীর সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া ছিল না। কোন কোন বিশেষ স্থানের বায়ু-মণ্ডলই এইরূপ বিশুষ্ক ছিল।

পূর্ব্ববিবৃত অবস্থার বিপরীত অবস্থার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে। আদিম যুগের প্রারম্ভ হইতেই এরূপ ব্যাপার পরিদৃষ্ট হয় যে, তাহাতে তখনকার কালে পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডল বাষ্প-কণা পূর্ণ ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। পৃথিবীর জল বায়ুর অবস্থা এরূপ ছিল যে, আজ কালকার অনুরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। যদি এই সমস্ত ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থা নির্ণীত করিতে হয়, তাহা হইলে, প্রাচীন কালে পৃথিবী বাষ্প আবরণে আচ্ছাদিত ছিল এই অভিমত দৃঢ় হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত স্তরের মধ্যে মধ্যে এরূপ ব্যাপারও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডল অত্যন্ত বিশুষ্ক ছিল। এই দুই বিপরীত ব্যাপার সমন্বিত করিলে ইহাই বুঝিতে পারা যায়, যে জীব সৃষ্টি হইবার যুগ হইতে কোন কোন সময়ে বায়ু-মণ্ডলে প্রচুর জল-কণা থাকিত অথবা পৃথিবী বাষ্পাবরণে সমাচ্ছাদিত থাকিত। আবার কোন কোন সময় বায়ু-মণ্ডল নীরস এবং মরুভূমীর উপযোগীই ছিল।

বায়ু-মণ্ডলের প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া তাপ-মাত্রার ব্যাপার লক্ষ্য করিলেও পূর্ব্বোক্ত ঐ অভিমত পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। লুই আগাসাই নামক জনৈক পণ্ডিত ইউরোপ ও আমেরিকার নিম্নভূমী সমূহ নীহার আচ্ছাদিত হইবার কারণ নির্দ্দিষ্ট করিলে, পণ্ডিতগণ সেই অভিমত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পূর্ব্বে পণ্ডিত-গণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী ব্যাপিয়া কেবল উত্তাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাজেই সহস্র বা দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা বা ইউরোপে জীব আবাসের উপযোগী প্রদেশে নীহার প্রবেশ করিতে পায় নাই। তখন এরূপ অভিমতও প্রচলিত ছিল যে, পৃথিবীর বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। কয়লা, কার-বনেট এবং অক্সাইড প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হওয়ায় বায়ু-মণ্ডলের শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; ক্রমাগত ধাতব যৌগিক ও অন্যান্য পদার্থ জলে মিশ্রিত হওয়ায় ও জলভাগ জল ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হওয়ায় সমুদ্রাদি অল্পতর আয়তন-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই উত্তাপের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় নানাস্থান নীহারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এবং এমন এক দিন আসিবে যখন সমগ্র পৃথিবী তুষারে চির আবৃত হইয়া

উঠিবে। কিছুকাল পরে এই অভিমতের স্থলে সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমাগত হীনতর হইয়া আসিতেছে অভিমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং এই শেষ অভিমত অনুসারে অতি নিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীর কি অবস্থা হইবে, অর্থাৎ পৃথিবী একবারে নীহার স্তূপে পরিণত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

এই শেষোক্ত অভিমত সম্পূর্ণ পরিপুষ্টিলাভ করিতে না করিতেই ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, এই সমস্ত প্রদেশও বহু বহু শত যুগ পূর্ব্বে তুষারাবৃত ছিল। এই প্রাচীন তুষার আবরণের চিহ্ন-সমূহের দক্ষিণে অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তরে ভারতবর্ষ। এমন কি বর্ত্তমানে এই সমস্ত প্রদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলের (Tropics) অন্তর্গত স্থানেও পুরাতন তুষার আবরণ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ* পণ্ডিতগণের পূর্ব্ব কথিত যুগের ষষ্ঠ বা সপ্তম যুগে অর্থাৎ পারমিয়ান্ (Permian) বা অঙ্গার উৎপাদক স্তর (carboniferous) উৎপত্তি কালেও এই সমস্ত স্থান তুষারাবৃত ছিল। এই অভিমত প্রচারিত হইলেও কিছুকাল যাবৎ অন্যান্য ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এত প্রমাণ সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং প্রমাণ সমূহ এরূপ অকাট্য হইতে লাগিল যে, সমস্ত ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণই স্বীকার করিলেন যে; বাস্তবিকই অতি প্রাচীনকালে, কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবী স্থানে স্থানে নীহারাচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, জীব সৃষ্টি হইবার যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যতকাল অতিবাহিত হইয়াছে তাহার মধ্যবর্ত্তী কালে গ্রীষ্ম মণ্ডলের (Tropics) পার্শ্বদেশে অনেক ভূখণ্ড, দাক্ষিণাত্য, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অনেক স্থানই তুষারাবৃত ছিল।

যে সমস্ত যুক্তির বলে উক্ত ভূখণ্ড সমূহ তুষারাবৃত ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই সমস্ত যুক্তির সাহায্যে ষ্ট্রেহাস্ এবং বিউস্ নামক দুইজন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, নরওয়ে প্রদেশ অতি প্রচীন কালে তুষারাচ্ছন্ন ছিল। উইলিস এবং ব্ল্যাকওয়েল্ডার নামক দুইজন পণ্ডিত চীন সম্রাজ্যের ৩১ ডিগ্রি নিরক্ষান্তর বৃত্তস্থিত ইয়াংজী উপত্যকা ক্যামব্রিয়ান যুগে তুষারাচ্ছন্ন বলিয়া নির্ণয় করিলেন। ঐ যুগে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ তুষারাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া হাউচিন এবং ডেভিড সাহেব সপ্রমাণ করিলেন। এই সমস্ত প্রদেশের তুষারাচ্ছন্নতার চিহ্ন সমূহ, যে স্তরে জীবোৎপত্তির প্রথম নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ ৭,৫০,০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বের স্তরে সন্নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ৭,৫০,০০,০০০ বৎসর আমরা মোটা মুটি হিসাবে ধরিয়া লইয়াছি। ইহা অপেক্ষা যে আরও অধিকতর কাল অতিবাহিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। অধ্যাপক কোলম্যান ক্যানাডা প্রদেশে ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কালে তুষারাচ্ছন্নতার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন।

কিন্তু সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের যে অভিমত আছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই।

পূর্ব্ব লিখিত প্রাচীন কালে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প শূন্যতা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবী প্রাচীনকালে নিবীড় বাষ্পাচ্ছাদনে আবৃত ছিল না। আবার তুষারাচ্ছন্নতা প্রমাণ সমূহও উক্ত অভিমতের প্রতিকূল। ইহাতে বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে স্থানে স্থানে, সময়ে সময়ে জল বায়ু কখন শীতল, কখন উত্তপ্ত, কখন বাষ্পপূর্ণ কখন বা নীরস হইয়াছিল; এবং চেতন পদার্থ সমূহও এই বিভিন্ন অবস্থায় ধ্বংশ হয় নাই। যদি প্রাচীন কালে চেতন পদার্থ জল বায়ুর বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সহ্য করিয়াও জীবিত থাকিতে পারিয়াছিল, ইহাই প্রমাণিত হয়, তখন ভবিষ্যতে যে জীব সমূহ বিভিন্ন অবস্থায় জীবিত থাকিতে পারিবে, তাহা পণ্ডিতগণ নিশ্চয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে পার্ব্বত্য প্রদেশ ও মেরু প্রদেশের তুষারাচ্ছন্নতা ও বায়ু-মণ্ডলের বিশুষ্কতা সমসাময়িক। এক্ষণে বায়ু-মণ্ডলও বিশুষ্ক এবং পার্ব্বত্য প্রদেশও তুষারাচ্ছন্ন। প্রাচীন কালে তুষারাচ্ছন্নতা ও বায়ু-মণ্ডলের বিশুষ্কতার এইরূপ কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কোন কোন যুগে এই দুই বিভিন্ন অবস্থার সম্মিলিত ক্রিয়ায় জল বায়ু নিয়মিত পরিবর্ত্তিত হইত। আজ পর্য্যন্ত যত বিভিন্ন কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ কালেই বায়ু-মণ্ডল নীরস ছিল।

আবার এরূপ দেখা যায় যে, সুদূর নিরক্ষান্তর বৃত্ত প্রদেশে এরূপ সমস্ত জীবের অস্তিত্ব অবিষ্কৃত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডল বা তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই তাহাদের বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। গ্রীনল্যাণ্ড, স্পিটস্‌বার্জ্জেন প্রভৃতি আর্কটিক সমুদ্রের দ্বীপ সমূহে এরূপ চেতন পদার্থের চিহ্ন পাওয়া যায় যে, তাহারা উত্তপ্ত প্রদেশ ভিন্ন জীবিত থাকিতে পারে না। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত প্রদেশ বর্ত্তমান কালে হীম মণ্ডলে অবস্থিতি, তাহাদের জল বায়ু সুদূর প্রাচীন কালে বর্ত্তমানের গ্রীষ্মমণ্ডল স্থিত প্রদেশ সমূহের অনুরূপ ছিল।

বিভন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জল বায়ুর বিভিন্নতা লক্ষ্য করিয়া ইহা মনে হয় যে, প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানই কখন হীম-শীতল, কখন মরুভূমীর ন্যায় উত্তপ্ত, কখনও বা তথায় বিশুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ু-মণ্ডলেরও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে পৃথিবীস্থ ভূভাগ ও জল-রাশির পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীর কোন দেশ এক সময়ে জলে আবৃত ছিল, আবার কোন সময়ে সেই একই প্রদেশ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ যুগের প্রথম যুগে ভূভাগের পরিমাণ ও চতুঃসীমা বর্ত্তমানের অনুরূপ ছিল

বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আরও প্রাচীনতর কালের অবস্থা অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান অপেক্ষা ভূভাগের আয়তন কখন অধিকতর আবার কখন বা অল্পতর ছিল। যে সমস্ত শক্তিবলে সমুদ্র বা ভূভাগের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে পারে, অতি প্রাচীনকালে সেই সমস্ত শক্তির নিরবচ্ছিন্ন সংঘর্ষণের ফলে কখন জল কখন স্থল বৃদ্ধি পাইত। তবে কোনও শক্তিই অপর শক্তির ধ্বংশ করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে পারে নাই। কিন্তু কখন্ কোন্ অবস্থায় স্থলের পরিমাণ বা জলের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার মীমাংশা করা সুকঠিন। তবে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশ যুগের প্রথম হইতে জল ও স্থলের পরিমাণ সমভাবে রহিয়াছে। হয়ত অতি প্রাচীন কালের কোন সময়ে বহু যুগ ধরিয়া জল ও স্থলের পরিমাণ এইরূপ সুনিরূপিত ছিল, পুনরায় মধ্যযুগে হ্রাস বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে আবার সুনিরূপিত হইয়াছে।

যে সমস্ত শক্তি পৃথিবীর স্থল ভাগের অবয়বকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই সমস্ত শক্তিই পৃথিবীর আয়তন বৃদ্ধির কারণ। এই সমস্ত শক্তিবলে কোন স্থান উন্নত হইয়া পর্ব্বতমালায় পরিণত হইয়াছে, আবার কোন স্থান ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া বহু বিস্তৃত জলরাশি একত্রিভূত হওয়ায় নানাস্থানে স্থল প্রকাশ পাইয়াছে। স্থল ভাগের প্রান্তে সমুদ্র তরঙ্গের শক্তিই আবার জল রাশির বৃদ্ধির কারণ। তরঙ্গ-রাশির সংঘর্ষে ক্রমাগত ভূভাগ ধৌত হইয়া যাইতেছে; এবং ভূভাগ অপসারিত হইয়া জল ভাগ ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। যদি অনির্দ্দিষ্ট কিয়ৎ যুগের জন্য স্থল-ভাগ বৃদ্ধি পাইবার শক্তির অবসান হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবী জলে ডুবিয়া যাইত, এবং স্থলচর সমস্ত জীবও ধ্বংশ পাইত। প্রাচীনকালে জলভাগ বৃদ্ধির শক্তি প্রায়ই অধিকতর পরাক্রান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সময়ে সময়ে সমুদ্র স্থলভাগের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু জল আরও অধিকতর স্থল-ভাগ গ্রাস করিয়া স্থলচর জীব ধ্বংশ করিবার পূর্ব্বেই স্থল-ভাগ পুনরায় স্বীয় শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া জল-ভাগ অপসারিত করিয়াছিল, এবং স্থলচর জীব সমূহ সর্ব্বথা সংরক্ষিত হইয়াছিল। অধুনা যে স্থানে ভূভাগ সেই স্থানে জলচর জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, জল-ভাগ সেই স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। হিমালয়ের পাদদেশের অভ্যন্তরের স্তরে সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, ইহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, সেই স্থান এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল।

প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিলে দেখা যায় যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানব সৃষ্টির কাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীই উপর্য্যুপরি পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক বিভিন্ন অবস্থাতেও জীবের জীবন রক্ষা সম্ভাবিত ছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত অবস্থার শক্তির বৃদ্ধি বা ন্যূনতা জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও জীবনী-শক্তি পৃথিবী হইতে একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে, পার্থিব অবস্থার শক্তির এরূপ পরিবর্ত্তন কখনও হয়

নাই। বিভিন্ন বিপরীত ও বিরুদ্ধ শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে পৃথিবীতে জীবনী-শক্তি রক্ষিত হইবার সাম্য অবস্থা জীবিত পদার্থ উদ্ভূত হইবার পর হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। যে শক্তিবলে পৃথিবী হইতে জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হইবার অবস্থার ব্যত্যয় হয় নাই, সেই শক্তিই পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থার নিয়ামক ও অনুশাসক। এই সাম্য-প্রবণ শক্তি কি বা কিরূপ তাহা আজও পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্রের কবল হইতে যে ভূভাগ রক্ষিত হইতেছে সম্ভবতঃ তাহার কারণ এই যে, বিভিন্ন যুগে স্থলভাগের বিভিন্ন রূপান্তর হইয়াছে, এবং মৃত্তিকার আভ্যন্তরিক কোন এক প্রচ্ছন্ন স্বাভাবিক শক্তি বলেই এইরূপ রূপান্তর সংসাধিত হইয়াছে। এই প্রচ্ছন্ন স্বাভাবিক শক্তি কি তাহা এখনও বুঝিতে পারা যায় নাই। অথবা ইহাকে বুঝাইবার জন্য যে সমস্ত তর্ক বা যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সে গুলিও তত সুসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

আগ্নেয়-পর্ব্বত ও অন্যান্য দ্বার দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে নানাবিধ বাষ্পীয় পদার্থ নিঃসৃত হইয়া বায়ুমণ্ডলের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। অতি প্রাচীন কালে পৃথিবী যে সমস্ত পদার্থ শোষণ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহাই নিঃসৃত হইতেছে কিনা তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের বিস্তর মতানৈক্য আছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক গঠনের উপরেই ইহার মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। আবার পৃথিবীর আভ্যন্তরিক গঠন পৃথিবীর উৎপত্তির উপর নির্ভর করিতেছে। তবে পৃথিবীর সহিত বায়ুমণ্ডলের ক্রমাগত সংস্পর্শের জন্য বায়ুমণ্ডলের উপাদান ব্যয়িত হইতেছে, তাহাই আবার আগ্নেয়পর্ব্বতাদি দ্বারা উদ্গত হইয়া পরিপূরিত হইয়া যাইতেছে, এই অভিমত বোধ হয় অনেকটা সত্য। কিন্তু এই সমস্ত স্বাভাবিক আদান প্রদান জীবনী-শক্তি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবার পক্ষে প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাম্যভাব সংস্থাপনে সহায়তা করিতেছে, এরূপ মনে হয় না। সমুদ্র বায়বীয় উপাদান একবার শোষণ করিয়া এবং অব্যবহিত পরেই পরিহার করিয়া জলরাশি ও বায়ুমণ্ডলের সাম্যভাব অনুশাসন করিতেছে। সমুদ্রের এই ক্রিয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ইহারও বিশেষত্ব এবং সীমা আছে, এবং সাম্যভাব সংস্থাপনে এক সমুদ্রের ক্রিয়াই পর্য্যাপ্ত নহে। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, যদি সর্ব্বত্র সাম্যভাব সংস্থাপনে কোন স্বাভাবিক শক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই শক্তি পার্থিব এবং সৌর অণু পরমাণুর সজীবতা ও এই সমস্ত অণু পরমাণুর সহিত পার্থিব এবং সৌর আকর্ষণী শক্তির যে সম্পর্ক তাহাতে নিহিত রহিয়াছে।

যদি বায়ুমণ্ডলের অণু পরমাণু প্রভৃতির ক্রিয়াগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোনরূপ সুমীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হয় যে, আমরা যাহাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বলিয়া জানি তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বায়ুমণ্ডল

বর্ত্তমান আছে, এবং এই সমস্ত বায়ুমণ্ডল ক্রমশঃ তরল হইতে তরলতর হইয়া পৃথিবীর কক্ষ প্রদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ও ইহারা পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তির আয়ত্বের মধ্যে। সুর্য্যের বায়ু-মণ্ডলের লক্ষণ অনুধাবন করিলে পৃথিবীর ন্যায় সুর্য্যেরও অনেক বায়ু-মণ্ডল আছে বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই বায়ু-মণ্ডল সম্প্রসারিত হইয়া পার্থিব বায়ু-মণ্ডলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছে। এই দুই বিভিন্ন ব্যোম পদার্থের বিভিন্ন বায়ু মণ্ডল পরস্পরের সহিত অণু পরমাণুর আদান প্রদান করিয়া পরস্পরের সাম্যভাব রক্ষা করিতেছে।

পার্থিব বায়ুমণ্ডলের উপাদান বৃদ্ধি পাইলে সূর্য্যমণ্ডলে সেই বৃদ্ধি পরিমাণ শোষিত হইয়া যায়, সেইরূপ পার্থিব বায়ু-মণ্ডলেব উপাদান হ্রাস পাইলেও সূর্য্যমণ্ডল হইতে তাহা পরিপূরিত হয়। যদি এই অভিমত সত্য হয়, তাহা হইলে জীবের প্রাণ-শক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য বায়ু-মণ্ডলের অবস্থা সর্ব্বদা আপনাআপনিই সাম্যভাবে সংরক্ষিত হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমাদের বায়ু-মণ্ডলের উপাদানের হ্রাস বৃদ্ধির সামঞ্জস্ত রক্ষা করিবার কারণ এক মাত্র পৃথিবী নহে, অথবা পৃথিবী হইতে যে সমস্ত পদার্থ বায়ু-মণ্ডলে সম্প্রসারিত হইযা বায়ুমণ্ডলকে আমাদের জীবন ধারণের উপযোগী বা অনুপযোগী করিয়া তুলে, তাহা নিয়মিত করিবার একমাত্র উপায় পৃথিবী নহে, পরন্তু সৌর ও পার্থিব বায়ু-মণ্ডলের সহিত অণু পরমাণুর আদান প্রদানই প্রাণীর জীবনী-শক্তি রক্ষার সর্ব্ব প্রধান কারণ।

সূর্য্য প্রতি নিয়ত প্রচুর শক্তি পৃথিবীকে অর্পণ করিতেছে। অবশ্য সূর্য্যেরও এই ব্যয় কতকাংশে পরিপূরিত হইতেছে বটে, কিন্তু ব্যয় অপেক্ষা আয়ের ভাগ অত্যন্ত অল্প। পূর্ব্বে পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে, সৌরজগতের উত্তাপ-ভাণ্ডার-সূর্য্যের এই উত্তাপ সাধারণ রাসায়নিক শক্তি, অথবা উল্কাপাতের সংঘর্ষণ অথবা অন্য কোন-কিছু যৎসামান্যের উপরেই নির্ভর করে। এইরূপে উত্তাপ সঞ্চয় করিয়া যদি সূর্য্যকে উত্তাপ বিতরণ করিতে হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কয়েক লক্ষ বৎসর পরেই বিদূরিত হইয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে র‍্যাডিও-য়্যক্টিভিটি (radio-activity) আবিষ্কৃত হওয়ায়, সূর্য্যের উত্তাপ উৎপত্তির কারণ সমূহ যথেষ্ট শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার বলে সূর্য্য যে কতকাল উত্তাপ বিতরণ করিতে পারিবে, অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব যে আরও কতকাল সম্ভব, তাহার ইয়ত্তা করাও অসাধ্য।

যদি বাস্তবিকই উক্ত অভিমত সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা আর অন্য কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে পারি কি না, তাহাই অনুধাবন করা উচিত। বর্ত্তমানে মানবের জ্ঞান যতটুকু বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে সূর্য্যোত্তাপের অভাবে আমাদের কোন বিপদের সম্ভাবনা না থাকিলেও, অন্যরূপ বহুবিধ উপায়ে

আমরা বিপন্ন হইতে পারি। সূর্য্য বা ঐরূপ কোন প্রকাণ্ডতর পদার্থের সহিত আমাদের পৃথিবীর সংঘর্ষ হইলে হয়ত পৃথিবী একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, অথবা পৃথিবী ঐরূপ কোন প্রকাণ্ডতর পদার্থের নিকটবর্ত্তী হইলে, পৃথিবীর সাম্যাবস্থার এরূপ বিশৃঙ্খল হইতে পারে যে, সেই উৎপাতের ফলে পৃথিবী ধ্বংশ হইয়া যাইবে। সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহের ভ্রমণ-পথ এরূপ নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, কোটী কোটী বৎসরের মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষণ সম্ভাবিত হইবে না। সৌর জগৎ মহা-ব্যোমের এক স্থানেই প্রতি নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে না। পরন্তু আমাদের সূর্য্য আমাদের সৌর জগৎ লইয়া, এইরূপ অসংখ্য কোটী কোটী সূর্য্য নিজ নিজ সৌর-জগৎ সমভিব্যাহারে প্রতিনিয়ত মহাব্যোমের অনিরূপিত অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। কাজেই অন্য সূর্য্যের সহিত বা অন্য সৌর জগতের অন্য গ্রহ উপগ্রহের সহিত আমাদের পৃথিবীর সংঘর্ষ অসম্ভব নহে। ধূমকেতু সমূহের কক্ষ পথ এরূপ জটীল যে, তাহাদের সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষ অতিশয় সম্ভবপর। তবে তাহাদের আয়তন পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় এত সামান্য যে, সেই সংঘর্ষে পৃথিবীর সম্পূর্ণ ধ্বংশ সম্ভাবিত নহে। অন্তরীক্ষে ইতস্ততঃ নভঃস্তূপ সমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইরূপ ব্যোমপথের নানা পদার্থের সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষ সম্ভব। আকাশে নূতন নক্ষত্রের উদয়, তাহা হইতে চকিতে তীব্রদ্যুতির নিঃসরণ এবং ক্রমে ক্রমে আলোকের অন্তর্ধান লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, আকাশে প্রতিনিয়তই এরূপ সংঘর্ষ সংঘটিত হইতেছে। এমন কি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, সূর্য্য সমূহ সম্যক নিকটস্থ হইয়া পুরাতন গ্রহ, উপগ্রহ সমূহকে বিধ্বংশ করে এবং তাহাদের স্থলে নূতন গ্রহ, উপগ্রহ অধিষ্ঠিত হয়। যাহাই হউক সংঘর্ষের ফলে পৃথিবী ও আমাদের সৌর-জগতের বিপদ ও ধ্বংশ অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু কতকাল পরে এই বিপদ সংঘটিত হইতে পারে?—নক্ষত্র সমূহের পরস্পর মধ্যে ব্যবধান এত অধিক যে, যদিও তাহারা বিভিন্ন-মুখে প্রধাবিত হইতেছে, তথাপি পরস্পরের সংঘর্ষ বা বিপজ্জনক নিকটতাপ্রাপ্তি শীঘ্র সম্ভাবিত নহে। এই কালের মোটামুটি একটা হিসাব হইতে পারে। পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, ১০,০০,০০, ০০,০০ ০০০ বৎসর পরে এক একবার সংঘর্ষ হওয়া সম্ভব। নক্ষত্রের গতি ও পরস্পরের ব্যবধান হইতে ভবিষ্যতে সংঘর্ষের একটা নিরূপিত সময় নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। ব্যোম-পথ হইতে আশু বিপদের সম্ভাবনা অতি অল্প। পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক কোটী বৎসরের মধ্যে জীব ধ্বংশ হইতে পারে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের এরূপ পরিবর্ত্তনও অসম্ভব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।)　　　মে, ১৯১২।　　　৫ম সংখ্যা।

মানবের ভবিষ্যৎ-কাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া মানব-জীবন অব্যাহত থাকিবে। যে দুইটী উপাদানের উপর জীবনী-শক্তি নির্ভর করিতেছে, তাহাদের অপচয় বা অতিবৃদ্ধি সহসা সম্ভাবিত নহে। নৈসর্গিক কোন ঘটনাও সহসা মানব-জীবনের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। ফলত আমরা বর্ত্তমানে যেরূপ আছি, কোটী কোটী বৎসর সেইরূপই থাকিব।

কিন্তু বর্ত্তমানে সকল অবস্থার সাম্যভাব, অথবা সমস্ত ব্যাপারের সমন্বয়ে জীবন রক্ষার অনুকূল অবস্থা, ভবিষ্যতে আমাদের জীবনের অবস্থা কি হইবে, তৎ-সম্বন্ধে সমস্ত সত্য প্রকটিত করিতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অবস্থা অতি প্রাচীন কালে কিরূপ ছিল, তাহা স্থির নিশ্চয় করা, বর্ত্তমান কালে একরূপ সাধ্যাতীত। আমরা যাহাকে জীব-উৎপত্তির যুগ বলি, তাহার বহু পূর্ব্বেও জীবের অস্তিত্ব ছিল এ সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কালে পৃথিবীর অবস্থাও যে বিভিন্ন ছিল, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। তবে সে অবস্থাতেও জীব জীবিত ছিল। সেই সেই অবস্থার সাম্যভাব থাকিলেও, অথবা পরিবর্ত্তিত হইলেও, জীবের সেই অবস্থার উপযোগী হওয়ার উপরই জীবন রক্ষা নির্ভর করিতেছে; অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থায় জীবন-রক্ষা করিবার জন্য আমদের উপযোগিতা, তৎ-অবস্থা

সহজাত নানা বিপদ আপদে জীবনী-শক্তির দৃঢ়তা, এবং তৎকাল প্রয়োজনানুরূপ কর্ম্মশীলতায় প্রবৃত্তিই আমাদের জীবন সংরক্ষিত হইবার প্রধান উপায়। পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত জীবোৎপত্তির ইতিহাস তুলনা করিলে, জীবোৎপত্তির ইতিহাস অতি সামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু এই সামান্য ইতিহাসেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা যে যুগ হইতে জীবের অস্তিত্ব পাইয়াছি, সেই যুগ হইতেই এরূপ শত শত জীব আবির্ভূত হইয়াছিল যে, তাহাদের জীবনী শক্তির দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক। শত সহস্র বিপদে ও অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনেও তাহাদের জীবনী-শক্তি একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে আবার এরূপ জীবও উদ্ভূত হইয়াছিল যে, সামান্য পরিবর্ত্তনেই অথবা সামান্য বিরুদ্ধ-অবস্থাতেই তাহারা একবারে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। তবে অধিকাংশই অতি কষ্টকর অথবা বিপজ্জনক এই দুইয়ের মধ্য অবস্থায় নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকিতে পারে। অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় জীব কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও কোটী কোটী বৎসর নির্ব্বিবাদে জীবিত থাকিবে। পৃথিবীর এই সমস্ত বিভিন্ন ইতিহাস-তত্ত্ব হইতে মানুষ কোটী কোটী বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, এ মীমাংসা যেরূপ সঙ্গত, আবার অতি শীঘ্র ধ্বংশ হইতে পারে, একথাও সেইরূপ সঙ্গত। এতকাল পর্য্যন্ত সমগ্র জীব-জগৎ লইয়া আলোচনা হইয়া আসিতেছিল। মানবও তাহার অন্তর্গত। বর্ত্তমানে কেবল মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়া থাকে। মানবের বিষয় ভাবিলে, এক জাতীয় একটা বিশেষ জীবের কথাই আলোচিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানবের বিষয় ভাবিলেই ইহাতে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে, তদ্দ্বারা প্রকারান্তরে যাবতীয় জীবিত পদার্থের কথাই আলোচিত হইয়া থাকে।

মানব-জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে দুইটী প্রশ্ন উদিত হয়। একটি মানবের নৈতিকতা এবং অপরটি মানবের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধিৎসা। মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন জীবই যে এই দুইটি দ্বারা পরিচালিত হয় নাই, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। মানবই এই দুই মহাধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কেননা বর্ত্তমান অতীতের এবং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ফলস্বরূপ এই মহাসত্য, মানব জীবনেই সম্পূর্ণ প্রতিভাত হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, আমাদের নৈতিকতা যত বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ কোন্ কার্য্য করণীয়, কোন্ পথ অবলম্বনীয়, এই জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাইবে, আমাদের স্থায়িত্বের পরিমাণ-কালও ততই বৃদ্ধি পাইবে। এই জ্ঞানের অভাবই আমাদের ধ্বংশের কারণ হইবে। নৈতিকতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ লইয়াই নিরুদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু কিরূপে সমগ্র মানব-জাতীর উপকার হইতে পারে, তাহাই স্থির করিতে যত্নই চেষ্টা করিবে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা লোক-ধ্বংশ হইবার

উপায় মানব কর্ত্তৃকই শতগুণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত আবিষ্কারের তালিকা নিষ্প্রয়োজন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা একই পুরুষে সমন্বিত হইলে, তবে মানবের কি করা উচিত বা কিরূপে মানব জীবন পৃথিবীতে বহুকাল অক্ষুন্ন থাকিবে, তাহার উপায় স্থিরীকৃত হইতে পারে। প্রচীন-মানবের দুই এক জন ব্যতীত, কি কি কারণে আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং কিরূপেইবা আমাদের জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কেহই বহুল আলোচনা করেন নাই। কিন্তু জীবন কি বৃদ্ধি পাইতে পারে? আমরা দেখিতেছি যে, যে রোগে পূর্ব্বকালে বহু লোক ধ্বংশ পাইত, সেই সেই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানবের জীবনী-শক্তি যেরূপ ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে, এমন এক দিন আসিবে, যখন কোন্ কোন্ অবস্থায় জীবন রক্ষিত হইতে পারে, তাহার সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়া যাইবে। যে সমস্ত বিষয় সেই সেই অবস্থার অনুকূল, তাহারাও আমাদের করায়ত্ত হইয়া উঠিবে, পিতামাতার কোন্ কোন্ দোষে সন্তান অল্পায়ুঃ হইয়া যায়, তাহাও নির্ণীত হইয়া সেই সমস্ত দোষ দূরীভূত হইবার উপায় বিহিত হইবে, কাজেই "মৃত্যু এক প্রকার পীড়া এবং ইহার হস্ত হইতে স্বচ্ছন্দে পরিত্রাণ পাইয়া অমর হইব" এরূপ না হইলেও, আমাদের জীবনী-শক্তি আরও বর্দ্ধিত হইবে, বুদ্ধি-বৃত্তি আরও পরিমার্জ্জিত হইবে, দেশে দেশে সাম্যভাব সংস্থাপিত হইবে, নৈসর্গিক শত শত বাধা বিঘ্নও মানব বিজ্ঞান-বুদ্ধি-বলে অনায়াসে বিতাড়িত করিবে, এবং সমগ্র পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড জ্ঞানের-আধার হইয়া উঠিবে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

রসায়ন-শাস্ত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আজকাল সহর-অঞ্চলের প্রতি পথে, অনেক গৃহস্থের আবাসে শুভ্র ও অত্যুজ্জ্বল গ্যাসের আলোক ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বেও গ্যাস ব্যবহৃত হইত বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যত পরিমাণ গ্যাস ব্যবহৃত হইত, এখন সেই একই পরিমাণ গ্যাস হইতে অত্যন্ত অধিকতর উজ্জ্বল আলোক পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে স্থানে ১৫টি আলোক প্রয়োজন হইত, বর্ত্তমানে সেই স্থানে একটি আলোকেই যথেষ্ট হইতেছে। ম্যাণ্টল্ (Mantle) আবিষ্কৃত হইবার পরেই এত সুবিধা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে আলোকের জন্ত যত ব্যয় হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক অল্পতর হইতেছে।

পর্ব্ব বা অন্য কোন আড়ম্বর-পূর্ণ কার্য্যোপলক্ষে আজকাল য়্যাসিটিলিন্ (acetylene) আলোকব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকেই ইহার বিষয় অবগত আছেন, এবং ইহার ব্যবহার যেকত সুবিধা-জনক তাহাও অনেকে বিদিত আছেন। উলার এবং উইল্সন্ নামক দুইজন রসায়ন-বেত্তার প্রগাঢ় অধ্যবসায়েই আজকাল য়্যাসিটিলিন ব্যবহার লোকের নিকট অনায়াস-সাধ্য হইয়াছে। রাসায়নিকগণই কি প্রকারে চলিষ্ণু ট্রেণে বা কি প্রকারে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গ্যাস বাহিত হইতে পারে, তাহা উদ্ভাবিত করিয়াছেন। আজকাল কত বিভিন্ন জ্যোতিঃ বিশিষ্ট আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের আবিষ্কর্ত্তৃগণের তালিকার মধ্যে রাসায়নিকগণেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রসায়ন-শাস্ত্র মানবের অভাব নিরাকরণ-কল্পে কতটুকু সাহায্য করিতেছে, তাহা এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আদৌ আলোচিত হইতে পারে না। যেখানে মানবজাতি অভাব অনুভব করিয়াছে, সেই খানেই রাসায়নিক ঐন্দ্রজালিক শক্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং অভাবও বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। রসায়ন — বিলাস-ব্যসনের উপাদান প্রস্তুত প্রণালী দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত নহে, পরন্তু অপরিহার্য্য নিত্য অভাবের হস্ত হইতে মানবের সর্ব্বদাই পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছে। রসায়ন-শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানব জাতির অর্থ উপার্জ্জনের পন্থা কতটুকু বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেকেরই অনায়াস-বোধ্য।

সিসিলি-দ্বীপে গন্ধক খনি হইতে গন্ধক উত্তোলন ব্যাপার যে কিরূপ কষ্ট ও ব্যয় সাধ্য, তাহা এই দ্বীপের গন্ধকের বিবরণী পাঠেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। দারুণ শ্বাস-প্রতিরোধক বায়ুর মধ্য দিয়া অল্পবয়স্ক বালকগণ খনি হইতে প্রায় অর্দ্ধ মণ ওজনের মিশ্রিত গন্ধক স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়া থাকে। তাহাদের যন্ত্রণার সীমা থাকে না। কিন্তু লুসিয়ানা প্রদেশের রাসায়নিকগণ এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, গন্ধক অনায়াসে খনি হইতে উত্তোলিত হইতেছে। তথায় গন্ধকের খনির ভিতরে দুইটি এক কেন্দ্র-বিশিষ্ট প্রকাণ্ড নল পরিচালিত করিয়া একটির দ্বারা উত্তপ্ত তরল ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড ঢালিয়া দিয়া অন্যটির দ্বারা পাম্প সহযোগে গলিত গন্ধক টানিয়া বাহির করিয়া লইতেছে।

পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ছিন্ন বস্ত্রাদি নরম করিবার জন্য উহা-দিগকে একস্থানে স্তূপাকার করিয়া রাখা হইত, এবং জলসিক্ত করিয়া পচাইয়া ফেলিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে চূণ প্রয়োগে সিদ্ধ করিয়া অতি অল্প সময়েই নরম করিয়া ফেলা হয়। পূর্ব্বে সূর্য্যের আলোকে ঐ ছিন্ন বস্ত্রগুলি কয়েক মাস ধরিয়া ফেলিয়া রাখিলে তবে শুভ্র হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে এক রাত্রির মধ্যেই ব্লিচিং-পাউডার সহযোগে তদপেক্ষা অধিকতর শুভ্র করা হইতেছে।

পূর্ব্বে সমস্ত কারখানা হইতেই আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেওয়া হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে

আবর্জ্জনা হইতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কারখানার প্রধান উৎপন্ন পদার্থের মূল্যও যথেষ্ট হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আধুনিক যুদ্ধ-বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান কারণ রসায়ন-শাস্ত্র।* রসায়ন-শাস্ত্র পদার্থের গঠন উপাদান নির্ণয় করিবার এত সূক্ষ্ম উপায়-সমূহ আবিষ্কৃত করিয়াছে যে, একজন সামান্য রাসায়নিকও অনেক পদার্থের উপাদান অনায়াসে নির্ণয় করিয়া ফেলিতে পারেন।

রসায়ন-শাস্ত্র ব্যতিরেকে জগতের এত উন্নতি কখনই সম্ভবপর হইত না। পণ্ডিত-গণ বলিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত দেশে সালফিউরিক এসিড যত ব্যয়িত হয়, সেই সেই দেশের শিল্প কারখানার উন্নতিও তত অধিক। আমরা বলিতে পারি যে, যে দেশের যত লোক রাসায়নিক, সেই দেশের সমৃদ্ধিও তত অধিক। দেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের একমাত্র উপায় রসায়ন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। কোন লোক কোনও উপাদান উৎপন্ন বা উদ্ভাবন করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতীয়ের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, আমরা তাহা উৎপন্ন বা উদ্ভাবন করিতে না পারিলেও উৎপন্ন দ্রব্যের উপাদান প্রণালী বুঝিয়া অনায়াসে তাহা উৎপাদন করিয়া আমাদের দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারি। এইরূপে পরের জিনিষ নিজে ব্যবহার করিতে হইলেও রসায়ন-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীরাম চন্দ্র সেন।

মৎস্যের মনস্তত্ত্ব।

বানর ব্যতীত অন্য কতিপয় ইতর জীবের মধ্যেও বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির যথেষ্ট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কুক্কুরের বুদ্ধি-বৃত্তি ও স্মৃতি শক্তি অনেকেরই সুপরিচিত। অশ্বের প্রভুপরায়ণতা, কর্ম্মতৎপরতা অনেক পাঠ্য-গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। হস্তির রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা-প্রবণতা যথেষ্ট। সেইরূপ মৎস্যেরও কোনও ক্ষমতা আছে কিনা, তাহা আজ পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয় নাই। সম্প্রতি এন অক্সনার নামক জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিৎ এ সম্বন্ধে কিছু পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। এডিঞ্জার নামক জনৈক পণ্ডিতের মতে মৎস্যের মানস-শক্তি আদৌ নাই, অথবা এ সম্বন্ধে কোন গবেষণা অধুনা কাল পর্য্যন্ত হয় নাই বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। মৎস্যের স্মৃতি-শক্তি অতি অল্প, কিম্বা নাই বলিয়াই পণ্ডিতগণের ধারণা। কেননা বঁড়শীতে একবার বিদ্ধ হইয়া কোনরূপে স্খলিত হইলেও, মৎস্যের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় না, পরক্ষণেই টোপ গাঁথা বঁড়শীতে ধৃত হয়। অক্সনার এই বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা করেন। তিনি সমুদ্র হইতে কতিপয় মৎস্য ধৃত করিয়া একটি

প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় রাখিয়া দেন। তিনি প্রথমে টোপ গাঁথিয়া বঁড়শী সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করতঃ উপর্য্যুপরি একই মৎস্যকে বহুবার ধৃত করিলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, বঁড়শী টোপের দ্বারা এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে যে, সেই খাদ্যে কোন বিপদ-লুক্কায়িত আছে, মৎস্যের এরূপ ধারণাই হয় না। কাজেই সাধারণ খাদ্য ও টোপের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় না বলিয়াই, টোপ-গাঁথা বঁড়শী গিলিয়া বিপদ-গ্রস্ত হয়। কাজেই অক্সনার বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বঁড়শী টোপের দ্বারা প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু বঁড়শীর প্রায় দুই ইঞ্চ উপরে একখণ্ড ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কাগজ গাঁথিয়া দিলেন। তিনি কতকগুলি মৎস্যকে এক স্থানে না রাখিয়া, প্রত্যেক মৎস্যকে পৃথক পৃথক জলাধারে ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে সঙ্গীহীন হইয়া প্রথমতঃ কোন মৎস্যই টোপ বা অন্য খাদ্য কিছুই গ্রহণ করিল না। ক্রমে ক্রমে মৎস্য সেই পৃথকীকৃত আবাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং ক্ষুধার উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রায় সম্পূর্ণ আট দিন পরে টোপও খাইতে আরম্ভ করায় শীঘ্রই ধরা পড়িল। অক্সনার তৎক্ষণাৎ বঁড়শী হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া মাছটিকে জলে ছাড়িয়া দিলেন। পরবর্ত্তী দিন ক্রমাগতই এইরূপে একই মৎস্য ধৃত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ১১ দিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে ধরা পড়িতে লাগিল। তবে প্রথম তিন দিন যেরূপ উপর্য্যুপরি ধরা পড়িয়াছিল, পরবর্ত্তী কয়েক-দিন ততবার ধরা পড়ে নাই। অবশেষে দ্বাদশ দিনে মৎস্য আদৌ টোপের নিকটেই গমন করিল না। অবশ্য প্রথম হইতেই টোপের উপর ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড সংযোজিত ছিল। এই কাগজের চিহ্নই বিপদ-সূচক বলিয়া মৎস্য বুঝিতে পারিল। ত্রয়োদশ দিনে কাগজ খণ্ড অপসারিত হইবা মাত্র ধৃত হইল। পুনরায় কাগজ সংযোজিত হইলে, মৎস্য পরবর্ত্তী ৩ দিন আদৌ টোপ খাইবার চেষ্টা করিল না। তবে মাঝে মাঝে আসিয়া টোপের পরীক্ষা করিয়া পলায়ন করিত। পরবর্ত্তী দিবস ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে টোপের নিকটবর্ত্তী হইয়া টোপটাকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিল। কিন্তু টোপ একবারে পূর্ব্বের ন্যায় গিলিয়া ফেলিল না। পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত টোপের উপর কাগজ দেখিলেই একবারে না গিলিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিতে লাগিল। অক্সনার প্রত্যেক মৎস্য লইয়া বহুবার এইরূপ পরীক্ষা করিলেন। প্রত্যেক বারেই ফল প্রায় একইরূপ হইল। ইহা হইতে অক্সনার সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মৎস্য-সমূহ প্রথমতঃ নিশ্চিন্ত চিত্তে টোপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং বঁড়শী হইতে স্খলিত হইলেও টোপে কোনরূপ বিপদ লুক্কায়িত থাকিতে পারে, অর্থাৎ খাদ্য স্বভাবতঃই খাদ্য, বিপজ্জনক নহে, এই স্বাভাবিক জ্ঞানবশে পুনঃ পুনঃ টোপ গিলিয়া ফেলে। কিন্তু খাদ্যের সহিত যদি এরূপ কোন অখাদ্য চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, ও সেই অখাদ্য চিহ্ন থাকায় বিপদ উৎপাদিত হয়, এবং সেই বিপদে যথেষ্ট যন্ত্রণা ও বেদনা

পাইতে হয়, এরূপ দেখিতে পায়, তাহা হইলে বিপদ ও যন্ত্রণার ধারণা মৎস্যের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তবে সেই ধারণা পশু-স্বভাব বশতঃ অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া থাকে। খাদ্য পাইলেই পশু-প্রবৃত্তি ইতর জীবকে খাইবার জন্য প্রলুব্ধ করে। কিন্তু বিপদ সূচক চিহ্ন বর্তমান থাকিলে মৎস্যও সেই খাদ্যে প্রলুব্ধ হয় না। ক্রমে ক্রমে পশু স্বভাব বশতঃ বিপদের কথা ভুলিয়া যায় এবং আবার খাদ্যে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু এই প্রলোভনে অতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশেষে বিপদের কথা এক বারে ভুলিয়া যায় এবং পুনরায় খাদ্য খাইতে আরম্ভ করে।

ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মৎস্যের মানসিক শক্তির বিকাশ আছে। তবে সে শক্তি অন্যান্য ইতর জীবের ন্যায় তীক্ষ্ণ নহে। পশ্বাদির স্বাভাবিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য জ্ঞানও যে সম্ভব, তাহা এই সমস্ত পরীক্ষা হইতেই প্রমাণিত হইয়া থাকে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত বোধোদয়ের অনুগ্রহে আমরা বাল্যকাল হইতেই জানি যে, ইন্দ্রিয়গণ আমাদের জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় শরীরের যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। চক্ষু মস্তকের পশ্চাৎদিকে হইলে কি ক্ষতি হইত তাহা সহজ বোধ্য।

নাসিকা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম যাবতীয় পদার্থের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বরূপত্ব নির্দ্দেশই এই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া।

জীবের যতরূপ কর্ত্তব্য ও ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে জীবন-ধারণই শ্রেষ্ঠ। প্রতিদিনই জীবনীশক্তি সংরক্ষিত হইবার উপাদান হ্রাস হয়। এই হ্রাস পুনরায় সাম্য-অবস্থায় আনিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য গ্রহণের দ্বার মুখ। এক্ষণে খাদ্যের নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতা নির্দ্দেশ করিবার জন্য যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্র রহিয়াছে, তন্মধ্যে জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, এবং ত্বকই প্রধান। এই খাদ্য নির্ব্বাচনে নাসিকার প্রয়োজন বলিয়াই, খাদ্য প্রবেশ দ্বারের ঠিক অব্যবহিত উপরে নাসিকা স্থাপিত হইয়াছে। যে খাদ্য উদরে প্রবিষ্ট হইবে, এমন কি জিহ্বার সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই, সেই খাদ্য উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট তাহা বুঝাইবার জন্যই খাদ্য মুখ বিবরের দ্বারে আসিলেই যাহাতে নাসিকা তাহার আঘ্রাণ লইয়া স্থির করিতে পারে, এই উদ্দেশেই নাসিকা মুখ গহ্বরের এত

সন্নিকটে ও এবং ঠিক উপরে স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীরই নাসিকা অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় মুখ বিবরের অব্যবহিত উপরে সংস্থাপিত।

মানবের নিকট খাদ্যের জন্য নাসিকার প্রয়োজনীয়তা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পতর হইয়া পড়িয়াছে। কেননা মানবের খাদ্যের সমস্ত উপাদানই প্রায় কৃষিলব্ধ। কাজেই প্রাকৃতিক অন্যান্য পদার্থের সহিত মানবের খাদ্যের সংমিশ্রণের সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। এতদ্ব্যতীত মানবের খাদ্য বস্তুর সংখ্যাও অল্প। আমরা যে সমস্ত শাক-সবজী খাইয়া থাকি, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু গাভীর খাদ্যের শাক-সব্জী বা তৃণ সংখ্যা এত অধিক এবং এত বিভিন্ন ধর্ম্ম ও গুণ সম্পন্ন যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমরা মাংস ভোজন করি। কোনরূপে বিপদ গ্রস্ত না হইলে, আমরা সাধারণতঃ কতিপয় প্রাণীরই মাংস ভোজন করিয়া থাকি; কিন্তু শৃগালের খাদ্যের মাংসের কোনরূপ বিচার আছে কিনা, তাহা আমাদের অপরিজ্ঞাত।

এই সমস্ত কারণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা মানবের নিকট হীনতর। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্যের অধিকাংশই অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে চক্ষু এবং ত্বক অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ই প্রধান। এতদ্ব্যতীত, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা দ্বারাও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

চক্ষু নাসিকার উপরে সংস্থাপিত বলিয়া এবং বহু দূরস্থিত পদার্থেরও জ্ঞান লাভে সহায়তা করে বলিয়া, আমরা অনেক বিষয়ে নাসিকার পরিবর্ত্তে চক্ষুর সহায়তা গ্রহণ করি। দূরে গলিত কোন জীব পতিত দৃষ্ট হইলেই, আমরা তাহার অনুভব করিয়া ফেলি, অথচ বায়ুর প্রতিকূলতা ইত্যাদি নানা কারণ বশতঃ নাসিকায় দুর্গন্ধ উপস্থিত হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। চক্ষু কপালে সংস্থাপিত হওয়ায় এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, মানব এরূপ জীব বলিয়া, বাস্তবিকই কোন জিনিষের একবার ঘ্রাণ লওয়ার পর দূর হইতে সেই পদার্থ দর্শন করিলেই আমাদের ঘ্রাণের অনুভূতি হয়, অর্থাৎ চক্ষু নাসিকারও কার্য্য করিয়া থাকে।

আমরা কাজ করি এই কথার অর্থই এই যে, আমরা মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হই, এবং পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করি। আমরা দর্শন করি বলিলে, ইহাই বুঝায় যে, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট বস্তুর আলোক গ্রহণ করি বটে, কিন্তু যতক্ষণ আলোকের প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে, ততক্ষণ আমরা কিছুই দেখিতে পাইতে পারি না। অথবা মস্তিষ্কের যে স্থান উদ্রিক্ত হইলে আমাদের দর্শন কার্য্য সম্ভব হয়, যতক্ষণ সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান উদ্রিক্ত না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষু দিয়া আলোক প্রবেশ করিলেও বাস্তবিক আমাদের দর্শন করা হয় না। অনেক সময়ে কোন বস্তু নয়নে প্রতিভাত হইলেও আমরা দেখিতে পাই না, তাহার কারণ আমাদের অন্যমনস্কতা, এবং এই অন্য-

মমকতায় মস্তিষ্কের শক্তি এত পরিমিবিষ্ট থাকে যে, দৃষ্ট বস্তু হইতে নিঃসৃত আলোক মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট স্থানকে উদ্রিক্ত করিতে পারে না।

সেইরূপ মস্তিষ্কের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থান উদ্রিক্ত হইলে আমরা ঘ্রাণ পাই। মস্তিষ্কের যে অংশ ঘ্রাণ-জ্ঞান উৎপাদক, অন্যান্য পশুর সেই অংশের সহিত তুলনায় মানবের সেই অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর। যে ইন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর, মস্তিষ্কের ভিতর সেই ইন্দ্রিয়ের প্রতিক্রিয়ার নির্দ্দিষ্ট স্থান বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইতর জীবের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি প্রয়োজনীয়; কাজেই মস্তিষ্কে তাহার উপযুক্ত স্থানের পরিমাণও বিস্তৃত। মোট কথা, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইতে থাকে, এবং ইতর জীব-জগতে ইহার শক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়।

আঘ্রাণে আমরা জীবনে কতটা সুখ পাইয়া থাকি, অথবা আমাদের জীবনে সুখের অংশ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তিতে আদৌ নিহিত কিনা, তাহা আজিও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমাদের চিন্তা-শক্তি নানা কারণে পরিচালিত হয়। এই সমস্ত কারণগুলি কি তাহা প্রায়ই অজানিত। শব্দ অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় আমাদের চিন্তার উপর বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে। দুঃখাতুর লোকেও সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হয়। গন্ধেও ঐরূপ শক্তি আছে। আমরা দুর্গন্ধে বিষণ্ণ হইয়া পড়ি, সুগন্ধে বিষাদ অবসন্ন হয়। রুসোর মতে গন্ধ কল্পনা-শক্তি উত্তেজিত করে। চন্দনের গন্ধে মনে দেবতার কল্পনা স্বতঃই উদয় হয়। আবার আধুনিক নানাবিধ সুগন্ধে মনে বিলাসিতা বা অন্য কিছু উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। ক্ষুধাতুর লোকের নিকট কোন আহার্য্যের সুগন্ধ কিরূপ তৃপ্তিদায়ক, তাহা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। অতএব ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাও আমরা জীবনে কিয়ৎ পরিমাণে সুখ উপলব্ধি করি, এ মীমাংসা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

পণ্ডিতগণের বিশ্বাস অসভ্য লোকের ঘ্রাণ-শক্তি আর্য্যগণের অপেক্ষা হীনতর। এই অভিমতের কতটা সত্য, তাহা "বিজ্ঞানে" পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তির ঘ্রাণ-শক্তি শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তির ঘ্রাণ-শক্তি অপেক্ষা তীব্রতর। প্রাণি-জগতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। একই জাতীয় শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট প্রাণী অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীর পীড়া অল্প হইয়া থাকে। অনেক সময়ে কৃষ্ণবর্ণ মেষ শ্বেতবর্ণ মেষের সহিত মিশিতে চাহে না। কেননা শেষোক্তগুলি প্রায়ই পীড়াক্রান্ত হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণের অভিমত এই যে, কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি তীব্র বলিয়া সহজেই অখাদ্য পরিত্যাগ করে, কাজেই পীড়িত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ হ্যাল্কের মতে উভয়েরই ঘ্রাণশক্তি সমান, তবে কৃষ্ণবর্ণ জীব শ্বেতবর্ণের ন্যায় পীড়া দ্বারা তত সহসা আক্রান্ত হয় না। আরিস্টটল্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বৃশ্চিক দংশনে শ্বেত শূকর অপেক্ষা কৃষ্ণ শূকরের যন্ত্রণা অল্প হইয়া থাকে।

গন্ধময় বায়বীয় পদার্থ যখন নাসিকা-স্থিত গন্ধগ্রাহী স্নায়ুর সংস্পর্শে আইসে, তখনই আমরা গন্ধ অনুভব করি। এই সমস্ত স্নায়ুর প্রান্তে কেশ সন্নিবিষ্ট থাকে, আমরা নাসিকা-গহ্বরে কেশ দেখিতে পাই।

জলে নাসিকা নিমজ্জিত করিলে গন্ধ পাওয়া যায় কিনা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু মৎস্যের ঘ্রাণশক্তির স্নায়ু জলেও পরিপুষ্ট হয় বলিয়া মনে হয় যে, জলে নিমজ্জিত হইলেও গন্ধ আঘ্রাত হইতে পারে।

শীতল জলে নাসিকা ধৌত করিলে, প্রায় এক ঘণ্টা কাল নাসিকার শক্তি বিলুপ্ত হয়। বিভিন্ন দ্রব্যে নাসিকা ধৌত করিলে ফলও বিভিন্ন হইয়া থাকে। হার্টল্ নামক কোনও চিকিৎসক নাসিকার গহ্বর দ্বারা গরম চা পান করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এইরূপ করিলে তাঁহার সর্দ্দি নিবারিত হইবে। ফলে তাঁহার ৬ মাসের জন্য ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত জীবনেও তিনি সম্পূর্ণ ঘ্রাণশক্তি ফিরিয়া পান নাই।

নাসিকার স্নায়ুর দ্বারা গন্ধ গৃহিত হইলে, ইহা চালুনীর ন্যায় এক প্রকার ছিদ্র-সঙ্কুল অস্থির ভিতর দিয়া (cribiform plate) মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়। মস্তিষ্কের এই অংশের সহিত নাসিকার স্নায়ুর সম্পর্ক আছে, ইহা অতি সত্য। কিন্তু এরূপও দেখা গিয়াছে যে, এই স্নায়ুর অভাবেও লোকে ঘ্রাণশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ডাক্তার বানার্ড একটি স্ত্রীলোকের শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার নাসিকায় ঘ্রাণশক্তির স্নায়ু আদৌ নাই; জীবিত অবস্থায় তিনি সুদক্ষ পাচিকা ছিলেন, কাজেই গন্ধ বিচার করিতে পারিতেন। তিনি তাম্রকুটের গন্ধ আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার গন্ধ গ্রহণের স্নায়ু না থাকিলেও জিহ্বা এবং নাসিকাতলে একটা বিশেষ পাতলা আবরণ ছিল। এক্ষেত্রে মনে হয় যে, এই পাতলা আবরণই তাঁহার ঘ্রাণতন্তুর কার্য্য করিত। সময়ে সময়ে নাসিকার নিকটস্থ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

গন্ধ বিচার করিতে হইলে নাসিকার গহ্বরে বায়ুর চলাচলের আবশ্যক। নিশ্বাস গ্রহণ না করিলে কিছুতেই গন্ধ পাওয়া যায় না। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিবার সময় কোন দ্রব্য নাসিকার নিকটস্থ করিয়া সেই দ্রব্য অপসারিত করিলেও পুনরায় নিশ্বাস গ্রহণ কালে তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। দ্রব্যটি বায়ুতে যে গন্ধটুকু ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাই পরে নাসিকায় প্রবেশ করে।

সর্দ্দি হইলে খাদ্যে অরুচির প্রধান কারণ এই যে, আমাদের ঘ্রাণশক্তি হ্রাস হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত সর্দ্দি করিলে আপেল, পেঁয়াজ এই দুইটি পৃথক চর্ব্বণ করিলেও আস্বাদের কোনও বিভিন্নতা সহসা ধরা পড়ে না। আঘ্রাণের বিভিন্নতাতেই আস্বাদের বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

কোন গন্ধদ্রব্য উপস্থিত হইলে আঘ্রাণদ্বারা কিরূপে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কিম্বা গন্ধ দ্রব্যের কোন্ ধর্ম্ম আমাদের এইরূপে অনুভূতি উপস্থিত করে, তাহাও আমরা অবগত নহি।

নাসিকার এইরূপ গন্ধগ্রাহী ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমরা নাসিকার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। কোন অপকারী বায়বীয় পদার্থ গৃহিত হইলে নাসিকা দ্বারা সেই বায়ু প্রবিষ্ট হয় বলিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ অপকারী বায়ু হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা পাইয়া থাকি।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

গত দশ বৎসরের মধ্যে এক বঙ্গ দেশেই অনেক লোক যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সেই জন্য আজকাল প্রায় প্রত্যেক চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ক-মাসিক পত্রে ইহার আলোচনা হইতেছে। এইরূপ আলোচনায় সুফল অবশ্যম্ভাবী। লোকে এইরূপ প্রবন্ধ-সমূহ পাঠে কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের লোকে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বেশ বুঝিতে পারেন যে, এরূপ কাজ করা কর্ত্তব্য নহে, ওরূপ করা কর্ত্তব্য, এরূপ আচার বিপজ্জনক, ওরূপ আচার কল্যাণকর। কিন্তু জ্ঞান পুস্তকেই সীমাবদ্ধ থাকে, কখনও প্রকৃত কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না। যত দিন জ্ঞান ও কার্য্য পরস্পরের সাহায্য না করিবে, ততদিন রোগ বিতাড়িত করিবার শত শত প্রবন্ধেও কোন ফল হইবে না। এই প্রবন্ধেও দুই একটি অনায়াসে পালনীয় উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

প্রথম — বঙ্গদেশ বিষুব রেখার অতি সন্নিকট। মোটামুটি ইহা ২৭° ও ২০° উত্তর নিরক্ষান্তর রেখার মধ্যে অবস্থিত। কাজেই ইহার জল বায়ু উত্তপ্ত, এবং বায়ু-মণ্ডল সর্ব্বদাই জল-কণা পূর্ণ। এরূপ প্রদেশে মুক্ত বাতাসে বসবাস ভিন্ন কখনই স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে না। আমাদের দেশে অনেকেই দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও জানালা দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া নিদ্রা যান। ইহার কুফল বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্য রাত্রির শীতল বায়ু গৃহের মধ্য দিয়া চলাচল করিলে, এবং নিদ্রিত ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনর্থপাত হইতে পারে। প্রকৃত দেখাও যায় যে, এইরূপ ঠাণ্ডা লাগিয়া লোকে কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? আমরা বাল্যকাল হইতেই বদ্ধ বায়ুতে বাস করিয়া হৃদয়, ফুস্ ফুস্ ইত্যাদি শারীরিক যন্ত্রকে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছি যে, ইহারা কিছুতেই

বদ্ধ উত্তপ্ত বায়ু ভিন্ন সহ্য করিতে পারে না। ফলে দিন দিন উক্ত ব্যাধি আরও নানাবিধ ব্যাধির কবলিত হইয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে খড়ের ঘরে এ বিপদ অপেক্ষাকৃত অল্প; কেননা যদিও জানালা দরজা বন্ধ থাকে অথবা এমনও অনেক ঘর আছে, যাহাতে জানালা দরজা আদৌ নাই, তাহাতেও বায়ু চলাচল অনেকটা অবারিত থাকে। খড়ের মধ্য দিয়া বায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে পারে। উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া খড় ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং অন্যান্য স্থান দিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ু গৃহ মধ্যে আসিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পল্লীর বায়ু স্বভাবতঃই অনেকটা নির্ম্মল থাকে বলিয়া রুদ্ধ বায়ুও অনেকক্ষণ নির্ম্মল থাকিতে পারে। শীত কালে নিদ্রা যাইবার পুর্ব্বেও আমরা জানালা দরজা বন্দ করিয়া একত্রে অনেকে কেরোসিনের বা গ্যাস আলোক জ্বালাইয়া বসিয়া থাকি। যদি সে সময়ে কোন লোক বাহির হইতে গৃহে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে একটা বিষম দুর্গন্ধ পাইয়া থাকেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, গৃহের বাতাস দুষিত হইয়াছে। তথাপি আমরা একটা জানালা খুলিয়া দিয়া নির্ম্মল বাতাস গৃহে প্রবাহিত করাইতে ইচ্ছা করি না। ট্রেনে চলাচলেব সময় শীত কালে জানালা বন্ধ না করিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। এক এক খানি গাড়ীতে কত লোক থাকে, তাহাদের কত প্রকার ব্যাধি থাকে। তত্রচ তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা দুষিত বায়ুর মধ্যে থাকিতে আমরা বিন্দুমাত্র আপত্তি করি না। এসম্বন্ধে কোম্পানীও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করে না। বদ্ধ বায়ুতে বাস করার ন্যায় স্বাস্থ্যের অপকারী আর কিছুই হইতে পারে না। আমার মনে হয় যে, যদি আমরা বাল্য-কাল হইতেই মুক্ত বায়ুতে বাস করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অনেক সাংঘাতিক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। শুনিয়াছি জাপানীগণ শীত কালেও ঘরের অন্ততঃ একটা জানালা খুলিয়া দিয়া শয়ন করেন, তাঁহাদের দেশে ফুস্ ফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আজকাল কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয় ও সাধারণের জন্য অন্যান্য অট্টালিকায় বায়ু চলাচলের পথ অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। এক এক গৃহে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্রের অধিক বসিতে পায় না; অবশ্য ইহার ফল কখনই মন্দ হইবেনা বলিয়া বিশ্বাস।

দ্বিতীয় — মুখ গহ্বরের স্বাস্থ্যের দিকে আমরা আদৌ লক্ষ্য করি না। কার্য্যালয়ে ১০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত খাটিয়া হয়ত হাত মুখ না ধুইয়াই অনেকে জল খাবার খাইয়া থাকেন। সমস্ত দিন ধরিয়া মুখে কত ময়লা জমা হইয়াছে। পুর্ব্বে ভুক্ত খাদ্যের যে সমস্ত কণা মুখে থাকিয়া গিয়াছিল তাহারা গলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আদৌ ধৌত না করিয়া তৎক্ষণাৎ খাদ্য উদরস্থ করিলে গলিত খাদ্য কণাগুলি মুখের ময়লা উদরস্থ হইয়া থাকে। প্রভাতে দন্ত ধাবন অভ্যাস অনেকেরই নাই। তাঁহারা স্নানের সময় দন্ত ধাবন করিয়া থাকেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মুখের খাদ্যকণা

পচিয়াছে. প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই দন্ত ধাবন না করিলে নানা উপায়ে সেই সমস্ত দূষিত পদার্থ উদরস্থ হইয়া যায়। অনেকে আবার স্নানের সময়েও কোনরূপে তাড়াতাড়ি দন্ত ধাবন কার্য্য সারিয়া ফেলেন, তাহাতে মুখ আদৌ পরিষ্কৃত হয় না, জিহ্বা অনেকে মাত্র দিয়াই পরিষ্কার করেন। এই সমস্তই স্বাস্থ্যের অন্তরায়। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত দন্ত পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, (Carious teeth) সেই সমস্ত দন্তসাহায্যেই শরীরে যক্ষার জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে নিমের বা ঐরূপ কোন দাঁতন ব্যবহৃত হইত। দাঁতনে দন্ত দৃঢ় হয় বটে, কিন্তু দাঁতন ব্যবহার অনেক সময়-সাপেক্ষ। আজকাল সময়ের অভাব বশতঃ অনেকে ইচ্ছা করিলেও দাঁতন ব্যবহার করিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে টুথ াশ ব্যবহার করা মন্দ নহে। কোমল টুথব্রাশ সহযোগে কোনও উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ টুথ পাউডার দ্বারা দন্ত মার্জ্জন বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে মুখ পরিষ্কৃত হয়, দন্তমূল শিথিল হয় না এবং দন্ত পচিয়া রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের দন্ত ধাবন আদৌ করান হয় না। ইহাতেও যথেষ্ট কুফল ফলে। প্রতিদিন না হইলেও একদিন অন্তর সন্তানের দন্ত মার্জ্জিত করিয়া দেওয়া জননীগণের কর্ত্তব্য।

তৃতীয় — সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আমোদ প্রমোদের ব্যাপারও বিভিন্ন হইয়াছে। থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতিতে আজকাল বাতাস সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে। আমাদের দেশে শীতকালেই যতরূপ বিভিন্ন আমোদ প্রমোদের আমদানী হয়। সার্কাশ, বায়স্কোপ ইত্যাদির বাহুল্য শীত কালেই হইয়া থাকে। চারিদিক বন্ধ করিয়া বায়ুচলাচলের পথ প্রতিহত করিলে, অভ্যন্তর ভাগ মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসে রীতিমত গরম হইয়া উঠে। যখন শরীর রীতিমত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই ক্রীড়া বা আমোদ প্রমোদ শেষ হয়; সেই উত্তপ্ত শরীরে অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগাইলে কিরূপ কুফল ফলে, তাহা অনেক অভিজ্ঞেই অবগত আছেন।

চতুর্থ— বর্ত্তমানে ট্রেণে, বিদ্যালয়ে, রেলওয়ে ষ্টেশনে, সাধারণ আগার প্রভৃতিতে একই গ্লাসে সকলের জল পান অত্যন্ত বিপজ্জনক। কাহার যে কিরূপ ব্যাধি রহিয়াছে, তাহা জানা নাই, অথচ একজন রুগ্ন ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট গ্লাসে আমরা নির্ব্বিকার চিত্তে জল পান করিয়া থাকি। এরূপ স্থলে হস্ত তালুতে জল ধরিয়া পান করা উচিত।

পঞ্চম — এরূপ শুনা গিয়াছে যে, ইউরোপের প্রধান প্রধান সহরে ময়লার গাড়ীর ছাদ থাকে, এবং মিউনিসিপ্যালিটির লোকগণ প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার সময় সমস্ত ময়লা তুলিয়া লইয়া যায়। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। এখানে বেলা ১১টার সময়েও ময়লা ফেলা শেষ হয় না, অধিকন্তু গাড়ীর ছাদ না থাকায়, গাড়ী-

স্থিত-ময়লার দৃশ্য কি বীভৎস ও তাহার দুর্গন্ধ কি বিষম হইয়া উঠে, তাহা কলিকাতাবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। ময়লার গাড়ী হইতে রাশি রাশি মক্ষিকা ও অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি, গলিত জীবে বসিয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করে। এ সম্বন্ধে সাধারণের ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত মক্ষিকা কলিকাতার খাবারের দোকানে খাবারের উপর দিবা রাত্রি বসিয়া থাকে ; আমরা জানিয়া শুনিয়াও এই সমস্ত মক্ষিকা-উচ্ছিষ্ট খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। একটা পচা মূষিক গাত্রে যে মক্ষিকা বসিয়াছিল, সেই মক্ষিকাই খাদ্যের পাত্রে হয়ত উপবিষ্ট হইয়া খাদ্য কণা গ্রহণ করিয়াছে, আমরাও আবার সেই খাদ্যই ভক্ষণ করিতেছি! এইরূপ দোকানের খাবার ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত।

ষষ্ঠ — ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী, বিচারালয় বা এইরূপ সাধারণের গন্তব্য স্থানে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকে যে, "সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য থুতু ফেলা উচিত নহে"। কিন্তু কয়জনে এই আদেশ পালন করিয়া থাকেন। কর্তৃপক্ষগণের এরূপ নিয়ম করা উচিত যে, যদি কেহ এইরূপে থুতু নিক্ষেপ করেন, তিনি আইন অনুসারে দণ্ডিত হইবেন। তাহা হইলে বোধ হয়, এই কদভ্যাস এবং রোগের প্রধান মূল বিদূরিত হইতে পারে। একজন যক্ষাক্রান্ত ব্যক্তি থুতু নিক্ষেপ করিল, তাহা সেই স্থানেই শুষ্ক হইয়া ধূলির আকারে শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিল। আমরা পীড়িত হইব না কেন?—অনেকে রুমালে থুতু ফেলিয়া পকেটে রাখা মন্দ মনে করেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, থুতু ফেলিয়া পরের সর্ব্বনাশ করা অপেক্ষা থুতু রুমালে করিয়া পকেটে রাখা ভাল। তবে যদি পকেটে বহুকাল থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দোষের বিষয় আর কি হইতে পারে। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই সেই রুমাল সাবান বা অন্য কোনরূপে পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

প্রধানতঃ এই সমস্ত ও এইরূপ নানাবিধ কারণে রোগ ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে আরও অনেক বিষয়ে সাবধানতা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যদি উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ে সাবধান হই, তাহা হইলে ব্যাধি এত শীঘ্র দেশ ব্যাপিয়া উঠিতে পারে না।

যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইল তাহা সকলেরই পরিচিত। কিন্তু পরিচিত হইলেও আমরা এ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ করি না বলিয়াই এই কয়েকটি কথার অবতারণা করা হইল। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিবার অভিপ্রায় আছে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার।

আলুর অন্ধত্বের কারণ।

আলুর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাষায় ইহাকে আলুর "চক্ষু" বলে। সময়ে সময়ে চক্ষু গুলি অতি অপকৃষ্ট বা একবারে ধ্বংশ হইয়া যায়। যে আলুর চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই "অন্ধ আলু" বলা হইয়াছে। আলু উপযুক্ত সময়ে বপন করিলে এই চক্ষু হইতেই নূতন বৃক্ষ উৎপাদিত হয়। আমরা যাহাকে বীজ-আলু বলি, তাহাতে চক্ষুর অবস্থা উৎকৃষ্ট থাকে। অন্ধ আলু আদৌ বীজের উপযুক্ত নহে। অন্ধ আলুর খোসা কর্কশ এবং গাঢ় বাদামী বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, এই সমস্ত আলু উন্ন (অর্থাৎ সঁ্যাতা) স্থানে রাখিলে এক প্রকার সূত্রবৎ শিকড়ের ন্যায় পদার্থে আবৃত হইয়া উঠে। ইংরাজীতে ইহাকে মাইসিলিয়াম (mycelium) কহে। এই শিকড় অতি নিম্ন শ্রেণীর এক প্রকার উদ্ভিদ-বিশেষ। অন্ধ আলুকে কর্ত্তন করিলে দেখা যায় যে, আলুর অন্ধত্বের কারণ, এই নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ, মাত্র চক্ষুর নিম্ন স্থানেই ব্যাপিয়া থাকে। এই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত শিকড় প্রবেশ করে। এতদ্‌ভিন্ন সমস্ত আলু বেশ উৎকৃষ্ট থাকে।

এই সমস্ত অন্ধ আলুর কতকগুলিকে শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে (green house) এবং মুক্ত স্থানে বপন করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি পচিয়া গিয়াছে, কতকগুলি পচে নাই বটে, কিন্তু নূতন বৃক্ষ উৎপাদন করিতে পারে নাই। এবং কতকগুলি হইতে নূতন চক্ষু নির্গত হইয়া বৃক্ষ উৎপাদিত হইয়াছে। এই বৃক্ষগুলি প্রথমতঃ বেশ সতেজ বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিন পরেই দেখা যায় বৃক্ষের পত্রগুলি সঙ্কুচিত হইয়া গুটাইয়া যাইতেছে। পাতাগুলির বর্ণ অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণ হরিদ্রা-বর্ণে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, এবং নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বৃক্ষের গাত্রে পূর্ব্বোক্ত মাইসিলিয়ামের কোনরূপ চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল অভ্যন্তর ভাগে বৃক্ষের কাণ্ডে সামান্য সামান্য বাদামী দাগ পরিদৃষ্ট হয়। এই বাদামী দাগগুলি পুরাতন আলু এবং নূতন আলু-বৃক্ষের ভূমধ্যস্থ কাণ্ডে, এবং মাটীর ভিতরের যে সমস্ত শাখা হইতে আলু উৎপন্ন হয়, সেই সেই শাখা ও উৎপন্ন আলু সমস্ত গুলিতেই অল্পে অল্পে ছড়াইয়া পড়ে। পূর্ব্বে মাইসিলিয়ামের কথা বলা হইয়াছে, ইহা এক প্রকার নিম্ন শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ বিশেষের শিকড় স্বরূপ। এই বাদামী দাগ-গুলির কারণ এই উদ্ভিদ। এই উদ্ভিদের পূর্ব্বোক্ত শিকড়গুলি আলুর চক্ষুর ভিতর দিয়া অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে। এক একটি আলু গাছের পত্র গুলি গুটাইয়া যায়, তাহার কারণও পূর্ব্বোক্ত নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ। কয়েক জাতীয় আলুতেই অন্ধত্ব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

আলুর অঙ্কুর এবং আলু বৃক্ষের পত্রের বিকৃতি উভয় রোগেরই কারণ এক। এই সমস্ত বৃক্ষ হইতে যে আলু উৎপন্ন হয়, তাহাতে চক্ষু যথেষ্ট থাকিলেও এবং চক্ষুগুলি সতেজ ও রোগ শূন্য মনে হইলেও সে গুলিকে বীজের জন্য রাখা কখনই উচিত নহে। কিন্তু সে গুলি খাদ্যের উপযুক্ত বটে, আবার খোসা মোটা হইয়া যায় বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত পচিয়া যায় না।

উদ্ভিদ জীবনে আলোকের-প্রভাব।

প্রাণি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, কয়েক জাতীয় অতিক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জীব আলোক ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত উদ্ভিদ হরিৎ, আলোক ব্যতিরেকে তাহারা কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। যে সমস্ত কণা বর্ত্তমান থাকায় পত্র হরিৎ বর্ণ ধারণ করে, তাহাকে ক্লোরোফিল (chlorophyll) কণা বলে। এই সমস্ত কণা হরিদ্বর্ণ। পত্রের এই হরিৎ কণা গুলির উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইলে বায়ু মণ্ডল হইতে পত্রদ্বারা গৃহীত কারবণ ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) বিশ্লিষ্ট হইয়া কারবণ (অঙ্গার) শরীর পুষ্টির জন্য বৃক্ষ গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন (oxygen) বায়ু মণ্ডলে পরিত্যক্ত হয়। আবার শারীরিক বৃদ্ধি এবং নানাবিধ যন্ত্রাদি উৎপত্তির জন্য কেবল হরিৎ উদ্ভিদ নহে, সমস্ত উদ্ভিদেরই আলোক রশ্মি প্রয়োজনীয়।

অঙ্গার উৎপাদন ব্যতীত আর কোন্ অবস্থায়, কোন কোন্ বিষয়ে এবং শারীরিক বৃদ্ধির কোন্ কোন্ অবস্থায় উদ্ভিদের আলোকের প্রয়োজন হয়, সেই সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতেই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই সুচারু মীমাংসা হয় নাই।

প্যারিস নগরে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ তত্ত্ববিৎ বাস্তল কথে সম্প্রতি নানাবিধ পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি কয়েকটি একজাতীয় উদ্ভিদ খোলা জায়গায় রোপণ করিয়া এরূপ পর্দ্দার বন্দোবস্ত করিলেন যে, সেই পর্দ্দার ভিতর দিয়া ইচ্ছাস্বরূপ আলোক-রশ্মি পাতিত করা যাইতে পারে, অথচ বায়ু চলাচলের পথ অবারিত থাকে। যে সমস্ত পদার্থ সূর্য্যের রশ্মি শোষণ করিয়া ফেলে, সেই সমস্ত পদার্থে পর্দ্দা প্রস্তুত করিলে সূর্য্যের রশ্মির ধর্ম্ম ও গুণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া, বিভিন্ন নিবীড়তা বিশিষ্ট ধাতব-তারের জালে পর্দ্দা প্রস্তুত করিলেন।

তিনি নানারূপে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন :—

যে সমস্ত উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ৩ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ১ম প্রকার—যে সমস্ত উদ্ভিদ সামান্য আলোকে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

২য় প্রকার—যে সমস্ত উদ্ভিদ পরিমিত (প্রখরও নহে অত্যল্পও নহে) আলোকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৩য় প্রকার—যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রচুর আলোকে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

উপরোক্ত ধাতব পর্দ্দার ছিদ্রের আয়তন অনুসারে এই তিন প্রকার উদ্ভিদের প্রত্যেকের আলোককে ৫ প্রকার বিভিন্ন তেজঃ-বিশিষ্ট করা হইয়াছিল; এবং অন্ধকারেও বৃক্ষ পালিত হইয়াছিল।

বাত্তল কম্বে লক্ষ্য করিলেন যে, গম বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত প্রখর আলোকের প্রয়োজন এবং মূলা বৃক্ষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোকেরও মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি প্রয়োজন।

প্রথম উৎপত্তি কালে সকল বৃক্ষেরই মৃদু আলোক বা অন্ধকার উপকারী। আলোক অল্প হইলে, মূল অপেক্ষা পত্রে, কাণ্ডে বা বৃক্ষের উপরের দিকের অংশে জলের পরিমাণ অধিক হয়। এই জল আবার সকল অংশেই সমান থাকে না। আলোকের প্রখরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ড স্থূল হইতে থাকে, এবং অনেক শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়। যে সমস্ত বৃক্ষের মৃত্তিকা-অভ্যন্তরস্থ-অংশে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, (আলু, মূলা ইত্যাদি) সেই সমস্ত বৃক্ষ প্রখর আলোক পাইলে, তাহাদের মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ অংশ, আকারে অথবা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। পুষ্পের সৌন্দর্য্য, সমগ্র উৎপন্ন ফলের সংখ্যা, নিরূপিত কালে যতগুলি ফল এককালে পরিপক্ক হইতে পারে, তাহাদের সংখ্যা অপ্রতিরুদ্ধ সূর্য্যালোকে বৃদ্ধি পায়। যে সমস্ত বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত একই প্রকার আলোকের প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা বা অন্য দেশের জল বায়ুর উপযোগী করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যে সমস্ত বৃক্ষের উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত নানারূপ প্রখরতা-বিশিষ্ট আলোকের প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে যে কোন দেশে যে কোন জল বায়ুর উপযোগী করা যাইতে পারে। আরও দেখা যায় যে, আলোক অধিক হইলে উদ্ভিদের যে অংশে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, সেই অংশের বৃদ্ধি হয় এবং আলোক অল্প হইলে পাতা, ডাল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যদি কোন বৃক্ষে কেবল পাতারই প্রয়োজনীয়তা থাকে, যেরূপ পূতিকা শাক ইত্যাদি, সেই সমস্ত বৃক্ষকে প্রখর রৌদ্রে বর্দ্ধিত করিলে তত সুবিধাজনক হয় না।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার।

সিংহল দ্বীপের রত্নরাজি।

"সোণার লঙ্কা" একথা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, রাবণের সৌধতল সুবর্ণ গঠিত ছিল।

কাঞ্চন রজত মণি স্ফটিকে নির্ম্মাণ।
পুরী শোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান॥

*　*　*　*　*

স্বর্ণ রৌপ্য ঘর সব দেখিতে রূপস।
চালের উপরে শোভে কনক কলস॥

*　*　*　*　*

পুরী দেখি রাম চন্দ্র করেন বাখান।
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি হেন রম্য স্থান॥

দিনের পর দিন গত হইয়া, ভাগ্যচক্রে এখন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের হস্তেই সোণার লঙ্কা পরিশাসিত। লঙ্কা দ্বীপে নানাবিধ মণি রত্নের খনি আছে। তথাকার রত্নরাজি দেখিতে অতীব সুন্দর, এবং তথায় বিবিধ প্রকার ও বিবিধ বর্ণের মণি রত্নাদি পাওয়া যায়। এই দ্বীপে হীরক, গোদন্তি, মরকত ইত্যাদি পাওয়া না যাইলেও, এখানে নানাবিধ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল রত্নের অভাব নাই। অনেক সময়ে এমন বহুমূল্য রত্নাদি পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের অনেকেই তাহাদের বিষয় অবগত নহেন।

সিংহলে কোরণ্ডম্ নামক রত্ন প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। লাল ও নীল বর্ণের কোরণ্ডম্গুলি নীলা ও চুণী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত গাঢ় লাল হইতে ঈষৎ লাল, নীল হইতে ঈষৎ আসমানী নীল ইত্যাদি নানাবিধ বর্ণের কোরণ্ডম্ পাওয়া যায়। আর এক প্রকার অতীব সুন্দর নীল আভাযুক্ত পীতবর্ণের কোরণ্ডম্ আছে। উহার বর্ণ দেখিতে অনেকটা উদয় কালীন সূর্য্যের ন্যায়। লঙ্কা দ্বীপে উহা "পট পরগন্" নামে অভিহিত। এখানে ক্বচিৎ সবুজ বর্ণের কোরণ্ডম্ও পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা সচরাচর পাওয়া যায় না। কুইন্সল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী আনাকী নামক স্থানে সবুজ বর্ণের কোরণ্ডম্ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু লাল কিম্বা বেগুণে রং এর সম্পূর্ণ অভাব।

কতকগুলি কোরণ্ডম্ হইতে তারকার আভার ন্যায় দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়, অর্থাৎ ইহাকে অর্দ্ধ-গোলকের ন্যায় করিয়া পরিশোধিত করিলে মনে হয়, যেন ইহার অভ্যন্তরে ষট্কোণ-বিশিষ্ট তারকা আছে, এবং উহার মধ্যস্থল হইতে চতুর্দ্দিকে রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজীতে ইহাকে Asterism কহে। এইরূপ কোরণ্ডম্ মণি কেবল সিংহলদ্বীপেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশেও ইহা কখন কখন অল্প মাত্রায় পাওয়া

যায়। এইরূপ উত্তম মণিগুলি জহুরীগণ অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকেন। ইংরাজীতে উহাদিগকে Asterias কিম্বা Star stone কহে। পীত ও হরিৎ কোরণ্ডমের মধ্য হইতে এরূপ তারকার ছটা বিকীর্ণ হয় না। ইহার কারণ কি তাহা স্থির হয় নাই।

আর এক প্রকার মণি কোরণ্ডমের মত পীত ব্যতীত নানা বর্ণের পাওয়া যায়। ইহাদিগকে স্পাইনাল্ (spinal) বলা হয়। ইহা কতকগুলি চুণী ও নীলার ন্যায়। সেইজন্য উহাদিগকে স্পাইনাল্ চুণী বা স্পাইনাল নীলা বলে। ইহা কোরণ্ডম্ অপেক্ষা কোমল ; এবং হীরক ও তামড়ার (garnet) ন্যায় আলোক-রশ্মি একদিকেই বাহিত করে (single refractive)। অগ্নি শিখার ন্যায় এক প্রকার স্পাইনাল্ পাওয়া যায় ; উহা সৌন্দর্য্যে চুণী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং অধিক মূল্যেও বিক্রিত হইয়া থাকে। ক্রাইসোবেরিল (chrysoberyl) নামক আর একটি সুন্দর উজ্জ্বল নানাবিধ বর্ণের রত্ন পাওয়া যায়। কিন্তু জন সাধারণে উহা তত আদৃত নহে। ইহার কেবল মাত্র দুই প্রকার আদৃত হইয়া থাকে, যথা আলেক্‌জান্দ্রাইট (Alexandrite) এবং সাইমোফেন অথবা ক্যাট্‌স্-আই (রোসেনা— Cymophané or cat's eye)। আলেক্‌জাণ্ড্রাইট দিবসের আলোকে ঈষৎ সবুজ ও রাত্রিতে গাঢ় লাল দেখায়। এই মণি সাইবিরিয়াতেও পাওয়া যায়। কিন্তু সিংহলেই ইহার প্রাচুর্য্য অধিক। সাইমোফেন অথবা ক্যাট্‌স্-আই (রোসেনা) অতীব সুন্দর। ইহাকে কুব্জ-পৃষ্ঠের ন্যায় কাটিয়া পরিশুদ্ধ করিলে, ইহাতে আলোক-রশ্মি পতিত হইয়া এরূপ ভাবে প্রতিফলিত হয় যে, দিবাভাগে বিড়ালের চক্ষুর তারকা যেমন দেখায়, রোসেনাও দেখিতে অবিকল সেইরূপ হইয়া থাকে ; সেই জন্যই ইহাকে ইংরাজিতে Cat's eye বলে। এই "বিড়াল চক্ষু" রত্নগুলি (রোসেনা) কেবল সিংহল দ্বীপেই পাওয়া যায়। যে ক্যাট্‌স্-আই বা রোসেনা গুলি আলেক্‌জাণ্ড্রাইটের মত সবুজ হইতে লাল বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়, সেগুলি অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। অনেক-ভ্রম বিশ্বাসী সিংহলবাসীরা মনে করিয়া থাকেন যে, কোন প্রেত-যোনী ইহার মধ্যে বাস করে। কোন জন্তুর চক্ষুর সহিত (এ স্থলে বিড়াল) ইহার সৌসাদৃশ্যই এই বিশ্বাসের মূলীভূত কারণ।

"জারগন্" বা "জিরকন্" নামে পীত হইতে সবুজ বর্ণের আর এক প্রকার রত্ন পাওয়া যায়। ইহার রং অতীব মনোহর ও ঔজ্জ্বল্যে হীরকের সমকক্ষ হইলেও ইহার তত সমাদর নাই। ইহার কারণ বোধ হয়, এই মণি অনায়াস প্রাপ্য।

এক্ষণে এই বহুমূল্য রত্নগুলি কিরূপে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। নদী-তীর বা খনি হইতে উত্তোলিত হইবার পর ললনাগণের অঙ্গ শোভা করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা ভিন্ন ভিন্ন কারিকরের শিল্প শালায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই প্রস্তর সকল উত্তোলন করিয়া "কাটাই", "পালিশ"

এবং অবশেষে বিক্রয় করা পর্য্যন্ত একটি অতি সুন্দর লাভ জনক ব্যবসা। এই ব্যবসা কতকগুলি কৃষ্ণকায় অর্দ্ধ শিক্ষিত মুসলমানের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহারা "মুর" নামে অভিহিত। এই মুরগণের মধ্যে অনেকেই বিপুল ধনশালী। এই ধনশালী ব্যবসায়িগণ কেবল বহুমূল্য রত্নাদি ক্রয় করিয়াই নিরস্ত থাকেনা, অনেক সময়ে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন রত্নপ্রসূ স্থানে রত্নের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়া থাকে। ক্রেতা ব্যতীত বিজাতীয় লোকদিগের কারখানায় প্রবেশ অধিকার নাই। প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫,০০,০০০ টাকার মণি আমেরিকা ও ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে।

চিত্র ৮।

প্রায় সমস্ত মহামূল্য প্রস্তরই প্রাচীন কালে আগ্নেয়গিরী উৎক্ষিপ্ত পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত। এই পর্ব্বতের কতকগুলি প্রস্তর "চকমকীর' প্রস্তরের ন্যায় অতিশয় কঠিন এবং কতকগুলি শ্লেটের ন্যায় নরম, এবং স্তরে স্তরে খুলিয়া যায়। এই প্রস্তরগুলি

চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হইতে কালে এইরূপ মহামূল্য রত্নে পরিণত হয়। তখন বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া ক্রমে পলি-পূর্ণ স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই পলি-পূর্ণ স্থানকে সিংহলে "ইল্লাম" কহে। ইল্লামকে ৩ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত খনন করিয়া ইহাদিগকে উত্তোলিত করা হয়। খনি হইতে উত্তোলন কালে প্রায় সকল রত্ন গুলিই দাগী থাকে। কোনটিই বিশুদ্ধ নির্ম্মল থাকে না। জলের স্রোতে বাহিত হইয়া সকল গুলিই অধিক বা অল্প মাত্রায় দাগী হইয়া যায়। যখন ইল্লাম বহু নিম্নে থাকে, তখন উহাদিগকে লাটাখাম্বার দ্বারা (১ম চিত্র) উত্তোলিত করা হয়, এবং নিকটবর্ত্তী নদী কিম্বা জলাশয়ে ধৌত করা হয়। ইল্লামের নিম্নতলস্থ পরিত্যক্ত প্রস্তর রত্ন-গর্ত্তগুলি প্রায় জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ জল পরিপূর্ণ গহ্বরগুলি অনেক সময়ে আবার অন্যান্য রত্ন প্রস্তারাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইল্লামের মধ্যে ছোট ছোট প্রস্তরগুলি পীত ও রক্ত কর্দ্দমে আচ্ছন্ন থাকে। উহারা প্রায় শুষ্ক অবস্থায় জমীর উপরে উত্তোলিত হয়। কিন্তু যদি ঐ রত্ন গহ্বরগুলি নিকটবর্ত্তী কোন নদী অপেক্ষা নিম্নতর-স্তরে থাকে, তাহা হইলে ঐ ইল্লাম-শুষ্ক না হইয়া প্রায় আর্দ্র ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও ইল্লামের স্তরগুলি জমীর উপরিভাগেও দৃষ্ট হয়। ইহা প্রায় নদীর তীর-ভূমিতেই অবস্থিত। প্রায় অক্টোবর মাস হইতে মার্চ্চ মাস (আশ্বিন হইতে চৈত্র) পর্য্যন্ত এই রত্ন অন্বেষণ করা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে গোল চালনীর ন্যায় ঝুড়িতে ধৌত করা হয়। সিংহলদেশ বাসিরা হাঁটু পর্য্যন্ত জলে নামিয়া ঐ ঝুড়িটি ধরিয়া ঘুরাইতে থাকে, (২য় চিত্র) এবং

২য় চি।

মধ্যে মধ্যে জলের অভ্যন্তরে উহা কাত করিয়া ধরে। ঐ সময়ে লঘু প্রস্তরগুলি জলের সহিত ভাসিয়া যায়, এবং ভারি গুলি ঝুড়ির মধ্যে থাকে; এইরূপে অনেকগুলি ঝুড়ি ধৌত করিলে সময়ে সময়ে কখনও কখনও দুই একটি মহামূল্য রত্ন পাওয়া যায়; নতুবা অল্প মূল্যের রত্নই অধিক। যদি দৈবাৎ একটি মহামূল্য রত্ন আবিষ্কৃত হয়, তহা হইলে

ঐ লোকদিগের মধ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ক্রেতাগণ অযথারূপ উচ্চ মূল্য বলিয়া পরস্পরকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করে। পরে ক্রমাগত বিনিময় দ্বারা হস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে চৌর্য্য বৃত্তিটা বিলক্ষণ রূপেই চলে, এবং স্বত্বাধিকারীকে ফাঁকি দিবার জন্য বহুমূল্য প্রস্তরের পরিবর্ত্তে অল্প মূল্যের প্রস্তর রাখা হয়। এই জন্য কর্ম্মচারীদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

এই ব্যবসা সিংহল দেশবাসীরা অতীব সাবধানতার সহিত চালাইয়া থাকে। উহারা কাহাকেও আভ্যন্তরিক ব্যাপার জানিতে দেয় না। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশবাসীর পক্ষে উহাদের ব্যবসার ভিতরের অবস্থা জানা অতীব দুরূহ ব্যাপার। সিংহলদেশবাসীরা কুসংস্কারের অত্যন্ত বশীভূত, এবং নানাবিধ ভূত প্রেতের বিষয় বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাহারা কখনই স্ত্রীলোকদিগকে প্রস্তর খনির নিকটে আসিতে দেয় না। কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, তাহাতে নিশ্চয়ই অনিষ্ট সংঘটিত হইবে।

সিংহল দ্বীপের অনেকগুলি বহু বিস্তৃত স্থানে রত্ন আছে। কিন্তু সাফ্রাগন্ (Saffragon) পার্ব্বতীয প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সাফ্রাগণ প্রদেশের নগরের নাম রত্নপুর। বোধ হয় বহু মূল্য রত্নাদি পাওয়া যায় বলিয়া, নগরের ঐরূপ নাম হইয়াছে।

৩য় চিত্র।

সিংহল-দেশ-বাসীরা প্রস্তরগুলি ভাল করিয়া কাটিয়া এবং পালিশ করিয়া তবে বিক্রয়ের জন্য বাহির করে। তাহার পূর্ব্বে কোন মতেই বিক্রয় করা হয় না। কারণ তাহারা [illegible] চায় যে, উহাদের মূল্য কত দূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। আরও তাহারা ইচ্ছা [illegible] না যে, ইউরোপীয় ব্যক্তিগণ অধিকাংশ প্রস্তরগুলি লইয়া গিয়া বিশুদ্ধ করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবে। সিংহল দেশীয় লোকেরাই প্রস্তরগুলি কাটিয়া পালিশ করে।

সানচক্রের ন্যায় একখানি সীসচক্রের একধারে কিঞ্চিৎ এমারী প্রস্তরের গুঁড়া দেওয়া থাকে। পালিশ করিবার সময় রত্নগুলি বাম হস্তে ঐ এমারী দেওয়া চক্রের একধারে চাপিয়া ধরিয়া রাখা হয়, এবং দক্ষিণ হস্তে ধৃত রজ্জু সংযুক্ত যষ্টি দ্বারা ঐ সানচক্র চালিত হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং ইহার কার্য্য প্রণালী অতীব সহজ। চুরী যাহাতে না হয়, সেই জন্য কখনও কখনও একজন লোকে তত্ত্বাবধারণ করে (৩য় চিত্র)। যাহাতে এই প্রস্তর গুলির গুরুত্ব এবং আকৃতি অল্প না হয়, সেইজন্য প্রস্তর কর্ত্তন কারীরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে, কাজেই ঔজ্জ্বল্য ও দর্শন-সৌষ্ঠবের দিকে একবারেই দৃষ্টি রাখে না। ইহারা এরূপ ভাবে প্রস্তর গুলি কাটে যে, তাহাদের দাগ অদৃশ্য ভাবে কোথায় থাকে কিছু বুঝা যায় না। ইহারা বর্ণের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমভাবে কাটায় গুণে উহা প্রায় সমান দেখায়। এই সকল লোক দ্বারা প্রস্তুত করা প্রস্তর গুলি পাশ্চাত্যদেশে তত আদরণীয় হয় না। কারণ উচ্চ মূল্যের অলঙ্কার গুলিতে উহার ব্যবহার অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে। ঐ কারণ বশতঃ উহাদিগকে পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ পুনরায় কাটিয়া লয়। মোটামুটি দেখিলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশ-

৪র্থ চিত্র।

বাসীদের কাটিবার যন্ত্র সিংহল দ্বীপ-বাসীগণের যন্ত্র হইতে বিশেষ পৃথক নহে তাহাদের যন্ত্রটি তামার, ও হীরকের গুঁড়া দ্বারা নির্ম্মিত, এবং খাড়াই না ঘুরাইয়া, শোয়ান ভাবে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা না ঘুরাইয়া বামহস্তের দ্বারা ঘুরান হয় (৪র্থ চিত্র)। প্রস্তরটি আবলুস্ কাঠের হাতল দিয়া ধৃত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চক্রের উপর ধীরে ধীরে স্পর্শ করা হয়। যদিও যন্ত্রটি দেখিতে অতি সামান্য বটে, তথাপি ভাল করিয়া কাটিতে হইলে বিশেষরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক করে।

সম্পাদক।

টাইটানিক।

সমস্ত সভ্যজগতই "টাইটানিক" অর্ণবপোত ধ্বংশ হওয়ায় চমকিত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় সংবাদ পত্রেই এই দুর্ঘটনার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। টাইটানিক ইংলণ্ডের অন্তর্গত সাদাম্‌টন্ বন্দর হইতে গত ১০ই এপ্রিল, বুধবার নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করে। এই অর্ণব-পোতের ইহাই প্রথম অথবা শেষ যাত্রা। রবিবার ১০টা ২৫ মিনিটের সময় (আমেরিাকর ঘটিকা অনুসারে ; আমেরিকার সময় গ্রীনউইচ সময় অপেক্ষা ৪ ঘণ্টা (slow) কম) সেব্‌ল্ দ্বীপ ও রেশ অন্তরীপের মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড তুষার শৈলের সহিত ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যতগুলি অর্ণবযান বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে টাইটানিক জাহাজই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৮৮২ ফিট ৬ ইঃ, খোল হইতে সর্ব্বোচ্চ পাটাতন পর্য্যন্ত উচ্চতা ১০৫ ফিট ৭ ইঃ। Evening News পত্রিকায় ইহার আকৃতি বিবরণ যেরূপ লিখিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

The Titanic's frame-works were specially forged and constructed, the deck and shell-plating were of the heaviest calibre, so as to make the hull a monument of strength. ... .. The Titanic's transverse bulkheads number fifteen. ...... The builders state that any two of these compartments might be flooded without in any way involving the safety of the ship. Relative to the closing of the water-tight doors, the official description issued by the White Star Line when the Titanic was launched states these are electrically controlled. Those giving communication between the various boiler rooms and engine rooms are arranged on the drop system — Harland and Wolff's special design. Each door is held in the open position by a friction clutch which can be instantly released by means of a powerful electric magnet controlled from the captain's bridge, so that in the event of accident, the captain can, by simply moving an electric switch, close the doors throughout, practically making the vessel unsinkable. Precaution floats are provided beneath the floor level which in the event of water accidentally entering any of the compartments, automatically lift, and thereby close, the doors opening into that compartment if they have not already been dropped by those in charge of the vessel. A ladder or escape is provided in each bed room, engine room and similar watertight compartments in order that the closing of the doors at any time should not imprison the men ; though the risk of this is lessened by electric bells placed in the vicinity of each door, which ring prior to their closing, and thus give warning to those below,

ইহার কর্ণের (rudder) দৈর্ঘ্য ৭৮ ফুট ৮ইঃ প্রস্থ ১৫ ফুট ৩ ইঞ্চ এবং গুরুত্ব ১০১ ১/৪ টন। মধ্যনঙ্গরের ভার ১৫ ১/২ টন, পার্শ্ব-নঙ্গরের প্রত্যেকটির ভার ৮ টন, মধ্য-নঙ্গরের লৌহ শৃঙ্খলে ২৯০ টন ভার পড়িলে ছিড়িতে পারে এবং ইহার দৈর্ঘ্য ৩৩৫ ফ্যাদম। জাহাজটি সর্ব্বশুদ্ধ দশতল ; সমস্ত গুলিই সুদৃঢ় ইস্পাতে নির্ম্মিত। নিম্নতলের নাম লোয়ার অর্লপ্, তদূর্দ্ধে অর্লপ্, লোয়ার, মিড্‌ল্, আপার, সেলুন, শেণ্টার, ব্রিজ, প্রোমিনেড, এবং সর্ব্ব উর্দ্ধে বোট। ব্রিজ নামক পাটাতনের দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফিট, এবং প্রোমিনেড ও বোট নামক পাটাতনের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফিটেরও

অধিকতর। ইহাতে ৬৫০টি প্রথম শ্রেণীর গৃহ, ৭৫০ জন প্রথম শ্রেণীর, ৫৫০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ১,১৫০ জন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ও জাহাজের কর্ম্মচারী সমেত মোট ৩,৫০০ যাত্রীর স্থান ছিল। ইহার ভোজনাগার এত বিস্তৃত যে, এককালে ৫৫০ জন প্রথম শ্রেণী, ৪০০ জন দ্বিতীয় শ্রেণী, ৫০০ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী একসঙ্গে ভোজন করিতে পারিত। কাপ্তেন এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীর আবাস এবং তার বিহীন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণের গৃহ সর্ব্ব ঊর্দ্ধ বোট নামক পাটাতনের উপর স্থাপিত ছিল। জাহাজ নির্ম্মাণে ২,৬২,৫০,০০০ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল। ইহাতে মোট ১২,৫২,৩৫০ মণ বোঝাই চাপান' যাইতে পারিত। স্নানাগার, টেনীস খেলিবার স্থান, এবং তৎসংলগ্ন দর্শকের গ্যালারী, নির্জ্জন বিহার স্থান, মল্ল স্থান, টার্কিশবাথ এই কয়েকটিই জাহাজের অনন্য সাধারণ ছিল। জাহাজে প্রথম শ্রেণীতে ৩১৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২১৯ জন, তৃতীয় শ্রেণী ৬৯৮ জন, এবং কর্ম্মচারী ৯০৩ জন, সর্ব্বসমেত ২,১৯৬ জন যাত্রী আরোহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৮৬৮ জনের জীবন রক্ষা হইয়াছে। টিটানিকের অধিকাংশ যাত্রীই সভ্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অধিকাংশই আমেরিকান্ এবং ইংরাজ।

মিঃ বিস্লি বলেন যে, তুষার শৈলের আঘাতে "টাইটানিকের ন্যায় প্রকাণ্ড দুর্ভেদ্য অর্ণবপোতের অগ্র ভাগ উৎক্ষিপ্ত হইয়া না পড়িলে জাহাজ কিছুতেই নিমজ্জিত হইত না। তুষার শৈলের সহিত সংঘর্ষের পর, প্রায় ৫ মিনিট কাল জাহাজ জলের উপর প্রায় লম্ব ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। পরে ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বক্র হইয়া প্রায় ২॥ ঘণ্টার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ টাইটানিক তুষার শৈলের পার্শ্বদেশ দিয়া গমন করিতেছিল, এবং বাস্তবতঃ জাহাজ ধ্বংশরে কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তুষার শৈলের পার্শ্বদেশ জলের মধ্যে অদৃশ্য ভাবে ঠিক একটা সেল্ফের (shelf) মত বিস্তারিত ছিল। তাহার আঘাতেই জাহাজ ভগ্ন ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কারপ্যাথিয়া নামক জাহাজই ৭০৫ জন লোকের জীবন রক্ষা করিয়া ছিল। জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিলে, ব্যাণ্ড-বাদক দল "Nearer, my God, to thee' এই সঙ্গীত বাদন করিতে করিতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়াছিল।

নিম্নে কতিপয় বিখ্যাত মৃতের নাম লিখিত হইল:—

কর্ণেল জে, জে, আষ্টর — পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন কুবের।

উইলিয়াম ষ্টেড —Review of Review নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক।

হাওয়ার্ড বি, কেস্ — Vacum Oil Co. র Managing Director এবং স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে নিরাপদে লাইফ বোটে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

[illegible] — টাইটানিক নির্ম্মাতাগণের director.

খৃষ্টপার হেড — চেলসীর মেয়র। ইত্যাদি।

স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণের জীবন রক্ষা কল্পে পুরুষগণ যেরূপ ধীরতা, আত্মত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। কয়েকটি রমণীও স্বামী বিয়োগে জীবন ধারণ অসহ্য জ্ঞানে পরিত্রাণের যথেষ্ট উপায় থাকিলেও, স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে আদৌ অভিলাষিণী না হইয়া স্বামীর সহিত একসঙ্গে প্রাণত্যাগ করিয়া পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

আটল্যাণ্টিক মহাসমুদ্রে যে স্থানে টাইটানিক নিমজ্জিত হইয়াছে।

হিমশিলা কি?—যাহার প্রচণ্ড আঘাতে দুর্ভেদ্য অর্ণবপোতও ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার শক্তিই বা কিরূপ, তাহাও অনেকেরই জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। ইংরাজীতে হিমশিলার নাম আইস বার্গ (Ice berg)। আইস (Ice) শব্দের অর্থ জল জমা তুষার, বার্গ (Berg) জারমান কথা, অর্থ পর্ব্বত; আইস বার্গের প্রকৃত বাঙ্গলা হিমশিলার পরিবর্ত্তে তুষার-শৈল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা গ্রীষ্ম মণ্ডলে বাস করি, অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীর এই মণ্ডলে সর্ব্বদাই বিরাজিত থাকে, কাজেই এই স্থান অত্যন্ত উষ্ণ। কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলেরও যত ঊর্দ্ধদেশে গমন করা যায়, ততই উষ্ণতা হ্রাস হইতে থাকে, অবশেষে এমন এক স্থানে আগমন করা যায় যে, তথায় তাপমাত্রা ০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সকলেই অবগত আছেন যে, জল ঐ তাপমাত্রায় জমিয়া বরফ হয়। যে উচ্চতায় জল জমিয়া যায়, সেই উচ্চতাকে পৃথিবীর হিম-রেখা বলে। যে সকল প্রদেশের পর্ব্বতমালা হিম-রেখারও ঊর্দ্ধে গমন করে, তাহাদের শিখর দেশ চিরতুষারে আবৃত থাকে। পর্ব্বতের শিখরে জল না থাকিলেও, কিরূপে বা কোথা হইতে তুষার উৎপাদিত হয়, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পই জমিয়া তুষার হয়। এই হিম-রেখা যত মেরু-প্রদেশের দিকে অগ্রসর হয়, ততই নিম্ন হইয়া,

মেরু প্রদেশে একবারে-সমুদ্র-বক্ষে মিলিত হইয়াছে। একবার ভাবিলেই হিম রেখার একটা কল্পনা হইয়া যাইবে। এই কল্পিত রেখা একটা প্রকাণ্ড গম্বুজের ন্যায়, তাহার দুই প্রান্ত দুই মেরু-প্রদেশে স্থাপিত; গ্রীষ্ম মণ্ডলে তাহার উচ্চতা ১৫,০০০ হইতে ১৮,০০০ ফিট এবং তাহার মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ পর্ব্বত শৃঙ্গই অবস্থিত। অবশ্য কোন আশ্রয় না পাইলে তুষার জমিতে পায় না; শূন্যে তুষার ঝুলিতে পারে না। কাজেই গ্রীষ্ম-মণ্ডলে হিম-রেখার উপরে উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ ব্যতীত বরফ জমে না। কিন্তু মেরু প্রদেশে সমুদ্রই জমাট বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড তুষার-প্রান্তর হইয়া উঠে। হিম-রেখার উপরে জল অতি অল্প বাষ্পীভূত হয়। কাজেই বরফ বিগলিত হইবার উপায় থাকে না এবং বরফের ভারের পরিমাণেরও আদৌ হ্রাস হয় নাই। বরফ একই স্থানে থাকিয়া থাকিয়া নিজের চাপেই অতি কঠিন ও দৃঢ় হয়। এ বৎসর যতটুকু বরফ ছিল, পরবর্ত্তী বৎসর তাহার উপরেই আবার বরফ জমিতে থাকে; এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইলে, বরফের ভার এত অধিক হয় যে, পর্ব্বত শৃঙ্গাদি আর সে ভার সহ্য করিতে পারে না, তুষার-শৈল ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার পতন কালে সম্মুখে যাহা পড়ে, তাহাই ধ্বংস হইয়া যায়।

গ্রীনল্যাণ্ডের প্রায় ৪,০০,০০০ বর্গ মাইল ভূভাগ এবং দক্ষিণ-মেরু প্রান্তস্থিত সমস্ত ভূভাগই বরফের ক্ষেত্র। এই সমস্ত প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময় অনেক তুষার-শৈল স্থানচ্যুত হইয়া সমুদ্রে আসিয়া পড়ে। প্রবন্ধে যে তুষার শৈলের প্রতিকৃতি দেওয়া হইল, তাহা হইতে ইহার আকৃতি ও ভীষণতার কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত তুষার-শৈল দেখিতে অতি মনোরম। দূর হইতে মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড মর্ম্মর পর্ব্বত; ছায়া ও আলোকের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র দৃশ্য বিভাসিত হয়। ভীষণ তরঙ্গাঘাতে জলোচ্ছ্বাস ধ্বনি অথচ তুষার-শৈলের ধীর মন্থর গতি ও প্রশান্ত মূর্ত্তি মনেএক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে।

Scientific Ammerican নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ইহাদের আকৃতি-বিবরণী এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল:— The weird pinnacles, spires, domes, minarets, and peaks that remind one of Castles fashioned by some genius for the pleasure of some whimsical fairy princess, find their courterpart in unseen, outlying spurs that project under water and that are fully as dangerous as any reef."

ইহার ৯ ভাগ জলে ডুবিয়া থাকে এবং মাত্র এক ভাগ উপরে ভাসিতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রকাণ্ড তুষার-ক্ষেত্রের অংশই তুষার-শৈল। তুষার-ক্ষেত্র অল্পে অল্পে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অগ্রবর্ত্তী অংশ ভগ্ন হইয়া তুষার শৈলের আকারে সমুদ্রে ভাসিয়া যায়। ইংরাজীতে ইহাকেই calving বলে। সমগ্রবর্ষ ব্যাপিয়া তুষার-শৈল সমুদ্রে আসিয়া পড়ে, তবে গ্রীষ্মেই ইহাদের অতিশয় আধিক্য হইয়া থাকে। আটল্যান্টিক মহাসমুদ্রে যে সমস্ত তুষার-শৈল ভাসিয়া আসে তাহাদের উৎপত্তি স্থান গ্রীনল্যাণ্ডের তীর-ভূমী। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌শ হাইড্রো-

গ্রাফিক অফিস হইতে যে দৈনিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে ইহাই বুঝায় যে, এপ্রিল, মেএবং জুন মাসে ৩০ ডিগ্রি নিরক্ষান্তর রেখা পর্য্যন্ত এবং ৪৮ ডিগ্রি ৩৮ মিনিট গ্রীণউইচ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত তুষার-শৈল ভাসিয়া আসে। বস্তুতঃ ৪০ ডিগ্রি উত্তর নিরক্ষন্তর রেখা পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় সকল সময়েই তুষার-শৈলের সহিত জাহাজের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

তুষার-শৈলের প্রায় ৯ ভাগ জলে ডুবিয়া থাকে।

ল্যাব্রাডর হইতে যে সমুদ্র-স্রোত দক্ষিণ দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, তাহাতেই তুষার শৈল ভাসিয়া আসে। তবে শৈলের পথে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে ; আর্টিক তীরভূমীতেই তুষার-শৈল সময়ে সময়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। লাব্রাডরের তীরভূমীতেও সময়ে সময়ে আবদ্ধ হইয়া নষ্ট হয়, আবার কতকগুলি একবারে সম্পূর্ণ বিগলিত হইয়া যায় ; এতদ্ব্যতীত তুষার-শৈলের এই পথে অসংখ্য দ্বীপ, উপসাগর, খাঁড়ী, চড়া, অন্তরীপ, নিমজ্জিত পর্ব্বত মালা থাকায়, অধিকাংশ তুষার শৈলই বিধ্বংশ হইয়া যায় ; নতুবা আটল্যান্টিক্ মহাসাগরের উত্তরাংশ তুষার শৈলের নগর হইয়া পড়িত। একটা সাধারণ তুষার-শৈলের জলের উপরি ভাগে কেবল প্রাচীরের উচ্চতা ৬০ হইতে ১০০ ফিট। তাহার উপর আবার শিখর ইত্যাদি রহিয়াছে। মোট জলের উপরি ভাগ হইতে শিখর-প্রান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ২০০ হইতে ২৫০ ফুট হইয়া থাকে এবং ইহার বিস্তার ৩০০ হইতে ৫০০ গজ। ইহাই সাধারণ একটা তুষার-শৈলের জলের উপরিভাগের আয়তন, তাহার উপর আবার এই পরিমাণের প্রায় ৯ ভাগ জলে ডুবিয়া থাকে। তাহা হইলে একটা প্রকাণ্ড তুষার শৈল কিরূপ হইতে পারে, তাহা আনায়াস বোধ্য।

যে পথে ইউরোপ ও আমেরিকা এই বিখ্যাত মহাদেশদ্বয়ের অর্ণবপোত সমূহ যাতায়াত করে, তাহা তুষার-শৈল-সমাকুল। যদি কোন কাপ্তেন তুষার-শৈল অবলোকন করেন, তাহা হইলে তিনি তার-বিহীন-তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ করিয়া নিকটস্থ জাহাজ সমূহকে, শৈলের অস্তিত্বের সংবাদ দেয়। এই উপায়ে ওয়াসিংটনস্থ ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্ হাইড্রোগ্রাফিক অফিসে ইহার সংবাদ উপস্থিত হয়। এই অফিস হইতে প্রতিদিন এইরূপ সামুদ্রিক বিপদ সমূহের সংবাদ আটল্যান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর এবং মেক্সিকো উপসাগরস্থ শাখা অফিস সমূহে প্রেরিত হয়। তথা হইতে অর্ণবযাত্রী জাহাজ সমূহ সংবাদ গ্রহণ করিয়া সতর্ক হইয়া থাকে, এবং সমুদ্র মধ্যস্থ জাহাজ সমূহও তার-বিহীন-তড়িৎ-বার্ত্তা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করিয়া সতর্ক হয়। ধ্বংসের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে টাইটানিকও আমেরিকা নামক জাহাজ হইতে দুইটি ভীষণ তুষার-শৈলের সংবাদ পাইয়াছিল।

তুষার শৈল ও তাহার পার্শ্বে অর্ণবপোত। উভয়ের অবয়বের তুলনা।

পূর্ব্বোক্ত হাইড্রোগ্রাফিক অফিস হইতে, কি কি চিহ্ন দ্বারা তুষার-শৈলের আগমন বা অস্তিত্ব সূচিত হইতে পারে, তাহাদের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

(১) তুষার-শৈল বস্তুতঃ নয়ন গোচর হইবার পূর্ব্বেই একটু আলোক-জ্যোতিঃ নয়নে প্রবেশ করে। এই জ্যোতিঃ সূর্য্য বা চন্দ্র কিরণ প্রতিফলিত হইয়া দর্শকের অভিমুখে প্রতিবাহিত হয়। (২) নির্ম্মল দিবসে তুষার শৈলের ঊর্দ্ধস্থ দিম্মগুলের বর্ণ প্রায়ই মস্তকের উপরিস্থিত আকাশের বর্ণ অপেক্ষা অল্প অনুজ্জ্বলতর হইয়া থাকে। (৩) অত্যধিক ঔজ্জ্বল্যের জন্য নির্ম্মল দিবসে এবং জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে বহুদূর হইতেই তুষার শৈল নয়ন গোচর হইয়া থাকে। (৪) কুজ্ঝটিকা পূর্ণ দিবসে বহুদূর হইতে তুষার শৈল যেন কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হয়। (৫) সমুদ্র মধ্যে জাহাজের বংশী-ধ্বনীর যদি প্রতিধ্বনী হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, এই প্রতিধ্বনীর কারণ তুষার-শৈল। বংশী-ধ্বনী ও তাহার প্রতিধ্বনীর অন্তবর্ত্তী এই সময়-ব্যবধানের সহিত ৫৫০ গুণ করিলে যে গুণ ফল হয়, জাহাজ হইতে মোটামুটি তত ফিট দূরে তুষার শৈল আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। (৬) তুষার-শৈল ভগ্ন হইয়া সমুদ্রে পতনকালে দূরস্থিত কামান গর্জ্জনের ন্যায় একরূপ শব্দ সমুত্থিত হয়। (৭) নিকটে তুষার থাকিলে দলে দলে শীল এবং নাগরিক

পঙ্ক্তি-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। (৮) শৈল সন্নিধানে বায়ু-মণ্ডলের তাপমাত্রা অল্পতর হয়, কিন্তু তুষার অত্যন্ত নিকটস্থ না হইলে তাপমাত্রার প্রভেদ বুঝা যায় না। (৯) সময়ে সময়ে সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা অল্পতর হইয়া যাইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তুষার শৈল নিকটস্থ হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের যে সমস্ত স্থানে শীতল ও উত্তপ্ত উভয় বিধ অবস্থার সংমিশ্রিত সামুদ্রিক স্রোত প্রবাহিত হয়, তুষার-শৈল সন্নিহিত হইলে সেই সেই স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বায়ু-মণ্ডল এবং সমুদ্রের জলের ঘন ঘন তাপ-মাত্রা গ্রহণ করিলে এবং তাপ মাত্রার অল্পতা বা আধিক্যের কারণ অনুধাবন করিলে, তুষার শৈলের অগ্রগমন অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

তুষার জলেরই অবস্থান্তর। জল হইতে উত্তাপ অপসারিত করিলে জল কঠিন হইয়া বরফ হইয়া থাকে। তুষার শৈল এই বরফেরই প্রকাণ্ড অংশ। বরফ যে পদার্থ জলও তাহাই। তুষার-শৈল বা বরফ জলে ভাসে কেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। তথাপি ইহার পুনরুল্লেখ করা গেল। উত্তাপ পাইলে প্রায় সকল পদার্থই প্রসারিত, এবং শীতলতায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। জলও শীতল করিলে সঙ্কুচিত হয়। সঙ্কোচ শব্দের অর্থ আয়তনের হ্রাস। একটা পদার্থ পূর্ব্বে যতটা স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই পদার্থ যদি তাহা অপেক্ষা অল্পতর স্থানে থাকে, তাহা হইলে ইহাই বুঝায় যে, সেই পদার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নিবিড় বা ঘন হইয়াছে। কাজেই জল শীতল করিলে তাহার আয়তনের হ্রাস হয়। ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্য্যন্ত জল সঙ্কুচিত হইয়া নিবিড়তম হইয়া উঠে। এই তাপমাত্রার কোন আয়তনের জল অবশ্যই অধিক তাপমাত্রার সম আয়তন জল অপেক্ষা গুরুতর। ৪° ডিগ্রি তাপমাত্রার
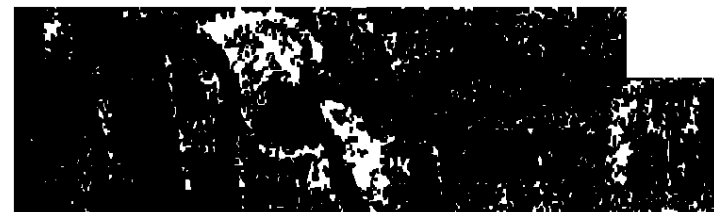
টাইটানিকের একটি কক্ষ।

অপেক্ষা জলের তাপমাত্রা আরও হ্রাস করিলে জল ক্রমে ক্রমে ০° ডিগ্রিতে আসিয়া বরফ হইয়া যায় বটে, কিন্তু জল সঙ্কুচিত না হইয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হইতে থাকে। অর্থাৎ বরফের তাপমাত্রা ০ ডিগ্রি বা তদপেক্ষা অল্পতর, তথাপি একসের ফুটন্ত জলে (১০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা) যতটুকু স্থান অধিকার করে, ফুটন্ত জলের এক সেরকে বরফে পরিণত করিলে, সেই বরফ তদপেক্ষা অধিকতর স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সেই জন্যই বরফ জলে ভাসে।

যে সমস্ত প্রকাণ্ড তুষার-শৈল হিম-মণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রে পরিচালিত হয়, তাহারা যে পথে অর্ণবপোত সমূহ আটল্যান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে, সেই পথে গ্রীষ্মের পূর্ব্বে প্রায়ই আসিয়া উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি যে সমস্ত তুষার শৈল দৃষ্ট হইতেছে, সে গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে তুষার-স্তূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মধ্য পথে পুনরায় স্থানীয় বরফের দ্বারা ধৃত হইয়া রহিয়া ছিল ; এবং সেই বরফ বিগলিত হইবার পরেই পুনরায় ভাসিতে আরম্ভ করিয়া অর্ণবপোতের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। এপ্রিল মাসে আটল্যান্টিক মহাসাগরের যতটুকু জল জমিয়া থাকে, তাহার ১৪ মাইল দক্ষিণ দিক দিয়া টাইটানিক গমন করিতেছিল। আটল্যান্টিক মহাসাগরের অর্ণবপোত সমূহে দুই ঘণ্টা অন্তর সমুদ্র জলের তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করা হয়। ডাক্তার মিলের মতে ইহা অপেক্ষাও ঘন ঘন তাপমাত্রা লিপিবদ্ধ করা উচিত। এই সমস্ত তুষার শৈলের আয়তন অত্যন্ত অল্প কিন্তু দৈর্ঘ্য অত্যন্ত অধিক। জাহাজের সহিত সংঘর্ষ হইলে মনে হয় যেন জাহাজ একটা পাহাড়ের গাত্র আহত হইল। টাইটানিকের সহিত যে তুষার শৈলের সংঘর্ষ হয়, রাত্রির অন্ধকার জনিত সেই শৈলকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায় নাই। কোনরূপ অত্যুজ্জ্বল সার্চ্চ লাইটের অভাবেই এইরূপ হইয়াছিল। আজকাল এরূপ তীব্র অলোক উদ্ভূত হইয়াছে যে, তৎসাহায্যে বায়ু-মণ্ডল কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকিলেও অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ আলোক সম্প্রতি প্রত্যেক জাহাজেই ব্যবহৃত হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে।
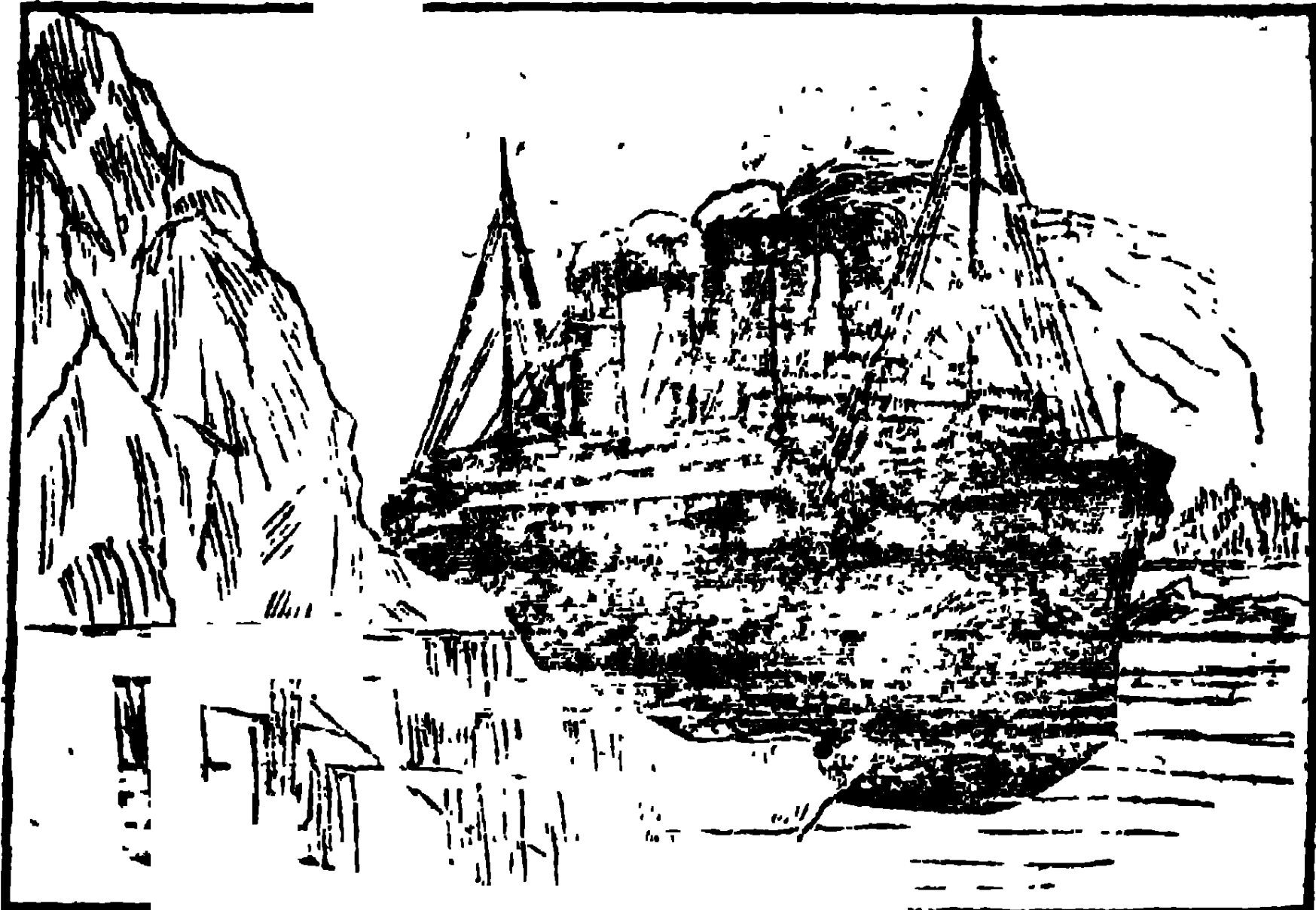
টাইটানিক ও জলে বিস্তারিত তুষার-শৈলের শেল্‌ফ্‌।

এই বিপদ-পাতের পর হইতেই কর্ত্তৃপক্ষগণ জাহাজে যাহাতে তার বিহীন তড়িৎ সংবাদ প্রেরণ যন্ত্রের এবং যন্ত্র পরিচালকগণের কোনরূপ অভাব না হয়, তৎবিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন, কেননা তার বিহীন তড়িৎ বার্ত্তা প্রেরণের পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছিল বলিয়াই টাইটানিকের সাহায্যার্থে অন্যান্য জাহাজ উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল।

ভবিষ্যতে "বিজ্ঞানে" তড়িৎ-প্রবন্ধে এই তার বিহীন তড়িৎবার্ত্তা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইবে। বর্ত্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফরাসী, ইটালী, স্পেন, এবং নিউজিল্যাণ্ড দেশে আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, যদি জাহাজে কর্ম্মচারী সমেত ৫০ জন যাত্রী থাকে, তাহা হইলে সেই জাহাজে তারবিহীন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ পন্থা রাখিতে হইবে। ইটালী দেশস্থ গাগ্‌লিলমো মারকণীই প্রথমে এই পন্থার উন্নতি সাধন করেন। তিনি ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ফরাসী এবং ইংলণ্ডের মধ্যে তারবিহীন তড়িৎ সংবাদ প্রেরণ করেন। সেই সময় হইতে এই পন্থা জগতের কত উপকার সাধন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বর্ত্তমানে ষ্টক এক্সচেঞ্জে মার্‌কণীর শেয়ার বিক্রয় হইতেছে। এই তারবিহীন তড়িৎবার্ত্তার ইতিহাস মারকণীর আমল হইতেই আরম্ভ হয় নাই। তবে তিনিই ইহাকে প্রথম কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি একবিংশতি বয়ঃক্রম কালে বিজ্ঞানবিৎ হার্টজএর উদ্ভাবিত কতকগুলি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে স্বকীয় উদ্যানে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে কয়েক হস্ত ব্যবহিত স্থানেই, অথবা এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে সংবাদ প্রেরণ করিতেই সক্ষম হন। ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার প্রথার বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করিয়া তুলিয়াছেন। শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

কাজের জিনিষ।

বৈদ্যুতিক ফুল ঝুরি।— ইহার আলো অত্যন্ত শুভ্র ও ফুল ঝুরি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, ইহা অনায়াসে ঘরে প্রস্তুত করা যায়—

বেরিয়ম নাইট্রেট (Barium Nitrate)	১৮ ভাগ
লৌহ চূর্ণ	২০ ভাগ
এলুমিনিয়ম চূর্ণ (aluminium) ..	২ ভাগ
ডেক্‌ষ্ট্রিন (Dextrine)	১½ ভাগ

উপরি উক্ত দ্রব্য গুলি জল দিয়া মিশাইয়া কাদার এর ন্যায় করিয়া মোটা তারের উপর লাগাইয়া শুকাইলেই হইল।

চীনে মাটীর জিনিষে লিখিবার কালী।—একটা বিশুদ্ধ [illegible] পিষ্ঠিত ২০ ভাগ রোজিন (Rosin) এবং উপযুক্ত পরিমাণ নাইট্রোসিন ১৫০ ভাগ [illegible] দ্রবীভূত কর। অন্য একটি ঐরূপ বোতলে ৩৫ ভাগ [illegible] ও [illegible] ভাগ [illegible] কর। অন্য একটি কাঁচ পাত্রে [illegible] এই মিশ্রিত রং এর দ্বারা চীনে মাটীর পাত্রে লেখা [illegible]

কাষ্ঠে নীল রং করিবার উপায়।— ১০০ ভাগ আয়রণ অ্যালাম (iron alum) ৫০ ভাগ রেড প্রুসিয়েট অফ পটাস (red prussiate of potash)। এই দুইটির প্রত্যেকটিকে ১০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত করিয়া শেষোক্তটিকে বাদামী বর্ণের বোতলে পূরিয়া অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দাও। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে দুই বোতল হইতে সমপরিমাণ দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া সামান্য এসিটিক দ্রাবক (acetic acid) ঢালিয়া একদিন রাখিয়া দাও। প্রথমে রং সবুজ হইবে, পরে কাষ্ঠের বয়স ও জাতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কালে সবুজ রং নীল রং হইয়া যাইবে। কাষ্ঠে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে নীলবর্ণ করিতে হইলে ৭ ভাগ ট্যানিক এসিড ১০০০ ভাগ জলে দ্রবীভূত করিয়া সেই দ্রাবণ প্রথমে কাষ্ঠে লাগাইয়া পরে পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিত দ্রাবণ লাগাইলে কাষ্ঠের রং অতিশীঘ্র নীল হয়।

গৃহপালিত পশ্বাদির গাত্র ধৌত করিবার তরল সাবান।—ক্রিওলিন (creoline)— ১০০ ভাগ; লাইসল (lysol)—১০০ ভাগ। সাধারণ সাবান —১৫০ ভাগ। জলে গুলিয়া গাভী ইত্যাদির গাত্র ধৌত করিয়া দিলে গাত্রের সমস্ত ময়লা দূরীভূত হয়।

বিবিধ।

জীবিত পদার্থের উপর অল্প তাপ-মাত্রার প্রভাব।—বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পিক্‌টে (Pictet) অল্প তাপমাত্রা সম্বন্ধীয় নানারূপ পরীক্ষা কালীন ডিম্ব, উদ্ভিদ ইত্যাদি জীবিত পদার্থের উপর অল্প তাপমাত্রা কিরূপ কার্য্য করে ও জীবিত পদার্থ সমূহ কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা দেখিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তিনি ঐ সকল পরীক্ষা হইতে এই তথ্য সমূহ অবগত হইলেন যে, জীব জন্তু অতি অল্প তাপ মাত্রা অর্থাৎ অত্যধিক শৈত্য সহ্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, এবং দারুণ শৈত্যাধিক্যেও তাহাদের জীবনী-শক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা বুঝা যায় না। রেতসর পোকার ডিমের তাপ মাত্রা ০° হইতে ৪০° সেন্টিগ্রেড নিম্ন তাপ মাত্রা পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়া ফেলিলে তাহাদের উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয় না। কিন্তু পক্ষি-ডিম্বের তাপমাত্রা ০° হইতে ২।৩ ডিগ্রি নিম্নে আনয়ন করিলেই নষ্ট হইয়া যায়। শীত প্রধান দেশের অত্যধিক শীতে নদী সমূহ জমিয়া যাইলে তাহাদের মধ্যস্থিত মৎস্য সমূহ নদীর জমাট জলে অর্থাৎ বরফের ভিতর প্রোথিত থাকে, এবং মৎস্য সমূহও জমিয়া বরফের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়; এমন কি সেই মৎস্যগুলিকে বরফ হইতে বাহির করিয়া বরফের মত টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। কিন্তু যত্তপি উপরোক্ত একটী মাছকে উত্তাপ দিয়া তাহার মধ্যস্থিত যে-জল জমিয়া গিয়াছে তাহাকে

পুনর্ব্বার গলাইয়া ফেলা যায়, তবে সেই মৎস্য তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব জীবন প্রাপ্ত হয় এবং জলে পূর্ব্বের মত খেলিয়া বেড়ায়। মৎস্য সমূহ ২০° নিম্ন তাপ মাত্রা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে। শম্বুকাদি ১১০° নিম্ন তাপ মাত্রা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। ভেককে ২৮° নিম্ন তাপমাত্রায় রাখিতে পারা যায়। পচাজলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটাণু ৭০° নিম্ন তাপ-মাত্রা সহ্য করিতে পারে, আবার জীবাণু বিশেষ (Bacteria, micrococci) প্রভৃতি অণু-বীক্ষণে দর্শনীয় জীব সমূহ ২০০° পর্য্যন্ত নিম্ন তাপ মাত্রা সহ্য করিতে পারে এবং পুনরায় তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলেই স্বাভাবিক রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পিক্‌টে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার অনাবৃত বাহু ১০৫° নিম্ন তাপ মাত্রায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জল 0° সেন্টিগ্রেড তাপ মাত্রাতেই জমিয়া বরফ হইয়া যায়। ০° অপেক্ষাও নিম্নতর তাপ মাত্রাতে ইহাই বুঝায় যে শৈত্য বরফের অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক।

কার্পাস বীজের তৈলের কারখানা।—আমেরিকায় উক্ত তৈলের কারখানা অতি বিস্তৃত ভাবে চলিতেছে। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তথায় প্রথম তৈলের কারখানা স্থাপিত হয়। তখন কারখানার সংখ্যা সমগ্র দেশে মাত্র ৪টি ছিল। সেই সময় হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে হাজার হাজার কল স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদিন ১০০০ হইতে ৫০০০ মণ তৈল উৎপাদিত হইতেছে। আমেরিকায় যত বীজ উৎপাদিত হয়, ভারতে তাহার প্রায় সিকি ভাগ বীজ উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইহাতেই কয়েকটি তৈলের কারখানা বেশ বিস্তৃতভাবে চলিতে পারে। তবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় না চালাইলে এই ব্যবসা প্রতি-যোগিতায় স্থান পাইতে পারে না। কথিত আছে যে, কোন দেশে লোকে লাঙ্গুল সমেত শৃগাল অন্য দেশে ।৵০ আনায় বিক্রয় করিয়া অবশেষে কেবল লাঙ্গুল মাত্র ৸০ আনায় পুনঃ ক্রয় করিয়া লইত। আমার মনে হয় যে, কার্পাস বীজসম্বন্ধে ভারতের পক্ষেও একথা বেশ খাটে। ভারতবাসী প্রথমে অল্প মূল্যে কার্পাস বীজ ইউরোপে চালান দেয় এবং পরে অধিক মূল্যে তৈল ক্রয় করিয়া লয়। ভারতবর্ষেই তৈল উৎপাদিত হইলে, শুল্ক, ভাড়া, ইত্যাদি নানা কারণের ব্যয় অল্প হইয়া তৈলেরও মূল্য অল্প হইতে পারে; এবং দেশের অর্থ দেশেও থাকিয়া যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই গত জানুয়ারী মাসে "ইণ্ডিয়ান কটন অয়েল কোম্পানী" নাম দিয়া নাভসারিতে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কারখানা খুলিবার প্রথম দিনে মাননীয় মিঃ পারেখ বলিয়াছিলেন যে, কার্পাস বীজের তৈলের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অন্যান্য তৈল অপেক্ষা এই তৈল উৎকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তাঁহার মতে কালক্রমে কার্পাস তৈল ঘৃতের স্থান অধিকার করিয়া বসিবে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই তৈল হইতে দুগ্ধ-মাখনের সম উৎকৃষ্ট এক প্রকার মাখন প্রস্তুত হইতেছে। তিনি বলেন যে, যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এই কারখানা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে

অতি শীঘ্র কারখানা লাভ-জনক হইয়া উঠিবে, এবং দেখাদেখি ভারতের নানা স্থানে অতি প্রয়োজনীয় এরূপ একটি পদার্থের অনেক কারখানা স্থাপিত হইবে।

ভারতে সোরার কারখানা।—অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে সোরার কারখানা চলিয়া আসিতেছে। জার্ম্মানির কঠিন প্রতিযোগিতাতেও প্রতিবৎসর প্রায় ৫,৪০,০০০ মণ সোরা বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বেহারের পল্লী অঞ্চলে সোরা দেশীয়গণ কর্ত্তৃক মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত হয়। সম্ভবতঃ জান্তব পদার্থ গলিত হইয়া প্রথমে এমোনিয়া এবং একরূপ উদ্ভিদাণুর সহযোগে এই য্যামোনিয়া হইতে নাইট্রিক এসিড এবং সর্ব্বশেষে মৃত্তিকাস্থিত পোটাসিয়ামের সহিত এই নাইট্রিক এসিডের ক্রিয়া হইয়া পোটাসিয়াম নাইট্রেট অথবা সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশ্য স্বভাবতঃ এই সমস্ত কার্য্য হয়। এই উদ্ভিদাণু সহযোগেই যে, রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, তাহার সত্যাসত্য এখনও সুমীমাংসিত হয় নাই। সম্প্রতি পুসা কৃষি বিদ্যালয়ের ডাক্তার লুথার এবং মিঃ যতীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি কিরূপে দেশীয়গণ এই সোরা উৎপাদন করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণী একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে প্রথায় সোরা উৎপাদিত হয়, তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য উক্ত পণ্ডিতদ্বয় কারবারের উন্নতি-কল্পে নানারূপ উপদেশ দিয়াছেন।

তাম্র।—আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে তাম্রের আকর হইতে আজ পর্য্যন্ত ১৭,৯৩৭,৪০,০০,০০০ মণ তাম্র উত্তোলিত হইয়াছে। এই দেশেই পৃথিবীর সর্ব্ব দেশ অপেক্ষা অধিকতম তাম্র পাওয়া যায়। যুক্ত রাজ্যে আজ প্রায় ৩০ বৎসরেরও অধিক তাম্র খনিতে কাজ চলিতেছে। কিন্তু কোন খনিতেই কার্য্যের বা উত্তোলিত তাম্রের পরিমাণের হ্রাস হয় নাই।

দান।—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের "যাদুঘরের" (museum) উত্তর দিকের স্থান ক্রয় করিবার জন্য কোন এক মহানুভব ১৫,০০.০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এত টাকা দান করিয়াও তিনি তাঁহার নাম ধাম গোপন করিয়াছেন। এইরূপ কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে মিঃ এ, জে, ব্যালফোরের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার উদ্দেশ্যে "জীবের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি" বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য এক অধ্যাপক নিয়োগের নিমিত্ত অন্য কোন এক মহানুভব এক কালীন ৩,০০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই অধ্যাপকের নাম—"Balfour Professor of Genetics" রাখা হইবে। এই দাতাও তাঁহার নাম ধাম গোপন করিয়াছেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের দানশৌণ্ডতা ও প্রকৃত হৃদয়বত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এরূপ নিঃস্বার্থ দান কখনই শুনিতে পাওয়া যায় না।

স্পঞ্জ ও ধুঁধুল জালি।—আমরা সাবান ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ ধুঁধুল জালি

ব্যবহার করিয়া থাকি। পাশ্চাত্যদেশে উহার ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল কিনা তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্প্রতি ইজিপ্ট দেশে এক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফল নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অদ্ভূত শ্মশ্রু।—উত্তর ড্যাকোটার (আমেরিকার যুক্তরাজ্যে) একটি লোকের দাড়ি ১১ ফুট ৬ইঃ অর্থাৎ প্রায় ৮ হাত লম্বা। লোকটির নাম হ্যান্স্ এন ল্যাংসেথ, তাহার জন্মভূমী নরওয়ে। তিনি ৩৬ বৎসর যাবৎ অতীব যত্ন সহকারে দাড়ী বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই প্রকাণ্ড দাড়ীতে তাঁহার কোন কষ্টই নাই। প্রত্যুতঃ ইহা স্বাস্থ্য রক্ষা করে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। এই দাড়ী থাকায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে আদৌ ঠাণ্ডা লাগিতে পায় না।

মানব কি।—রাসায়নিক তত্ত্ব— একজন পূর্ণবয়স্ক সাধারণ মানব (যাঁহার ভার প্রায় ১ মণ ৩০ সের) ১,২০০ ডিম্বের সহিত সমান। তাঁহার শরীরস্থিত বায়বীয় পদার্থ দ্বারা ৩,৬৪৯ কিউবিক ফিট একটি গ্যাস-আধার পূর্ণ হইতে পারে। তাঁহার শরীরের লৌহে ৪ টি বড় বড় পেরেক (একটা পেরেকের দাম — ৵১০), চর্ব্বীতে ৭৫ টা বাতি আর একটা বেশ বড় সাবান, ও ফসফেট হইতে যে ফসফরাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে ৮,০৬৪ বাক্স দেশলাই হইতে পারে। তাঁহার শরীরের হাইড্রোজেন দ্বারা একটা ব্যোমজান পূর্ণ করিলে সেই ব্যোমজানের দ্বারা তিনি নিজেই অনেক দূর আকাশে ঘুরিয়া আসিতে পারেন। অবশিষ্ট উপাদানের মধ্যে তাঁহার শরীরে ৬ চামচ লবণ, একবাটী চিনি আর ৩৭ সের জল পাওয়া যায়। শরীর এবং অস্থি পঞ্জরাদি তত্ত্ব— একজন মানবের ৫০০ মাংস পেশী, ১,০০,০০০, ০০,০০,০০০ সেল (cell), ২০০ বিভিন্ন অস্থি খণ্ড, ১৬ সের রক্ত, কয়েক শত হস্ত পরিমিত ধমনী এবং শিরা, ২৫ ফিটের অপেক্ষাও অধিকতর দীর্ঘ অন্ত্র এবং কোটি কোটি লোমকূপ আছে। হৃদয়ের ভার একপোয়া ও দেড় পোয়ার মধ্যে। হৃদয়ের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে (ventricle) অর্দ্ধপোয়া বা তিন ছটাক তরল পদার্থ ধরিতে পারে। ইহা শূন্যগর্ভ, পেশীময় একটা যন্ত্র, প্রতি মিনিটে প্রায় ১১ সের অর্থাৎ প্রতিদিন ৪৩২ মণ রক্ত পাম্প (pump) করে।

চিনদেশে এইরোপ্লেন বা আধুনিক ব্যোমযান।—চিনদেশে প্রথম এইরোপ্লেন প্রদর্শিত হইলে তদ্দেশবাসিগণ যে কিরূপ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অপেক্ষাকৃত ভদ্র লোকগণ বিস্ময়ে অবাক হইয়াছিল, এবং ইতরগণ "উড়ন্ত রাক্ষস" মনে করিয়া বেলুন দেখিয়াই পলায়ন করিয়াছিল।

বায়স্কোপের ছবির দৈর্ঘ্য।—কিরূপে ছবি তুলিতে হয় অথবা ছবি কেন চলিতে থাকে হয়, তাহা বলা হইতেছে না। তবে যাহাকে "ফিল্ম" বলে, তাহার দৈর্ঘ্য কত

তাহাই বলা হইয়াছে। এক ফুট ফিল্ম্এ ১৬টি ছবি থাকে ; এক সেকেণ্ডে ১৬টি ছবি পর্দায় [illegible] হয়, অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে ১ ফুট ফিল্ম্ দেখান হয়। গড়পড়তা প্রত্যেক ফিল্ম্ ১০০০ ফুট দীর্ঘ। বিলাতে মোটের উপর প্রতি দিন ২ বার ৮টা বিভিন্ন ঘটনার ছবি দেখান হয়। সপ্তাহে ৬ দিন বায়স্কোপ রঙ্গমঞ্চ খোলা থাকে। গ্রেট বৃটেনে সর্ব্ব সমেত ৩০০০ বায়স্কোপ রঙ্গমঞ্চ আছে। তাহা হইলে —

১ ফুট ফিল্ম্এ	১৬ ছবি
১০০০ „ „	১৬,০০০ „
৮টা ঘটনার „	১,২৮,০০০ „
প্রতি দিন ২ বারের „	২,৫৬,০০০ „
সপ্তাহে ৬ দিন দেখান হয় „	১৫,৩৬,০০০ „
৩০০০ রঙ্গমঞ্চ	৪,৬০,৮০,০০,০০০

মোট প্রতি সপ্তাহের ছবির সংখ্যা কত তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যদি এই সমস্ত ছবি একটি ফিল্ম্ হইত, তাহা হইলে ফিলমের মোট দৈর্ঘ্য ৫৪,৫৪৫ মাইল ৮০০ গজ, অর্থাৎ পৃথিবী ২$\frac{১}{৪}$ বার এই ফিল্ম্ দ্বারা বেষ্টন করা যাইত।

FOOD.

(Translated from Rai Bahadur Dr. Chunilal Bose's book on "Food")

(1)

Food in relation to health.

The relation of food to health is very intimate. The incidence of many diseases may be attributed, directly or indirectly, to bad food, to insufficient food or to its improper use. Thus, over-feeding is often responsible for dyspepsia and many other disorders of the bowels which are sometimes very difficult to cure. On the other hand, food, when deficient in qualitity or insufficient in quantity, causes emaciation and debility and reduces the resisting power of the system against the onslaughts of diseases. We are painfully familiar with the melancholy sight of the poor men in any country falling ready victims to outbreaks

of epidemics from which their more fortunate well-fed bretheren often escape owing to their greater resisting power. Again, we require certain principles to be present in our food one of which goes to form our flesh, another produces heat and gives us strength, and we get them from such different kinds of food as meat, fish, rice, *dal*, bread, butter, milk, salt, etc. Now, an excess of any one of these principles in our food causes great disturbance in the system and, if continued for sometime, would give rise to many incurable diseases. Thus, taking too much meat often brings on serious disorders of the liver and also the painful disease called *gout*, while excessive consumption of starchy and saccharine food (rice, sugar, etc.) is responsible for much dyspepsia and diabetes that prevail in this country. We can neither live on meat nor on rice alone and keep good health. The different principles of food (which I shall deal with fully later on) must be taken in adequate quantity and in proper proportions for the growth of the body and for the maintenance of health and strength.

The common saying among the people of this country that *"Food should be taken according to one's taste"* (*Ap roochi khana*) is not always a sound precept to follow. We sometimes find people exhibiting altogether a perverted taste for indigestible or unwholesome food, and in time of sickness, we often find our patients crying for food which would prove very harmful to them. The individual taste in such cases, if encouraged, would lead to disastrous results. It is true that some people are able to take with impunity certain kinds of unwholesome food, but these cases must be considered as exceptional. Every action of our life is subject to certain laws, and when these are strictly obeyed, we expect the best of results from them. It is, therefore, foolish to think that such an important matter as the proper selection of food can safely be left to the caprices and sweet will of each individual.

Infected food is often responsible for the incidence of such diseases, as Cholera and Typhoid Fever, which are caused by specific germs entering into our system through an impure water or milk-supply. Then again, certain deadly poisons known as *ptomaines*, which are produced in meat and fish undergoing decomposition, often give rise to serious symptoms, sometimes attended with fatal results, in persons unsuspectingly using such meat or fish as food.

The subject of food is inseparably connected with the Public Health Department. We have already referred to general weakness brought on people by continued supply of insufficient food. The vitality of the nation suffers, and people die in numbers whenever an epidemic breaks out; thus the energy and the resources of the Public Health Department are taxed to the utmost in combating against the epidemic. The community becomes poorer as its able-bodied and earning members are struck down by disease and carried away to early grave.

The Public Health Departments in the countries of Europe and America are trying their level best to improve the food-supply for children and special measures have been enforced in those countries to ensure an abundant supply of pure milk free from all bacterial contamination. It is satisfactory to note that with improved milk-supply, the mortality among the children in those countries has been appreciably reduced.

The consideration of such an important subject with which the health and the material prosperity of our people are intimately connected can not fail to be interesting.

(2)

What is food?

Whatever we put into our mouth and goes down into the stomach, must not be considered as food. Most people take tea or coffee neither of which, except the small quantities of milk and sugar which are added to it, acts as a food. Some people are in the habit of chewing betels, others tobacco, and some women-folk are very fond of eating chalk and baked earth (*Geophagy*), but such articles can not come under the category of food.

That which we eat and which goes to build up our body and gives us strength is food in the true sense of the term.

Certain articles such as milk, sugar, fruits, &c., in their natural state, are fit to be taken as food without being subjected to any special preparation. But most foods require cooking to make them palatable and digestible. Rice, *dal*, flour, meat, fish, vegetables, &c., must undergo the process of cooking before they can be used as food.

The art of cooking has been practised since man first [illegible] of civilisation. Before that, people used to live on [illegible] and raw meat. Such primitive types of the human races [illegible] still extant in some parts of the Indian Archipelago and in the continent of Africa. It may be that some kinds of food (such as meat) are more easily digestible when taken raw than cooked, but no one would ever think of taking raw meat on account of its superior digestibility, except under exceptional circumstances. Cooking is rightly considered in India as one of the important branches of the Fine Arts; it was an important subject of female education and has always been looked upon as one of the indispensable accomplishments of Indian ladies of respectable families. In our village homes, the services of ladies who are expert in cooking are in great demand on all festive occasions, and how greatly are their services appreciated and what honour and approbation they receive from their elders for their labour of love! Those that look upon cooking as a menial duty have got mistaken notions of respectability. They lack the fine sense to appreciate its educative and æsthetic value. What a pleasure it is to prepare and serve food with her own hands to her husband and to her children is only known to the good housewife. In England too, ladies of aristocratic families take pride in preparing with their own hands dishes for their guests on special occasions and all feel honoured by having a share of such dainties.

As most Indian families are of moderate means, the cost of engaging a professional cook is often heavily felt. If the ladies take upon themselves the duty of cooking food for the family, much saving may be effected which may profitably be appropriated in providing more nourishing food for the children and for their better education.

It should always be remembered that *cooking* is a fine art and that its performance an honorable duty.

To be continued.

কলিকাতা ৫১ নং [illegible] প্রকাশিত।

বিজ্ঞান

১ম বর্ষ।) জুন, ১৯১২। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিজ্ঞান-নীতি।

প্রথম-পরিচ্ছেদ।

অধিরোহণ-প্রণালী।

আমরা সাধারণতঃ "বিজ্ঞান" বলিলে যাহা বুঝি, তাহা অনেক বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের পর বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। নৈসর্গিক নিয়মাবলীর সংস্থাপন বা প্রতিপাদন কেবল পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে না; অথবা পূর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণ-সমূহের সমতা ও পূর্ব্ব-পরীক্ষা সকলের অভিন্নতা সত্যের সার্ব্বজনীন্ মানদণ্ড নহে। শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিম্বা দুই একটি পরীক্ষা সংসাধন করিয়া, কোনও একটি নৈসর্গিক সত্যকে কোনও এক সাধারণ নিয়মের আয়ত্তে আনিতে পারা যায় না। বিচার এবং প্রমাণের দৃঢ়-ভিত্তির উপর বিজ্ঞান-মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত। যে সকল সত্য স্বতঃসিদ্ধ নহে, তাহাদের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য ন্যায়ের "অধিরোহণ-প্রণালীর" আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হয়। ন্যায়ের নীতি আমাদের চিন্তার বিষয়ীভূত নৈসর্গকে, পরীক্ষা ও পর্য্য-বেক্ষণের নিক্তিতে ওজন করিয়া, অধিরোহণের অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেয়। এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা হইতে যাহা উঠিয়া আসে, তাহাই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য, নিয়মের দ্বারা সংযত, মানবের সম্পূর্ণ আয়ত্তীকৃত, এবং এই সত্যই মানবের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমী। এই অধিরোহণ নীতি কিরূপ, কি প্রণালীতে ইহা নিয়ন্ত্রিত, এবং কি প্রকারে ইহা ভ্রমহীন ও গ্রহণ-যোগ্য হইয়া আমাদের চিন্তাকে শাসিত ও পরিচালিত করে, তাহা কেবল ন্যায়-শাস্ত্রেরই আলোচ্য বিষয় নহে, পরন্তু ইহা বিজ্ঞান-সাধারণের নিজস্ব এবং

বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই অনুশীলন-যোগ্য। পুরাতন শ্রেণীর নৈয়ায়িকগণ এ বিষয়ের প্রতি যথা-যোগ্য মনোযোগ প্রদান করেন নাই বটে, কিন্তু প্রতীচ্যের নব্যন্যায়ে এখন ইহার স্থান অতি উচ্চে। আমাদের যে সকল জ্ঞান অনুভূতি সাপেক্ষ নহে, তৎসমুদায়ই অধিরোহণার্জ্জিত। অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ এই চিরন্তন সত্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, ন্যায়ের এই প্রণালীটি সাধারণ-ভাবে অনুশীলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জড়বিজ্ঞানের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত না থাকায়, এবং যে উপায়ের দ্বারা বিজ্ঞানের সাধারণ সত্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের প্রণিধানের অযোগ্য বোধে উপেক্ষিত হওয়ায়, তদনুষ্ঠিত এই বিশ্লেষণ-সমূহ নির্ভুল হইলেও, ইহারা বিজ্ঞানের ভিত্তিনির্ম্মাণোপযোগী নিয়ম সমূহ-গঠন করিতে নিতান্তই অযোগ্য এইরূপ বিবেচিত হওয়ায়, ইহারা বহুদিন বৈজ্ঞানিকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অবরোহণান্তর্ভুক্ত সমবায়ের (syllogism) নিয়ম-সমূহ যেমন অধিরোহণের আনুমানিক সত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করে, সেইরূপ অধ্যাত্মবাদিদিগের প্রবর্ত্তিত বিশ্লেষণ, ভ্রমহীন হইলেও, বৈজ্ঞানিক বিচারের কার্য্যোপযোগী নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইল না; এবং যাঁহারা প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে বর্ত্তমান উন্নতি-পথে অগ্রসারিত করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের গবেষণায় প্রযুক্ত প্রণালীর সীমা প্রসারিত করিয়া সহজেই অধিরোহণ নীতির একটা সম্পূর্ণ উপপত্তি (theory) নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন, তাঁহারা ইহার দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানে বহুদিন অবধি বিরত ছিলেন। সে বেশীদিনের কথা নহে, যে দিন হোয়েওয়েল, স্পেন্সর, মিল ও কঁৎ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বৈজ্ঞানিক উপসংহারের অপেক্ষা তাঁহাদের গবেষণায় প্রযুক্ত প্রণালীটি অধিক মূল্যবান মনে করিয়াছিলেন, এবং সাবধান ভাবে এই প্রণালীটা বিশ্লেষণ-পূর্ব্বক একটা অভিনব দার্শনিক তত্ত্বের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

এখন অধিরোহণ বলিলে কি বুঝিতে হইবে? মিল ইহার যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন, বোধ হয় সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল অথচ অভ্রান্ত। যে ক্রিয়া দ্বারা আমরা সাধারণ প্রস্তাব-সমূহ প্রমাণ ও আবিষ্কার করিতে পারি, তাহাই তাঁহার মতে অধিরোহণ। ইহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির প্রমাণ সংগ্রহ করে এবং অবরোহণ প্রণালীর বিপরীত। কিন্তু অধিরোহণ কেবল যে সাধারণ সত্য লইয়াই ব্যস্ত তাহা নহে, যে ব্যষ্টি সত্য-সমূহের সমন্বয়ে আমরা একটা বিশাল সমষ্টিতে বা সাধারণ সত্যে উপনীত হই, যে ক্ষুদ্র প্রস্তাব সকল পুঞ্জীভূত হইয়া একটা মহত্তর সত্যের পথ প্রদর্শন করে, সেই ক্ষুদ্রতর প্রস্তাব সমূহের সত্যও এই অধিরোহণ প্রথায় প্রামাণ্য; এবং পূর্ব্বপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সমূহের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা এই প্রণালীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহাই অন্যান্য অপ্রমাণিত প্রতিপাদ্যে ইহার প্রয়োগ যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে যদি সত্য-বিশেষের প্রমাণ সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে

সেই শ্রেণীর সকল সত্যের প্রমাণের জন্য যে এই একই প্রণালীর প্রয়োগ সমীচিন হইবে, তাহা বৈজ্ঞানিক পাঠককে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাই যদি সত্য হয়, সাধারণ অথবা বিশেষ সত্য-সমূহ একই নিয়ম এবং একই প্রণালী দ্বারা প্রতিপাদ্য এ কথাটা যদি আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা হইলে বিজ্ঞানের বিচার-প্রণালী যে আমাদের দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য গুলিও নিয়ন্ত্রিত করিবে, সে কথা বোধ হয় আর বেশী বুঝাইতে হইবে না। যদি এই বৈজ্ঞানিক বিচার-প্রণালীর একটা সম্পূর্ণ ধারা গঠন করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ধারা যে আমাদের জীবন-সংগ্রামের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মরূপে এবং আমাদের সর্ব্ব কার্য্য-সাধনায় যে বিশেষরূপে প্রযোজ্য, তাহা প্রমাণ করা কষ্ট-সাধ্য নহে। যেহেতু, সুনিয়ন্ত্রিত সকল অনুমান হইতেই সাধারণ সত্য সমূহ সুলভ্য; যে প্রণালীতে এই সকল সাধারণ সত্যে আমরা উপনীত হই, তাহার বিশ্লেষণ প্রকৃতপক্ষে অধিরোহণ প্রথার সাধারণ বিশ্লেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোনও বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্বের গবেষণাই হউক অথবা কোন বিশেষ সত্যের অনুসন্ধানেই হউক, আমরা আমাদের প্রতিপাদ্য বস্তুকে প্রমাণ করিতে যে প্রণালীই অবলম্বন করি না কেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (experiment) দ্বারাই হউক অথবা অবরোহণ সমবায়ের (ratiocination) দ্বারাই হউক, আমাদের অনুমানের প্রত্যেক পদক্ষেপ অধিরোহণের কশাঘাতে সংযত; এবং উভয় পক্ষেই অধিরোহণের ভ্রমশূন্যতা একই কারণ সাপেক্ষ।

যিনি উচ্চ বিজ্ঞানকে দূরে ফেলিয়া দিয়া, আপনার সাধারণ কর্ত্তব্য পালনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে সুবিধার অনুসন্ধিৎসু, যিনি অমূর্ত্ত্য জ্ঞানের অমরাবতী হইতে নামিয়া আসিয়া মর্ত্ত্য জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব কার্য্যকলাপ আপনার মনের মত করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘটনা সমূহের অনুধাবন করিতেছেন, তাঁহাকে অনেক সময়ে অধিরোহণ-প্রণালীর মূলতত্ত্বগুলি বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতে অসমর্থ হয়। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা বোধ হয় এটা আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। আদালতে বিচারক ও জুরিদের সম্মুখে একজন কৌন্সিলি তাঁহার মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাকে এই অধিরোহণের মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার পূর্ব্বক উপসংহারে উপনীত হইতে হয় না। তাঁহার কর্ত্তব্য প্রমাণিত-সাধারণ প্রস্তাব সমূহ হইতে একটা বিশেষ প্রস্তাব নির্ব্বাচন করা এবং এই সকল প্রস্তাব এরূপ ভাবে নির্ব্বাচন করিতে হইবে যে, তিনি তদ্দ্বারা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারেন যে, কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা (subject) তাহার আরোপ্যের (predicate) সহিত তাঁহার মনের মত ভাবে সম্বন্ধ, অর্থাৎ তাঁহার যাহাতে সুবিধা হয় তিনি, তাঁহার সংজ্ঞা এবং আরোপ্যের মধ্যে, ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন। কোনও সন্দেহ-পূর্ণ প্রশ্ন বা ঘটনা জুরিকে বুঝাইবার জন্য তিনি যে সকল সাধারণ প্রস্তাব বা মূল

তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিবেন, তৎসমুদায়ই সুসিদ্ধ এবং তাহাদিগের প্রমাণের জন্য কাহাকেও নৈয়ায়িকের দ্বারে তৈলবট লইয়া হত্যা দিতে হইবে না। তাঁহার প্রামাণ্যকে এই সকল প্রস্তাব বা মূল তত্ত্বের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা তাঁহার কৌশল সাপেক্ষ। তাঁহার প্রকৃতিদত্ত অথবা অর্জিত অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রামাণ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের জ্ঞানের উপরেই তাঁহার সাফল্য নির্ভর করে। কুশলতা যদিও অর্জন সাপেক্ষ বটে, কিন্তু কোনও নিয়মের দ্বারা সংযত নহে। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সাফল্য আমার করতলগত হইবে, বিজ্ঞান সে পথ প্রদর্শন করে না; বৈজ্ঞানিক নিয়ম মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদে ঢাকিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই।

কিন্তু যখন কোনও বিষয় আমার চিন্তা জগতের বিষয়ীভূত হয়, তখন ওই নির্ব্বাচিত বিষয়ের দ্বারা আমার প্রামাণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব কিনা, সে কথা বিজ্ঞান আমাকে বলিয়া দিবে। পথ নির্ব্বাচন আমার আয়ত্বগত, কিন্তু এইপথ আমাকে কোন্ সুদূর অবিজ্ঞাত রাজ্যে লইয়া যাইবে তাহা বিজ্ঞানের বিবেচ্য। গবেষণাপরায়ণ ছাত্রই হউন অথবা আদালতের সুদক্ষ কৌন্সিলিই হউন, অধিরোহণ লব্ধ সত্যগুলি তাঁহাকে আপনা হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া বিজ্ঞানের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; এবং প্রতিপাদ্যের প্রতিপাদন অধিরোহণের নিয়মাবলী দ্বারা সুসংযত হইবে। অতএব একবার নির্ব্বাচন সুসিদ্ধ হইলেই আমাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। তারপর ক বাবু তাঁহার শ্যালক পুত্রের মাতৃষ্বসার সম্পত্তি করতলগত করুন, অথবা খ বাবু খুন করিয়া 'বেকসুর খালাস' পান, কিম্বা মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় একটা বিশাল নৈসর্গিক নিয়ম প্রতিপাদিত হউক, বিজ্ঞান কলের মত কাজ করিয়া যাইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদের নির্ব্বাচিত প্রস্তাব গুলি প্রমাণ-সাপেক্ষ। যে সকল নিয়মের দ্বারা আমরা আমাদের নির্ব্বাচিত প্রস্তাব সমূহ হইতে শেষ উপসংহারে উপনীত হই, সেগুলি হয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য, না হয় তাহারা পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত অনুমান। ব্যষ্টির সত্যের উপর সমষ্টির সত্য নির্ভর করে, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং এই নির্ব্বাচিত প্রস্তাবগুলি যে সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে, তাহা আমাদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বিশেষরূপে "যাচাইয়া" লইতে হইবে। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র সাধারণ কর্ত্তব্য সমূহ পালনে কিম্বা আদালতের কলহের মধ্যে, নিক্তির ওজনের সত্য অনেক সময়ে আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার অমর রাজ্যে অপ্রামাণ্য, অযৌক্তিক বা ঔপপত্তিক কিছু ধরিয়া লইবার উপায় নাই। কিন্তু একটা কথা এস্থানে বলা যাইতে পারে যে, অমাদের জীবনের বাস্তব কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রস্তাবিত সত্য সমূহের প্রমাণ সংগ্রহ যেমন সর্ব্ব সময়ে আবশ্যক হয় না, এবং আমাদের সাধনায় সিদ্ধিলাভ যেমন [illegible]দের ব্যক্তিগত কৌশলের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ বিজ্ঞানের শাখা বিশেষের [illegible]লোচনায় (বিশেষতঃ যে সকল শাখায় অবরোহণ প্রণালীর বহুল ব্যবহার আছে)

সত্যের অপলাপ না করিলেও, প্রস্তাবিত সত্য-সমূহের প্রতিপাদনের আবশ্যকতা হয় না। যেমন গণিত বিজ্ঞান; ইহা প্রধানতঃ অবরোহণ প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠাপিত, এবং অধিরোহণ প্রণালী ইহাতে প্রযুক্ত হইয়া গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে সত্য গুলি প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহারা এরূপ স্বতঃপ্রমাণিত ও এত মৌলিক যে, তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ন্যায়ের কিম্বা বহুদর্শিতার মন্দিরে পূজা-সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইতে হয় না; গণিতের প্রতিপাদ্য বিশেষের অনুশীলন আমাদের কুশলতা ও দক্ষতার সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাধারণ এবং বিশিষ্ট সত্য যে একইরূপ প্রমাণের যোগ্য এবং তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহের প্রণালী যে সম্পূর্ণ অভিন্ন একথাটা বুঝিতে হইলে আমাদের আর একটা কথা স্মরণ করিতে হইবে; সেটা এই যে, বিজ্ঞানের অনেক গুলি শাখার ক্ষুদ্রতর সত্য-সমূহ ইহাদিগের মূলতত্ব-সমূহের ন্যায় একইরূপ প্রমাণ সাপেক্ষ, এবং এই সকল বিশিষ্ট সত্য-সমূহের প্রমাণ সংগ্রহ, ইহার সাধারণ প্রণালীর সমতার কোনও অংশে ত্রুটি সাধন না করিয়া প্রসাধিত হয়। ইহার একটা দৃষ্টান্ত প্রদান করিলে বোধ করি কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে। জ্যোতিষ যে সকল অনুমান বিশেষের উপর ইহার অবরোহণ-লব্ধ সত্য সমূহ প্রতিষ্ঠাপিত করে অনেক সময়ে সেগুলি আমাদের সরল পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতার অতীত হইলেও অপর জ্ঞাত সত্য সমূহের সাহায্যে তাহারা প্রতিপাদিত হয়। এইরূপে সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহগণের আয়তন ও দূরত্ব, এবং পৃথিবীর আকার ও আবর্ত্তনাদি আমাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্বের গণ্ডীর মধ্যে না থাকিয়া, আমাদিগের অনুশীলনের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমরা আমাদের কথাটা আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব গণনায় বেশ একটু গোলমাল আছে। সরল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা শীর্ষ বিন্দু হইতে চন্দ্রের দূরত্ব একই সময়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠে দুই স্থান হইতে নির্দ্ধারণ করা ব্যতীত এ সম্বন্ধে আর কিছুই আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সুলভ নহে।

পর পৃষ্ঠার চিত্রে চ চন্দ্র, অ এবং অ১ পৃথিবী পৃষ্ঠে দুইটি মানমন্দির এবং ম পৃথিবীর কেন্দ্র। একই সময়ে অ এবং অ১ হইতে চ'র শীর্ষ দূরত্ব বিদ্ধ হইল এই বেধলব্ধ দূরত্ব মনে কর স এবং স১

তাহা হইলে জ্যামিতি হইতে

$$\text{স} = \text{ক} + \text{ব}$$

$$\frac{\text{জ্যা ব}}{\text{জ্যা } (১৮০^{\circ} - \text{স})} = \frac{\text{দ}_১}{\text{দ}}$$ যথা দ=মচ এবং দ১=পৃথিবী ব্যাসার্দ্ধ,

$$\therefore \text{জ্যা ব} = \frac{\text{দ}_১}{\text{দ}} \text{জ্যা স}$$

অর্থাৎ চন্দ্রের লম্বন কলার * জ্যা= $\frac{দ_১}{দ}$ জ্যা স

চক্রবালস্থিত চন্দ্রের পক্ষে

লম্বন = ল = $\frac{দ_১}{দ}$

একণে দুইটি মান-মন্দির হইতে নির্দ্ধারিত দুইটি লম্বন কলার জ্যা একত্রিত করিলে আমরা প্রাপ্ত হই :—

$$জ্যা\ ল + জ্যা\ ল_১ = \frac{দ_১}{দ}(জ্যা\ স + জ্যা\ স_১)$$

কিন্তু ল এবং ল১ অত্যন্ত ক্ষুদ্র

$$\therefore\ ল + ল_১ = \frac{দ_১}{দ}(জ্যা\ স + জ্যা\ স_১)$$

যদি হ এবং হ১ মাণমন্দিরদ্বয়ের অক্ষাংশ হয়, তাহা হইলে

$$ল + ল_১ = স + স_১ - (হ + হ_১)$$

$$= স + স_১ - হ - হ_১$$

(*) গর্ভ-সূত্রে যদা ভাভাং চন্দ্রার্কৌ সমলিপ্তিকৌ।
চকস্থতারাবিতক্ষচন্দ্রেন তন্নম্বনং স্মৃতম্‌।
ভাস্করঃ সিদ্ধান্ত-শিরোমণি।

$$= \frac{\text{দ১}}{\text{দ}} (\text{জ্যা স} + \text{জ্যা স১})$$
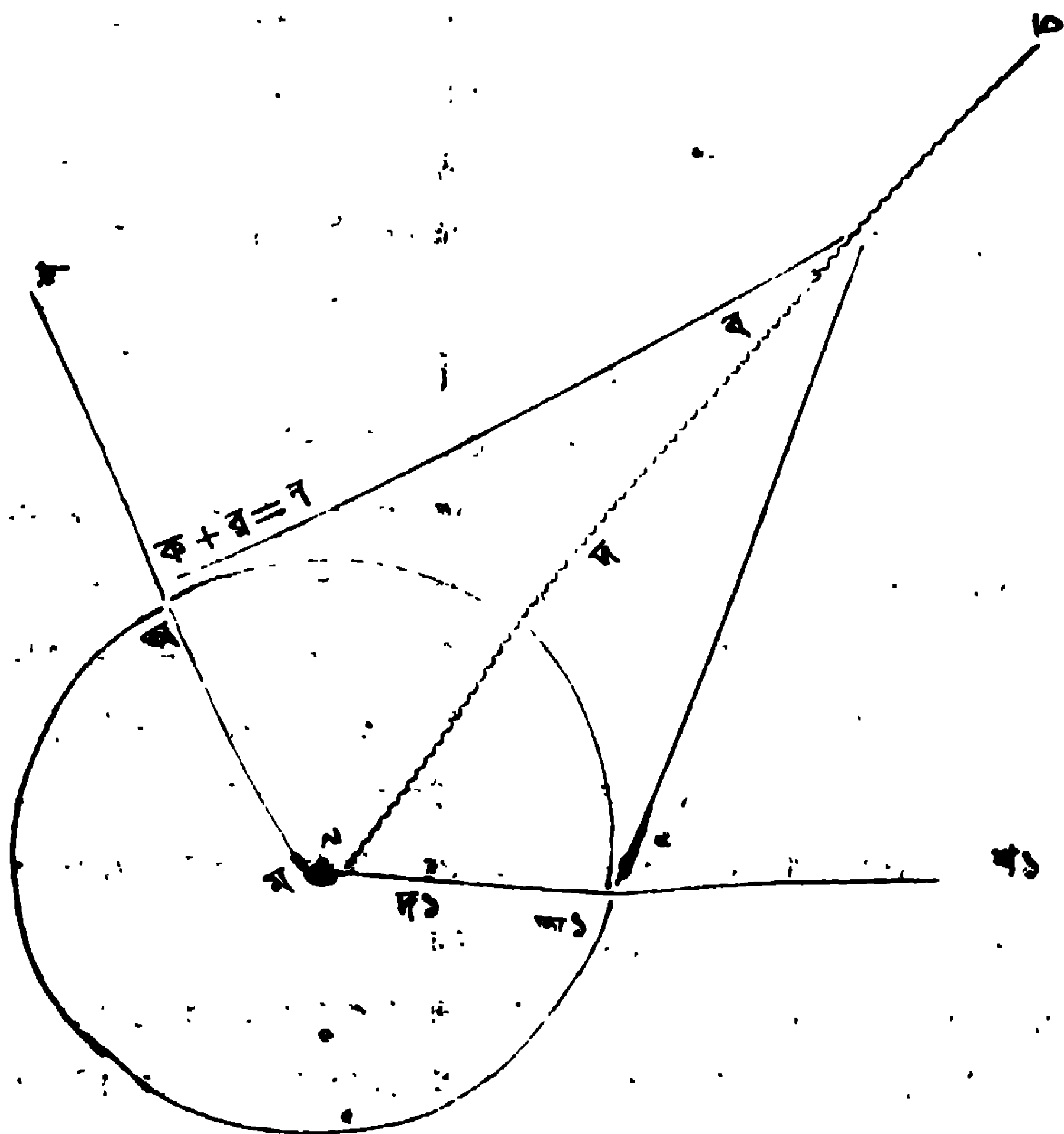
$$\therefore \quad \text{দ} = \frac{\text{দ১} (\text{জ্যা স} + \text{জ্যা স১})}{\text{স} + \text{স১} - \text{হ} - \text{হ১}}$$

অতএব দেখা গেল যে ইহার মধ্যে কেবল স ও স১ সরল বেধ লব্ধ সত্য আর সমস্ত রাশীগুলিই সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। এই প্রতিপাদনে প্রতি পদক্ষেপে একটি নূতন অনুমানের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ফলে একটি মহত্তর অনুমান প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই মহত্তর অনুমান প্রমাণিত ব্যষ্টি অনুমানের সমবায় মাত্র। যে নিয়মে আমরা আমাদের উপসংহারে উপনীত হইয়াছি, ঠিক সেই সকল নিয়মই ইহার আনুসঙ্গিক ক্ষুদ্রতর প্রতিপাদ্য গুলিকে প্রতিপন্ন করিয়াছে। এখন আমরা সাধারণ সত্য বলিলে যাহা বুঝি, তাহা পূর্ব্ব প্রদত্ত দৃষ্টান্ত ঠিক বুঝাইতে না পারুক কতকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে বৈজ্ঞানিক বিচারের ফল—সত্য বিশেষের প্রমাণ সংগ্রহ করা নহে। ইহার উদ্দেশ্য একটা সার্ব্বজনীন্ এবং সাধারণ নিয়ম নির্ম্মাণ। জ্যোতিষের কোনও একটি বিশেষ দৃষিষয় অনুশীলন বা কোনও একটা নৈসর্গিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য নিয়ম বিশেষের সংগঠন বিজ্ঞানের কার্য্য নহে। চন্দ্রের দূরত্ব নির্দ্দেশ বিজ্ঞান বিশেষের উদ্দেশ্য নহে। যে কোনও সুদূরস্থিত পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করার নিয়ম সংস্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই বিশালতর প্রতিপাদ্য ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রতিপন্ন হইবে। চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া আমরা ইহার দূরত্ব নির্ণয় দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম, এবং ইহা হইতে আমরা এই দৃষ্টান্তে যে সকল প্রদত্ত রাশী সমূহ প্রাপ্ত হই, দূরস্থিত জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণে সে সকল রাশী বিরল, এবং দূরতর জ্যোতিষ্কের বিশালতর দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য উপরি প্রদত্ত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর রাশীর স্থানে বৃহত্তর রাশী আসিয়া দেখা দেয়, এবং চন্দ্রের বৃহত্তর লম্বন্ কলা নক্ষত্রের ক্ষুদ্রতর লম্বন কলার দ্বারা স্থানচ্যুত হয়। মোটের উপর কথাটা একই। কোনও সাধারণ বৈজ্ঞানিক নিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রণালী গ্রহণ করিতে হয়, কোনও একটি বিশিষ্ট দৃষিষয়ের ব্যাখ্যা অথবা কোনও প্রতিপাদ্য বিশেষের প্রমাণ কিংবা কোনও নৈসর্গিক ঘটনার কোনও অংশ সম্বন্ধে কোনও ক্ষুদ্রতর নিয়ম সংস্থাপনে সেই একই প্রণালী গ্রাহ্য। বিজ্ঞানের নীতি সার্ব্বজনীন্ নীতি এবং ইহার বিচার সর্ব্বজনীন্ বিচার, ইহার তুলাদণ্ড মানবের সকল চিন্তার ও সর্ব্ব প্রয়াসের সুস্পষ্টভাবে গুরুত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতে প্রস্তুত।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ কুমার।

আলোক চিত্রণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ডার্ক রুম।

ক্যামেরা পছন্দমত ক্রয় করা হইলে পর, দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ অন্ধকার ঘর বা ডার্করুম (dark room)। যদি বাড়ীতে কোন খালি ঘর থাকে, তবে তাহা লইয়া যদি ডার্করুম করা যায়, তাহা হইলে বেশ ভাল হয়। তাহা না পাইলে সিঁড়ির নীচের ঘর হইলেও চলিতে পারে। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যদি সুবিধা হয় তবে ছাদের উপরে কিম্বা উঠানে কাঠের ছোট ঘর করিয়া ডার্করুম করিলেই হয়। যদি কোনটাই সম্ভব না হয় তাহা হইলে অগত্যা রাত্রিতে কোন ঘরে ডেভলপ (develope) করিতে হইবে। ডার্করুমে প্রথমে একটি ভাল রুবি ল্যাম্প (ruby lamp) বা লাল কাচ দেওয়া ল্যাম্প আবশ্যক। সাদা আলো বা কোন প্রকারে তাহার কার্য্যকরী রশ্মি (actinic rays) যদি এক্সপোজ করা প্লেটে লাগে, তাহা হইলে প্লেট ফগ্ ড্ (fogged) হয় অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্য লাল আলোর প্রয়োজন, লাল আলোতে প্লেট নষ্ট হয় না; কিন্তু আজ কাল যেরূপ প্লেট প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে এই লাল আলো বেশীক্ষণ লাগিলে অল্প ফগ্ ড্ হইয়া যায়। বিশেষতঃ আইসোক্রোমাটিক প্লেট গুলিকে সযত্নে লাল আলোর রশ্মি হইতে রক্ষা করিতে হয় কারণ লাল আলো এই প্লেটে লাগিলে প্লেট খারাপ হইয়া পড়ে।

রুবিল্যাম্প হইতেও কখন কখন কার্য্যকরী রশ্মি (actinic rays) বহির্গত হয়, অপকৃষ্ট লাল কাচ থাকিলে এইরূপ হইয়া থাকে। কাচ কার্য্যোপযোগী কিনা বা তাহা হইতে কার্য্যকরী রশ্মি (actinic rays) বহির্গত হয় কিনা, তাহা দেখিতে হইলে এক-খানা ডার্কস্লাইড লইয়া তাহার ভিতর একখানা ড্রাইপ্লেট পুরিয়া লইতে হয়, তাহার পর রুবিল্যাম্প জ্বালিয়া ডার্কস্লাইডের এক পাশের স্লাইড অর্দ্ধেক টানিয়া খুলিয়া এই লাল আলোর ল্যাম্প একফুট দূরে এক মিনিট ধরিতে হইবে। যদি লাল কাচ দিয়া সাদা আলোকের কার্য্যকরী রশ্মি আসিয়া থাকে তবে প্লেট অন্ততঃ তিন মিনিট ডেভলপ করিলে দেখা যাইবে যে, যে ভাগে লাল আলো লাগিয়াছে, তাহার বর্ণ কাল হইয়া গিয়াছে। যদি খুব অল্প রশ্মি আসে, তাহা হইলেও অল্প কাল হইয়া যাইবে।

এই অবস্থা দেখিলে লাল কাচটি বদলাইয়া দিতে হইবে। কাচ দিয়া এই রশ্মি আসে কিনা তাহা দেখিতে হইলে, ইল্ফোর্ডের এম্প্রেস প্লেট (Ilford, empress plate) বা সেইরূপ কোন প্লেট ব্যবহার করিতে হইবে।

ডার্করুমে অন্ততঃ দুইটি জানালা থাকিলে ভাল হয় ও এই জানালাতে লাল কাঁচ দিয়া দিতে হয়। প্রয়োজন মত জানালা খুলিলে যেন আলো ও বাতাস ঘরে আসিতে পারে। দরজার পাস দিয়া আলো আসিলে তাহার উপর পেষ্টবোর্ড মারিয়া দিলে চলে। ঘরের মধ্যে বাতাস গমনাগমনের ভাল উপায় রাখা দরকার; কেননা অনেক সময় ঘরের ভিতর বেশীক্ষণ থাকার প্রয়োজন হইতে পারে। সেজন্য ঘরের উপরের দিকে কতকগুলি ৩ ইঞ্চি পরিমাণে ছিদ্র করা প্রয়োজন ও ঘরের নীচের দিকেও কতকগুলি ছিদ্রের প্রয়োজন। উপরের ছিদ্র দিয়া দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে ও নীচের ছিদ্র দিয়া ভাল বায়ু আসিবে। কিন্তু ছিদ্র করিলে ঘরে সাদা আলো আসিবে, কাজেই তাহা বন্ধ করিবার জন্য টিনের তিনধার বাঁকান চোঙ্গ করা প্রয়োজন। ইহার একটা দিক ছিদ্রের মধ্যে দিয়া আঁটিয়া দিলেই হইবে। ইহার ভিতর দিকটাতে কাল রং লাগাইতে হইবে, কিন্তু এই বর্ণ যেন উজ্জ্বল বা চকচকে না হয়, তাহা হইলে ঘরে সাদা আলো যাইবে।
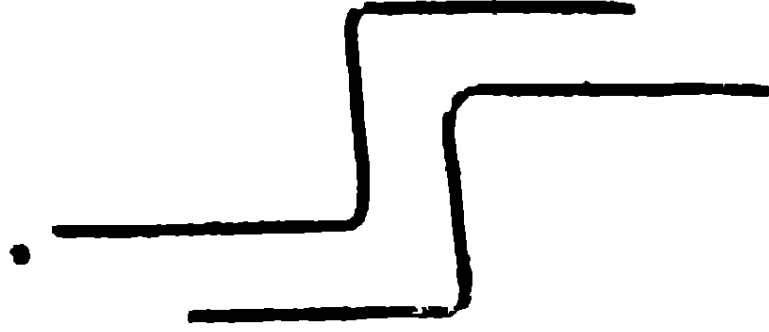
একখানি টেবিল দরকার; পাছে কোন জিনিস হঠাৎ টেবিল হইতে পড়িয়া যায়, সেজন্য তাহার চারিধারে উচু করিয়া পাতলা কাঠ মারিয়া দিতে হইবে, ইহার উপরটা দস্তার একখানা পাত দিয়া মুড়িয়া দিলে ভাল হয়; কেননা নানারকম এসিড ও ঔষধাদি পড়িয়া টেবিলের কাঠ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। জল বাহিরে যাইবার জন্য একটা নল থাকা চাই। এই টেবিল খানি লাল কাঁচ দেওয়া জানালার সম্মুখে বসাইলে বেশ সুবিধা হয়; কিন্তু প্লেট ডেভেলপ্ করিবার সময় যেন প্লেটের উপর লাল আলো না পড়ে। টেবিলটি যেন সমভাবে বসান হয়, কোন দিক উঁচু নীচু না থাকে। তৎপরে ঘরের বাহিরে কিম্বা জায়গা থাকিলে ঘরের ভিতরে একটা জল রাখিবার বড় টপ থাকা চাই। ইহা উপরে বসাইয়া দিলে ঠিক টেবিলের উপর যেন নল দিয়া জল পড়িতে পারে।

রুবি ল্যাম্পটি যেন তৈলে জ্বলিবার বন্দোবস্ত থাকে, তাহা হইলে অনেক সুবিধা হয়। গ্যাস থাকিলে আরও ভাল হয়। রুবি ল্যাম্পের আলোর তেজ এরূপ হওয়া চাই, যেন ল্যাম্প হইতে এক ফুট তফাতে সংবাদ পত্র পড়িতে পারা যায়।

ডার্করুমের সব বন্দোবস্ত ঠিক হইলে নিম্নলিখিত জিনিষ গুলির প্রয়োজন।

মেজার গ্লাস — দশ আউন্সের একটা
ঐ — তিন আউন্সের একটা।
মিনিম গ্লাস — একটা।
নিক্তি — একজোড়া।

চারিখানি পোর্সিলেন ডিস (পোর্সিলেন ডিস পরিষ্কার করা অতি সহজ)।

বড় ডিস বা প্লেট ও পেপার ধুইবার সরঞ্জাম। প্রিন্টিং ফ্রেম একটা। প্রয়োজনীয় আরকাদির কথা পরে লিখিব।

ড্রাই প্লেট।

রৌপ্যের ব্রোমাইড ও জিলাটিন নামক এক প্রকার পদার্থ মিশ্রিত করিয়া কাচের উপর সমান ভাবে লাগান থাকে; ইহাকে ড্রাই প্লেট বলে। এই মিশ্রিত পদার্থে সামান্য আলোক লাগিলেই এক রাসায়নিক ক্রিয়া হয়, সেজন্য প্লেট ডার্করুমে খুলিতে হয়। ড্রাইপ্লেট নানাপ্রকারের আছে,—কোনটাতে ক্যামরার লেন্স দ্বারা প্রতিফলিত আলো অল্প লাগিলেই ছবি উঠে এবং কোনটাতে আলো অনেকক্ষণ লাগিলে ছবি উঠে। দৃশ্য ও গৃহের ছবি তুলিতে স্লো প্লেট বা যে প্লেটে আলো বেশীক্ষণ লাগাইতে হয় তাহাই ব্যবহার করা উচিত। প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে র‍্যাপিড্ প্লেট বা যে প্লেটে কম আলো লাগিলে ছবি উঠে, তাহাই ব্যবহার করা উচিত। গতিশীল কোন জিনিষ বা ছোট ছোট ছেলে, যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের ছবি তুলিতে হইলে ঐরূপ প্লেট ব্যবহার করিতে হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে স্লো প্লেট ব্যবহার করাই ভাল; কারণ এই প্লেটে কাজ করিবার খুব সুবিধা এবং প্রথমে অন্য প্লেট অপেক্ষা ইহা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। ক্রমে উন্নতি করিতে পারিলে ও সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলে র‍্যাপিড্ প্লেট ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। ব্যবহার করিবার জন্য প্লেটগুলি ডার্কস্লাইডে ভরিয়া লইতে হয়, তজ্জন্য ডার্করুমে যাওয়া প্রয়োজন। ডার্করুমে গিয়া ডার্ক স্লাইড খুলিয়া, প্লেটের বাক্স খুলিয়া প্লেট বাহির করিতে হয়। যে কোন প্রস্তুতকারকের হউক না কেন প্রায়ই দেখা যায় যে, চারিখানা করিয়া প্লেট একসঙ্গে জড়ান আছে। দুইখানা প্লেটের ফিল্মের দিক মুখামুখি করা থাকে। চারিখানা করিয়া প্লেট একসঙ্গে জড়ান থাকে। যে কোন প্রস্তুত-কারকের প্লেট হউক না, সকলেরই প্লেটে ফিল্ম্ মুখামুখি করিয়া মোড়া থাকে। সেজন্য মোড়ক খুলিলে সকলের উপর প্লেটের ফিল্ম্ নিচের দিকে থাকিবে এবং তাহার নিচের প্লেটের ফিল্ম্ উপরের দিকে থাকিবে। এজন্য রুবিল্যাম্প জ্বালিবার কোন প্রয়োজন নাই। ফিল্ম্ কোন দিকে আছে তাহা জানিবার আর এক উপায় আছে; যে দিকে কাচ আছে সে দিকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে কেমন তৈলাক্ত বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু যে দিকে ফিল্ম্ আছে সে দিক বেশ শুষ্ক বোধ হয়, কিম্বা নখ দিয়া ঘষিলে কাচের দিকে পিছ্লাইয়া যায় কিন্তু ফিল্মের দিক পিছ্লায় না। যদি ইহাতেও ফিল্ম্ কোন্ দিকে

আছে টের না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অগত্যা রুবি ল্যাম্পের আলোকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কাচের দিকটাতে আলো পড়িলে চকচক্ করে কিন্তু ফিলমের দিকে তত চক্‌চক্ করে না। কিন্তু ড্রাই প্লেট লাল আলোর কাছে যত না লইয়া যাওয়া যায় ততই ভাল, কারণ ফগড্ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ফিল্মেও হাত না দেওয়া ভাল, কেননা আঙুলের দাগ লাগিতে পারে, তাহাতে ছবি বড় বিশ্রী দেখায়। সে জন্য প্রথমোক্ত রূপে ফিল্ম্ কোন্ দিকে তাহা ঠিক করা ভাল।

কোন্ দিকে ফিল্ম্ আছে তাহা ঠিক করিয়া লইয়া, যেদিকে স্লাইড টানিয়া উপরে উঠাইতে হয় সেই দিকে ফিল্মের দিক দিয়া প্লেট পরাইয়া দিতে হয় অর্থাৎ ডার্কস্লাইড ক্যামেরাতে বসাইয়া দিলে ফিল্মের উপর যেন ছবি প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। যদি পুস্তকের মত ডার্কস্লাইড থাকে তাহা হইলে দুইখানা প্লেটের মধ্যে একখানা কাল কার্ড লাগাইয়া দিতে হয়, তাহা না দিলে এক প্লেটের প্রতিফলিত ছবি অন্য প্লেটে লাগিতে পারে। প্লেট ভরিবার পূর্ব্বে প্লেট খানি হইতে ধুলা ঝাড়িয়া লইতে হয়। ধুলা বুরুশ দিয়া আস্তে ঝাড়িলেই ভাল হয়, কারণ যদি রেশম বা পশমের কোন দ্রব্য দিয়া ঝাড়া যায়, তাহা হইলে পশমের দ্রব্য ফিলমের গায়ে লাগিয়া তড়িৎ উৎপন্ন হয়, সেজন্য ধুলা না গিয়া বরং আরও ধুলা লাগিয়া যায়। আর এক উপায়ে ধুলা ঝাড়া যায়,—টেবিলের উপর প্লেট খানি আস্তে ঘা দিলে ধুলা পড়িয়া যায়।

তাহার পর, ডার্কস্লাইড বন্ধ করিয়া কাল কাপড়ে মুড়িয়া লইতে হয়, কেননা যত সাবধান হওয়া যায় ততই ভাল। ডার্কস্লাইড বন্ধ করিয়া বাকি প্লেটগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া তবে ডার্করুম হইতে বাহির হইতে হয়। প্লেটগুলি কোন কারণেই স্যাঁতসেঁতে যায়গা বা অবিশুদ্ধ বায়ু পূর্ণ স্থানে, কিম্বা খুব গরম যায়গাতে যেন না রাখা হয়। এরূপ করিলে প্লেট খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ষাকালে প্লেট খুব সযত্নে রাখিলেও, বেশীদিন ভাল রাখা যায় না, সেজন্য প্লেট ক্রয় করিবার সময় দেখিয়া লইতে হয় প্লেট নূতন কিনা।

বড় স্যাপের ক্যামেরা থাকিলে তাহাতে ক্যারিয়ার বা ছোট প্লেট লাগাইবার ব্যবস্থা পাওয়া যায়। তাহা লাগাইয়া ছোট প্লেট ব্যবহার করিতে পারা যায়। যথা $\frac{১}{১}$ বা ফুল সাইজের ক্যামেরা থাকিলে তাহাতে ক্যারিয়ার লাগাইয়া $\frac{১}{২}$ প্লেট ও $\frac{১}{৪}$ প্লেট ছবিও তোলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ প্লেট ভাল বাসেন না। কারণ ইহা হাত হইতে পড়িয়া গেলে ভাঙ্গিয়া যায় ও বিদেশে যাইতে হইলে অনেক সময় পাঁচ, দশ ডজন প্লেট লইয়া যাইলে বড় ভারী হইয়া পড়ে, কিন্তু ফিল্ম্ হইলে এ সব হয় না। কাচের পরিবর্ত্তে সেলুলয়েড নামক এক প্রকার পদার্থের উপর রৌপ্য ব্রোমাইড ও জিলাটিন মিশ্রিত পদার্থের সমভাবে প্রলেপ থাকে, সোজা কথায় ইহাকে ফিল্ম্ বলে। প্লেটের মতই ফিল্ম্ ব্যবহার করা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অর্থো-ক্রোম্যাটিক নামে এক প্রকার প্লেট হইয়াছে। ইহার গুণ এই যে সর্ব্বপ্রকার বর্ণের তারতম্য সাধারণ প্লেটে বুঝা যায় না, কিন্তু এই প্লেটে তাহা টের পাওয়া যায়। বেগুনিয়া কিম্বা নীল বর্ণের রশ্মিগুলি সাধারণ প্লেটে শীঘ্র কার্য্য করে। সে জন্য এই দুই বর্ণ নেগেটিভে কাল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সবুজ বর্ণ ফিকা কাল বা প্রায় সাদা ও লাল বর্ণের যায়গাতে শাদা বা খালি কাচ দেখা যায়। কিন্তু এই নূতন প্রকার প্লেটে নীল, হরিদ্রা, সবুজ ও লাল বর্ণের তারতম্য বেশ বুঝা যায়। এবং সেই সেই স্থানে কাল রঙের গাঢ়তার তারতম্য হয় ও ছবি আরও সুন্দর দেখায়। দৃশ্য তুলিতে হইলে এই প্রকার প্লেট ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়।

ডার্করুম থাকিলে যখন তখন ডার্কস্লাইডে প্লেট ভরা যায় ও ডেভলপ করা যায় কিন্তু তাহা না থাকিলে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় ও তখন ঘরের দরজা, জালালা বন্ধ করিয়া কাজ করিতে হয়। তবে দিনের বেলায় প্লেট ভরিবার জন্য চেঞ্জিং ব্যাগ বা প্লেট বদলাইবার থলিয়া পাওয়া যায়। ইহার এক দিক দিয়া ডার্কস্লাইড ঢুকাইয়া দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়, আর এক পার্শ্বে হাত ঢুকাইবার জন্য দুইটি ছিদ্র আছে তাহার মধ্য দিয়া হাত দিয়া স্পর্শ দ্বারা ফিলম্ কোন দিকে আছে, তাহা ঠিক করিয়া ডার্কস্লাইডে প্লেট পূরিতে হয়। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে। যদি কখন দূর দেশে গিয়া অনেকগুলি ছবি তুলিতে হয়, তখন একস্পোজড বা ব্যবহৃত প্লেট গুলি বদলাইয়া নূতন প্লেট ডার্ক স্লাইডে ভরিয়া দেওয়া যায়। এ জন্য ডার্করুম না থাকিলে ও বিদেশ যাইতে হইলে ইহার একটি সঙ্গে রাখিলে বড় কাজে আসে।

প্রতিমূর্ত্তী।

সর্ব্ব প্রথমে কিসের ফটো তুলিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কারণ প্রতিমূর্ত্তি তোলা ও দৃশ্য তোলার মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। তবে, এখন ধরিয়া লওয়া গেল যেন প্রতিমূর্ত্তি তোলারই ইচ্ছা, তাহা হইলে কোন সুবিধামত আলোকিত স্থানে ক্যামেরা আনিয়া ষ্ট্যাণ্ডের সঙ্গে লাগাইয়া খাটাইয়া লইতে হয়। এ বিষয় আমি ষ্ট্যাণ্ড ক্যামেরার কথাই বলিতেছি। ক্যামেরা ঠিক করিয়া, যদি ক্যাপ থাকে তাহা হইলে তাহা খুলিতে হইবে, শাটার থাকিলে তাহা টিপিয়া খুলিতে হইবে, খুলিয়া ফোকাস করিতে হইবে। ফটোগ্রাফ্ শিক্ষার্থী সর্ব্বপ্রথমে আত্মীয়স্বজনের প্রতিমূর্ত্তি তুলিতেই উৎসুক হয়। প্রতিমূর্ত্তি দুইরকম স্থানে তোলা যায় গৃহের বাহিরে ও তৈয়ারী করা ষ্টুডিওতে। কিন্তু শিক্ষার্থীর ষ্টুডিও থাকা সম্ভব নহে, সেজন্য সে সম্বন্ধে বলিব না। এতদ্ভিন্ন সাধারণ গৃহের মধ্যেও ছবি তোলা যায়, তবে বেশী এক্সপোসার দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

প্রতিমূর্ত্তি তোলা প্রথম প্রথম খুব সহজ বোধ হইতে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয়ের মধ্যে ইহা অন্যতম।

সাধারণত যে লেন্স ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই প্রতিমূর্ত্তি তোলা যাইতে পারে; অবশ্য তাহার ডায়াফ্রাম অন্ততঃ f৮ হওয়া আবশ্যক। যদি f১১ দেওয়া দৃশ্য তুলিবার লেন্স (landscape lens) থাকে, তাহাতেও হইতে পারে, অবশ্য ইহাতে বেশীক্ষণ একস্‌পোসার লাগিবে। f৪, f৫ প্রভৃতি ডায়াফ্রামওয়ালা লেন্স বিক্রয় হয়। ইহাতে প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যও হয়। প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার জন্য যে লেন্স বিশেষ করিয়া প্রস্তুত হয় তাহাকে পোর্ট্রেট লেন্স (portrait lens) বলে। শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা সুবিধাজনক নহে, কারণ ইহা আজকালকার-প্রস্তুত ক্যামেরার পক্ষে খুব ভারী ও ইহা দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি তোলা ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয় না।

প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে ফাষ্ট (fast) প্লেট ব্যবহার করা উচিত, কারণ তাহাতে খুব কম একস্‌পোসার দিতে হয় ও বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের ও নার্ভাস (nervous) রোগিদিগের ছবি তুলিতে ইহার প্রয়োজন হয়। আইসোক্রোমাটিক (isochromatic) প্লেট ব্যবহার করিলে মুখের দাগ ইত্যাদি বড় টের পাওয়া যায় না।

এখন গৃহের মধ্যেই ছবি তোলার কথা লিখিব। প্রথমে কোন প্রকার ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রয়োজন; গৃহের দেওয়ালেই চলিতে পারে কিন্তু ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকিলেই ভাল হয়। ইহা রং দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলেও চলে; কিম্বা সুবিধা হইলে একটা কিনিলেও হয়। নিজে প্রস্তুত করিয়া লইলে অনেক কম পড়ে। চাদর শাল বা র‍্যাপার দিয়াও কাজ চলে।

ইহা ব্যতীত একটি রিফ্লেক্টর (reflector) প্রয়োজন। যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার মুখের একদিকে আলো আসিয়া পড়ে এবং অন্য দিকটা অন্ধকার থাকে, সেজন্য সেদিকে রিফ্লেক্টার দিলে অনেকটা আলোকিত হয়। কাহারও দ্বারা একখানা সাদা চাদর সেদিকে ধরিয়া রাখিলে হয় কিম্বা একটা কাঠের ফ্রেম করিয়া তাহাতে সাদা কাগজ আঁটিয়া লইলে বেশ সুবিধা হয়। বাজারে যাহা বিক্রয় হয় তাহা অবশ্য খুবই ভাল ও তাহাতে নানারকম সুবিধা আছে।

যাহার ফটো তুলিতে হইবে তাহাকে ঠিক করিয়া বসান ও আলোর বন্দোবস্ত, এই দুইটিই প্রতিমূর্ত্তি তোলার মধ্যে প্রধান জিনিষ। যাঁহারা প্রথম ছবি তুলিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে বড় চিত্রকর কিম্বা ফটোগ্রাফারের চিত্র ভাল করিয়া দেখিয়া চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হয়। কোন চিত্র পুস্তক দেখিয়া, কি প্রকার আলো পড়িলে ভাল চিত্র হয় ও কি ফল হয় ও কি প্রকারে লোককে বসাইলে ভাল ভাল ছবি হয় ও দেখিতে চিত্রোপযোগী হয়, তাহা বেশ শিখিতে পারা যায়। সাধারণতঃ সকলের এক ভুল ধারণা আছে যে, যাহার ছবি তুলিতে হইবে তাহার যে প্রকার সুবিধা হয়, সেই প্রকারে বসাইয়া তুলিলেই ভাল ছবি হয়। আবার এই সকল ছবি দেখিয়া এই ভুল ধারণা দৃঢ় হইবে। কারণ যে সকল ফটোর মধ্যে এই প্রকার

অনায়াসে বসাইয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা সত্যই ঐরূপ করিয়া তোলা হয় নাই, বা হঠাৎ ঐরূপ হয় নাই—অনেকদিন শিক্ষার ফলে ঐরূপ করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে।

ইংরাজী নামের বাংলা ব্যাখ্যা।

ফগ্ড—এক্স্পোজ্ না করা বা এক্স্পোজ্ করা প্লেটে যদি কখন সামান্য আলো লাগে বা খারাপ রুবিল্যাম্পের লাল কাচের ভিতর দিয়া কার্য্যকরী রশ্মি লাগিয়া যদি প্লেটে এক প্রকার অল্প কাল আবরণ হইয়া যায় এবং তদ্দরা ঝাপ্সা হইয়া যায় তাহাকে ফগ্ড্ বলে। অবশ্য ফগ্ড হইয়াছে কিনা তাহা ডেভেলপ্ করিলে বুঝিতে পারা যায়। অন্যান্য কারণেও ফগ্ড্ হয় তাহা পরে বক্তব্য।

ডেভেলপ—এক্স্পোজ করা প্লেটে রাসায়নিক আরকাদির দ্বারা ছবি পরিস্ফুট করিলে ডেভেলপ্ করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

FOOD.

Translated from Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose's book on "Food."

(3)

The need for food.

Let us now see why we need food. Those, who have any experience of fasting, know very well how it weakens the body and makes it unfit for any kind of work. Prolonged fasting causes great emaciation and makes the bones prominent and protruding. In times of famine, some of us are familiar with the melancholy sight of the unfortunate sufferers reduced to living skeletons only. As soon as they get sufficient food, the loss is quickly made up for and they become plump and strong again. We thus see that the body becomes wasted and enfeebled when food is insufficient or altogether cut off, but that it regains strength and flesh as soon as food is supplied. Food therefore serves two principal purposes—(1) making-up for the waste and helping the growth of the body, and—(2) supplying energy to do work.

Whatever work we perform, it causes wasting. During walking, rising, sitting, running or doing any kind of exercise, the various muscles of the body engaged in the particular act relax and contract and thus suffer waste. Even mental exercises, such as studying and thinking, cause waste of the particular organs concerned in such functions. If we take the weight of a person, then ask him to do a piece of work entailing hard labour and afterwards weigh him again, we shall find that he has lost much weight by doing the work. Why should there be this loss of weight? The cause is not far to seek. A kind of combustion is going on within our system and wasting is the direct result of this internal burning. When we burn a piece of wood, we find it is reduced in bulk and the residue left is much lighter than the original substance. In a similar manner, the burning inside our body causes waste, and consequently loss of body-weight. Even if we do not apparently exert ourselves, the combustion still goes on as some of the internal functions such as respiration, heart's action, &c., do not depend on our will but are involuntary natural acts which must go on even if we lie down quietly and determine not to stir. These organs are thus unremittingly working and suffering waste. It may be asked what evidence is there to show that our body is undergoing combustion? Well, a few simple experiments will establish the truth of the statement.

The best proof that our body is undergoing combustion is furnished by the fact that the products of this combustion are identically the same as those of charcoal or wood when burnt in the air. The only difference between the two phenomena is that whereas both heat and light are produced by the combustion of charcoal or wood in the air, there is only heat but no light produced in the burning which occurs within our body. The latter phenomenon is therefore aptly described as slow combustion.

Any kind of fuel, such as wood, coal, charcoal, oil, wax or stearin, and all animal and vegetable substances contain carbon and hydrogen, besides a few other elements. When any of these is burnt in the air, the carbon and hydrogen contained in the substance chemically combine with the oxygen of the air and give rise to two products, viz., carbonic acid gas and water respectively. Now, carbonic acid gas is colourless and invisible. We cannot, therefore, recognise it by sight but we cannot detect its presence by a simple experiment. We know pure lime-water is clear, colourless and transparent as water

but when it comes in contact with carbonic acid gas, it turns milky due to the formation of an insoluble compound of lime and carbonic acid called carbonate of lime, of which chalk is one of the varieties.

Exp. 1. In a clean wide-mouthed glass bottle, put about an ounce of clear lime-water, cover the mouth with a glass plate and shake the contents well. No particular change is noticed in the lime-water. Now fix a small candle to a bent piece of wire, light it, introduce it into the bottle and cover the mouth of the bottle with a piece of paper, the wire passing through it. After a short time, the candle will go out by itself. Take out the candle, close the mouth of the bottle with the glass plate and shake well the contents again. This time the clear lime-water will become milky.

Why has the clear lime-water turned milky? Well, carbon is one of the constituents of the candle and during its combustion, the carbon of the candle has chemically combined with the oxygen of the air contained in the bottle forming carbonic acid gas and this has turned the lime-water milky.

Hydrogen is another constituent of the candle and during its combustion, the hydrogen combines with the oxygen of the air and forms water. But as the water thus formed remains in a state of vapour which is invisible, we cannot recognise the presence of this water by sight. We can, however, detect its presence by a simple experiment.

Exp. 2. Light a candle and hold a clean dry glass tumbler over the flame. After a short while, the interior of the tumbler will appear misty, due to the condensation of the water-vapour formed during the burning of the candle into minute drops by contact with the cold surface of the glass tumbler.

Thus we see that the burning of carbon and hydrogen in air produces carbonic acid gas and water respectively. We have already said that like wood and candle, carbon and hydrogen are the principal constituents of our body. These burn slowly inside the body with the help of the oxygen of the air we inhale and the products of such slow combustion are also carbonic acid gas and water, which are constantly being thrown out of our body by our lungs with the expired air. We cannot see them as both of them are colourless and invisible, but can recognise their presence by similar tests as mentioned before.

Exp. 3. Place some clear lime-water in a glass tumbler and blow into it some air from the lungs through a glass tube. The lime-water will turn milky.

We have already seen that it is the carbonic acid gas which makes lime-water milky. It is therefore evident that with our breath, a large quantity of carbonic acid gas escapes from our body. This carbonic acid gas is produced by the slow combustion of carbon contained in the body.

We can similarly prove that water also is being produced in the system by the slow combustion of hydrogen which is another constituent of our body.

EXP. 4. Take a clean mirror and blow upon it several times. It will turn dim due to the condensation of water-vapour present in our breath by contact with the external cold surface of the mirror. If you draw your finger over the dim surface, you will at once recognise the presence of water there.

In the cold weather, if we give a few puffs in the cold outer air early morning, we find a cloud forms each time we blow out. This is due to the condensation of water-vapour present in our breath by contact with the external cold atmosphere. The water-vapour which is naturally invisible becomes visible as cloud when it condenses into minute droplets of water by contact with the cold outer air.

These experiments leave no doubt that our body is constantly undergoing combustion; but as this combustion takes place very slowly, heat is only produced but no light, as in the case of ordinary combustion of wood and other fuels. We become cognisant of this heat when we touch the body of a living warm-blooded animal. The dead body is cold to the touch, because respiration has ceased in the dead animal, and no combustion takes place in the body to produce heat. This combustion maintains our body-heat generally at 98·4°F. and we can measure it by a thermometer. In the febrile state the combustion goes on more energetically, more heat is produced and the temperature of the body rises several degrees accordingly.

I have already mentioned that a substance containing carbon loses weight when it burns. Now, the human body is undergoing slow combustion the result of which must be continued loss of weight, but if we take the weight of a healthy adult day after day, we notice the strange fact that he keeps practically a constant weight for a long time, or even we find him sometimes gaining in weight, and it is only in case of illness that he loses weight. How is this to be accounted for?

I have already said that whether we do or do not do any work, our body suffers waste all the same. If this waste is not fully made up for or not at all, we become weak and emaciated and ultimately die. Let us now see how this waste is recouped. We require coal or some other fuel for working a steam-engine. When the first charge is consumed, we have to put in fresh charges of coal, otherwise the engine stops. Our body is like a steam-engine and it requires some kind of fuel to

enable it to work and food is the fuel that we employ in working our body-engine. The digested food is absorbed by the blood and taken by it to all parts of the system. Every part of the body appropriates to itself the exact quantity it is in need of, which is formed into tissues and thus all the waste is repaired and the growth of the body helped by the excess. A portion of the food undergoes combustion in the blood by uniting with the oxygen of the air it contains. In coal and other kinds of fuel, the potential energy stored up in them is first converted into heat and then into energy which helps the working of the engine. There is a good deal of potential energy stored up in our food, and when it undergoes combustion in the blood, heat is produced which keeps up our body-temperature and part of it is transformed into energy which gives us strength to work. The different kinds of food we take contain all the ingredients of our body. Food is, therefore, the only souce for making up for the waste of the body and supplying it with energy to work.

As the waste of the body has to be repaired, so its growth has also to be maintained. A new-born child gradually develops into a full-grown adult. There is a great difference in size and proportions between a baby and an adult person. If we simply consider the length of the body, we shall see the enormous difference between the two. A healthy new-born baby measures 18 inches only but the average height of an adult person is 5 feet 6 inches. The weight of a newborn child is from 4 to 5 seers, that of an adult healthy man is not less than 1½ maunds. The development of all parts of the body usually takes place in proportion to the height of the individual. From birth up to 25 to 30 years of age, the body continues to grow. After this period, no more growth takes place but it continues in the same state for a good many years. As we grow old, wasting begins. We, therefore, see that the food we take not only repairs waste but contributes to the growth of the body up to 25 or 30 years of life; it makes a child into a boy, a boy into a young man and a young man into a full-grown adult. The child, the boy, and the young man require considerable quantity of food for double purposes, viz., the repair of the waste of the body, and for its growth. Insufficient food at this stage of life is very harmful as it retards the development. On the other hand, over-feeding is extremely injurious.

We can therefore classify the need for food under four different heads:—

1. Repair of waste.
2. Helping of growth.
3. Production of heat.
4. Supply of energy.

All foods are not equally able to discharge these four functions; some of them help the growth and repair of tissues and the others produce heat and energy. We shall try to explain the functions of the different kinds of food in their proper place.

(To be continued.)

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দুই একটি কথা।

আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, চুম্বকত্ব, শব্দ ও পদার্থের সাধারণ-ধর্ম্ম এই কয়েকটি বিষয় লইয়াই আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। বহুশতাব্দী-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণাব ফলে বর্ত্তমান যুগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, কি আলোক, কি তাপ, কি তড়িৎ এই সকলই বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইথার নামক অদৃশ্য দ্রব্যবিশেষের স্পন্দনেব ফল-মাত্র। ইথাব কি তাহা সম্যক ধারণা করা অতিশয় দুরূহ; কেননা, ইথাব সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান অতিশয় সঙ্কীর্ণ। শব্দোৎপত্তির কারণও স্পন্দন; তবে এ স্পন্দন ইথারের নহে; বাযবীয় অণু-সমূহের। পূর্ব্বকালে তাপ প্রভৃতি যে সূক্ষ্ম তরল পদার্থ-বিশেষ বলিয়া অনুমিত হইত, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইহাব অন্যতম প্রমাণ এই যে, পদার্থ তাপযুক্ত কিম্বা তাপবিযুক্ত হইলে ইহার ওজনের হ্রাস বৃদ্ধি হয না।

ইথারের স্পন্দনেই, তাপ, আলোক ও তড়িতের সৃষ্টি। স্পন্দনের বেগ ও প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আলোক, তাপ, শব্দ ও তড়িৎ উৎপন্ন হয়। স্থল বিশেষে কেবল মাত্র স্পন্দনের দ্রুততার তারতম্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়-বিশেষের অনুভূতি কিম্বা অনুভূতির কারণ হয়। ইথারে স্পন্দনের বেগ বর্দ্ধিত হইতে হইতে সীমাবিশেষ অতিক্রম করিলে মানবের চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। কম্পন রেটিনায় (retina) সঞ্চালিত হইয়া স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কে উপনীত হয়; উহাতেই আলোকের উপলব্ধি হয়। বর্ণানুভূতিও ঐ আন্দোলনের বেগের ইতর বিশেষে সঞ্জাত হয়; স্পন্দনের প্রকৃতিগত পার্থক্য জনিত নহে। ইথারে প্রতি সেকেণ্ডে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে আমরা লাল আলোক দেখিতে পাই। ক্রমে স্পন্দনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আমরা যথাক্রমে লোহিত, অরেঞ্জ, পীত, হরিৎ প্রভৃতি রামধনুর ন্যায়

সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট সাতটি বর্ণ দেখিতে পাই। এই সকল বর্ণ অতিক্রম করিবার পর ইথার কম্পন এত দ্রুত হইতে থাকে যে, আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয় সাহায্যে আর তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না। তখন উক্ত কম্পনের আলোকত্ব নষ্ট হয়। কিন্তু উহার আলোকত্ব নষ্ট হইলেই যে উহার অস্তিত্ব লোপ পায় এরূপ নহে। স্পন্দন পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত হইতে থাকে মাত্র। এই ইথার তরঙ্গ রাসায়নিক পদার্থ বিশেষের উপর প্রক্রিয়া সাধনে সমর্থ। ইহা হইতেই উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ সংগৃহীত হয়। অপর পক্ষে কম্পন বেগ কমিতে কমিতে যখন নিম্ন-সীমা অতিক্রম করে তখন আবার আলোক-তরঙ্গ চক্ষুর স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা সাধনে অসমর্থ হয়। তখন আলোক-তরঙ্গ তাপ-তরঙ্গে পরিণত হয়। থার্মোপাইল (thermopyle) নামক যন্ত্র-বিশেষের সাহায্যে তাপ-তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায়; এই যন্ত্রে অত্যল্প পরিমাণে তাপ-রশ্মি পতিত হইলেই বৈদ্যুতিক গ্যাল্‌ভানোমিটার (Galvanometer) যন্ত্রে তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায়। অনেকেই পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকিবেন যে, একটি প্রজ্জলিত চুল্লীর সম্মুখে একটা বৃহৎ কাচের প্লেট (Glass Screen) ধরিলে, উত্তাপের অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে; কিন্তু আলোক-রশ্মি পূর্ব্ববৎই কাচাবরণ ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। কম্পনের দ্রুততা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে হইতে পরিশেষে তাপতরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত হয়। এই সকল তরঙ্গ প্রোফেসার হার্জ (Hertz) আবিষ্কৃত বিখ্যাত বৈদ্যুতিক রেজোনেটার (resonator) নামক যন্ত্র-সাহায্যে দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়।

ইথারের স্পন্দন প্রযুক্ত যেরূপ তাপ, আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, সেইরূপ বায়বীয় কণা-সমূহের কম্পনে শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে স্পন্দনের প্রকৃতি ইথার-স্পন্দন প্রণালী হইতে ভিন্ন। এই প্রকৃতিগত পার্থক্য নিম্ন লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে কিয়ৎপরিমাণে ধারণা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ মনে করুন, একটি দীর্ঘ দড়ির একপ্রান্ত একটি বৃক্ষের কাণ্ডে বাঁধিয়া অপর প্রান্ত পর্য্যবেক্ষক নিজহস্তে ধরিয়া দড়িটাকে লম্বা করিয়া রাখিলেন। এক্ষণে হস্তস্থিত প্রান্তটি ধরিয়া যদি জোরের সহিত একটি ঝাঁকি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উর্ম্মীপরম্পরা দড়িটির উপর দিয়া বৃক্ষের দিকে ধাবিত হইবে। এ ক্ষেত্রে স্পন্দনের যে প্রকৃতি আলোক-তরঙ্গের প্রকৃতিও অবিকল তদনুরূপ। অনুধাবন করিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, তরঙ্গগুলি একটির পর একটি করিয়া রজ্জুর উপর চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু রজ্জুর ক্ষুদ্র অংশ গুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হয় না। নিজ নিজ স্থানে [illegible]মান ভাবে স্পন্দিত হইতে থাকে। সেইরূপ ইথার ও স্ব-স্ব স্থানে কম্পিত [illegible] অথচ তরঙ্গগুলি মণ্ডলাকারে পরিবাহিত হয়। ইথার-তরঙ্গ কিরূপে বৃত্তাকারে [illegible]াহিত হয় তাহা বুঝিতে হইলে, মনে করুন পর্য্যবেক্ষক হস্তে একটি রজ্জুর পরি-

বর্ত্তে অসংখ্য রজ্জু-মালার প্রান্তভাগ ধারণ করিয়াছেন; এই রজ্জুগুলির দ্বিতীয় প্রান্ত-সমূহ যদি পর্য্যবেক্ষকের চতুর্দ্দিকে প্রোথিত খুঁটির সহিত আবদ্ধ থাকে, আর পর্য্য-বেক্ষক পূর্ব্ববৎ নিজের হস্তধৃত প্রান্ত গুলি বেগে আন্দোলিত করিতে থাকেন, তাহা হইলে বাহিরের লোক দেখিতে পাইবেন যে, তরঙ্গগুলি পর্য্যবেক্ষককে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে চতুর্দ্দিকে পরিবাহিত হইতেছে। স্থির-পুষ্করিণীতে একটি ঢিল ফেলিলে অনেকটা এইরূপ স্পন্দন হয়। ঢিলটি যে স্থানে পড়ে, সেই স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে তরঙ্গনিচয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অথচ ভাসমান বৃক্ষপত্রাদি স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই আন্দোলিত হইতে থাকে।

মনে করুন পূর্ব্ব পরীক্ষায় রজ্জুগুলিকে খুঁটিতে বাঁধিবার পূর্ব্বে ইতস্ততঃ বিদ্য-মান কয়েকটি বৃক্ষকাণ্ডে লম্বমান সরল রেখার ন্যায় কয়েকটি ছিদ্র করা হইল, এবং সেই সকল ছিদ্রপথে রজ্জুগুলি চালিত করিয়া পরে খুঁটিতে বাঁধা হইল। এক্ষণে ধৃতপ্রান্ত সমূহ স্পন্দিত করিলে তরঙ্গগুলি পূর্ব্ববৎই ছিদ্রপথ মধ্য দিয়া অপ্রতিহত ভাবে পরিবাহিত হইবে। এই ধর্ম্ম,— পদার্থের স্বচ্ছতার সহিত তুলনীয়।

যখন আলোক ও শব্দোৎপত্তি যথাক্রমে ইথার ও পদার্থের আন্দোলনের ফল, তখন বিভিন্ন স্থান হইতে আগত পরস্পর বিরুদ্ধ তরঙ্গপরম্পরা একস্থানে উপস্থিত হইয়া আলোক ও শব্দের বিনাশ সাধন করেনা কেন, এরূপ প্রশ্ন মনোমধ্যে উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে একই ঘরে দুইটী বাতি জ্বলিলে কোথাওত অন্ধকার হয় না, এবং দুইজন একত্রে কথা বলিলে যদি আমরা শুনিতে না পাই, তাহা হইলে যদি বক্তাদিগের ফুস্‌ফুস্‌যন্ত্র অতিমাত্রায় বলযুক্ত না হয় তবে আমাদিকে নিজ নিজ শ্রুতি-শক্তির প্রাখর্য্যের প্রতি সন্দিহান হইতে হয়। বস্তুতঃ, স্থানবিশেষে আলোক তরঙ্গ ও শব্দতরঙ্গ ধ্বংশ প্রাপ্ত (destructive interference) হইয়া থাকে। কিরূপে ইহা সংঘটিত হয়, এই প্রশ্নের যথার্থ মীমাংসা করা আয়াসসাধ্য এবং সে মীমাংসায় বিবিধ জটীলতার অবতারণা করিতে হয়। তবে কি কারণে একই ঘরে দুইটি বাতি জ্বলিলে অন্ধকার হয় না, নিম্নের দৃষ্টান্তে তাহার একু প্রকার স্থূল ধারণা করা যাইতে পারে। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, স্থির পুষ্করিণীর মধ্যে যদি দুইটি ঢিল নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দুইটি পৃথক্ তরঙ্গ শ্রেণী উৎপন্ন হয়। উভয়ই বৃত্তা-কারে বর্দ্ধিত হইতে হইতে পরিশেষে উভয় তরঙ্গ শ্রেণীই পরস্পরের মধ্য দিয়া অক্ষুন্নভাবে বিপরীত দিকে পরিবাহিত হয়। সাধারণতঃ, একের অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের পক্ষে অন্তরায় হয় না। পরস্পর বিরুদ্ধ আলোক তরঙ্গ ও শব্দতরঙ্গ এই কারণেই অপ্রতিহত ভাবে পরিবাহিত হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শব্দতরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গের প্রকৃতির পার্থক্য

আছে। আলোক তরঙ্গের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকটা স্থূল ধারণা হইয়াছে; এক্ষণে শব্দতরঙ্গের প্রকৃতি কিরূপ তাহার অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

মনে করুন কয়েকটী সমায়তন বিশিষ্ট একই প্রকার মার্ব্বেল গোলক লইয়া প্রত্যেকটী তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গোলকটী হইতে সমানদূরে স্থাপন করিয়া সরলভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। শ্রেণীর শেষের গোলকটিকে অন্য একটি গোলক দিয়া যদি সজোরে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে আঘাতের বেগে ধাবিত হইয়া সেটি তৎসম্মুখস্থ গোলককে প্রহত করিবে। দ্বিতীয় গোলক আঘাত কারীর বেগ নিজস্ব করিয়া লইয়া তৃতীয়টিতে প্রহত হইবে, প্রথমটি দ্বিতীয়ের স্থানে স্থির হইয়া থাকিবে; কেননা তাহার সমুহ বেগ দ্বিতীয়ে অর্পিত হইয়াছে। এইরূপে পর পর আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইতে যখন সর্ব্বশেষ গোলকটি আহত হইবে তখন সেটি দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। প্রথম মারবেলটি যখন দ্বিতীয়কে আঘাত করিল, তখন তাহার নিজের আয়তন কুঞ্চিত হইয়া কতকটা ডিম্বাকারে পরিণত হইল। পরে পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তির-চেষ্টায় বিস্ফারিত হইল; এই বিস্ফারণের বেগেই দ্বিতীয়টি স্থানচ্যুত হইয়া অগ্রসর হইল। এইরূপে প্রত্যেক মারবেলটি আকুঞ্চন বিস্ফারণ প্রযুক্ত হওয়াতে একশ্রেণীর তরঙ্গ পরম্পরার সৃষ্টি হয়। শব্দতরঙ্গ এই শ্রেণীর তরঙ্গের সহিত তুলনীয়। এ ক্ষেত্রে তরঙ্গ যে দিকে পরিবাহিত হইতেছে, অণুগুলিও (মার্ব্বেল এ ক্ষেত্রে বায়বীয় অণু) সেইদিকেই আন্দোলিত হইতেছে। নচেৎ অন্য বিষয়ে আলোক তরঙ্গের সহিত শব্দতরঙ্গের প্রকৃতির বিশেষ পার্থক্য নাই।

উল্লিখিত পরীক্ষায় মনে করুন সমায়তন বিশিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ মার্ব্বেলগুলির পর আরও কয়েকটি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর সমায়তন বিশিষ্ট মার্ব্বেল ঐ শ্রেণীতেই সজ্জিত করা হইল। এক্ষণে ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট মার্ব্বেল শ্রেণীর শেষেরটিকে পূর্ব্ববৎ বেগে সঞ্চালিত করিলে মার্ব্বেল গুলি একটির পর একটি করিয়া আহত হইয়া শেষ ক্ষুদ্র মার্ব্বেলটি বৃহদায়তন প্রথম মার্ব্বেলে প্রহত হইবে; ফলে সেটিও সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া পরবর্ত্তী গোলককে ধাক্কা দিবে। এইরূপ তরঙ্গপরম্পরা পরিবাহিত হইবে। কিন্তু, শেষ ক্ষুদ্র মার্ব্বেলটি প্রথম বৃহৎ মার্ব্বেলকে আঘাত করিয়া স্বীয় আয়তন বিশিষ্ট অন্য মার্ব্বেলের ন্যায় স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে না; আঘাত করিয়া নিজেই পশ্চাতে হটিয়া আসিবে। বৃহৎ মার্ব্বেলটিও ক্ষুদ্র মার্ব্বেলটির অপেক্ষা কম বেগে সঞ্চালিত হইবে। ইহার কারণ ভারের তারতম্য। বস্তুতঃ, এই কারণেই কামানের গোলা যে বেগে নিক্ষিপ্ত হয়, কামান তদপেক্ষা কম বেগে পশ্চাতে হটিতে (recoil) চেষ্টা করে। [illegible]র বেগ সমান হইলে কামান দাগা নিরাপদ হইত না। বন্দুক ছুড়িতে গেলে [illegible]দিকে যে আঘাত লাগে তাহার কারণ ইহাই। ক্ষুদ্র মার্ব্বেল পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া পশ্চাতের গোলকটাকে আঘাত করে, সেটা আবার তাহার পশ্চাতের গোলকটাকে

আঘাত করে। এইরূপে বিপরীত দিকে একটী তরঙ্গ শ্রেণী পরিবাহিত হয় (reflected waves) ও সেই আলোক-তরঙ্গ দর্পণে প্রতিফলিত হয় ও শব্দ-তরঙ্গ পর্ব্বত-গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া প্রতিধ্বনিতে পরিণত হয়।

বস্তুতঃ আলোক প্রতিফলিত না হইলে পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইত। কেন না, পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থই জ্যোতিঃহীন (non-luminous)। অধিকাংশ পার্থিব পদার্থই অপর জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের (luminous) নিকট আলোক ধার করিয়া নিজের কাজ চালায়। পৃথিবীর পক্ষে সূর্য্যই আলোকের অনন্ত খনি-স্বরূপ। আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই, সেই সকল পদার্থে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া প্রতিফলিত হওয়াতে আমরা সেই সেই পদার্থকে দেখিতে সক্ষম হই। পদার্থ মাত্রেরই উপরিভাগ অল্প বিস্তর পরিমাণে বন্ধুর; তন্নিবন্ধন রশ্মিমালা চতুর্দ্দিকেই বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু আমরা যে স্থানেই থাকিনা কেন, অস্বচ্ছ পদার্থ কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ না হইলে উক্ত বস্তু আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হয়। পদার্থ যদি সম্পূর্ণ-রূপে অবন্ধুর হইত, তাহা হইলে সূর্য্যালোক সত্বেও কেবল মাত্র স্থান বিশেষ হইতেই পদার্থ বিশেষ আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইত। আলোকরশ্মি যদি প্রতিফলিত না হইত, জ্যোতিহীন বস্তু মাত্রই কি দিবসে কি রাত্রিতে আমাদিগের দৃষ্টিবহির্ভূত থাকিত; এবং সূর্য্যাস্তের সহিত অকস্মাৎ গভীর রাত্রির কৃষ্ণচ্ছায়া আমাদিগের গ্রাস করিত; গোধূলি কাহাকে বলে আমরা জানিতাম না। শুক্লপক্ষে চন্দ্রমাও সুশীতল কিরণ বর্ষণ করিয়া জগতকে তৃপ্ত করিত না; ঘরে ঘরে বাতি জ্বালিলেও জীবগণ পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে সক্ষম হইত না। কেবল মাত্র বাতিগুলি দেখা যাইত। এইরূপে বিভীষিকাময়ী রজনী অতিবাহিত হইয়া অকস্মাৎ সূর্য্যালোকে জগত উদ্ভাসিত হইয়া পড়িত; ঊষা কাহাকে বলে কেহই বলিতে পারিত না। দিবসে শুদ্ধ সূর্য্যই দেখিবার জিনিস হইত; প্রাণিগণ কি দিবসে কি রাত্রিতে পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিত অথবা অপর জীবের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভূত প্রেত জ্ঞানে ভীত হইত। জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত; কেন না, আজি কালি বিংশশতাব্দীর সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সত্বেও যখন মানব অন্ন পায় না, তখন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কিরূপে আহার জুটাইবে?

আলোক প্রতিফলিত না হইলে ঊষা কিম্বা গোধূলির অস্তিত্ব থাকিত না। ইহার কারণ এইরূপ, পৃথিবী যে বায়ু-মণ্ডলীয় আবরণে বেষ্টিত তাহা অসংখ্য ধূলী-কণায় পরিপূর্ণ। একটি অন্ধকার ঘরে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে যদি সূর্য্যালোক প্রবিষ্ট করান যায়, তাহা হইলেই উড্ডীয়মান ধূলী-কণা সমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পরে তদীয় রশ্মিমালা বায়ু-মণ্ডলীয় অগণিত ধূলি-কণা সমূহে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে উপস্থিত হয়। উহাতেই গোধূলি ও ঊষার

হয়। সুতরাং আলোক ধূলি-কণা সমূহে প্রতিফলিত না হইলে গোধূলি ও ঊষা থাকিত না।

বস্তুতঃ, প্রকৃতি দেবীর কার্য্য-প্রণালী ও নিয়মানুবর্ত্তিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগের ক্ষুদ্র হৃদয় প্রকৃতই গভীর সুমহৎ ভাবে পূর্ণ ও বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। যে কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতাকে আমরা পদে পদে তুচ্ছ করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করি না, প্রকৃতিদেবী যদি একমুহূর্ত্ত কালের জন্য সেই নিয়মানুবর্ত্তিতায় অতিশয় অল্প ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলে এই মহতী বিশ্বসৃষ্টি এক পলকে অনন্তে লীন হইয়া যাইবে; ইহা সম্যক উপলব্ধি করিলে মানব-চিত্ত স্বতঃই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে।

শ্রীনির্ম্মল কুমার সেন।

তাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাপমান যন্ত্র (Thermometer)

তাপ প্রয়োগে পদার্থের তাপমাত্রা (Temperature) বৃদ্ধি হইলে আমরা ভাল করিয়া তাহার পরিমাণ করিতে পারি না; আমাদের স্পর্শ ইন্দ্রিয় তেমন সূক্ষ্ম নহে। তাপের পরিমাণ অনুভব করা ত দূরের কথা, অনেক সময়ে কোন জিনিষটা উষ্ণ ও কোনটা শীতল আমরা তাহাই স্থির করিতে পারি না। নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তিনটি পাত্র গ্রহণ করুন; ক, খ, গ এই তিনটি পাত্রে যথাক্রমে শীতল, ঈষদুষ্ণ ও অত্যুষ্ণ (১০°, ৩০°, ও ৮০° পর্য্যন্ত উত্তপ্ত) জল রাখা হইল। এক্ষণে বাম হস্ত ক পাত্রে ও দক্ষিণ হস্ত গ পাত্রে ডুবাইলে ক এর জল শীতল এবং গ এর জল উষ্ণ বোধ হইবে। অল্পক্ষণ এইরূপ রাখিয়া পরে উভয় হস্ত খ পাত্রস্থিত জলে ডুবাইলে দুই হস্তে দুই প্রকার অনুভূতি হইবে—বাম হস্তে উষ্ণ এবং দক্ষিণ হস্তে শীতল বলিয়া বোধ হইবে। বাম হস্ত পূর্ব্বে শীতল জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া শীতলের সংস্পর্শে উহাও শীতল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পর যখন ঐ শীতল হস্ত খ পাত্রস্থিত উষ্ণতর জল স্পর্শ করিল তখন উহা উষ্ণতর বলিয়া বোধ হইল। অপর দিকে দক্ষিণ হস্ত খ এর জল স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে অধিকতর উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাই উহা শীতল বলিয়া বোধ হইল। অর্থাৎ এক হস্ত

যেটা উষ্ণ অপর হস্তে তাহাই শীতল বলিয়া বোধ হইল। তাহা হইলে আমরা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। মানুষের মন যেমন পূর্ব্ব-সংস্কারের (prejudice) অধীন, তাহার ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ।

তবে তাপমাত্রা নিরূপণের জন্য এমন কাহারও সাহায্য লইতে হইবে, যাহার এইরূপ সংস্কার অর্থাৎ চেতনা ও স্মৃতি নাই,—অর্থাৎ কোনও নির্জীব পদার্থের সহায়তা লইতে হইবে; তাই বায়ু, গ্যাস, ধাতু, প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল পদার্থ মানুষের মত কথা কহিয়া মুখ-ভঙ্গির দ্বারা কোনও সামগ্রীর তাপমাত্রা জানাইয়া দিতে পারিবে না। সুতরাং অন্য উপায়ে তাহাদের মনোভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। আমরা জানি, তাপ-প্রয়োগে পদার্থের যেমন তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়, তেমনই উহার আরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়, তন্মধ্যে আয়তন বৃদ্ধিই প্রধান। একটি লৌহশলাকায় তাপপ্রয়োগ করিলে, তাহার তাপমাত্রা বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়তনও বাড়িবে। সুতরাং আমরা যখনই দেখিব যে, শলাকাটি দৈর্ঘ্যে ঈষৎ বাড়িয়াছে, তখনই বুঝিব যে, উহার তাপমাত্রাও বাড়িয়াছে। এক্ষণে কত তাপমাত্রায় শলাকাটির কতটুকু প্রসারণ হয়, তাহা যদি দেখিয়া রাখি, তবে ভবিষ্যতে শলাকার প্রসারণ দেখিয়া বলিতে পারিব উহার তাপমাত্রার কতটুকু বৃদ্ধি হইয়াছে। এই স্থূল কথাটুকুর উপর তাপমানের নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু তাপ-সংযোগে সকল পদার্থেরই অল্পাধিক পরিমাণে আয়তন বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অথচ সকল সামগ্রীকে তাপমাত্রা (temperature) নিরূপণে নিযুক্ত করা সমান সুবিধাজনক নহে। সুতরাং কোন্ পদার্থের ব্যবহার বিশেষ সুবিধা জনক হইবে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে তাপমানের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তাহার বর্ণনা করা যাউক।

(১) তাপমান এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে উহাকে সহজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া যায়।

(২) উহার মূল্য অত্যন্ত অধিক না হয়।

(৩) তাপমানে কোন্ পদার্থ অপরের অপেক্ষা উষ্ণতর, কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইলে চলিবে না বরং ঐ পদার্থটি নিজে কত উষ্ণ অর্থাৎ উহার তাপমাত্রা কত তাহাই প্রদর্শিত হওয়া উচিত।

(৪) তাপমান এইরূপ ভাবে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে অতি অল্প তাপ-মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি উচ্চ তাপমাত্রা পর্য্যন্ত নিরূপণে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৫) তাপমান এমন কোনও পদার্থে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, যাহা বহিঃস্থ তাপ

শীঘ্র গ্রহণ করিতে পারে। তাপমান উষ্ণজলে ডুবাইলে তৎক্ষণাৎ উহারও সেই তাপমাত্রা হওয়া আবশ্যক, এবং সেই তাপমাত্রা প্রদর্শিত হওয়া উচিত। নতুবা যে মুহূর্ত্তে তাপমান জলে ডুবান হইল সেই মুহূর্ত্তে জলের তাপমাত্রা কত তাহা জানা যাইবে না। আবার যখন উহা জানা যাইবে, তখন হয়ত জলের আর সে তাপমাত্রা নাই,—উহা শীতল হইয়া গিয়াছে।

(৬) তাপমানে তাপমাত্রার পরিমাণ অতি সূক্ষ্মরূপে (accurate) হওয়া উচিত।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপে তাপমান যন্ত্রে এই ছয়টি প্রধান গুণের সমাবেশ হইতে পারে।

(১) যন্ত্রটি ক্ষুদ্র ও লঘু হওয়া উচিত।

(২) স্বর্ণ, প্লাটিনম্ প্রভৃতি কোনও বহুমূল্য পদার্থ ব্যবহার করিলে চলিবে না, কারণ তাহাতে তাপমানের মূল্য অযথা বাড়িয়া যাইবে। অধিকন্তু উহার নির্ম্মাণ-প্রণালী সহজ হইলে মূল্য অধিক হইতে পায় না।

(৩) যে সামগ্রী ব্যবহার হইবে, তাহা সম-সম্প্রসারণশীল (uniformly expansible) হওয়া উচিত, এবং তাপমাত্রার পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য যন্ত্রে বিভক্তি চিহ্ন (graduation) থাকা আবশ্যক।

(৪) সহজদাহ্য বা সহজে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এরূপ কোনও পদার্থের ব্যবহার চলিবে না।

(৫) বহিঃস্থ তাপ-গ্রহণক্ষম পদার্থ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৬) অধিক প্রসারণশীল পদার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি পদার্থ তাপমান-নির্ম্মাণের উপযোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন ঃ—

(ক) বায়ু, (খ) জল, (গ) শোধিত সুরাসার (alcohol), (ঘ) পারদ, ও (ঙ) কঠিন ধাতু, যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনম্।

এক্ষণে এই পাঁচটি পদার্থের মধ্যে কাহার কি দোষগুণ আছে তাহার আলোচনা করিয়া কোনটি সাধারণ তাপমানের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা স্থির করা যাইবে।

(ক) বায়ু। ইহার প্রসারণশীলতা এত অধিক যে যন্ত্রটিকে খুব বড় না করিলে চলে না; অধিকন্তু যন্ত্রের নানাপ্রকার আনুসঙ্গিক অংশের বাহুল্য-বশতঃ উহা অত্যন্ত বৃহদাকার হইয়া পড়ে, এবং স্বয়ং বায়ুর কোনও মূল্য না থাকিলেও বায়বীয় তাপমানের নির্ম্মাণ-প্রণালী এত জটিল যে, উহা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ। সূক্ষ্মতার হিসাবে বায়ুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ উহার প্রসারণশীলতা অত্যন্ত অধিক। বায়বীয় যন্ত্রের একপ্রধান গুণ এই যে, উহা অত্যন্ত অল্প তাপমাত্রা হইতে অতি উচ্চ তাপমাত্রার পর্য্যন্ত

ব্যবহার করা চলে। কারণ বায়ুর সহজে অবস্থান্তর ঘটে না।—উহা যেমন একদিকে —১৪০° তাপমাত্রায় তরল হয়, অপরদিকে তেমনই অতি উচ্চ তাপমাত্রাতেও উহার কোন অবস্থান্তর ঘটে না। কিন্তু বায়ুর বহিঃস্থ তাপগ্রহণের ও পরিচালনের ক্ষমতা অতি সামান্য, সেজন্য বায়বীয় তাপমানের সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয় করিতে হইলে অনেক বিলম্ব ও অসুবিধা হয়।

(খ) জল। তাপমান নির্ম্মাণে জল ব্যবহার করিলে উহা ক্ষুদ্র ও সুলভ হয় বটে, কিন্তু জলের প্রসারণশীলতা সর্ব্বদা সমান নহে, সেজন্য কেবল ৪° হইতে ৯০° পর্য্যন্ত উহার ব্যবহার চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত জলের তাপ গ্রহণ ও পরিচালনের ক্ষমতাও অতি অল্প।

(গ) শোধিত সুরা। সমস্তই প্রায় জলের অনুরূপ, কেবল ইহা অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার চলে।

(ঘ) পারদ। পারদের তাপমান অতি ক্ষুদ্রও নির্ম্মিত হইতে পারে এবং মূল্যবান নহে। পারদ সমপ্রসারণশীল, তাপ পরিচালক এবং –৩৫° হইতে +৩৫০° পর্য্যন্ত উহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

(ঙ) কঠিন ধাতু। স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্লাটিনম্ প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত তাপমান ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান। ধাতুমাত্রেই সমপ্রসারণশীল এবং অতি নিম্ন হইতে উচ্চ তাপমাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে। উহাদের তাপ-পরিচালকতা অধিক কিন্তু প্রসারণশীলতা অতি অল্প।

কোন্ যন্ত্র শ্রেষ্ঠ। আমরা দেখিতেছি যে সূক্ষ্ম পরিমাপের হিসাবে বায়ু নির্ম্মিত তাপমানই শ্রেষ্ঠ; এবং অত্যন্ত নিম্ন হইতে উচ্চ তাপমাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার চলে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য কোনও গুণ নাই, বরং নানা অসুবিধাই আছে। সেজন্য যখন অত্যন্ত সূক্ষ্মতার প্রয়োজন কিম্বা অত্যুচ্চ বা অতি নিম্ন তাপমাত্রার ব্যবহার করিতে হয়, তখনই বায়ু নির্ম্মিত তাপমানের প্রয়োজন হয়।

পারদ নির্ম্মিত তাপমানই সচরাচর ব্যবহারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। ইহাতে সকল সুবিধাই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এবং আজকাল পারদের যে সকল উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে তাপমাত্রার অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ করা চলে। তবে –৩৫° র নিম্নে ও +৩৫০° উপরে ব্যবহার করা চলে না, এবং এ অসুবিধা দূর করিবারও উপায় নাই, সুতরাং সে স্থলে বায়বীয় তাপমানই ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু উক্ত সীমার মধ্যে পারদ যন্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যোপযোগী এবং সেজন্য পারদের তাপমানই অধিক প্রচলিত।

পারদের সাধারণ-তাপমানের নির্ম্মাণ-প্রণালী। একটি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট কাচের নলের এক প্রান্ত অগ্নির তাপে গলাইয়া কন্দ (bulb) প্রস্তুত

করিতে হয়। এই নলের ছিদ্র সকল অংশে সমান স্থূল হওয়া আবশ্যক। এইরূপ নল বাছিয়া লইতে হইলে নলের ভিতর সামান্য পারদ প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহাকে নলের সকল অংশে সরাইয়া লইয়া দেখিতে হয়। যদি নলের সকল অংশেই ঐ পারদ সমান স্থান অধিকার করে তবে নলটি কার্য্যোপযোগী বলিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে এই নলের অপর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কাচের ফনেল (funnel) গ জুড়িয়া লইতে হয়। তাহার পর কন্দ ও নলটিই পারদ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। কিন্তু ফনেলে পারদ ঢালিলেই উহা নলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ নলের ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে পারদ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের বায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সেজন্য নলটিকে একটি দাঁড়ে (stand) আঁটিয়া ক কন্দটিতে মধ্যে মধ্যে অল্প তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তাপ সংযোগে কন্দের বায়ু প্রসারিত হয় এবং সেই বর্দ্ধিত বায়ুটুকু উপরের পারদের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়। এক্ষণে স্পিরিট ল্যাম্প সরাইয়া লইলে কন্দের বায়ু পুনরায় শীতল হয় এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প স্থান অধিকার করে, সুতরাং উপর হইতে পারদ আসিয়া এই অবশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে ক্রমে কন্দ ও নলের এক অংশ পারদে পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর কন্দটিতে কিছু অধিক তাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার ফলে পারদের মধ্যস্থিত বায়ু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ দূর হইয়া যায়। অনেকক্ষণ তাপ দিলে পারদ ফুটিতে থাকে, এবং উপর হইতে উহার বাষ্প বহির্গত হইতে থাকে। ভিতরের সমস্ত বায়ু দূর হইয়া গিয়া যখন নলের উপরাংশ পারদ বাষ্পে পূর্ণ থাকে সেই সময়ে ফনেলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাপ প্রয়োগে নলের মুখ গলাইয়া বন্ধ করিতে হয়। কন্দ ও নলটী এখন কেবল পারদ ও তাহার বাষ্পে পূর্ণ হইয়া রহিল। তাহার পর নলটিকে শীতল হইবার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। উহা যত শীতল হয়, উহার আয়তন ততই কমিতে থাকে। এইরূপ আয়তনের হ্রাস অনেক দিন ধরিয়া চলে। সেজন্য ভাল তাপমান নির্ম্মাতারা এক বৎসর বা ততোধিক কাল রাখিয়া দেয়। পরে তাপমানের বিভক্তি (graduation) করা হইয়া থাকে।
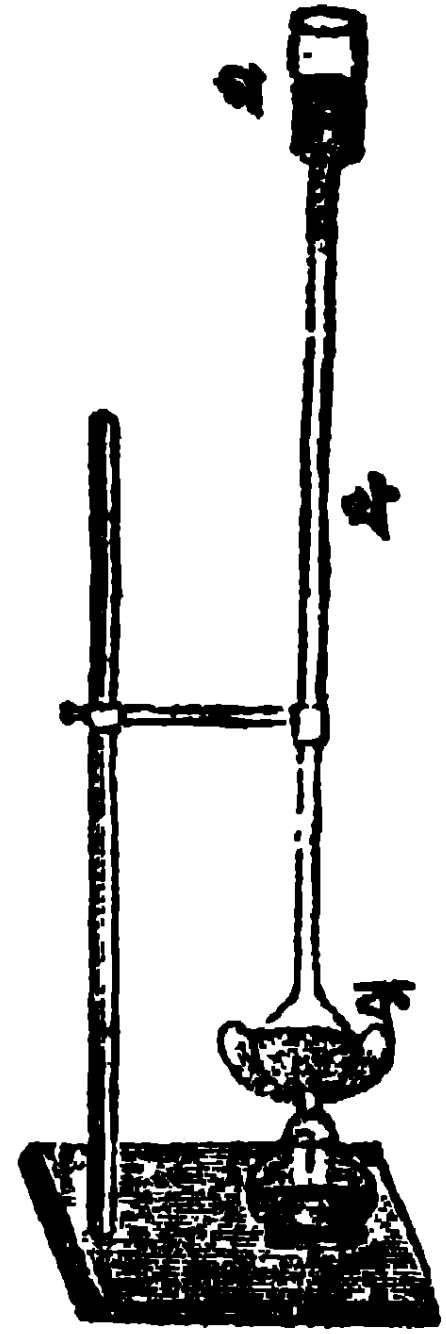
জগতে যে সকল পদার্থ আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। একখণ্ড গন্ধককে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা যে তাপমাত্রায় দ্রব হয় অপর একখণ্ড গন্ধক দ্রব করিবার সময় যদি বায়ু-মণ্ডলের চাপ

(atmospheric pressure) পূর্ব্ববৎ থাকে তবে সেই নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রাতেই উহা দ্রব হইবে *। সেইরূপ আমরা যখন যে অবস্থাতেই জলে তাপ প্রয়োগ করি না কেন বায়বীয় চাপ সকল সময়ে সমান থাকিলে একই নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় উহা বাষ্পীভূত এবং অপর একটি নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রায় উহা জমিয়া বরফে পরিণত হয়। এই দুইটি নির্দ্দিষ্ট তাপ-মাত্রাকে যথাক্রমে জলের স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) ও জলের হিমাঙ্ক (Freezing point) বলা হইয়া থাকে, এবং তাপমানের বিভিত্তিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক্ষণে তাপমানে এই দুই অঙ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্থাৎ স্ফুটন্ত জলের বাষ্পে যন্ত্রটি রাখিলে নলের মধ্যস্থিত পারদ সূত্রের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে এবং উহাকে বরফের ভিতর রাখিলেই বা পারদ সঙ্কুচিত হইয়া কত নামিয়া যাইবে তাহা স্থির করিতে হইবে।

তাপমানে জলের হিমাঙ্কের স্থান নির্দ্দেশই প্রথমে করিতে হয়। খ চিহ্নিত ফনেল বা অপর কোনও ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্র বরফের টুকরায় পূর্ণ করিয়া তাহার ভিতর তাপমান ক এর নিম্নভাগ প্রোথিত করিয়া রাখিতে হয়। বরফ গলিয়া ঘ পাত্রে পতিত হয় এবং যন্ত্রের পারদ শৈত্য সংযোগে সঙ্কুচিত হইয়া নিম্নগামী হইতে থাকে। যেখানে যাইয়া পারদের অধোগতি স্থগিত হয় সেখানে কাচের উপর একটি চিহ্ন করিতে হয়। উহাই জলের হিমাঙ্ক চিহ্ন।
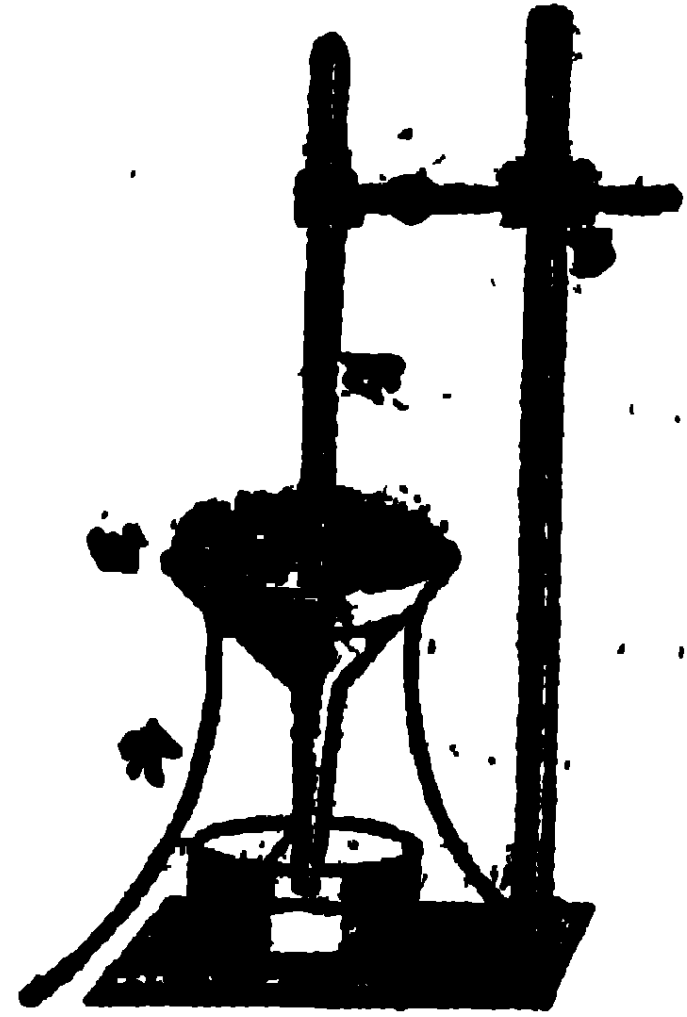
এইবার তাপমানে জলের স্ফুটনাঙ্কের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তাহার প্রণালী প্রদর্শিত হইল। ক চিহ্নিত একটি ধাতুময় পাত্রে পরিশ্রুত (Distilled) জল রাখিয়া উত্তপ্ত করা হয়। জল বাষ্পীভূত হইয়া খ এর ভিতর দিয়া উত্থিত হয় এবং উহার মধ্যে লম্বমান তাপমান ও উত্তপ্ত হইতে থাকে। বাষ্প তীর নির্দ্দেশিত দিকে যাইয়া ঘ নলের দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে। অপর দিকে উহা চ চিহ্নিত মানোমিটরের (Manometer) ভিতর প্রবেশ করিয়া বাষ্পের
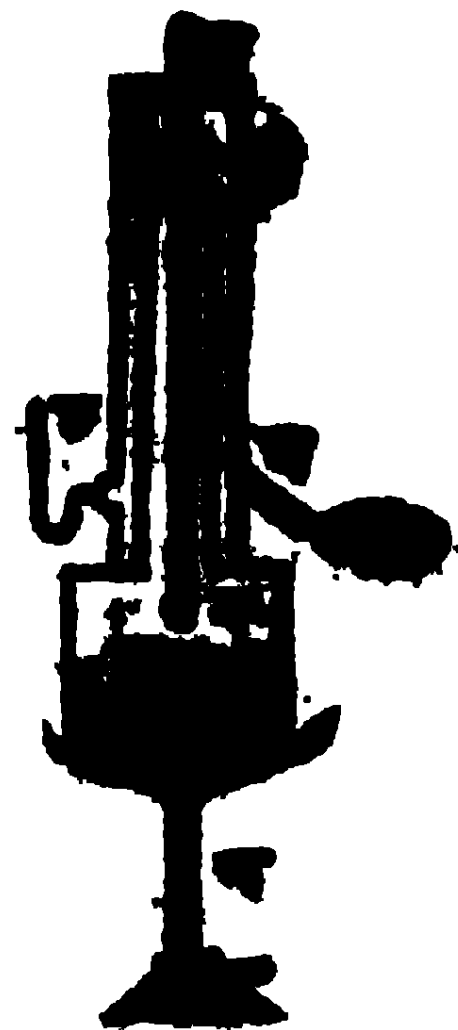
* বায়বীয় চাপের পরিবর্ত্তন ঘটিলে দ্রাবণাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক প্রভৃতির ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কি তাহা পরে আলোচিত হইবে,—এক্ষণে ইহা মানিয়া লওয়া যাউক।

আভ্যন্তরীন চাপের সহিত বহিঃস্থ বায়ুমণ্ডলীর চাপের ঐক্য নির্দ্দেশ করে। এই দুই চাপের তারতম্য না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে জল নির্দ্দিষ্ট তাপ মাত্রায় ফুটিবে না। অনেকক্ষণ এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া যেখানে প্রসারণশীল পারদের উত্থান শেষ হয় সেইখানে জলের স্ফুটনাঙ্কের চিহ্ন করিতে হয়।

এইরূপে দুইটি নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এই দুই অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং তাহার উপরস্থিত ও নিম্নস্থ স্থান কতকগুলি সমান সমান অংশে বিভক্ত করিলেই তাপমানের বিভক্তি করা হইল। এইরূপ বিভক্তি নানা প্রকারের হইতে পারে, কিন্তু প্রধানতঃ তিন প্রকারের বিভক্তিই হইয়া থাকে। তাহা প্রদর্শিত হইল :—

সেল্‌সিয়স্ (Celsius) কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শাতমিক (Centigrade) স্কেলে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের মধ্যবর্ত্তী স্থলকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং ঐ দুইটি অঙ্ককে ০° ও ১০০° বলা হয়। হিমাঙ্কের নিম্নে বিয়োগ চিহ্নিত সংখ্যা —১, —২৩ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এবং স্ফুটনাঙ্কের উপর ১০১, ১০৮ ইত্যাদি সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।
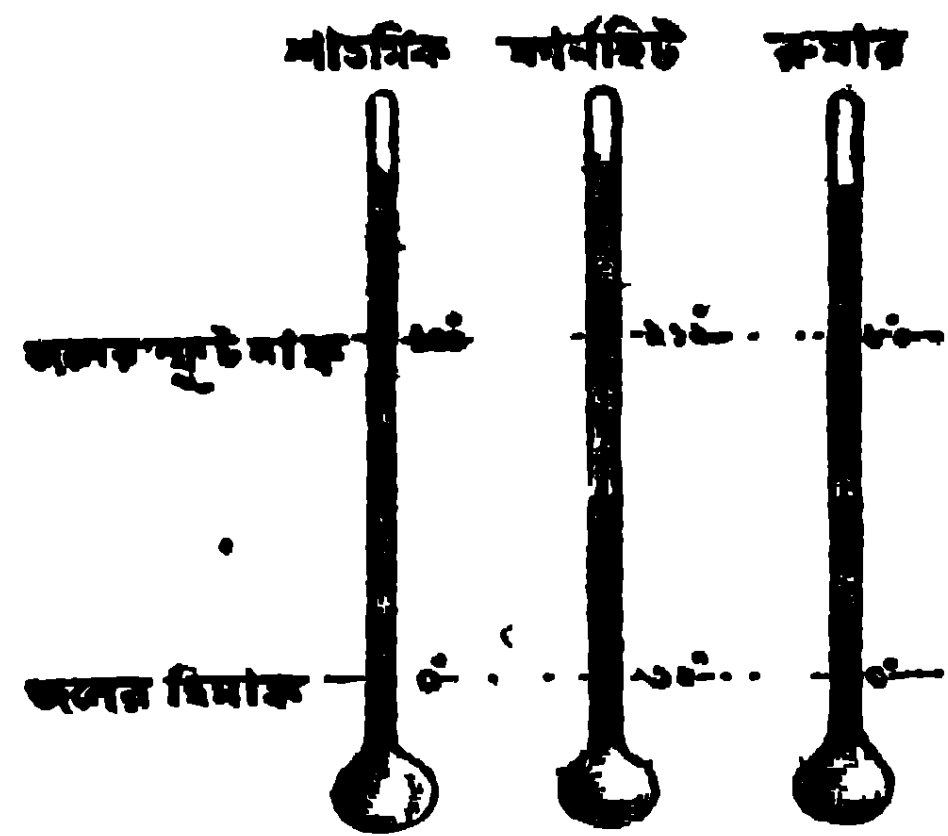
ফার্ণাইটের (Fahrenheit) স্কেলে উক্ত অংশটি ১৮০ ভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং হিমাঙ্ককে ৩২ ও স্ফুটনাঙ্ককে ২১২ ধরা হয়। বরফ ও সাধারণ লবণ মিশাইয়া যে তুষার মিশ্র (Freezing mixture) প্রস্তুত হয়, তাহার তাপমাত্রাকেই ফার্ণহিট ০° ধরিয়াছিলেন, কারণ তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এই ধারণা ছিল যে, ইহাই সর্ব্বনিম্ন তাপমাত্রা, ইহার অধিক শৈত্য আর হইতে পারে না।

রুমারের (Reaumur) স্কেলে জলের হিমাঙ্ককেই ০ ধরা হইয়াছে বটে কিন্তু স্ফুটনাঙ্ককে এক শতের পরিবর্ত্তে ৮০ ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী অংশকে ৮০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক জগতে কেবল শাতমিক তাপমানই প্রচলিত। ফার্ণহিটের তাপমান ইংলণ্ড ও হলণ্ডে কোনও কোনও কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রুমারের তাপমান এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে।

উপরোক্ত তিন প্রণালীতেই প্রত্যেক বিভক্তি রেখাকে ডিগ্রী (Degree) বলা হইয়া থাকে। সেজন্য কোন্ স্কেলের তাপমাত্রা তাহা বুঝাইতে হইলে ডিগ্রীর চিহ্নের (°) পর সেই স্কেলের নাম সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে হয়, যথা ৫৮°শঃ, ১৩°ফাঃ, ৮৭°রুঃ ইত্যাদি।

এই তিন প্রকার ডিগ্রীর তুলনা করিলে দেখা যায় যে :—

১° শঃ $= \frac{১৮০}{১০০} = \frac{৯^\circ}{৫}$ ফঃ | ১° ফঃ $= \frac{৪^\circ}{৯}$ রূঃ

১° শঃ $= \frac{৮^\circ}{৫}$ রূঃ | ১° রূঃ $= \frac{৫^\circ}{৪}$ শঃ

১° ফঃ $= \frac{৫^\circ}{৯}$ শঃ | ১° রূঃ $= \frac{৯^\circ}{৪}$ ফ

কখনও কখনও এক স্কেলের তাপমাত্রাকে অপর স্কেলের তাপমাত্রায় পরিণত করিতে হয়। শাতমিক হইতে রুমারে বা রুমার হইতে শাতমিকে পরিণত করা নিতান্ত সহজ, কারণ $\frac{৪}{৫}$ দ্বারা গুণ করিলেই হয়। কিন্তু ফার্ণহিটের স্কেল আসিলে অন্য প্রকার প্রক্রিয়া আবশ্যক। সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলি প্রদত্ত হইল, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

$\frac{৯}{৫}$ শঃ + ৩২ = ফঃ ... ... (১)

$\frac{৫}{৯}$ (ফঃ − ৩২) = শঃ . .. (২)

$\frac{৯}{৪}$ রূঃ + ৩২ = ফঃ ... . (৩)

$\frac{৪}{৯}$ (ফঃ − ৩২) = রূঃ ... ... (৪)

উদাহরণ। ১৪° ফঃ তাপমাত্রা শাতমিক স্কেলের কত ডিগ্রীর সমান হইবে তাহা সূত্র (২) খাটাইলেই জানা যাইবে। $\frac{৫}{৯}$ (১৪−৩২) = $\frac{৫}{৯}$ × − ১৮ = −১০° শঃ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, বি, এ।

শিশু-শিক্ষা।

একমাত্র ইংলণ্ডেই প্রায় ১৫০,০০০ দুর্ব্বল মতি শিশু রহিয়াছে। এতন্মধ্যে ৪৮,০০০ জন সাধারণ নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। কর্তৃপক্ষগণ এই সমস্ত শিশুর শিক্ষা বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবার নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। জনসাধারণ এই সমস্ত শিশুগণের শিক্ষার জন্য ন্যায়তঃ যত অর্থ ব্যয় করা উচিত, তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। কেননা যে সমস্ত বালকগণের মানসিক বা শারীরিক দুর্ব্বলতা এত অধিক যে, তাহাদের কোন বিষয়েই শিক্ষালাভ দুরূহ ব্যাপার, তাহাদের

শিক্ষার জন্য ব্যয় বাহুল্য করা বস্তুতঃই অর্থের অপব্যবহার। যাহারা শিক্ষার উপযোগী তাহাদিগকে সমগ্র শিশু সমষ্টি হইতে পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদের শিক্ষার সম্পূর্ণ সুবন্দোবস্ত করা উচিত। "শিশু সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা" সংগ্রহের যে সমিতি রহিয়াছে, তাহার কর্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর সমগ্র শিশুকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, কেবল মাত্র শিক্ষার উপযোগী শিশুগণেরই শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিয়া, শিশুগণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহারা শিশু সম্বন্ধে আরও একটি তথ্য আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা শিক্ষার উপযোগী শিশু সমূহ হইতে বালিকাগণকে পৃথক করিয়া তাহাদের কিরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক তাহাই নির্দ্ধারণ করিতেছেন। বালিকাগণের এরূপ শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের মানসিক ও শারীরিক দুর্ব্বলতা নষ্ট হইতে পারে। বালক ও বালিকার শিক্ষা একরূপ হওয়া উচিত নহে। উভয়ের শারীরিক উপাদানের যথেষ্ট বিভিন্নতা রহিয়াছে। শোণিতে দুইরূপ কণা রহিয়াছে—শ্বেত ও লোহিত। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের এক মাইক্রোমিলিমিটার micromillimetre (তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্র অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর) পরিমাণ শোণিতে ৫০,০০,০০০ পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীর উক্ত আয়তন-রক্তে ৪৫,০০,০০০ লোহিত রক্ত কণিকা রহিয়াছে। বয়সের তারতম্য অনুসারে এই কণিকার তারতম্য হইয়া থাকে। বয়সের যে সময়ে বালিকাগণের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও পূর্ণতা অতিক্রত বেগে হইয়া থাকে, সেই সময়ে শারীরিক ও মানসিক নানাবিষয়ে নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। কাজেই শিক্ষাও এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের উপযোগী হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। বয়সের কোন সময়ে বালিকাগণের শরীরে অল্পাধিক রক্তহীনতার লক্ষণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে তাহারা প্রায়ই আলস্য-পরায়ণ ও সর্ব্বকার্য্যে বীত-রাগ হইয়া উঠে। এরূপ কালে তাহাদিগকে বালকের ন্যায় শারীরিক ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দিলেও তাহাদের শরীরের কোন উন্নতি হইতে পারে না। ফলতঃ বালক ও বালিকার শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ শিক্ষাতেই যথেষ্ট পার্থক্য ও সমীচিন দূরদর্শিতা এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়।

ডাক্তার জে, কারলভ, যে সমস্ত শিশুগণের শ্রবণেন্দ্রিয় দুর্ব্বল তাহাদের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—দুইটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই শিক্ষা লব্ধ জ্ঞান অর্জ্জিত হইয়া থাকে,—কর্ণ ও চক্ষু। কাজেই এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের যাহাতে সম্যক পরিপুষ্টি সাধন হয়, তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণের সর্ব্বদা মনোযোগী হওয়া উচিত। সম্পূর্ণ বা অল্পাধিক বধিরতার অবশ্যম্ভাবী ফল মানসিক দুর্ব্বলতা। নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সপ্তবর্ষ বয়স্ক বধির বালকের মস্তিষ্ক ঐ বয়সের একজন সাধারণ বালকের মস্তিষ্ক অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ গুণ ক্ষুদ্রতর। বধিরের চিন্তাশক্তি অবধিরের চিন্তাশক্তি অপেক্ষা ক্ষীণতর।

কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, বা যে কার্য্য-সম্পাদনে হস্ত, পদ, পেশী, তন্তু ইত্যাদির প্রয়োজন, সেই সেই বিষয়ে ও সেই সেই কার্য্যে বধির ও অর্দ্ধবধির উভয়েই সমান। যে সমস্ত শিশু বধির তাহাদিগকে ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা তাহাদের ৩ বৎসর বয়ঃক্রম কাল, অথবা যখনই তাহারা বধির এইরূপ বুঝিতে পারা যাইবে, তখন হইতেই হওয়া উচিত। বিলাতে বধিরগণের ভাষা শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়ের অভাব নাই। আমাদের দেশে কলিকাতাতে এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ভাষা শিক্ষার জন্য বধিরগণকে অন্ততঃ ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে রাখা উচিত। যাহারা অর্দ্ধবধির বা অর্দ্ধমূক তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বধির গণের সহিত পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে উভয়েরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধের সমালোচনা কালে জনৈক পণ্ডিত বলেন যে, যে সমস্ত বধির শিশুর পিতৃপিতামহও বধির, তাহাদের মানসিক-শক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তি এক পুরুষের বধির শিশু অপেক্ষা হীনতর। কাজেই এরূপ দুই জাতীয় শিশুকেও পৃথক করা উচিত।

অন্ধ ও যক্ষারোগ-গ্রস্ত শিশুগণের শিক্ষার সুচারু বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। অন্ধগণকে মৌখিক শিক্ষা দেওয়াই ভাল। তাহারা ক্রমাগত শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকিয়া ইতিহাস, সাহিত্যাদি মুখে মুখে শিক্ষা করিবে। চেষ্টা করিলে অন্ধগণকে অঙ্কশাস্ত্রেও শিক্ষিত করা যাইতে পারে। যক্ষারোগ-গ্রস্ত শিশুগণের শিক্ষা সম্পূর্ণ মুক্ত বায়ুতে হওয়া উচিত। তাহাদিগকে কোনমতেই সুস্থ শিশুগণের সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে।

মানসিক স্বাস্থ্যের সহিত শিশুগণের শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতার বিশিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। শারীরিক গঠনে পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে, শিশুর মানসিকশক্তি আদৌ বিকশিত হয় না। আমাদের দেশে অনেকেই বালককে চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালেই শিক্ষার্থে হয় স্বীয় আবাসে অথবা কোন পাঠশালার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেন। ইহার ফল আপাতঃ মধুর হইলেও পরিণামে বড়ই বিষময়। শিক্ষার অনুপযোগী মস্তিষ্ক শিক্ষার কাঠিন্য গ্রহণে কিছুতেই সক্ষম হইতে পারে না। জাপান দেশে ৬ বৎসরের পূর্ব্বে শিশুকে আদৌ পুস্তকের সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া হয় না। জাপান দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। ৬ বৎসর না হইলেও, সবল ও সুস্থকায় বালককে কিছুতেই ৫ বৎসরের পূর্ব্বে পাঠাভ্যাসে নিয়োজিত করা উচিত নহে। বালকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আহার, বিহার, পান, ভোজন ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। বালক পাঠশালায় যাইতেছে, লেখা পড়ায় যথেষ্ট মনোযোগ রহিয়াছে, কিন্তু যদি আহার বিহারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কখনই বালকের জীবন সুখকর হইতে পারে না। শিক্ষকগণের স্বাস্থ্য

রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় মস্তিষ্কের অধঃপতন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে. সর্ব্ববিষয়ে সাবধান না হইলে যে ভবিষ্যতে আরও অপকার হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে শিক্ষার গুরুভার যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মস্তিষ্কের সর্ব্বোতোভাবে বিকাশ দূরের কথা কেবল শিক্ষা বিষয়েও সম্যক পরিস্ফুট হয় না। কোন কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট শুনা যায় যে, শিশুগণের স্বাস্থ্য হানির কারণ পাঠের গুরুভার নহে, পরন্তু, নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষা সমাপন করাই শিশুগণের স্বাস্থ্য হীনতার একমাত্র কারণ। তাঁহাদের মতে বালকগণকে যদি পরীক্ষা দিতে না হয়, তাহা হইলে শিক্ষা সুচারু হইতে পারে, এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে, কেননা এক একটি পরীক্ষাতে মস্তিষ্কের উপর যেরূপ চাপ পড়ে, সেই চাপের তীব্রতা উপশম হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হইতে থাকে। এই জন্যই আমাদের দেশে অধিকাংশ বি এ, এম এ, উপাধিধারী যুবকগণ শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তিতেই হীন। বালকগণকে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাখা শুভকর, নতুবা তাহারা অসৎ সঙ্গে পথে পথে ও গোপনে নানাবিধ দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া জীবন নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু পরীক্ষার নিষ্পেষণে বালকগণকে নিষ্পেষিত করা হয় বলিয়া শিক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হইতে পায় না।

বালকবালিকাগণকে ইন্দ্রিয়-সংযম-শিক্ষা বোধ হয় জগতের কুত্রাপি দেওয়া হয় না। অতীত এবং বর্ত্তমান উভয় কালেই জনকজননী কেহই এ বিষয়ে পুত্রকন্যাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন নাই। সংযম-শিক্ষার অভাবে আমরা কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে সকল সময়েই প্রায়ই অসংযত চিত্ত হইয়া পড়ি। শিক্ষকগণের ব্রত অতি মহৎ। বালকের চরিত্র শিক্ষকের দ্বারাই গঠিত হয়। সুশিক্ষকের ছাত্র কিছুতেই কুশিক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-সংযম শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা জনক-জননীর তত্ত্বাবধানে না থাকিলে শিক্ষকেরই গ্রহণ করা উচিত। শিক্ষকগণ সময় ও সুযোগ মত বালক বালিকাগণকে অনায়াসে ইহার কুফল বুঝাইয়া দিতে পারেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে জননীরই এই সম্বন্ধে শিক্ষার ভার-গ্রহণ করা উচিত। যে দেশে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক, সে দেশে ইহা সম্ভব পর বটে, কিন্তু আমাদের দেশে নহে। কেননা আমাদের দেশে শত করা ৯৯ জন স্ত্রীলোক ইন্দ্রিয়-সংযম এই কথার অর্থই আদৌ অবগত নহে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

বিবিধ।

চক্ষুর রোগ-শান্তি।—প্যারিস নগরে ডাক্তার ম্যাজিটট্ চক্ষুর অভ্যন্তরে 'করনিয়া' বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের চক্ষুর তারকার উপরে এক অতি স্বচ্ছ কাচবৎ পর্দ্দার ন্যায় আবরণ আছে, ইহার নাম করনিয়া। পঞ্চদশ-বর্ষ বয়স্ক এক বালকের চক্ষুতে গরম চূণ লাগিয়া যাওয়ায় উক্ত করনিয়া একবারে ঘোলা হইয়া গিয়াছিল, এবং বালকেরও দৃষ্টি-শক্তি একবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। এই অস্বচ্ছ করনিয়ার মধ্যভাগে ডাক্তার ম্যাজিটট্ $\frac{১}{৫}$ বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থান অস্ত্র প্রয়োগে বাদ দিয়া ফেলিলেন এবং সেইস্থানে অন্য একটি মানুষের করনিয়ার এক অংশ ঠিক একখানি ক্ষুদ্র সার্সির আকারে বালকের অস্বচ্ছ করনিয়ার উক্ত কর্ত্তিত অংশে লাগাইয়া দেন। এই নূতন করনিয়া তিনি ৮ দিন পূর্ব্বে অপর ব্যক্তির চক্ষু হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রায় সাতদিনের মধ্যেই এই স্বচ্ছ করনিয়া একবারে সংযুক্ত হইয়া গিয়া বালকের দৃষ্টি-শক্তি প্রায় ফিরিয়া অসিয়াছিল।

ভারতীয় আবহাওয়ার অফিসের কার্য্য বিবরণীঃ—১৯১০ সালের উক্ত কার্য্য বিবরণীতে বহু স্থানে দেশের আবহাওয়া সংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কোডাইক্যানাল হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সমস্ত মানমন্দিরেরই বিশেষ কার্য্য বিবরণী লিখিত হইয়াছে। কোডাইকানাল মানমন্দিরের কার্য্য বিবরণী পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯১০ সালে সূর্য্যে কৃষ্ণ-চিহ্নের (solar spots) সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অল্পতর ছিল; ১৯০৮ সালে গড় পড়তা প্রত্যেক দিন ৩০৯ চিহ্ন এবং ১৯১০ সালে ১০৮ চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। সূর্য্য আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৬ দিন সম্পূর্ণ চিহ্ন বর্জ্জিত ছিল। এই বিবরণীতে বৎসরকে ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—শীত এবং গ্রীষ্ম ও "মনসুনের" আগমন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কাল। মোটের উপর ১৯১০ সাল ১৮৯৪ সালের পরে শীতলতম বৎসর। ফেব্রুয়ারী এবং মে মাসে স্বাভাবিক অপেক্ষা উত্তাপের প্রাবল্য কিছু অধিক ছিল। সেইরূপ এপ্রেল, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের শীতের প্রাবল্য যথেষ্ট অধিক ছিল। ১৮৯৪ খৃঃ অঃ পরে এই বৎসরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর বসন্ত এবং শীতকালে বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত জলকণা-শূন্য ছিল।

আগ্নেয় গিরি।—রয়টার সংবাদ দিয়াছেন যে, আলাস্কা অন্তরীপে সিউআর্ক বন্দরে কিছু দিন পূর্ব্বে একটি জাহাজ উপস্থিত হয়। সেই জাহাজ আলিউসিয়ান দ্বীপ-পুঞ্জের কাটমাই নামক স্থানে আগ্নেয় গিরি সমুত্থিত ধূলিকণায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জাহাজের যাত্রিগণ বর্ণনা করিতেছেন যে, প্রথমে ধূলিকণা ও আগ্নেয় পর্ব্বত উত্থিত অন্যান্য

পদার্থ প্রবল স্রোতের ন্যায় বেগে বহির্গত হইয়া চারিদিক ছাইয়া ফেলিল ; পরে স্থলের পার্শ্ব দিয়া একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল। ধূলিকণায় সূর্য্যালোক একবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তীর হইতে জাহাজ প্রায় ৭০ মাইল দূরে ছিল, তখন বেলা ৪ ঘটিকা, কিন্তু সেই সময়েই ঘন অন্ধকার হইয়া উঠিল, এবং ভস্ম ও ধূলিকণা জাহাজের ডেকের উপর ভূরি ভূরি পতিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের মতে স্থল ভাগের প্রান্ত হইতে ৩০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান এই ভস্মে সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার সিট্‌ল্ নামক স্থান হইতে তারে সংবাদ আসিয়াছে যে, আগ্নেয় গিরির উৎপাতের জন্য কাডিয়ারে, রসপ্‌বেরি, আফগ্‌নাক নামক আলাস্কার তিনটি প্রসিদ্ধ দ্বীপে তার বিহীন তড়িৎ-বার্ত্তা প্রেরণ করাই সম্ভব হয় নাই।

এইরোপ্লেন — গত ৮ই জুন তারিখে লণ্ডন সহরে ব্যোমযানের দৌড়বাজী হইয়া গিয়াছে। ইহার নাম এইরিয়াল ডার্‌বি (Aerial Derby)। ইহার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রথম একটী সুবর্ণ কাপ্. এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ নগদ পুরস্কার ২৫০, ১০০ এবং ৫০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড—১৫৲)। এই দৌড়বাজীতে পথের দূরত্ব ৮১ মাইল। প্রতিযোগিতায় ১৫টি ব্যোমযান উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কেবল ৭টি উড্ডীয়মান হইয়াছিল। এবং ইহার মধ্যে ৫টি দৌড়বাজী সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিল। প্রথম পুরস্কারঃ— জি, হামেল, সহযাত্রী শ্রীমতী ডেভিস্. সময়— ৩৮মিঃ ৪৬সে। দ্বিতীয় পুরস্কার— মুর হাউস, সময়— ২ ঘণ্টা ২২ সেকেণ্ড। তৃতীয় পুরস্কার— জে ভ্যালেণ্টাইন্, সময়— ২ ঘণ্টা ২৬মিঃ ৩০সেঃ। চতুর্থ পুরস্কার— পাইবার কেহই উপযুক্ত হয় নাই। লণ্ডন সহরের বহুসহস্র লোক এই দৌড়বাজী উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। এই প্রতিযোগিতা হইতে এইরূপ সরকারী বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে ঃ— অল্প শক্তি বিশিষ্ট মনোপ্লেন ব্যোমযানের ক্ষিপ্রতা প্রসংশনীয়। দুঃখের বিষয় এই প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে একটি ইংরাজ মনোপ্লেন স্থান পায় নাই। পরিচালকগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদের গন্তব্য পথ [illegible]রণে কোন কষ্ট হয় নাই; কেননা তাহাদের গমনীয় পথের নিম্নে অসংখ্য লোকজন দাণ্ডায়মান থাকায় গমনীয় পথ স্বতঃই চিহ্নিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের মানচিত্র, দিগ্দর্শন যন্ত্র এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক যন্ত্রাদি লইয়া গমনীয় পথ স্থির করিয়া লইয়া গমন করা উচিত ছিল, তাহা হইলেই তাহাদের কার্য্য দক্ষতা বোধগম্য হইত। যখনই প্রয়োজন হইবে, তখনই যাহাতে এইরোপ্লেন কর্ণধার অনায়াসে বায়ুর অনুকূল ও প্রতিকূলগতি ও ব্যোমযানের গতি বুঝিতে পারে, এরূপ যন্ত্রাদি উদ্ভূত ও নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

[illegible]মিনিয়াম ধাতু— ১৯০৫ সালে উক্ত ধাতুর প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র মোটর [illegible] বাহুল্য বশতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু এর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অথবা প্রয়োজনমত

উক্ত ধাতু না পাওয়ায় মোটরকার কারিকরগণ বাধ্য হইয়া এলুমিনিয়মের পরিবর্ত্তে একপ্রকার ইস্পাতের পাতলা পাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই ইস্পাতের পাত যেরূপ দৃঢ় এলুমিনিয়ম্ সেইরূপ দৃঢ় ব্যবহার করিতে হইলে এলুমিনিয়াম লৌহ অপেক্ষা অধিকতর ভারি হইয়া পড়ে। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে এলুমিনিয়াম ৯,০০০ টন হইতে ৩৫,০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং মূল্যও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ১৯০২ সালে যেরূপ ছিল, ১৯১০ সালে তাহার অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ইস্পাত ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মোটরকারে আর এলুমিনিয়ম প্রয়োজন হয় না, কাজেই এই ধাতু এখন তৈজসাদি ও অন্যান্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এক নূতন উপায়ে, এলুমিনিয়মের পাত পরস্পর সংযুক্ত করিবার জন্য পৃথক "ঝাল" (solder) ব্যবহার না করিয়া, দুইটি পাতকে গলাইয়া একবারে একটি পাতের ন্যায় করা হইতেছে। এই সমস্ত পাত হইতে নানাবিধ রাসায়নিক তৈজস বিনির্ম্মিত হইতেছে। বিশেষতঃ গৃহস্থ-তৈজসের জন্য বর্ত্তমানকালে এলুমিনিয়ম একটী প্রধান ধাতু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অতিশয় লঘু। ইহা তাম্রাদির ন্যায় আদৌ বিষাক্ত নহে। ইহাতে তাম্রাদির ন্যায় "কলঙ্ক" পড়ে না। বস্তুতঃ সাধারণ অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা ইহা অতি সহজে "জরিয়া" যায় না। অধিকন্তু অন্যান্য ধাতব পাত্রে খাদ্যাদি রাখিলে খাদ্যের বর্ণ যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই ধাতুর স্বাভাবিক একটা বর্ণে পরিণত হয়, এলুমিনিয়মে সেরূপ হয় না। মদ্য চোলাইএর কারখানায়, পদার্থ "গাঁজাইয়া" ফেলিবার কারখানায় ও অন্যান্য অনেক কারখানায় আজকাল এলুমিনিয়মের প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলুমিনিয়ম পাকস্থলীর আদৌ অপকারী নহে।

দান।—ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শেফিল্ড বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয়ে নিউইয়র্ক নিবাসী মারে গুগেনহিম্ প্রায় ৬০,৩০০ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে খনিজ [illegible] বিদ্যাবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মৃত্যু।—[illegible] সপ্তাহ পূর্ব্বে মহামতি এম্ লেকো ডি বইবাউড্রান্ (M. Lecoq De B[illegible]udran) ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে জল কোন্ ধাতব লবণের বা কোন পদার্থের কত টুকুতে অত্যাসক্ত হইয়া উঠে তৎসম্বন্ধে গবেষণা করেন। পরে পদার্থের স্পেক্‌ট্রাম নির্ণয় করিতে যাইয়া নানাবিধ বিষয় আবিষ্কার করেন। এইরূপ করিতে করিতে তিনি গ্যালিয়াম নামক ধাতু আবিষ্কার করেন। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহার প্রধান গবেষণার বিষয় স্পেক্‌ট্রাম্। তিনি ইহাতেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা "রয়্যাল সোসাইটি" তাঁহার এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ডেভি সুবর্ণ পদক পুরস্কার দিয়াছিলেন।

কাজের জিনিষ।

মুখের মেচেতা নষ্ট করিবার উপায়।— সালফোকারবনেট অফ জিঙ্ক ২ ভাগ গ্লিসারিণ ২৫ ভাগ, গোলাপ জল ২৫ ভাগ, স্পিরিট ৫ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লও। পরে ঔষধটি প্রাতে, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার পূর্ব্বে মুখে লাগাইলে মুখের মেচেতা দূরীভূত হয়।

চর্ম্ম পরিষ্কৃত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।—নিম্নলিখিত ঔষধটি যদি কোন স্থানে ঘসড়ানি লাগে বা ক্ষত থাকে, সে স্থানে লাগান একবারেই উচিত নহে। এই ঔষধ প্যারিসের বাজারে "Lait antiphelique" নামে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ব্যবসাও চলিতে পারে। ১২ গ্রেণ করোসিভ সাব্লিমেট ৩ আউন্স অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটারে গলাইয়া লও, পরে বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক এসিড তিন ড্রাম ঢালিয়া দাও। উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। পরে উহা এক পাশে রাখিয়া দাও। বাদাম (তিক্ত) থেঁতো করিয়া এক খলে রাখিয়া রীতিমত মাড়িতে থাক তাহাতে ১ আউন্স গ্লিসারিন ঢালিয়া ঐরূপে মাড়িতে থাক, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া মাড়া আবশ্যক। যখন বেশ পরিষ্কার খিচ শূন্য কাদার ন্যায় হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে ৯ আউন্স অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া দাও। এই সময়ে ভয়ঙ্কর জোরে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া মাড়া আবশ্যক; এইরূপে মাড়িবার সময় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দুই ড্রাম বেন্‌জিন টিঞ্চার ঢালিতে থাক। উত্তমরূপে নাড়া হইয়া গেলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত করোসিভ সাব্লিমেট ইত্যাদির সলিউসন ঢালিয়া দাও। পরে ইহাকে ব্লটিং পেপার দিয়া ছাঁকিয়া লও। তাহাতে আরও অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া এক পাইট কর। ইহা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মুখে এবং গাত্রে লাগাইতে হইবে। গাত্রের যেন কোন স্থানে আঁচড় না থাকে।

চুল উঠাইবার উপায়।—অনেক সময় চুল উদ্গত হয় না, যে স্থানে চুল উদ্গত হইতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি উদ্গত হইতেছে না, সেই স্থানে ইহা লাগাইলে চুল বাহির হইয়া থাকে। এসেটিক এসিড ১ ড্রাম, কলোন ওয়াটার ১ আউন্স জল মিশাইয়া ছয় আউন্স। মিশ্রিত করিয়া যে স্থানে চুল বাহির করিতে হইবে, তথায় সর্ব্বসময়ে লাগাইতে হইবে।

[illegible] কাঠের খুঁটি ও স্তম্ভ রক্ষা করিবার উপায়।—কাঠের খুঁটী পুঁতিলে মাটীর [illegible] অংশ জীর্ণ হইয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে রুসিয়ার টেলিগ্রাফের খুঁটি পুঁতিয়া [illegible]র পাশে খানিকটা লবণ পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহাতে খুঁটি গুলি অনেককাল [জী]র্ণ হয় নাই। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত খুঁটি মাটীতে পোঁতা

হইয়াছে, তাহাদের সকল গুলিকেই ৩। ৪ মাস উপরোক্ত জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছিল। ৩।৪ মাসে কাষ্ঠগুলি তাহাদের ওজনের সমপরিমাণ লবণ-জলের শতকরা ৭০ ভাগ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া ফেলে।

স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি মূল্যবান ধাতুতে এনামেল করিবার উপায়।—

	ফ্লিন্ট কাঁচ। ভাগ	বিশুদ্ধ সোহাগা। ভাগ	ধাতব অক্সাইড
স্বচ্ছ লোহিত এনামেল	৩০	৪	গোল্ড পার্পল্ ০·৬৫ গ্র্যাম
স্বচ্ছ নীল "	৩৪	৬	কোবাল্টিক অক্সাইড ৬ গ্র্যাম
গাঢ় নীল "	৩০	৬	কোবাল্টিক্ অক্সাইড ৪ গ্র্যাম, হাড়ের কয়লা ৪ গ্র্যাম। আরসেনিক এসিড ৪ গ্র্যাম।
বেগুনিয়া "	৩৭	৪	কোবাল্টিক অক্সাইড ০·১২ গ্র্যাম। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ৪ গ্রাম।
স্বচ্ছ সবুজ "	৩০	২	কিউপ্রিক অক্সাইড ৪ গ্র্যাম।
গাঢ় সবুজ "	৩০	৮	কিউপ্রিক অক্সাইড ৪ গ্র্যাম, বোন মিল ৪ গ্র্যাম, আরসেনিক এসিড ২ গ্রাম।
কৃষ্ণবর্ণ "	৩০	৮	কিউপ্রিক অক্সাইড ৪ গ্র্যাম, ফেরিক অক্সাইড ৩ গ্র্যাম, কোবাল্টিক অক্সাইড ৪ গ্র্যাম, ম্যাঙ্গানিক অক্সাইড ৬ গ্র্যাম।
শ্বেতবর্ণ "	৩০	৬	টিন্ অক্সাইড ৬ গ্র্যাম, আরসেনিক এসিড ২ গ্র্যাম। (এই পদার্থ গুলি যে কোন রাসায়নিকের কারখানায় বা ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়)।

যেরূপ এনামেল করিতে হইবে, তাহার পার্শ্বে লিখিত পদার্থ গুলিকে উক্ত ভাগে হইয়া রীতিমত চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। ধূলি অপেক্ষা সূক্ষ্ম চূর্ণ হওয়া আবশ্যক। তাহার পরে মুছিতে করিয়া রীতিমত উত্তাপে গলাইয়া ফেল। ঠাণ্ডা হইলেও শক্ত হইয়া যাইবে। পুনরায় তাহাকে ধূলীর ন্যায় গুঁড়াইয়া ফেল। লাগাইবার পূর্ব্বে ল্যাভেণ্ডার তৈলে গুলিয়া, পরে অতি কোমল ব্রুশে করিয়া লাগাইতে হয়।

চুলীর বা ঐরূপ দ্রব্যের জন্য অদাহ্য উপাদান।— উৎকৃষ্ট কাঁকর বালী রীতিমত গুঁড়াইয়া লইয়া উত্তপ্ত অবস্থাতেই জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা কর। অতঃপর চালুনীতে করিয়া ছাঁকিয়া মিহি বা মোটা দানা যেরূপ ইচ্ছা বাহির করিয়া লও। এই বালীর ১০০ ভাগের সহিত ৭ ভাগ কিম্বা ৮ ভাগ পাথুরে চূণ এবং ৩ কিম্বা ৪ ভাগ কেওলিন মিশাইয়া দাও। এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টায় যতটুকু লাগান যাইতে পারে, ততটুকুতে জল মিশাইয়া কাদার মত কর। পরে যাহাকে অদাহ্য করিতে হইবে, তাহাতে লাগাইয়া দাও। একবারে অনেক পরিমাণ জলে মাখা উচিত নহে, কেননা দুই এক ঘণ্টা পরে জল মিশ্রিত উক্ত পদার্থ এত দৃঢ় ও কঠিন হইয়া যায় যে, তাহা আর ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না।

স্বাভাবিক বর্ণে ফল-পুষ্প ইত্যাদি করিবার উপায়।—

ফটকিরি (Alum.)	...	১০০ গ্র্যাম।
পোটাসিয়াম কারবনেট্ (Potassium Carbonate)	...	৬০ ,,
পোটাসিয়াম নাইট্রেট্ (Potassium Nitrate)		১২ ,,
সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্ (Sodium Chloride)	...	২৫ ,,
আরসেনিয়াস্ এসিড্ (Arsenious acid)	...	১০ ,,

উপরোক্ত কয়েকটি দ্রব্য ৩০০০ C. C. গরম জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ১২০০ C. C. Glycerine এবং ৩০০ C. C. Mythelated alcohol, মিশ্রিত করিয়া লইলেই হইল। এই মিশ্রিত তরল পদার্থে যে যে বস্তু রাখা যায়, তাহাদের আকার, বর্ণ, সুন্দর রূপে রক্ষিত থাকে এবং বহুদিন পরে বাহির করিলে ঠিক টাট্‌কা বলিয়া বোধ হয়।

কর্ক এসিড প্রুফ করিবার উপায়।—কর্ক acid প্রুফ অর্থাৎ এসিডে নষ্ট না হয়, এরূপ করা অনেক সময়ে অত্যন্ত দরকার হইয়া পড়ে, তাহা করিতে হইলে ৫০০ ভাগ gelatine ২৪ ভাগ Glycerine দিয়া ৪৫ ডিগ্রি centigrade পর্য্যন্ত তাপ দিয়া গরম কর, এবং তাহাতে কর্ক গুলি চুবাইয়া রাখ, কিছুক্ষণ পরে তাহা হইতে কর্ক গুলি বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিয়া শুষ্ক কর। পরে ৭০ ভাগ paraffin এর সহিত ২০ ভাগ vasseline মিশ্রিত করিয়া ৪০ ডিগ্রি cet. তাপে গরম কর, এবং তাহাতে কর্কগুলি চুবাইয়া রাখ কিছুক্ষণ পরে কর্কগুলি বাহির করিয়া শুষ্ক করিলেই উহারা acid কিম্বা alkli তে নষ্ট হইবে না।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) জুলাই, ১৯১২। ৭ম সংখ্যা।

মৃত্তিকা।

আমাদের দেশে অনেক জমী "পতিত" থাকে। তাহাতে কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে কেহ কখনও আদৌ চেষ্টা করেন না। অনেক সময়ে পড়া পতিত জমীতে ফলকর বৃক্ষ উৎপাদন করা সম্ভব। কৃষিকার্য্যে সাফল্যের প্রথম উপায় মৃত্তিকার অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। মৃত্তিকার প্রাকৃতিক অবস্থা, রাসায়নিক তত্ত্ব, জান্তব উপাদান ইত্যাদির মর্ম্ম জ্ঞাত হইবার পরে, তাহারা কোন জাতীয় উদ্ভিদের উপকারী এবং কাহার অপকারী তাহা জানা অতি প্রয়োজনীয়। কৃষি-ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে, সেই মৃত্তিকায় যে ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা জানিয়া, তাহা উৎপাদন করিতে কিরূপ ব্যয় হইতে পারে, উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্য কিরূপ, তাহার প্রচলনের অবস্থা ইত্যাদি জানাও প্রয়োজনীয়। পরে কিরূপে চাষ করিলে, মৃত্তিকা খনন করিলে, জল সেচনের ব্যবস্থা করিলে কোন্ বিশেষ উদ্ভিদের উপযোগী হইবে, তাহা জানাও আবশ্যক।

কোন এক জাতীয় স্বাভাবিক ঘটনা-সমূহকে রীতিমত বুঝিতে হইলে, তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও পার্থক্য জানা অতীব প্রয়োজনীয়। সেই পার্থক্য দ্বারা তাহাদের কোন্ কোন্ বিভিন্ন অবস্থা সূচিত হয়, তাহারও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যখন আমরা এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হই, তখন আমরা এই সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনা-সমূহের মধ্যে যে গুলির পরস্পর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাদিগকে লইয়া এক একটা বিভাগে বিভক্ত করি। মৃত্তিকার বিভাগসম্বন্ধেও ঠিক এই যুক্তিই প্রযোজ্য। যাহাতে উদ্ভিদ উৎপাদিত হয়, তাহাই মৃত্তিকা। কাজেই কর্দ্দম, কঙ্করময় প্রদেশ,

গভীর গহ্বর, মরুভূমী, সহজেই চূর্ণ হইয়া যায় এরূপ মাটী, ইত্যাদি সমস্তই মৃত্তিকার অন্তর্ভুক্ত। এই মৃত্তিকায় আমার নিজের অভিলাষমত কোন বৃক্ষ উৎপাদিত হইতে পারে কিনা বুঝিবার জন্য, যে যে পদার্থ দ্বারা সেই মৃত্তিকা গঠিত হইয়াছে তাহাদের বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করা, বস্তুতঃই উচিত নহে। আগাছাই হউক, ফসলই হউক বা পুষ্পবৃক্ষই হউক এই মাটীতে কি উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার পরীক্ষাই প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকার বিশ্লেষণে কি কি জানা প্রয়োজনীয়ঃ— রাসায়নিক উপাদান (এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে কোন্ কোনটি বৃক্ষের উপযোগী), চূণ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ, জান্তব পদার্থের অবস্থা ও পরিমাণ, এই সমস্ত উপাদানের জলে দ্রবণীয়তা, ক্ষার জাতীয় পদার্থের পরিমাণ, মৃত্তিকার প্রাকৃতিক তত্ত্ব, কাঠিন্য, বর্ণ, গঠন, জলধারণের ক্ষমতা, উত্তাপ, অক্সিজেন ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থের সংযোগ, এবং প্রাকৃতিক কোন্ অবস্থায়, অর্থাৎ জল-বায়ু ও দেশের আবহাওয়া কিরূপ থাকিলে, উপরি উক্ত উপাদান-সমূহ নির্ব্বিবাদে থাকিতে পারে।

মৃত্তিকার আবহাওয়া বা জল-বায়ুর অবস্থা বলিলে দুইটি বিষয় ধরিতে হইবে।— (১) দেশের জলবায়ুর অবস্থা; (২) মৃত্তিকার অভ্যন্তরের অবস্থা, অর্থাৎ রাসায়নিক ও প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কারণে মৃত্তিকার অভ্যন্তরের এরূপ অবস্থা হইযাছে। শেষোক্ত কারণে দেশের জল বায়ু এক হইলেও, উৎপাদিত উদ্ভিদের উপর বিভিন্ন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একই স্থানে থাকিলেও কাদা এবং বালির তাপমাত্রার যথেষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার বিখ্যাত কৃষি-তত্ত্ববিৎ হুইটনেই প্রথমে মৃত্তিকার এরূপ তারতম্যে যে কৃষিলব্ধ উদ্ভিদেরও যথেষ্ট তারতম্য নির্ভর করে, তাহা লক্ষ্য করেন।

মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রণালী এবং উপাদানে গঠিত হইয়া থাকে বলিয়াই, উহার প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক অবস্থা বিভিন্ন হইয়া থাকে। মৃত্তিকার গঠন-প্রণালীর এই গুলিই প্রধান ঃ— সময়, অর্থাৎ কতকাল ধরিয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত ও কতকাল ধরিয়া মৃত্তিকার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে; জল-নির্গম-প্রণালী; দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা; ইত্যাদি। মৃত্তিকার গঠন-উপাদানের মধ্যে প্রস্তর-চূর্ণই প্রধান অর্থাৎ কোন্ কোন্ প্রকারের প্রস্তর চূর্ণ হইয়া এইরূপ মৃত্তিকা উৎপাদিত হইয়াছে, অথবা কোন এক মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রস্তর চূর্ণের কতটুকু মিশ্রিত আছে, ইত্যাদি।

দেশের জলবায়ুর অবস্থা ভেদে মৃত্তিকার উদ্ভিদ উৎপাদন করিবার শক্তি বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই প্রকার মৃত্তিকা বিভিন্ন জলবায়ু বিশিষ্ট দেশে থাকিলে, সর্ব্বত্র একই প্রকার উদ্ভিদ উৎপাদিত হইতে পারে না। দেশের তাপমাত্রা উদ্ভিদের উপর বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। বাতাসে জল-কণার পরিমাণ সর্ব্বদেশে সমান নহে। মৃত্তিকার গঠনে, রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে এই জল-কণার পরিমাণ বিশেষ কার্য্যকর। যে

সমস্ত দেশের বায়ু-মণ্ডল জল-কণা শূন্য, সেই সমস্ত দেশের প্রস্তর-সমূহ অধিক ক্ষয়িত হইয়া থাকে। কাজেই মাটীতে অধিক কঙ্কর থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীত অবস্থাপন্ন দেশে মৃত্তিকার রাসায়নিক উপাদানের আধিক্য হয়। শুষ্ক প্রদেশে জলে দ্রবণীয় লবণ জাতীয় পদার্থ মৃত্তিকায় অধিক থাকে।

মৃত্তিকার উপাদান নানাবিধ উপায়ে গঠিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জলেরই প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক। পৃথিবীর যে সমস্ত প্রদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত প্রদেশের অধিকাংশই, নদী প্রভৃতি জল-প্রণালীর দ্বারা পর্ব্বত বা অন্য প্রদেশ হইতে আনীত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। উদাহরণ স্বরূপ আফ্রিকার নীল নদীর মোহনা প্রদেশ ও বঙ্গদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত জমীর উপাদান সর্ব্বত্রই প্রায় সমান ভাবে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত হয় বলিয়া, এই সমস্ত মৃত্তিকার সারভাগও অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে।

বায়ুর সাহায্যেও মৃত্তিকা গঠিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত প্রদেশে বালুকার ভাগ অধিক, অথচ এই সমস্ত বালুকা বাহিত হইবার নদী বা অন্য কোনরূপ কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই সমস্ত প্রদেশে বালুকার অন্যতম কারণ বায়ু। বিভিন্ন প্রদেশের ধূলিকণা পরিবাহিত হইয়া কোন এক প্রদেশে প্রক্ষিপ্ত হয়। উত্তর চীন প্রদেশের মৃত্তিকা এইরূপ পরিবাহিত ধূলিকণার দ্বারা গঠিত বলিয়া ভন রিস্‌টোফেন্ প্রথম স্থির করেন।

যে সমস্ত প্রস্তর হইতে মৃত্তিকা উৎপাদিত হয়, সেই সমস্ত প্রস্তরের প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক উপাদানের উপরেই মৃত্তিকারও ঐ সমস্ত উপাদান নির্ভর করে। আবার যে কারণের দ্বারা প্রস্তর ক্ষয়িত হইয়াছে, তাহার উপরেও মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ভর করে। কেননা বিভিন্ন কারণে প্রস্তরের বিভিন্ন উপাদান এবং একই কারণ বিভিন্ন প্রস্তরের বিভিন্ন উপাদান ক্ষয়িত হয়।

বর্ণের উপর মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি তত নির্ভর করে না। জান্তব পদার্থের পরিমাণ, পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত, মৃত্তিকার উপদান-সমূহের সহিত অম্লজেনের সম্মিলিত হইবার পরিমাণ, চুণ জাতীয় ও ধাতব পদার্থের পরিমাণ, ইত্যাদির তারতম্যের উপরেই জমীর বর্ণ নির্ভর করে। জান্তব পদার্থের অনুপাতে মৃত্তিকার নাইট্রোজেনের তারতম্য হইয়া থাকে। এই নাইট্রোজেন ঘটিত দ্রব্যের অল্পাধিক্যের উপরেই জমীর উর্ব্বরতা-শক্তির অল্পাধিক্য বা তারতম্য হয়। লাইম কার্ব্বনেট মাটীতে বর্ত্তমান থাকিলে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। যদি কোন জমীতে বৃক্ষের খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট ধাতব যৌগিক না থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত জমী সম্বন্ধে রীতিমত বিবেচনা করিয়া তবে বৃক্ষাদি রোপণ করা উচিত।

জমীর উৎপাদিকা শক্তি জমীর প্রাকৃতিক গুণাবলীর উপরেই নির্ভর করে।

জমীর মাটী যত "ঝুরা" হইবে, জমীতে জল যত শীঘ্র পরিবাহিত হইয়া চলিয়া যাইবে, অথচ মাটী বেশ ভিজা থাকিবে, জমীর অভ্যন্তর ভাগে যত অধিক বায়ু প্রবেশের পথ অপ্রতিহত থাকিবে, জমীর উত্তাপ যত দেশের সাধারণ উত্তাপের সমান থাকিবে, জমীতে হলাকর্ষণ যত সহজ-সাধ্য হইবে, জমীর উর্ব্বরতা-শক্তি ততই অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

উদ্ভিদে তুষারের প্রতিক্রিয়া।

এক নির্দ্দিষ্ট তাপমাত্রাতেই কোনও এক নির্দ্দিষ্ট জাতীয় চেতন পদার্থের প্রাণ সংরক্ষিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত বৃক্ষে খাদ্য বা জল ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত স্থূল ও রসাল হয়, সেই সমস্ত বৃক্ষ ৪৫ হইতে ৪৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রাতেই ধ্বংশ হয়। শুষ্ক ঘাসে বর্দ্ধিত বা এইরূপ অন্যান্য অজান্তব কতকগুলি ব্যাকটিরিয়া অনেক অধিক তাপমাত্রায় (৭০ ডিগ্রি হইতে ১০০ ডিগ্রি) সুখে জীবিত থাকে এবং সংখ্যায় রীতিমত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই তাপমাত্রা অন্য বৃক্ষের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতি স্থানে যে "শেওলা" উৎপন্ন হয়, তাহা ৫৭, ৭০, ৮৫ এমন কি ৯৩ ডিগ্রি সেন্টি-গ্রেড তাপমাত্রা পর্য্যন্ত অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। অনেক উদ্ভিদের বীজ, শৈবাল, মস্ (moss), স্পোর, ব্যাকটিরিয়া প্রভৃতি অল্পে অল্পে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ১২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (১০০ ডিগ্রি জলের স্ফুটন তাপমাত্রা) তাপমাত্রা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে। বস্তুতঃ প্রত্যেক চেতন পদার্থই একটা নির্দ্দিষ্ট ঊর্দ্ধ ও নিম্ন তাপমাত্রায় জীবিত থাকে। তাম্রকূট, শসা, কুমড়া, সে সমস্ত লতায় "সুটির" আকারে ফল উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত লতা ৪ ডিগ্রি হইতে ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে বিশীর্ণ হইয়া যায়; যদি এই সমস্ত বৃক্ষের উত্তাপ ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়, অথচ বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের তাপমাত্রা অতি অল্প থাকে, তাহা হইলে পত্রগুলি পুনরায় পরিপুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠে। ০ ডিগ্রি (বরফের তাপমাত্রা) অপেক্ষা অতি অল্প অধিকতর উচ্চ তাপমাত্রায় বৃক্ষের মূল আর জল শোষণ করিতে পারে না; এবং চতুষ্পার্শের বায়ুর জলকণা বরফ হইতে থাকে বলিয়া বৃক্ষের পত্রাদি হইতে অতি ত্বরিত বেগে জল বাষ্পাকারে নির্গত হইয়া আসে। কাজেই নিম্ন তাপমাত্রায় গাছটি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে। যদি গাছটিকে জলে ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে পত্রাদি শুষ্ক হয় না। তাপমাত্রা ০ ডিগ্রি না হইতে হইতেই কতক গুলি বৃক্ষের রস জমাট হইয়া যায়, কাজেই তাহাদের জীবনী শক্তিতে একটা ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ডেজি পুষ্পবৃক্ষ,

পাইন বৃক্ষ ইত্যাদির রস জমাট বাঁধিয়া পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া যাইলেও ইহারা জীবিত থাকে। কতকগুলি আণবিক জীব ও উদ্ভিদ —১২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিম্নতাপ মাত্রা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। কিন্তু আলু, তামাক, দ্রাক্ষা ইত্যাদি বৃক্ষের জীবনী-শক্তি ০ ডিগ্রি হইতে সামান্য নিম্ন তাপমাত্রাতেই একবারে ধ্বংস হইয়া যায়।

তাপমাত্রা অতি নিম্ন করিলে বৃক্ষের আভ্যন্তরিক গঠনের অবস্থা কিরূপ বিপর্য্যস্ত হয়, তাহা দেখিবার জন্য ভিয়ানার অধ্যাপক ডাক্তার মলিশ একরূপ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই যন্ত্রের প্রধান উপকরণ — একটি দুই দেওয়াল বিশিষ্ট কাষ্ঠের বাক্স। এই দুই দেওয়ালের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানে কাষ্ঠের করাত গুঁড়া ইত্যাদি তাপ অপরিচালক পদার্থ সন্নিবিষ্ট থাকে। উদ্দেশ্য,—যাহাতে বাক্সের অভ্যন্তরের তাপ বিকীর্ণ হইয়া না যায়। বাক্সের অভ্যন্তর ভাগ গ্যালভানাইজড্ লৌহ দ্বারা মোড়াই করা থাকে। বাক্সের মধ্যে অণুবীক্ষণ স্থাপন করিবার একটি পাত্র রহিয়াছে। বাক্সের ঢাকনায় দুইটি গর্ত্ত আছে। একটি দ্বারা অণুবীক্ষণের নল বহির্গত থাকে এবং অপরটিতে একটি অতি তীক্ষ্ণশক্তি বিশিষ্ট তাপমানযন্ত্র (thermometer) প্রবেশ করান থাকে। এই তাপমানযন্ত্রের কন্দ (bulb) যে পদার্থে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব পরীক্ষিত হইবে, সেই পদার্থে সংলগ্ন থাকে। তিনি এই যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে জিলাটিনের তাপমাত্রা অতি নিম্ন করিয়া পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফল এইরূপ হইল:—পরীক্ষিত জিলাটিনের নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফকণা প্রস্তুত হইল, নানাস্থানে বায়ুকণা প্রবেশ করিয়া পড়িল, এবং অবশেষে জিলাটিন জালের ন্যায় অতিশয় জটীল হইয়া স্পঞ্জের ন্যায় হইয়া পড়িল। যে পদার্থের গঠন জিলাটিনের ন্যায় (colloid) সেই সমস্ত পদার্থই নিম্নতাপমাত্রা প্রয়োগে স্পঞ্জের ন্যায় জটীল হইয়া পড়িল; অর্থাৎ জল ও জিলাটিন পৃথক হইয়া জল বরফ হইয়া গেল। উদ্ভিদের আঠাল পদার্থ ইত্যাদিও এইরূপে নিম্ন তাপমাত্রায় পরিবর্ত্তিত হয়। যে সমস্ত দ্রাবণে লবণ ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে, নিম্ন তাপমাত্রায় তাহাদের জল এবং লবণ পৃথক হইয়া জল জমিয়া যায়। উদ্ভিদেও জিলাটিনের ন্যায় কোলইড পদার্থ, আঠাল পদার্থ, লবণাদির দ্রাবণ থাকে। কাজেই নিম্ন তাপমাত্রায় লইয়া যাইলে ইহাদের অবস্থাও ঐরূপ হইবে।

নিম্ন তাপমাত্রায় লইয়া যাইলে কেন বৃক্ষাদি জীবিত থাকিতে পারে না, তাহার কারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে:—বৃক্ষের অভ্যন্তর ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণবিক প্রকোষ্ঠ (cell) বিনির্মিত। এই সমস্ত প্রকোষ্ঠ জলে পূর্ণ থাকে। এই জলে নানাবিধ রাসায়নিক লবণ মিশ্রিত থাকে। নিম্ন তাপমাত্রায় লইয়া যাইলে এই আণবিক প্রকোষ্ঠ হইতে জল বিনির্গত হইয়া যায়। জল বিনির্গত হইয়া যায় বলিয়াই বৃক্ষাদি মরিয়া যায়। বৃক্ষাদি শুষ্ক হইয়া মৃত

হইবার কারণ অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, মূল ইত্যাদির জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইবার কারণ এই যে, তাহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, সেই জলের অভাব। নিম্ন তাপমাত্রায় উদ্ভিদের মরিয়া যাইবার কারণও এই জলের অভাব।

রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্য্যবিবরণী।

১৯১১

(বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট)

আলোচ্য-বর্ষে বিশ্লিষ্ট পদার্থের মোট সংখ্যা ৪,১৯৮, গত বর্ষে ২,৮৯৫। ১৯১১ সালে ২৪ প্রকার ঘৃত বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ১৪ প্রকার ঘৃত উৎকৃষ্ট, অবশিষ্ট ১৪ প্রকারে অন্য জন্তুর মাখন জাতীয় পদার্থ, উদ্ভিজ্জ কিম্বা খনিজ তৈল মিশ্রিত ছিল। মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালের সুপারিন্টেনডেণ্ট ২ প্রকার দুগ্ধ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, দুই প্রকার দুগ্ধই উৎকৃষ্ট; কোনরূপ অন্য পদার্থ বা দুগ্ধ রক্ষা করিবার জন্য অন্য কোন পদার্থ মিশ্রিত ছিল না। ১৫ প্রকার আরোরুট ও ময়দা পরীক্ষিত হইয়াছিল। প্রত্যেকটিই খাদ্যের উপযোগী। ২,১৩৮ প্রকারের কোকেন পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সর্ব্ব সমেত ৮৯ প্রকারের জল পরীক্ষিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১০ প্রকার উৎকৃষ্ট, ২৩ প্রকার ব্যবহার যোগ্য, ১২ প্রকার ব্যবহার করিলে কুফল ফলিতে পারে এরূপ সন্দেহজনক ৪৪ প্রকার একবারে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আসামের ডলু নামক স্থানের পুষ্করিণীর জল উৎকৃষ্ট এবং নোয়াখালি রেলওয়ে ষ্টেশনের কূপের জল ব্যবহারের অযোগ্য। মোকদ্দমা সংক্রান্ত (খুন, জখম, ইত্যাদি) ২০৭২ বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছিল। সর্ব্ব সমেত ৮৩৩ জন অপঘাতে মৃত লোকের নাড়ীভুঁড়ি পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মরফিয়া ও অহিফেন সেবনে মৃতের সংখ্যা অধিক, তৎপরেই আরসেনিক। আসাম, চট্টগ্রাম, প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও বর্দ্ধমান বিভাগে এবৎসর এইরূপে মৃতের সংখ্যা গতবৎসর অপেক্ষা অধিকতর, ও অন্যান্য বিভাগে অল্পতর। প্রেসিডেন্সি বিভাগেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কলিকাতায় সর্ব্বসমেত ১৪৫টি মৃত ব্যবচ্ছেদ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ২৪ জনের মৃত্যুর কারণ স্থিরীকৃত হয় নাই এবং ৩ জনের শরীরে বিষের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। রায় বাহাদুর ডাক্তার চুনীলাল বসু এই সমস্ত মোকদ্দমা সংক্রান্ত পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকেন। এ বৎসর কয়েকটি অসাধারণ বিশ্লেষণের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) যশোহরের সিভিল সার্জ্জন একজন পূর্ণবয়স্কা মুসলমান স্ত্রীলোকের

কতকটা মাংস পিণ্ড পাঠাইয়া দেন। এই স্ত্রীলোক ওলাউঠায় মরিয়াছিল এইরূপ অছিলায় ৬ মাস পূর্ব্বে সমাধিস্থ হইয়াছিল। এই মাংস পিণ্ডে আরসেনিকের অস্তিত্ব ছিল।

(২) গত আবর অভিযানে একজন নেপালী টেলিগ্রাফ কুলি একটি বাণের দ্বারা আহত হইয়াছিল। এই বাণের ফলার মুখ হইতে খানিকটা পদার্থ চাঁচিয়া লইয়া রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইহাতে ক্রোটন্ তৈল আবিষ্কৃত হয়। এই ক্রোটন তৈল শরীরে প্রবিষ্ট হইলে মৃত্যু না হইলেও আহত স্থানে অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

(৩) হাজারিবাগের সিভিল সার্জ্জন একটা মস্তকের খুলী, কয়েকটি পঞ্জরাস্থি, পেলভিক্ বোন ইত্যাদি কয়েকটি অস্থি-খণ্ড প্রেরণ করেন। এই হাড়গুলি মানুষের বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই পেলভিক বোন হইতে ইহা পুরুষের হাড় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এই অস্থি খণ্ড পূর্ণাঙ্গ পুরুষের যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ, সেই জন্য মৃতব্যক্তি একজন পূর্ণবয়স্ক বলিয়া বুঝিতে পারা গেল।

তপন, পবন, তরঙ্গ।

সার উইলিয়াম র‍্যামজে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আর খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিবার প্রয়োজন হইবে না। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যত দূরে কয়লা রহিয়াছে, ততদূর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটিয়া এবং সেই সমস্ত সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া নল চালাইয়া ও সেই সমস্ত নল দ্বারা অক্সিজেন ও তড়িৎ প্রেরণ করিয়া কয়লা দগ্ধ করিয়া ফেলিলে যে গ্যাস উৎপাদিত হইবে, সেই গ্যাসের দ্বারা অসংখ্য গ্যাস-এঞ্জিন পরিচালিত হইবে। এই সমস্ত এঞ্জিন উদ্ভূত তড়িৎ শক্তি ১০০ মাইল ব্যাসার্দ্ধ ব্যাপী ভূখণ্ডে পরিচালিত হইবে। তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইল :—

By this plan 30 per cent. of the coal energy can be converted into useful work, instead of a meagre 15 per cent., which, by present method of coal consumption, is the best efficiency obtainable. Thus we may double the life of our coal mines: and, in addition, the smoke problem will have become a thing of the past.

সূর্য্যও যাহাতে পৃথিবীর অধিবাসিগণকে কল চালাইবার উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রদান করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে। একটা প্রকাণ্ড বক্রোদর দর্পণকে (reflector) সূর্য্যাভিমুখে রাখিয়া তাহার অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে (focal point) একটা বাষ্পস্থালী রাখা হইবে। উক্ত দর্পণ দ্বারা পরিবাহিত সূর্য্য-তাপ সাহায্যে বাষ্পস্থালী বাষ্প

পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ফলে একটা মুদ্রাযন্ত্র অনায়াসে পরিচালিত হইবে। এখনও এরূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই বটে, তবে বর্ত্তমানে এইরূপ ধরণের এক প্রকার যন্ত্র আছে। উক্ত যন্ত্রে সংলগ্ন কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট নল মুখ হইতে উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহ বিনির্গত হইয়া নলগুলিকে দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত করিয়া থাকে। আমাদের দেশে এবং ইজিপ্টে এইরূপ ধরণের এক প্রকার যন্ত্র আছে; ইহার দ্বারা রন্ধন-কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত দর্পণের ন্যায় একটা দর্পণ প্রয়োজন। এই দর্পণ কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং কাষ্ঠের উদরের ভাগে পাতলা কাচের দর্পণ সংলগ্ন করা থাকে। এই দর্পণের অধিশ্রয়ণ বিন্দুতে রন্ধন পাত্র বসান থাকে। সূর্য্যের তাপে রন্ধন কার্য্য সমাধা হয়। ফ্রাঙ্ক সুমান্ তাঁহার উদ্ভাবিত এইরূপ একটি কলের নাম সান্ এঞ্জিন (Sun Engine) রাখিয়াছিলেন। এই এঞ্জিন সাহায্যে ইজিপ্ট দেশে জল উত্তোলিত হইয়া থাকে। ফিলাডেলফিয়ায় এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট যন্ত্র রহিয়াছে, ইহাদ্বারা প্রতি মিনিটে ৩,০০০ গ্যালন জল ৩৩ ফিট উচ্চে উত্তোলিত হইয়া থাকে। ইজিপ্টের সূর্য্য অত্যন্ত প্রখর, কাজেই ফিলাডেলফিয়া অপেক্ষা ইজিপ্টে এইরূপ যন্ত্রে কার্য্য অধিক হইবে।

সমুদ্রের জোয়ার ভাটার শক্তি যাহাতে অপব্যয়িত না হয়, তাহারও চেষ্টা হইতেছে। মিষ্টার লেয়ার্ড একটি যন্ত্র পেটেণ্ট করিতেছেন। সেই যন্ত্রটি প্রকাণ্ড দেওয়াল বিশিষ্ট একটি অতিকায় পাত্র। পাত্রটি সমুদ্রের তীরে স্থাপিত হইবে। জোয়ারের সময় জল এই পাত্রে প্রবেশ কালে একটা মিল হুইল আবর্ত্তিত করিবে। তাহার দ্বারা একটা ডাইনামো চলিবে, এবং ভাটার সময় বিপরীত দিকে উক্ত হুইল আবর্ত্তিত হইবে। এরূপ অনুমিত হইয়াছে যে, এইরূপে ডাইনামো পরিচালিত হইলে, এত তড়িৎ উৎপাদিত হইবে যে, সেই তড়িৎ সাহায্যে একটা রেলওয়ের সমস্ত ট্রেণ চালিত হইবে। তবে সেই সমস্ত রেলওয়ের শেষ সীমা সমুদ্রতীর হওয়া প্রয়োজন। বাতাসের দ্বারাও একটা মিল হুইল পরিচালিত হইতে পারে। এই মিল হুইলের সাহায্যে এত তড়িৎ উৎপাদিত হইতে পারে যে, স্বচ্ছন্দে তাহার দ্বারা প্রতি গৃহ তড়িৎ আলোক ও তড়িৎ শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

রেশম রঞ্জিত করিবার প্রণালী।

গত দশ বৎসরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে রেশমের কারখানা অতিশয় বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি বর্ত্তমানে সমগ্র জগতে এই ব্যবসায় যুক্তরাজ্যই অগ্রণী। রেশম উৎপাদন ও রেশম বর্ণ রঞ্জিত করা এই দুই কারবারেই যুক্তরাজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

যাবতীয় ধরণের ও উৎকৃষ্ট হইতে অপকৃষ্ট সমস্ত রেশমই, বস্ত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই রঞ্জিত হইয়া থাকে। আমরা যে শ্বেত বর্ণের রেশম ব্যবহার করি, তাহাও

রঞ্জিত, রেশমের অকৃত্রিম বর্ণ নহে। আমরা যে সূত্রকে "অরগ্যানজাইন্" (organzine) বলি, তাহা আর কিছুই নহে, দুই "থি" বা ততোধিক রেশম সূত্র পৃথক পৃথক একই দিকে "পাক" দিবার পরে একত্রিত করা। এই সূত্র বস্ত্রের "টানা"র (বস্ত্রের দৈর্ঘ্যের দিকের সূত্র) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সূত্র ইংরাজীতে ট্রাম (tram) নামে অভিহিত, তাহা দুই বা তিন "থি" রেশম সূত্র একত্রিত করিয়া "পাক" দিবার পরে, পুনরায় ডবল করিয়া দেওয়া। এই সূত্র—বস্ত্রের "পড়েনে" ব্যবহৃত হয়। (পড়েন—বস্ত্রের বিস্তারের দিকের সূত্র)। মৌলিক রেশম-সূত্রে আদৌ "পাক" থাকে না। এই মৌলিক রেশম সূত্রের বস্ত্র যেরূপ কোমল, চিকণ ও সুদৃশ্য হয়, পাক দেওয়া রেশম সূত্রের বস্ত্র সেরূপ হয় না। ইউরোপীয় বিলাসিনীগণের অধিকাংশ বস্ত্রই মৌলিক রেশম সূত্রে নির্ম্মিত। অনেকেই পঞ্জী ও চিফণ (pongee and chiffon) দেখিয়াছেন। ইহারা মৌলিক রেশম সূত্রে নির্ম্মিত।

রেশম রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে, রেশম সূত্রের স্বাভাবিক চর্ব্বি জাতীয় এবং আঠাল পদার্থ আংশিক বা সম্পূর্ণ বিদূরিত করা হইয়া থাকে। টানা ও পড়েনের সূতায় অর্থাৎ অরগ্যানজাইন ও ট্রাম নামক সূত্রে এই আঠাল জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। সুপল্ (souples) নামক এক প্রকার সূতা হইতে উক্ত আঠাল পদার্থ শতকরা ৫ হইতে ৮ ভাগ বিদূরিত করা হয়। সেইরূপ এক্রু (ecru) নামক সূত্র হইতে মাত্র ৫ ভাগ নষ্ট করা হয়। অলিভ অয়েল হইতে প্রস্তুত সাবানের জলে কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত ফুটাইলে তবে উক্ত আঠাল পদার্থ রেশম সূত্র হইতে বিদূরিত হইয়া যায়। যে সূত্র হইতে যত পরিমাণ আঠাল পদার্থ নষ্ট করা প্রয়োজনীয়, সেই সূত্র তদুপযোগী একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ফুটাইয়া লইতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট কালের পরিমাণ কারিকর অভিজ্ঞতার দ্বারা সংগ্রহ করেন। অলিভ অয়েল সাবানের জল হইতে সূত্র উত্তোলিত করিয়া লইয়া অতঃপর গরম জলে ফুটাইতে হয়। সর্ব্বশেষে অতি ক্ষীণ শক্তি বিশিষ্ট হাইড্রোক্লোরিক এসিডের জলীয় দ্রাবণে সূত্র নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিলেই আঠাল পদার্থ বিদূরিত করিবার প্রণালী (stripping) শেষ হইয়া যায়।

আঠা বিদূরিত করিবার পরে সূত্রগুলি শুষ্ক করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের ওজন অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কাজেই এই অল্পভার সূত্রকে রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বেই, ইহার ভার পুনর্ব্বার সমান করিয়া লইতে হয়। কোন কোন ব্যবসাদার এই শুষ্ক রেশমের ভার স্বাভাবিক ভারে পরিণত করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু ইহার ভার স্বাভাবিক ভার অপেক্ষা অনেক বাড়াইয়া দেন। ইহার ফলে ক্রেতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, অধিকন্তু রেশম সূত্রও তত দৃঢ় থাকে না। কোন কোন ব্যবসাদার স্বাভাবিক ভার অপেক্ষা এই শুষ্ক রেশম সূত্রের ভার দ্বিগুণ করিয়া তুলেন।

দুইটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রেশমের ভার বর্দ্ধিত করা যায়ঃ— (১ম) নাইট্রেট অফ আয়রণের জলীয় দ্রাবণে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়া শুষ্ক করিতে হয়। এই দ্রাবণের শক্তি বমের হাইড্রোমিটারের ৩৬ ডিগ্রির অধিক বা অল্প হওয়া উচিত নহে (30° degrees of Baume scale)। (২য়) বাইক্লোরাইড অফ টীন্ এর জলীয় দ্রাবণ (26 or 27 degrees of Baume scale)। এই দুই দ্রাবণের কোন একটিতে সূত্র গুলি অন্ততঃ ১ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিতে হয়। পরে তাহাকে জলে রীতিমত ধৌত করিয়া, হয় শুষ্ক করিবার কলে অথবা উত্তপ্ত বাতাসে, শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রেশম সূত্রের ওজন ব্যবসায়ীর ইচ্ছানুরূপ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমাগত এই প্রণালী পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত নাইট্রেট অফ আয়রণ ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবহার করিলে আর একটা বিশেষ সুবিধা হয়। রেশমকে রঞ্জিত করিবার সময় রেশম সূত্রে সম্মিলিত এই নাইট্রেট অফ আয়রণ ও রং পরস্পর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হয়। কাজেই রেশমের রং অতিশয় পাকা হইয়া যায়। বাইক্লোরাইড অফ টিনের দ্রাবণে রেশম সূত্রের ওজন বৃদ্ধি করা হইলে, রেশম সূত্রগুলিকে পুনরায় ফস্ফেট অফ সোডার দ্রাবণে ডুবাইয়া লইতে হয়। ফস্ফেট অফ সোডার দ্রাবণে ২।৪ ফোঁটা আমোনিয়া ঢালিয়া দিয়া উহার অম্লত্ব নষ্ট করিয়া, অম্ল ও ক্ষার উভয় গুণই হীন (neutral) করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য যতবার উক্ত বাইক্লোরাইড অফ টীনের দ্রাবণে রেশম সূত্রকে ডুবান প্রয়োজন হইবে, ততবার ফস্ফেট অফ সোডার দ্রাবণেও সূত্রগুলি ডুবাইয়া লওয়া প্রয়োজন। এইরূপে ওজন বৃদ্ধি করিবার প্রণালী শেষ হইলেও, কোন কোন ব্যবসাদার রেশম গুলিকে পুনরায় সালফেট অফ আলিউমিনার জলীয় দ্রাবণে কিছু ক্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া রাখেন। এইরূপ করিলে রং করিবার সুবিধা হয়। পরে রেশমকে পুনরায় সিলিকেট অফ সোডার দ্রাবণে ডুবাইয়া দেওয়া হয়, এরূপ করিলে রেশমের ভার পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

লগউড এবং ফুষ্টিক (logwood and fustic) এই দুইটিই রেশমকে কৃষ্ণ বর্ণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সমস্ত রেশমের ভার অতিশয় অধিক, সেই সমস্ত রেশমের জন্য লগউডই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অল্পভার রেশমে ফুষ্টিক ব্যবহৃত হয়। এই শেষোক্ত রেশমকে বিশুদ্ধ বর্ণ রঞ্জিত (pure dye) রেশম বলে। রেশম রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে কোন কোন কারিকর রেশমকে একটু নীল আভাযুক্ত করিয়া লয়। এরূপ করিতে হইলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাসের জলীয় দ্রাবণে রেশমগুলিকে নিমজ্জিত করিয়া লইতে হয়। কোন কোন কারিকর আবার এরূপ নীলাভাযুক্ত না করিয়া একবারেই রংএর পাত্রে রেশম ডুবাইয়া ধরে। উপরোক্ত দুই প্রকার রংই উত্তপ্ত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। একটা ৩০ ফিট লম্বা, ৩ ফিট চওড়া, ৩ ফিট

গম্ভীর কাঠের ছৌবাচ্চায় রং এর উত্তপ্ত দ্রাবণ ঢালিয়া দিয়া রেশমের সূতার ফেটী বা গোছ গুলিকে ঐ চৌবাচ্চার গায়ে আড়াআড়ি ভাবে লাগান কাঠের দণ্ডে ঝুলাইয়া রং এর দ্রাবণে ডুবাইয়া রাখিতে হয়।

রেশমের ফেটীগুলিকে ক্রমাগত নাড়িতে হয় ও ক্রমাগত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রেশমের বর্ণ মনের মত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপে রংএর চৌবাচ্চায় রেশমগুলিকে নাড়া চাড়া করা প্রয়োজনীয়। অতঃপর রেশমকে রংএর চৌবাচ্চা হইতে উঠাইয়া কারবনেট অফ সোডার ক্ষীণ দ্রাবণে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কারবনেট অফ সোডা হইতে উঠাইয়া ফেটী গুলিকে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া রীতিমত ধৌত কবিতে হয়। সর্ব্বশেষে বিশুদ্ধ অলিভ অয়েলে ও লেবুর রসে নিমজ্জিত করিয়া লইলেই রেশম সূত্র উজ্জ্বল ও চিক্কণ হইয়া উঠে।

কৃষ্ণ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ করিতে হইলে কারিকরগণ প্র[illegible]তঃ আনিলিন ডাই ব্যবহার কবেন। যে পাত্রে ডুবাইযা রেশমেব আঠাল পদার্থ বিদূরিত করা হইয়াছে, সেই পাত্রেই সামান্য পরিমাণ ইচ্ছানুরূপ রং ঢালিনা দেওয়া প্রয়োজন। ফেটিগুলি তাহাতে ডুবা[illegible] [illegible]৫ মিনিট ধরিয়া খুব তাড়াতাড়ি নাড়া চ[illegible] করিবাব পরে ফেটি-গুলিকে তুলি[illegible] লই[illegible] পুনরা[illegible] উক্ত পাত্রে আব একটু রং ঢালিয়া ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা ধবিয়া এইরূপ ক[illegible]তে করিতে তবে রেশমেব বর্ণ কারিকরের ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে। যদি রং অতি গাঢ় হইয়া যায়, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত রং মনের মত না হয়, ততক্ষণ ক্ষীণ শক্তি[illegible]শিষ্ট আমোনিয়ার দ্রাবণে যেটিকে ডুবাইযা রাখিতে হয়। পরে রেশমকে পূর্ব্বের [illegible] প্রণালী অনুসারে চিক্কণ ও উজ্জ্বল করিযা লইলেই রঞ্জিত করা কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

গত ২৫ বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কার্য্যাবলী।

জার্ম্মানদেশে "প্রমিথিয়াস্" নামক একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা আছে। এই পত্রিকা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই পত্রিকার এক সংখ্যায় এই ২৫ বৎসর মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে কি কি কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে, তাঁহার একটি বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল। যখন এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, অন্য সাধারণ লোকে এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিকে অদৃষ্ট অসম্ভব বা অকাশ-কুসুমবৎ মনে করিতেন।

এমন কি অনেক বৈজ্ঞানিকও এই সমস্ত বিষয় সমাধানের জন্য সময়ক্ষেপ করা একবারে বৃথা মনে করিতেন। ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিকগণ ও সাধারণ লোক বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিষয়গুলির সমাধান একবারে অসম্ভব নহে, তবে বহু সময় সাপেক্ষ। বর্ত্তমানে প্রায় সমস্ত প্রশ্ন গুলিই মীমাংসিত হইয়াছে, কিন্তু তত্তৎ স্থলে আবার নূতন নূতন প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। যে সমস্ত বিষয়ের সমাধানে বৈজ্ঞানিকগণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল :— (১) এইরোপ্লেন—ব্যোমযান অনেক কাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে বালকগণ যে "ফানুস" উড্ডীন করিয়া থাকে তাহাও ব্যোমযান। কিন্তু কি প্রকারে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া পরিচালক ইচ্ছানুরূপ স্থানে অক্লেশে গমনাগমন করিতে পারেন, তাহাই বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তার বিষয় ছিল। প্রাচীন বেলুন গুলিকে বায়ু অপেক্ষা লঘু না করিলে কিছুতেই উড্ডীন করা যাইত না। কিন্তু আধুনিক মনোপ্লেন, বাইপ্লেন বায়ু অপেক্ষা অনেক গুরুতর; তথাপি এই সমস্ত ব্যোমযান আরোহী লইয়া পরিচালকের ইচ্ছানুরূপ প্রদেশে অক্লেশে গমনাগমন করিতেছে। (২) সমুদ্রের তলদেশ নৌ-সঞ্চালন। প্রাচীন কালে মহাসমুদ্রে গমনই কি দুষ্কর ছিল। এখন সমুদ্রের প্রতি স্থান নাবিকগণের সুপরিচিত। বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রের অভ্যন্তরে ও তলদেশে কি রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কারের জন্য এরূপ যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত করিয়াছেন যে, নাবিকগণ সেই সমস্ত যন্ত্র সম্বলিত পোষাক পরিধান করিয়া বৈদ্যুতিক অলোক হস্তে স্থলভাগের ন্যায় স্বচ্ছন্দে জলদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে রত্নাকরের অগাধ রত্নরাজির বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করিয়া জন সমাজকে বিস্ময়-চকিত করিয়া তুলেন। এখন জলের মধ্য দিয়া কত প্রকার নৌকা স্বচ্ছন্দে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে। (৩) উত্তর মেরু অবিষ্কার। সাধারণ লোকের নিকট উত্তর মেরু আবিষ্কারের মূল্য নাই। কিন্তু জ্ঞান-পিপাসু বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর কোন স্থান উত্তর মেরু, তাহার প্রাকৃতিক অবস্থা কিরূপ, তাহা না জানিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। ইহার জন্য কত মহামূল্য জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ক্যাপটেন পিয়ারী ভৌগলিকগণের বাঞ্ছিত উত্তর মেরু প্রদেশ অবিষ্কার করিয়াছেন। (৪) তাপমাত্রার absolute ডিগ্রি। ইহা প্রাপ্ত হইতে এখনও ৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক নিম্নে যাইতে হইবে। (৫) তার বিহীন তড়িৎ বার্ত্তা। ইহার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অবর্ণনীয়। অসীম সমুদ্র পথে বিপদ বার্ত্তা জানাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। ইহা উদ্ভাবিত হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত, ইহার দ্বারা যে কত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জনক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিজ্ঞানের পাঠকগণ পূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত আছেন। (৬) তড়িৎতার সহযোগে আলোকচিত্র প্রেরণ—যে কোন ব্যক্তির আলোকচিত্র (Photograph) অনায়াসে টেলিগ্রাফের তারের দ্বারা দূরদেশে

পূর্ব্বে মধ্যে প্রোন্নত হইয়াছে। বাস্তবিকই ইহা কত বিস্ময়াবহ। (৭) স্বাভাবিক বর্ণের আলোকচিত্র। আলোকচিত্রণ প্রণালী যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ উন্নত হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অতি নিকট ভবিষ্যতে তৈল-চিত্র বা বর্ণ-রঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়োজন হইবে না। সমস্তই আলোকচিত্রণ যন্ত্রে সংসাধিত হইবে। যে বৃক্ষের যে স্থানে যে বর্ণ রহিয়াছে, আলোকচিত্রে সেই সেই স্থানে সেই সেই বর্ণ সুন্দর প্রতিফলিত হইতেছে। পূর্ব্বে ফটোগ্রাফে মাত্র শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের সমাবেশে ছবি পরিস্ফুট হইত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক যে বর্ণ যে স্থানে থাকিবে আলোকচিত্রেও সেই সেই বর্ণ পরিস্ফুট হইবে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লোকে যে মনে করিত এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে, তাহার কারণ যথেষ্ট ছিল। কেননা তখনকার কালের বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে এ সমস্ত সম্ভব বলিয়া মনে করিবার কোন উপায় ছিলনা। এই সমস্ত বিষয় একবারেই বর্ত্তমানের ন্যায় হইয়া উঠে নাই। পরন্তু ইহাদিগকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য মধ্যপথে অনেক নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে হইয়াছে, এবং সেই সমস্ত আবিষ্কার হইতে নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবিত হইয়াছে, ও ভবিষ্যতের জন্য নূতন নূতন প্রশ্ন সংরক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক এই সমস্ত বিষয় হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞানের নিকট কোন বিষয় অসম্ভব হইতে পারে না; অথবা বৈজ্ঞানিকের কোন চেষ্টাকে উপহাসের যোগ্য বা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সাধারণের আদৌ কর্ত্তব্য নহে।

তৈলে পুষ্প গন্ধ নিষিক্ত করিবার প্রণালী।

বাজারে যে সমস্ত সুগন্ধি তৈল বা অন্য গন্ধ দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহাদের অধিকাংশই পুষ্প হইতে সংগৃহীত হয় না। নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে বর্ত্তমানে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। গৃহস্থগণ কিরূপে নিজ নিজ ব্যবহারের তৈল সুগন্ধযুক্ত করিতে পারেন, এই প্রবন্ধে তাহাই লিখিত হইতেছে। কলিকাতায় এরূপ করা গৃহস্থগণের পক্ষে সম্ভব নহে; কেননা পুষ্প-সংগ্রহ ব্যাপার কলিকাতাবাসীর নিকট অসম্ভব। পল্লীর প্রশস্ত গৃহ প্রাঙ্গণে নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষ উৎপাদিত হইতে পারে। এই সমস্ত পুষ্প স্বচ্ছন্দে তৃপ্তিকর ও নির্দ্দোষ বিলাসের উপাদানে ব্যবহৃত হইতে পারে। গৃহস্থের স্ত্রী কন্যাগণ একটু চেষ্টা করিলেই অনায়াসে এই সমস্ত পুষ্পের সৌরভ তৈলে নিষিক্ত করিতে পারেন। মোটামুটি যে সমস্ত পুষ্পে কোনরূপ সৌরভ আছে, সেই পুষ্প হইতেই তৈল সুগন্ধ করা যায়। তবে কোন কোন পুষ্পে

তৈল উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত হয়, কোন কোন পুষ্পে সেরূপ হয় [illegible] কেননা কোন কোন জাতীয় ফুলের সুগন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কর্ষণ করা যাইতে পারে না। গোলাপ, বেল, যুঁই, মল্লিকা, বকুল, শেফালী প্রভৃতি ফুলে গন্ধ অতি শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে চোয়ান যায়। প্রথমে এই সমস্ত ফুল লইয়া চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পুষ্প চয়ন করিবার সময় স্থির করিয়া লওয়ার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কেননা প্রত্যেক পুষ্পই তাহার জীবনের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েই অতিশয় সৌরভময় হইয়া উঠে। সেই সময়েই পুষ্প চয়ন করা প্রয়োজনীয়। অনেকে মনে করেন যে, সদ্য মুকুলিত কুসুমই অতিশয় সৌরভময়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ নাও হইতে পারে। কাজেই দুই একবার পরীক্ষা করিয়া কোন্ সময়ে কোন্ পুষ্পের গন্ধ অধিক আমোদজনক হইয়া উঠে, তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে হইবে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, সদ্য মুকুলিত ফুল অপেক্ষা যখন পুষ্পের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ দল, পরাগ কেশর, গর্ভ-কেশর ইত্যাদি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তখনই গন্ধে দিক আমোদিত হইয়া উঠে। তখনই পুষ্প চয়নের শ্রেষ্ঠ সময়। দিবা দ্বি-প্রহরের পূর্ব্বে পুষ্প চয়ন কর্ত্তব্য, কেননা আমাদের দেশের দারুণ সূর্য্যতাপে পুষ্প অঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। অথচ প্রভাতেই চয়ন করা উচিত নহে; কেননা ফুলের গাত্রে শিশির বা কোনরূপ জলীয় পদার্থ লাগিয়া থাকিলে, তাহা হইতে সুন্দররূপে গন্ধ নিষিক্ত করা যায় না। পুষ্প সঞ্চয় করিবার পরেই যদি তাহাতে জল লাগিয়া আছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত পুষ্প "চালুনী" বা লোহার জালের কোনরূপ চৌকা কাঠাম বা ঐরূপ কোন পাত্রে ফুলগুলি ধীরে ধীরে সাজাইয়া আস্তে আস্তে চালুনী বাতাসে দোলাইলেই জল বাষ্পীভূত হইয়া যায়। চালুনীর ছিদ্রগুলি যেন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, অর্থাৎ যেন সর্ব্বদিক দিয়া পুষ্পের গাত্রে বাতাস লাগিতে পায়। এক একটি চালুনীতে এক স্তরের অধিক পুষ্প কখনই রাখা উচিত নহে। চয়ন করিবার পরেই যতশীঘ্র সম্ভব পুষ্পগুলিকে জল হীন করা প্রয়োজনীয়। নতুবা ফুলের পাপড়ীগুলি ঝিমাইয়া পড়ে ও বিবর্ণ হইয়া যায়, কাজেই সুগন্ধও অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। তাড়াতাড়ি ফুলের চালুনী কয়েকবার মাত্র দোলাইলেই পুষ্প-সমূহ প্রায়ই বেশ জল হীন হইয়া যায়। আর তৈল সম্বন্ধে এই কথা যে, যে তৈলে কোনরূপ স্বাভাবিক গন্ধ আছে তাহা তত ভাল হয় না। সরিষার তৈলে একটা বিশেষ গন্ধ আছে; কাজেই সরিষার তৈলে কোন কার্য্য হইবে না। বাজারের নারিকেল তৈলের স্বাভাবিক গন্ধ দূরীভূত করা অসম্ভব। গন্ধহীন স্বচ্ছ নারিকেল তৈল ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। উহার মূল্য কিছু অধিক। অতি পরিষ্কৃত, স্বচ্ছ, জলবৎ তরল, গন্ধ-হীন রেড়ীর তৈল পাওয়া যায়। এইরূপ উৎকৃষ্ট তিল তৈলও সুলভ। শেষোক্ত তিন প্রকার তৈলে বেশ কাজ চলিতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ "লাকা" তৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। লাকা তৈল অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা বিশুদ্ধ অলিভ তৈল (olive oil) ভিন্ন

আর কিছুই নহে। কোনরূপ জান্তব বা খনিজ তৈল মিশ্রিত থাকিলে আদৌ ভাল হয় না। অত্যুৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ তৈলে কোনরূপ গন্ধ থাকে না, কাজেই এই সমস্ত তৈলে পুষ্পের সৌরভ অতি শীঘ্র নিষিক্ত হইয়া যায়। ইহার পরে কতকগুলি তুলার কোমল গোলাকার "মুটি" প্রয়োজন। মুটিগুলি যেন অত্যধিক মোটা বা পাতলা না হয়। অতঃপর কতকগুলি প্রশস্ত মুখ পাত্র প্রয়োজন। পাত্রগুলি কাচের হইলেই ভাল হয়। ৪ ইঞ্চ প্রশস্ত মুখ ৭ ইঞ্চ লম্বা বোতলের মূল্যও অধিক নহে। তুলার মুটি গুলি যেন বোতলের মুখ দিয়া অনায়াসে প্রবেশ করান যাইতে পারে। কোনরূপ ধাতব তৈজসের সম্পর্ক না রাখাই ভাল। বহু সংখ্যক তুলার মুটি প্রস্তুত করিয়া রাখা ভাল। একটা এনামেল বা চীনা মাটীর গামলায় তৈল ঢালিয়া তাহাতে মুটীগুলি সিক্ত করিয়া লইতে হইবে। তৈলে মুটীগুলি রীতিমত ভিজিয়া যাওয়া প্রয়োজন। কাজেই তৈলের গামলায় মুটীগুলিকে কিয়ৎকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ইতি মধ্যে ফুলগুলিকে বাছিয়া ফেলা যাইতে পারে। ফুলগুলি একটি একটি করিয়া চালুনী হইতে তুলিয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হইবে। ফুলের গাত্রে কর্দ্দম বা ময়লা যেন লাগিয়া না থাকে। যদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্তগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে, ধুইয়া লইলে চলিবে না। ফুলের সহিত পাতা বা অন্য কিছু যেন আসিয়া না পড়ে। ফুলগুলি পাত্রান্তর করিবার সময় পাপ্‌ড়িগুলি যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। ধূলির ন্যায় চূর্ণ করিতে হইলে খানিকটা লবণের প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত মুখ বোতলগুলি রীতিমত পরিষ্কৃত থাকা আবশুক। যদি পরিষ্কৃত না থাকে, তবে সাবান দিয়া বা অন্য উপায়ে রীতিমত ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া জলহীন করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর একটি বোতলের তলায় সামান্য লবণ ছড়াইয়া দাও। সেই লবণের উপর এক স্তবক পুষ্প রক্ষা কর। তাহার উপর তৈলসিক্ত তুলার মুটি চাপাইয়া দাও, তাহার উপর আবার লবণ ছড়াইয়া দাও, তাহার উপর আর এক স্তবক ফুল চাপাইয়া দাও, তাহার উপর তৈল সিক্ত মুটি দাও, তাহার উপর আবার লবণ দাও, ইত্যাদি। এইরূপে বোতল পূর্ণ হইয়া যাইলে, অতি সামান্য চাপ প্রয়োগে আরও দুই এক স্তবক লবণ, ফুল ও মুটি চাপাইয়া বোতলটি মুটি ও ফুলে ঠাসিয়া ফেলিতে হইবে। ক্রয় করিবার সময় সেই সমস্ত প্রশস্ত মুখ বোতলের জন্য কাচের ছিপি পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ছিপির পাশ দিয়া প্রায়ই ফাঁক থাকে। সেই জন্য প্রথমে বোতলের মুখে আলগা করিয়া একখণ্ড কাগজ চাপা দিয়া তবে এই ছিপি আঁটিয়া দিতে হইবে,—অর্থাৎ বোতলের ভিতর যেন বায়ুর সংস্পর্শে না আসে। পার্চ্চমেণ্ট অথবা যে কাগজে তৈল লাগিলে কাগজ খারাপ হইয়া যায় না এইরূপ কাগজ হইলেই ভাল হয়। বোতল পূর্ণ করা হইয়া যাইলেই বোতলের মুখ বন্ধ করা দরকার। কেননা খোলা থাকিলে ভিতরের জিনিস খারাপ হইয়া যায়। এইবার বোতলগুলি এমন স্থানে রাখিতে হইবে, যেখানে এগুলি

সর্ব্বদা রৌদ্র পায়। ফলতঃ বোতলে যত রৌদ্র লাগিবে, ফলও ততই ভাল হইবে। যদি এরূপ স্থানের নিতান্তই অভাব হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত,রৌদ্রের নিকট-বর্ত্তী কোন স্থানে রাখিলেও চলিতে পারে। এইরূপে বোতলগুলিকে নিম্ন পক্ষে দশ, উর্দ্ধ পক্ষে একপক্ষ রাখা প্রয়োজন। এই সময়ের পরে বোতলগুলির ছিপি খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং বোতলের মুখে শুভ্র পুরাণ ছিন্ন উড়ানী খণ্ড বা কোনরূপ পরিস্কৃত পাতলা ন্যাকড়া বাঁধিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইতে হইবে। ছাঁকিবার পূর্ব্বে হাতা বা চামচের দ্বারা ফুটিগুলি টিপিয়া তৈল নিঙ্গাড়াইয়া ফেলিতে হইবে। দেখিবে এই তৈল মনোরম সৌরভময় হইয়া উঠিয়াছে। অকৃত্রিম পুষ্প গন্ধে মন বাস্তবিকই তখন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তবে ফুলের গন্ধ যদি ক্ষীণ হয়, তবে তৈল গন্ধও অতি ক্ষীণ হইবে। বাজারে যে সমস্ত সুগন্ধী তৈল পাওয়া যায় তাহাদের অপেক্ষা এই সমস্ত গৃহে প্রস্তুত তৈলের গন্ধ অধিকতর কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। তৈল বাহির করিয়া লইয়া বোতলে বেশ রীতিমত ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। সময়ে সময়ে দুই তিন প্রকারের পুষ্প মিশ্রিত করিয়া তৈল সুগন্ধ করা যায়। কিন্তু কোন্ ফুলের সহিত কোন্ ফুল মিশিতে পারে, এবং কোন্ ফুলের কোন্ পরিমাণ মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত সমস্ত ফুলের গন্ধ সমান ভাবে থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। পুষ্পের সহিত কোন কোন পদার্থ মিশাইয়া দিলে আরও অধিকতর সুগন্ধ হয়। অনেকে পুষ্পের সহিত লবঙ্গ মিশাইয়া দেন; তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে তৈলের গন্ধ বাস্তবিকই অতি মনোহর হইয়া উঠে। তৈল গন্ধময় হইবার পরেই ব্যবহার করা উচিত নহে। অন্ততঃ এক সপ্তাহ রাখিয়া ব্যবহার করিলে দেখা যায় যে, তৈলের গন্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সময়ে সময়ে এরূপ হয় (অথবা প্রায়ই হয়) যে, তৈল বোতল হইতে ছাঁকিয়া লইবার সময় বেশ গন্ধ ছিল, কিন্তু ৭।৮ দিন পরে ব্যবহার করিবার সময় গন্ধ হয় একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, বা অতি সামান্য আছে। কিন্তু গন্ধের এরূপ তিরোধান সাময়িক মাত্র। আর ২।৪ দিন অপেক্ষা করিলেই দেখা যায় যে, গন্ধ দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার কারণ কি আজও পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। তৈলের শিশির ছিপি আদৌ খুলিয়া রাখা উচিত নহে। ব্যবহার করিবার পরেই ছিপি আঁটিয়া রাখা ভাল। নতুবা অনেক সময়ে গন্ধ হ্রাস হয় এবং অনেক কাল থাকে না।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

অণু।

যে সমস্ত ক্ষুদ্র বস্তু কেবল চক্ষু সাহায্যে দর্শনীয় নহে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য লইয়া থাকি। এই যন্ত্র সহায়তায় আমরা মানবের পরিচিত চেতন বা অচেতন উভয়বিধ পদার্থের প্রায় প্রত্যেকেরই আভ্যন্তরিক অতি সূক্ষ্ম গঠন প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। বস্তুতঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শনৈঃ শনৈঃ প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

পদার্থের অণু ও পরমাণু কিরূপ তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কোন পদার্থকে বিভাগ করিতে করিতে যখন বিভক্ত পদার্থ এত ক্ষুদ্র হইয়া উঠে যে, আর বিভাগ করা যায় না, তখন সেই ক্ষুদ্রতম কণাকে আমরা অণু বলি। অণু দুই বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা সংগঠিত হইলেও অণুকে আর বিভাগ করা অসম্ভব। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, এবং শক্তি ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতও হইতেছে সত্য, তথাপি অণু লক্ষ্য হইতে পারে এরূপ শক্তিসম্পন্ন অণুবীক্ষণ কখনও আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। সম্প্রতি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে পেরিণ অন্য এক উপায়ে অণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রায় ২৫ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অতি শৈশবাবস্থায় কয়েকজন পণ্ডিত কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন যে, পদার্থ মাত্রেই অবিনশ্বর য়্যাটম (atom=পরমাণু) বিনির্ম্মিত, এবং সমস্ত য়্যাটম নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল। তাঁহাদের এই উপপত্তি (theory) প্রমাণ করিবার কোনরূপ উপায় ছিল না, কিন্তু মনে হয়, তাঁহারা স্বাভাবিক জ্ঞানবশতঃই এরূপ সত্য কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন।

এই গ্রীক সভ্যতা উন্মেষের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু ঋষিগণও পদার্থের শেষ পরিণতি অণু-পরমাণু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারাও অণু-পরমাণুকে চলিষ্ণু বলিয়া মনে করিতেন। গ্রীকগণ পদার্থের শেষ পরিণতি য়্যাটম্ বা পরমাণু মনে করিতেন, অর্থাৎ য়্যাটম্ পৃথক ভাবে থাকিতে পারে এরূপ কল্পনা করিতেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ তাহা মনে করিতেন না; তাঁহারা বলিতেন, "পরমাণু নিত্যা ও অনিত্যা; ইহার মধ্যে অণুলক্ষণা নিত্যা। অর্থাৎ পরমাণু থাকিলেও, পরমাণু পৃথক থাকিতে পারে না—কাজেই অনিত্য; কিন্তু অণু (molecule) অর্থাৎ দুই বা ততোধিক পরমাণুর একত্রে অস্তিত্ব সম্ভব—কাজেই নিত্য।

নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যাস্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥
ভাষাপরি।

বর্ত্তমানেও বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

গ্রীকগণের এই আণবিক কল্পনাও পাশ্চাত্য দেশে ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। পুনরায় প্রায় ২,০০০ বর্ষ পরে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ভিত্তি-ভূমী, অর্থাৎ পদার্থের মৌলিক গঠন প্রণালী প্রাচীন গ্রীক উপপত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিকই অণুর আকৃতি বা প্রকৃতি কিরূপ বা তাহাদের গতিরই বা কিরূপ প্রকৃতি তাহা পরীক্ষা করিবার উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। যদি কোন ব্যক্তি অতি দূর হইতে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, সমুদ্র গম্ভীর, নিশ্চল ও নিষ্কম্প; তাহাতে তরঙ্গের বিন্দুমাত্রও সমাবেশ নাই। কিন্তু যদি তৎক্ষণাৎ একটি অর্ণবপোত অসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার আলোড়ন বিলোড়নে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন যে, সমুদ্র নিষ্কম্প নহে, পরন্ত তরঙ্গ-সমাকুল। সেইরূপ আমরা অতিদূর হইতে দেখিবার প্রয়াস পাইতেছি বলিয়াই অণুর অন্দোলন বা গতি অথবা আকৃতি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এইরূপ কোন একটা উপায় অবলম্বন করিয়াই অধ্যাপক পেরিণ আণবিক প্রকৃতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যদি একটি বর্ত্তুলাকার পদার্থ জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, সেই পদার্থটি জলের তলদেশে উপস্থিত হইবে। কিন্তু পদার্থের ব্যাস অল্প হইলে, জলের তলদেশে উপস্থিত হইবার জন্য পদার্থের গতিও তত অল্প হইবে। যদি কোন তরল পদার্থে ভাসমান অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ কণা গুলিকে অণুবীক্ষণ সহযোগে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, তাহারা ডুবিয়াও যাইতেছে না, বা ভাসিয়াও উঠিতেছে না; পরন্ত তাহাদের গতি যেন একরূপ অনিয়ন্ত্রিত ভাবাপন্ন। যদি পদার্থ-গুলির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে মনে হইবে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবিত পদার্থের রাজত্ব দেখিতেছি। আর তাহারা ক্রমাগত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। পেরিণের মতে প্রত্যেক পদার্থ-কণিকা ঠিক এক একটি প্রকাণ্ডকায় অণুর ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। কাজেই বায়বীয় পদার্থ যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত ইহারাও ঠিক সেইরূপ।

প্রায় প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, পর্ব্বত প্রদেশের বায়ুমণ্ডল সমুদ্র-তীরের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা তরলতর; অর্থাৎ সমুদ্রের বাতাস ঘন এবং পাহাড়ের বাতাস অল্প ঘন। ইহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, একটা সুদীর্ঘ বাতাসের স্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিলে, নিম্নের বাতাস উর্দ্ধের বাতাসের ভারে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। কাজেই যতই উর্দ্ধে গমন করা যাইবে বাতাসও তত অল্প ঘন হইতে থাকিবে। যদি বায়ুমণ্ডলের কোন স্থানের ঘনত্বকে ০ ধরা হয়, তাহা হইলে বায়ুর ঘনত্বের নিয়ম এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে— "০ ঘনত্ব হইতে বায়ুর উচ্চতার দূরত্ব সমান্তর-শ্রেঢ়ী (arithmetical progression) হারে বৃদ্ধি পাইলে, উহার ঘনত্ব সমগুণ-শ্রেঢ়ী (geometrical progression) হারে কমিতে

থাকে।" সাধারণ তাপমাত্রার প্রতি ৬ কিলোমিটারে (৩·৭ মাইল) বায়ু-মণ্ডলের ঘনত্ব অর্দ্ধেক হ্রাস পায়। কিন্তু বায়বীয় পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে উহার ঘনত্ব হ্রাস হইয়া থাকে। যদি বায়ুমণ্ডল কেবল মাত্র অক্‌সিজেনে গঠিত হইত, তাহা হইলে ০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপ মাত্রায় ৫ কিলোমিটার (৩ মাইল) গমন করিলেই উহার ঘনত্ব অর্দ্ধেক হইত। আবার হাইড্রোজেন, অক্‌সিজেন অপেক্ষা ১৬ গুণ লঘু বলিয়া কেবল হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডল, অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা ১৬ গুণ উর্দ্ধে উঠিলে, তবে ইহার ঘনত্বের অর্দ্ধেক হ্রাস পাইত। ইহা হইতে ইহাই সূচিত হয় যে, আণবিক গুরুত্বের বি-সম অনুপাতে দূরত্বের বৃদ্ধি হয়। পেরিনের মতে, জলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি ভাসিতে থাকে, সেই জলটিকে একটা বায়ুমণ্ডলের ন্যায় কল্পনা করা যাইতে পারে।

পেরিন নানারূপ তরল-পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করেন। তাহার একটিতে দেখিতে পান যে, তাহার ঘনত্বের পরিমাণ অর্দ্ধেক হইলে, ১ মিলিমিটারের ৫০০ ভাগের ১ ভাগ উচ্চ হইয়াছিল। যদিও এই তরল-পদার্থে ভাসমান প্রত্যেক পদার্থগুলির ব্যাস ১ মিলিমিটারের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও অল্পতর, তথাপি প্রত্যেকটির ভার অক্‌সিজেনের এক অণুর ভার অপেক্ষা দশ কোটিগুণ অধিকতর। কাজেই অক্‌সিজেনের অণুর ভার অনায়াসে স্থির করা যাইতে পারে। এইরূপে অণু-পরমাণুর অস্তিত্বও অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। শ্রীপঞ্চানন সরকার।

প্রকাণ্ড অতিকায় হস্তী।

এক সময়ে পৃথিবী অতিকায় হস্তীতে পূর্ণ ছিল, বর্ত্তমানে তাহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে। তবে তাহাদের অস্থি-পঞ্জরাদি প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে ষ্টাটগার্ট নগরের যাদুঘরে (Museum) একটি প্রকাণ্ড অতিকায় হস্তীর পঞ্জর রক্ষিত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন যে, আজ পর্য্যন্ত যত অতিকায় হস্তীর অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই নবাবিষ্কৃত অতিকায় হস্তীই বৃহত্তম। এই যাদুঘরের পরিচালক ডাক্তার এবারহার্ড ফ্রাস বার্লিনের একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই হস্তি-সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণী প্রকাশিত করিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যে প্রাচীন-জীবজন্তুর ইতিহাস-অভিজ্ঞ যে সমস্ত পণ্ডিত রহিয়াছেন, ফ্রাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আমেরিকা মহাদেশেও সুপরিচিত, কেননা, তিনি এই প্রাচীন-জীবজন্তু-বিষয়ে শিক্ষার কিয়দংশ আমেরিকায় লাভ করিয়াছিলেন। এই অতিকায় হস্তী "নেকার" নামক নদীর "মার" নামক উপনদীর বালুকা ও প্রস্তর-স্তূপে আবি-

কৃত হইয়াছে। এই স্থান প্রস্তরীভূত জীবজন্তুর অস্থি-কঙ্কালের জন্য বিখ্যাত। গত ১৯১০ সালের আগষ্ট মাসে কয়েক খণ্ড অস্থি পাওয়া যায়; পরে অতি যত্নের সহিত ক্রমে ক্রমে সমস্ত কঙ্কাল খনন করা হইয়াছে। অস্থিগুলি এত অধিক চূর্ণতা-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদিগকে পুনরায় প্যারিসপ্ল্যাষ্টার সহযোগে দৃঢ় করিয়া ও লৌহ-দণ্ডের ঠেস দিয়া তবে উত্তোলন করা সম্ভব হইয়াছিল। পরে অতি ধীরতার সহিত সমস্ত অস্থি-কঙ্কাল ষ্টাটগার্টে আনীত হইয়াছিল। এই হস্তীর মস্তকের খুলীর ভারই প্রায় ২১ মণ। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সমস্ত কঙ্কাল বাহিত হইয়াছিল। অতঃপর প্রস্তর হইতে অস্থিগুলিকে নির্ম্মুক্ত করা, রাসায়নিক আরকাদি প্রয়োগে অস্থিগুলিকে দৃঢ় করা, এবং ভগ্ন অংশগুলিকে মেরামত করা ইত্যাদি কার্য্যেই কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া যায়। অবশেষে ডিসেম্বর মাস হইতে অস্থিগুলিকে সংযোজিত করিতে আরম্ভ করা হয়। প্রকাণ্ড লৌহদণ্ডকে সমকোণে বক্র করিয়া হাঁড়গুলিকে ঠেস দেওয়া হয়, প্রকাণ্ড মঞ্চ উত্তোলন করিয়া হাড়গুলিকে যথা স্থানে সন্নিবিষ্ট করা হয়; এইরূপে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ অনবরত পরিশ্রম করিয়া তবে অস্থিখণ্ডগুলি যথাযথ স্থানে সংযোজিত হইয়াছে। ইহার দন্তের দৈর্ঘ্য ৭ ফিট। এই প্রকাণ্ড অতিকায় হস্তীর উচ্চতা ১৩ ফিট।

পৃথিবীতে একবারেই মানব সৃষ্ট হয় নাই। প্রথমে তৃণ, লতা, উদ্ভিদাদি, পরে জীব-জন্তু এবং ক্রমে ক্রমে মানব সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ইতর-জীব যুগে, অতিকায় হস্তীই বিশেষ বিখ্যাত। অতিকায় হস্তীর ন্যায় সমসাময়িক বহুশত জীব ছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ-স্বরূপ অস্থিকঙ্কাল চিহ্ন প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু অতিকায় হস্তীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দন্ত, বিশাল অস্থিপঞ্জর ভূরি ভূরি নিহিত রহিয়াছে। মানব সৃষ্ট হইবার পরেই জ্ঞান লাভ করিয়া একবারে আধুনিক মানবের মত ছিল না। মানবের জ্ঞান উন্মেষের প্রথম কালে অর্থাৎ যে সময়ে পূর্ণ-বর্ব্বর মানব ধাতব পদার্থের ব্যবহার জানিত না, অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিত না, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তরখণ্ড লইয়া তৎকালীন অতিকায় হস্তীর ন্যায় বিশাল-দেহ ইতর-জীবের সহিত সংগ্রাম করিত, সেই যুগের মানবও প্রস্তরের উপর জীব দেহ অঙ্কিত করিত; এখনও সেই সমস্ত প্রস্তর পাওয়া যায়। এই প্রস্তরগুলি এই বিপুলকায় হস্তি সমূহের বহুসংখ্যকত্বের পরিচায়ক। কেননা লোকে প্রথমে যে জিনিষ সর্ব্বদা দেখে, তাহা চিত্রিত করিতে চেষ্টা করে। জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ বরফে চাপা থাকিলে পচিয়া নষ্ট হয় না। মৎস্যাদি দূর দেশে প্রেরিত হইলে বরফে চাপা দিয়া প্রেরিত হয়। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান সমান উত্তপ্ত নহে, সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহ চির-নীহারে সমাচ্ছন্ন। সেই সমস্ত স্থানে প্রাচীন মৃত-জীব সমূহ এরূপ ভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের গাত্র-লোম পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত জীব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই সমস্ত হস্তীর অবয়ব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

লোমে আবৃত ছিল এবং ইউরোপ, আমেরিকা, উত্তর এসিয়ায় দলে দলে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব ছিল যে, ইহাদের দন্তগুলি একটা পাক খাইয়া ভিতরের দিকে গুটাইয়া থাকিত এবং দৈর্ঘ্যে সময়ে সময়ে ১৩ ফিটেরও অধিক হইত। এই সমস্ত দন্তের প্রকাণ্ডতা দেখিয়া এরূপ ধারণা স্বতঃই আসিয়া পড়ে যে, এই হস্তিগুলি আধুনিক হস্তী অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ ও প্রকাণ্ড ছিল। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে. আজ কাল যেরূপ আফ্রিকা দেশীয় হস্তি-সমূহের মধ্যে এক একটা প্রকাণ্ড হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সেই সময়েও কখনও কখনও এক একটা বিপুলকায় হস্তী পাওয়া যাইত। অধিকাংশ হস্তীই আধুনিক হস্তীর সমান ছিল। হস্তীর দন্ত দীর্ঘ, স্থূল, এবং ভারী; হস্তিনীর কৃশ, খর্ব্ব, ও অল্প ভারী। অতিকায় হস্তীর কঙ্কালের অভাব নাই। জার্ম্মানী এবং সাইবিরিয়ায় প্রচুর বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ সাইবিরিয়ায় ইহা একটি প্রধান ব্যবসায়ের দ্রব্য বলিয়া গণ্য। ষ্টাটগার্টের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ গত দুই শত বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত অস্থি কঙ্কালের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই স্থানে পূর্ব্বে কখনও একটা হস্তীর পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। তবে বর্ত্তমানের এই কঙ্কাল-পুঞ্জ, পূর্ব্ব উত্তোলিত সমস্ত কঙ্কালপুঞ্জ অপেক্ষা বৃহত্তম। এই জীবটির পদ চতুষ্টয় সুদীর্ঘ, এবং আমরা যে সমস্ত অতিকায় হস্তীর অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছি ও যে যুগে তাহারা বর্ত্তমান ছিল, এই হস্তীটিকে সেই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের জীব বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত অতিকায় হস্তীর দন্তদ্বয় যেরূপ কুশ্রী, ইহার সেরূপ নহে, ইহার দন্তদ্বয় বেশ সুডৌল ভাবে অর্দ্ধ গোলাকার হইয়া বক্র হইয়াছে এবং শেষভাগ বৃত্তের কেন্দ্রাভিমুখী। হস্তীর শরীর খর্ব্ব, কিন্তু পরিপুষ্ট। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইহার পদচতুষ্টয় সুদীর্ঘ। পদের উপরের অংশ প্রায় ৪$\frac{১}{২}$ ফিট। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই হস্তী বেশ দ্রুত দৌড়াইতে পারিত, এবং তৎকালীন ক্ষীপ্র জীবের সমতুল্য ছিল।

এই হস্তী-যুগে মানবের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা, বা ইহারা মানবের কখনও সংস্পর্শে আসিয়াছিল কিনা তাহার স্থিরতা নাই। কেননা এই হস্তীর উৎপত্তির যুগ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে মানব উৎপত্তির বা যে যুগে মানবের প্রস্তরাদিই আত্মরক্ষার অস্ত্র-স্বরূপ ছিল, সেই যুগের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। খুব সম্ভবতঃ এই সমস্ত হস্তী ২,০০,০০০ বা ৩,০০,০০০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে বিচরণ করিত।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম।

পৃথিবীর জীবনে যে সমস্ত যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনায়াসে সেই গুলির আবৃত্তি করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন যে, ইতিহাসে যেমন সমস্ত বিষয়ের একটা শৃঙ্খলা রহিয়াছে, সেইরূপ পৃথিবীর যুগের পরিবর্ত্তনে ও আগমনেও সেইরূপ একটা সুনিয়ম রহিয়াছে। তবে এই সমস্ত যুগের বাৎসরিক কাল পরিমাণ কত, তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বলিতে সক্ষম নহেন। এই কাল-পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য নানারূপ চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ফরাসী দেশের জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের সভায় বসলার নামক একজন পণ্ডিত এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সূর্য্যের কি পরিমাণ উত্তাপ ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে, তাহা লইয়াই তিনি প্রথমে আলোচনা করেন। কোন পদার্থ সঙ্কুচিত হইলে সঙ্কুচিত হইবার সময় একটা শক্তির বিকাশ হয়। মহাকর্ষণের প্রভাব বশতঃ সূর্য্যের আয়তন সঙ্কুচিত হইতেছে এবং এই সঙ্কোচের ফলে যে শক্তি বিকশিত হইতেছে, সেই শক্তি হইতেই সূর্য্যের উত্তাপ উদ্ভূত হইতেছে, এই অভিমত সত্য হইলে সূর্য্য যে হারে বর্ত্তমানে উত্তাপ বিকীরণ করিতেছে, সেই হারে ভবিষ্যতেও বিকীরণ করিলে, ভবিষ্যতে আর ঊর্দ্ধ-সংখ্যায় দুই কোটি বৎসর সূর্য্য আমাদিগকে উত্তাপ প্রদান করিতে পারে। পৃথিবীতে বর্ত্তমান জীব জন্তুর অস্তিত্বের সম্ভব হইবার একমাত্র কারণ সূর্য্যোত্তাপ। অথবা এই সূর্য্যোত্তাপেই পৃথিবী জীবিত রহিয়াছে। যদি সূর্য্যোত্তাপ নির্ব্বাপিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীও নির্জ্জীব হইবে। বর্ত্তমানে মানবের যেরূপ জ্ঞান উন্নত হইয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, সূর্য্যোত্তাপ উৎপত্তির এই অভিমত আদৌ সমর্থন যোগ্য নহে। কেননা আমরা জানিতেছি যে, সূর্য্যের উত্তাপের প্রধানতম কারণ র‍্যাডিওয়্যাক্‌টিভ্ (radioactive) প্রণালী। আবার এই প্রণালীতে সূর্য্য কতটুকু উত্তাপ পাইয়া থাকে বা লব্ধ উত্তাপের কতটুকু ব্যয়িত হয়, তাহার স্থির হয় নাই। কাজেই সূর্য্যোত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি ধরিয়া পৃথিবীর বয়ঃক্রম অনুমানের চেষ্টা করা বৃথা। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর স্তরের স্থূলত্বের পরিমাণ করিয়া পৃথিবীর বয়ঃক্রম অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে সমুদ্রাদি প্রতি শতাব্দীতে যে স্তর উৎপাদন করে, তাহার গভীরতা প্রায় ২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চ মাত্র। এখন দেখা যাউক পৃথিবীর এইরূপ স্তরের গভীরতা কত? এই গভীরতা প্রায় ৫০ মাইল। তাহা হইলে পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় ৮,০০,০০,০০০ অষ্ট কোটি বৎসর।

ডবলনি নগরের অধ্যাপক জলি অন্য উপায়ে পৃথিবীর বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণে চেষ্টা করিয়াছেন। সমুদ্রের জল লবণাক্ত। এই লবণের ভাগ প্রতি বৎসরেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পর্ব্বতাদির উপর বৃষ্টির জল পতিত হইলে প্রস্তরের লবণ-উপাদান জলে

বিগলিত হয়, তাহার শতকরা হিসাব করা হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, ১০,০০,০০,০০০ দশ কোটী বৎসর এইরূপে লবণ বাহিত হইলে তবে সমুদ্রের জল বর্ত্তমানের ন্যায় লবণাক্ত হইতে পারে। সমুদ্রে যত লবণ রহিয়াছে, সেই লবণ উদ্ধার করিতে পারিলে সমস্ত ভূভাগ ২৯৩ ফিট উচ্চ করিয়া লবণ রাশি দ্বারা আবৃত করা যায়।

বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি অন্য আর একটি উপায়ে পৃথিবীর বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণে চেষ্টা করিতেছেন। তাহা র‍্যাডিওঅ্যাকটিভ (radioactive) ব্যাপার। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সমস্ত র‍্যাডিওঅ্যাকটিভ প্রস্তর রহিয়াছে, পণ্ডিতগণ তাহাদের গ্যাসের পরিমাণ শতকরা হিসাবে পরীক্ষা করিয়াছেন। র‍্যাডিয়াম, ইউরেনিয়াম্ এবং অন্যান্য র‍্যাডিওঅ্যাকটিভ পদার্থের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে। সেই হইতে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়। এই হিলিয়ামের কিয়দংশ পাহাড়ে থাকিয়া যায়। যে র‍্যাডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ প্রস্তরে বর্ত্তমান থাকে, তাহার পরিমাণ অনুসারে, প্রস্তরের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শতকরা হারে হিলিয়ামের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ইহা হইতে পৃথিবীর বয়সের একটা পরিমাণ হইতে পারে বটে, কিন্তু হিলিয়াম এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ এবং ছড়াইয়া পড়িয়া নিঃসারিত হইয়া যাইতে পারে। কাজেই এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারিত হইলে অনেক অল্প হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক এই হিসাবেই পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী অল্প দূর দেশের প্রস্তরের বয়ক্রম ৮০,০০,০০০ বৎসর, ইওসিন নামক যুগের প্রস্তরের বয়স ৩,০০,০০,০০০ বৎসর, অঙ্গার উৎপাদক যুগের প্রস্তরের বয়স ১৫,০০,০০,০০০ বৎসর, আর্চ্চিয়ান যুগের প্রস্তরের বয়স ৭১,০০,০০,০০০ বৎসর। যাহাই হউক এইরূপ ভাবে পরীক্ষা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবার বয়স সহস্র সহস্র কোটি বৎসর।

রসনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

মুখ গহ্বরস্থিত আস্বাদের স্নায়ু-সমূহ উদ্রিক্ত হইলে, আমাদের যে একটা বিশেষ অনুভূতি হয়, তাহাকেই আমরা আস্বাদ বলিয়া থাকি। প্রায় সমস্ত ঘড়ি যেরূপ একই সময় নির্দ্দেশ করিতে পারে না, সেইরূপ প্রায় সমস্ত লোকেরই আস্বাদের পূর্ণতা বা তীক্ষ্ণতা সমান হইতে পারে না। আস্বাদের স্নায়ু-সমূহ রসনার পার্শ্বদ্বয়ে, অগ্রভাগে, এবং পশ্চাৎদিকের উপরিভাগের প্রায় সমস্ত অংশেই পরিব্যাপ্ত থাকে। তালুর কোমল অংশে, বিশেষতঃ "আল জিহ্বার" নিকটবর্ত্তী অংশে (কিন্তু আল জিহ্বায় নহে), তালুর পার্শ্বদ্বয়ের গলদেশ-অভিমুখি-স্থান সমূহে, এবং খাদ্য-প্রবেশ-কালে বায়ুনলীতে খাদ্য প্রবেশ পথ বন্ধ করিবার যে আবরণ (epiglottis) আছে তাহাতে এবং গলনালীতেও আস্বাদের স্নায়ু-সমূহ পরিব্যাপ্ত থাকে। শৈশবাবস্থায় কস'এর দুই পার্শ্বে, তালুর

কঠিন অংশে, জিহ্বার উপরিভাগের সমস্ত অংশে এই সমস্ত স্নায়ু বর্ত্তমান থাকে। বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনের শক্তি অল্প পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে কেননা স্বাদ-স্নায়ু শক্তি-হীন বা মৃত হইয়া যায়, এবং জীবনের, অবসানের পুর্ব্বে স্বাদ-শক্তি প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। খাদ্যের অবস্থা এক হইলেও বৃদ্ধগণ খাদ্যের আস্বাদ যেরূপভাবে পায়, যুবকগণ বা অল্প বয়স্কগণ তাহা অপেক্ষা অধিকতররূপে পাইয়া থাকে। রসনার শক্তির ব্যক্তিগত পার্থক্যের সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পার্থক্যের সম্পর্ক থাকিলেও একটি প্রধান বিষয়ে এই দুইটির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক লোকের জন্ম হইতেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি থাকে না। কিন্তু রসনার সম্পূর্ণ শক্তিহীনতা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সদ্যঃজাত শিশু অপুর্ণ বলিয়া তাহার মস্তিষ্ক থাকে না, বা থাকিলেও তাহার শক্তি বা ক্রিয়াশীলতা আদৌ গণ্য নহে। কিন্তু শিশু আস্বাদ-জ্ঞানশূন্য হয় না। বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্য শিশুর মুখে দিলে শিশুর মুখ বিকৃতি বা মুখ ভঙ্গি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যে শিশু খাদ্যের আস্বাদ উপলব্ধি করিতেছে। জন্মকালেও মানব আস্বাদ হীন থাকে না, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, রসনা বা আস্বাদ-ইন্দ্রিয় জীবনরক্ষার জন্য কিরূপ প্রয়োজনীয়। অবশ্য নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা খাদ্য সর্ব্ব প্রথমে এবং মোটামুটি রকমে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু জিহ্বাই খাদ্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের চরম পরীক্ষক। পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে সমস্ত স্নায়ুদ্বারা আস্বাদ শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করে। ইহাদের একটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ কর্ণের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইয়াছে। যদি কোন পীড়া বশতঃ কর্ণ স্ফীত হয় বা কর্ণে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে জিহ্বার সেই দিকের আস্বাদ শক্তিও হ্রাস পাইয়া থাকে। সুমধুর আস্বাদে পুর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিগণের জিহ্বা লালায় পুর্ণ হইয়া যায়। চর্ব্বণ করিবার সময় এই লালা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঝাল বা জিহ্বার চর্ম্মের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল (চুণ জাতীয়) পদার্থ জিহ্বার সংস্পর্শে আসিলেও জিহ্বা হইতে লালা বহির্গত হইতে থাকে। মধুর আস্বাদে যে লালা বহির্গত হয়, তাহাদ্বারা খাদ্য পরিপাক করিবার প্রাথমিক বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু তীব্র, কটু বা জিহ্বা দগ্ধ হইয়া যায়, এরূপ আস্বাদে যে লালা বহির্গত হয়, তাহা তীব্র পদার্থের প্রতি-ক্রিয়াকে আরও ক্ষীণ শক্তি করিয়া তুলে, এবং সেই লালা উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেনা বরং স্বতঃই নিষ্ঠীবনের আকারে বাহির করিয়া ফেলিবার বাসনা উদ্রিক্ত করে। মিষ্ট আস্বাদ পাইলে শিশুর শোষণ করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হয়, এবং তিক্ত, অম্ল বা লবণাক্ত আস্বাদে ঐ প্রবৃত্তি খর্ব্ব হইয়া থাকে। আস্বাদের সহিত শিশুর শ্বাস প্রশ্বাসেরও সম্বন্ধ রহিয়াছে। এরূপ সম্বন্ধ পুর্ণ বয়স্কগণের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল জাগ্রত অবস্থায় নহে, নিদ্রিত অবস্থাতেও আস্বাদের ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের উপরের কার্য্য করে। বস্তুতঃ হিপ্‌নটাইজ করিলে সময়ে সময়ে লোকে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ নিদ্রিতের ন্যায়

থাকিলেও বা মানসিক বিকৃতি বশতঃ নিদ্রিতের ন্যায় কার্য্য করিলেও আস্বাদের ক্রিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। জিহ্বার সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটায় পূর্ণ। তালুতে ঘর্ষণ করিলে জিহ্বা সমতল বা মসৃণ বোধ না হইবার কারণই ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টক-সমূহ। আস্বাদের স্নায়ুসমূহ এই কাঁটায় শেষ হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকগুলির অভ্যন্তরে আণবিক প্রকোষ্ঠ (cells) রহিয়াছে। আস্বাদের আণবিক প্রকোষ্ঠগুলিও (taste cells) ইহাতে নিবিষ্ট থাকে। আস্বাদস্নায়ুর প্রান্ত-ভাগ দীর্ঘ সূত্রের ন্যায়, এবং আস্বাদু প্রকোষ্ঠের চারিদিকে জড়াইয়া থাকে। কাঁটা গুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ, কাজেই দুই কাঁটার মধ্যবর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন, অর্থাৎ এই কাঁটাগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিখায় পূর্ণ। মধুর আস্বাদের খাদ্য এই পরিখায় আসিয়া পড়ে; এবং কাঁটাগুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে বলিয়া শীঘ্র সরিয়া যাইতে পারেনা। কাজেই খাদ্য অল্পক্ষণ এই পরীখায় পড়িয়া থাকে, এবং স্নায়ুসমূহ এই সমস্ত খাদ্যের আস্বাদ ভাল করিয়া গ্রহণ করিবার সুবিধা পায়। এইরূপ বন্দোবস্ত আস্বাদ গ্রহণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে যে সমস্ত খাদ্য উত্তেজক, তাহা জিহ্বায় পতিত হইবা মাত্র প্রচুর লালা নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ ধৌত হইয়া যাইত। কোন এক আস্বাদের খাদ্য মুখে দিবার পরে, সেই আস্বাদের খাদ্য জিহ্বার পরিখা হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত না করিয়া মুখে অন্য আস্বাদের খাদ্য দিলে আমরা দ্বিতীয় খাদ্যের আস্বাদ ভালরূপ বুঝিতে পারিনা। সেই জন্য কুলি করিবার সময় জিহ্বা রীতিমত আলোড়ন আবশ্যক। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ পৃথক। অন্য গন্ধ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকিলেও একটা বিশেষ গন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ বেশ গ্রহণ করা যায়। একটা মিশ্রিত পদার্থে বিভিন্ন দ্রব্যের গন্ধ বুঝিতে পারা অসম্ভব নহে।

দ্রব্য দ্রবীভূত না হইলে আমরা কিছুতেই আস্বাদ পাইনা। যে পদার্থ মুখের লালায় দ্রবীভূত না হয়, যেমন কাচ, হীরক ইত্যাদি, সেই পদার্থ মুখে দিলে কোনরূপ আস্বাদ পাওয়া যায় না। এমন কি বায়বীয় পদার্থও লালায় দ্রবীভূত না হইলে তাহাদের আস্বাদ পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণতঃ ৪ প্রকার আস্বাদ অবগত আছি। মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত এবং লবণাক্ত। বৈজ্ঞানিকগণ আরও দুই প্রকার আস্বাদ গ্রহণে দক্ষ— ধাতব এবং ক্ষার জাতীয়। কেহ কেহ বলেন লবণ এবং অম্ল, আস্বাদের উপযুক্ত নহে। কেননা তাহারা তীব্র এবং জিহ্বা ঝলসাইয়া যায়। তাঁহাদের মতে উক্ত দ্রব্যদ্বয় জিহ্বায় পতিত হইলে আস্বাদ গৃহীত হয় না, তাহারা জিহ্বা স্পর্শ করিলেই জ্বালা করে। এখানে জিহ্বার ত্বক স্পর্শেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, জিহ্বার স্পর্শ-শক্তির সহিত আস্বাদ গ্রহণ শক্তি একযোগে কার্য্য করে। কিন্তু এ অভিমত তত যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও, যে সমস্ত পদার্থ লাগিলে জিহ্বা ঝলসাইয়া যায়, সেই সমস্ত জিনিষের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

অনেকেই ধাতব পদার্থের আস্বাদ কিরূপ তাহা জানেন না। একখণ্ড লৌহ অথবা তাম্র অথবা পিত্তল মুখে দিলে, একটা বিশেষ আস্বাদের অনুভূতি হয়। তাহাই ধাতব আস্বাদ। ইহা মিষ্ট এবং অম্লের মিশ্রণ। তৈল, সুগন্ধ, ঝাল, কষায় ইত্যাদির আস্বাদ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় এবং উত্তাপ এই তিনের একযোগে প্রতিক্রিয়ার ফল। যে সমস্ত কারণে কষায় আস্বাদ পাওয়া যায়, অম্ল তাহার একটি কারণ। অনেক সময়ে শিশুগণ লবণ এবং অম্ল আস্বাদের গোলমাল করে, উভয়কেই অম্ল বলিয়া মনে করে।

মিষ্ট আস্বাদ প্রধানতঃ জিহ্বার উপরিভাগ হইতে এবং তিক্ত আস্বাদ নিম্ন ভাগ হইতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে জিহ্বার উপরে যে আস্বাদ-নির্ব্বাচক কাঁটার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সমস্ত কাঁটায় আস্বাদ স্নায়ু শেষ হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলি বিভিন্ন বিভিন্ন আস্বাদ এবং কতকগুলি সমস্ত আস্বাদই গ্রহণ করে। ১২৫টি কাঁটার মধ্যে ২৭টি কিছুই করে না। অবশিষ্ট ৯৮টির মধ্যে কতকগুলি কোন্ কোন্ পদার্থের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

টারটারিক দ্রাবকের	আস্বাদ	৯৮ কাটা (সমস্ত কাঁটাই)	গ্রহণ করে।
চিনির	”	৭৯ ”	”
কুইনাইন	”	৭১ ”	”

অত্যন্ত অল্প পরিমাণ জিনিষের আস্বাদ পাওয়া যায় না; কোন্ জিনিষের কতটুকু পরিমাণ মুখে দিলে আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহা লিখিত হইল।

চিনি	৩ হইতে ৫৮	মিলিগ্রাম।
লবণ	১ হইতে ৩৬	”
সালফিউরিক দ্রাবক	০·৪	”
কুইনিন হাইড্রোক্লোরাইড ...	০·০৪	”
ষ্ট্রিক্‌নিন্ সালফেট	০·০০৫	”

লবণাক্ত পদার্থের আস্বাদ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ে, এবং তৎপরে মিষ্ট, তৎপরে অম্ল, এবং তিক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়ে পাওয়া যায়। জিহ্বার অগ্রভাগে দিলে নিম্নলিখিত পদার্থগুলির পার্শ্বে লিখিত সময়ের মধ্যে আস্বাদ পাওয়া যায়।

লবণ	০·২৫	হইতে	০·৭২	সেকেণ্ডের মধ্যে
মিষ্ট	০·৩০	”	০·৮৫	” ”
অম্ল	০·৬৪	”	০·৭০	” ”
তিক্ত	২·০০	”	৭·০০	” ”

পাকস্থলিরও অস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ১৫ জন ব্যক্তি পাকস্থলীর পীড়ায় ভুগিতেছিলেন।

তাহাদিগকে ক্ষীণ শক্তির লবঙ্গ তৈল প্রদান করা হয়। মোট ৮০ বার পরীক্ষার মধ্যে ৬৯ বার পরীক্ষার পাকস্থলীর চতুষ্পার্শে একটা তীব্রতার এবং উত্তাপের অনুভূতি হইয়াছিল। ইহার ২৬টিতে এই অনুভূতি শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কাজেই পাকস্থলীরও এইরূপ একটা অনুভূতি আছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১০০ ভাগ জলে ০·৪ হইতে ০·৫ ভাগ বিশুদ্ধ হাইড্রো-ক্লোরিক দ্রাবক মিশাইয়া পান করিলে শূন্য পাকস্থলীতে কোন প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারেনা। সুরাসার সামান্য তীব্রতা উদ্রিক্ত করে। কিন্তু গলনালীতে (œsophagus) অতি তীব্র প্রতিক্রিয়া করে।

রাসায়নিক পদার্থের সহিত আস্বাদ উৎপাদনের কোন সম্পর্ক রহিয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ফল আদৌ সন্তোষজনক নহে। তাহাদের গন্ধ সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষার ফলও এইরূপ। রাসায়নিক পদার্থের গঠন-উপাদান ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। যে সমস্ত পদার্থ আঘ্রাত হইলে বা উদরে প্রবিষ্ট হইলে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, সেই সমস্ত পদার্থের প্রবেশ দ্বারেই আমরা স্বভাবতঃ সাবধান হইবার অবকাশ পাইনা। অনেক বিষাক্ত বায়বীয় দ্রব্যের আঘ্রাণ আমরা আদৌ বুঝিতে পারিনা। জিহ্বার অবস্থাও তদ্রূপ। প্রত্যেক বিষাক্ত খাদ্যই বমনকারক নহে। ক্যালোমেল পাকস্থলী জীর্ণ করিয়া ফেলে ও জরাইয়া তুলে, তথাপি রসনার আস্বাদ-গ্রহণ শক্তির কোন অপচয় করে না। আঠাল পদার্থ অপেক্ষা দানা বাঁধা পদার্থের আস্বাদ জিহ্বা অতিশীঘ্র গ্রহণ করে। এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহাদের আস্বাদ বেশ মিষ্ট, যেমন ক্লোরোফরম, স্যাক্রানিন্, সুগার অফ লেড, বেরিলিয়ামের রাসায়নিক লবণ সমূহ ইত্যাদি। যে সমস্ত পদার্থ আস্বাদ করিলে অম্লত্ব অনুভূতি হইত, তাহারই পূর্ব্বে দ্রাবক (acid) বলিয়া নির্ব্বাচিত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন অনেক দ্রাবক আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, তাহাদের আস্বাদ আদৌ অম্ল নহে। রাসায়নিকগণ মৌলিক পদার্থগুলিকে এক এক ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ক্লোরিন, আইওডিন, ব্রোমিন এবং লিথিয়াম, পোটাসিয়াম, সোডিয়াম, রিউবিডিয়াম, ইত্যাদি। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, এক বিভাগের সমস্ত দ্রব্যের আস্বাদ প্রায় সমতুল্য। ইহাদের আণবিক গুরুত্বের অনুপাতে আস্বাদের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একই শক্তি বিশিষ্ট সালফিউরিক দ্রাবকের আস্বাদ ফস্ফরিক দ্রাবকের আস্বাদ অপেক্ষা অধিকতর অম্ল।

দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অনেক সময়ে ঘ্রাণ-শক্তি হ্রাস পায়; কিন্তু রসনার কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না। আস্বাদ শক্তির নানা কারণে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কপার সালফেট বা পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রাবণে কুলি করিয়া সিগারেটের ধূম পান করিলে, মিষ্ট আস্বাদ পাওয়া যায়। পোটাসিয়াম ক্লোরেট কিম্বা অতি ক্ষীণ শক্তি

সালফিউরিক দ্রাবকের জলীয় দ্রাবণে কুলি করিলে বিশুদ্ধ জলের আস্বাদ মিষ্ট হয়। হরিতকি চর্ব্বণের পর জল মধুর লাগে। মিষ্ট-রস পানীয় দ্রব্যের পর অম্ল দ্রব্য আস্বাদ করিলে অম্লতা বৃদ্ধি পায়। অনেকে মনে করেন যে, মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের পর অম্ল আস্বাদ করিলে, অম্লতা অল্প হইবে, কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে খাদ্য আস্বাদ হীন বা বিস্বাদ বোধ হইবার কারণও এইরূপ। আবার এইরূপ কোন কারণেই, যে খাদ্য আমরা অত্যন্ত স্বাদু বলিয়া মনে করি, সেই খাদ্যই একবারে আস্বাদ হীন হইয়া পড়ে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।—১০০ ভাগ জলে ০·১ ভাগ লবণ দ্রবীভূত করিয়া ও সাধারণ জলের ন্যায় আস্বাদ-বিশিষ্ট এরূপ অতি ক্ষীণ শক্তি কুইনাইন দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া পান করতঃ চিনির সরবত পান করিলে অধিকতর-মিষ্ট বোধ হয়। দুইটি বিভিন্ন আস্বাদের অতি ক্ষীণ জলীয় দ্রাবণের মিশ্রণ পান করিলে অধিকাংশ স্থলে দুইটি পদার্থই স্বাদহীন মনে হয়। কেননা উভয়ে পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া উভয়কেই শক্তিহীন করিয়া ফেলে। লবণ ও চিনির ক্ষীণ দ্রাবণ মিশাইয়া পান করিলে কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না। যদি দ্রাবণ দুইটি বেশ ঘন হয়, তাহা হইলে প্রথমে একটির, পরে আর একটির অর্থাৎ পরে পরে উভয়েরই আস্বাদ পাওয়া যায়। যদি কোন দ্রাবণে মিষ্ট এবং তিক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে বিভিন্ন সময়ে জিহ্বার কোন কোন স্থানে মিষ্ট এবং কোন কোন স্থানে তিক্ত আস্বাদ পাওয়া যায়। কাজেই অনেকগুলি পদার্থের মিশ্রিত কোনরূপ বিশেষ আস্বাদ পাওয়া যায় না। অনেকেই বলিয়া থাকেন, অমুক জিনিষ খাইতে "টক্ টক্" "ঝাল ঝাল" "তেঁত তেঁত" ইত্যাদি। তিক্ত ও বিশ্রী আস্বাদের ঔষধ হইতে রোগীকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য চিকিৎসকগণ প্রায়ই মিশ্রিত ঔষধে মিষ্ট দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া থাকেন। কেন না রোগী মিষ্টতার দিকেই অধিক মন দিয়া থাকে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদের শক্তির বিশেষ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে, শক্তির তীক্ষ্নতা হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু রসনার নানাবিধ বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু অতি মিষ্ট আস্বাদ গ্রহণে অত্যন্ত প্রিয়। অতি মিষ্ট ব্যতীত অতিশয় কোন আস্বাদই তাহার ভাল লাগে না। বয়স বৃদ্ধি পাইলে তবে তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত দ্রব্যের আস্বাদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আস্বাদ গ্রহণ শক্তির কোন বিভিন্নতা রহিয়াছে কিনা, তাহা স্থির করা বিশেষ সহজ নহে। কেননা অভ্যাসই বিভিন্নতার মূল কারণ। যে সমস্ত পুরুষ ধূম পান করেন এবং মিষ্ট দ্রব্য আস্বাদের অধিক সুযোগ পান, তাঁহারা তিক্ত দ্রব্য আদৌ পছন্দ করেন না। এখানে অভ্যাসই এরূপ মিষ্টপ্রিয়তার কারণ। উড়িষ্যা দেশের পুরুষ এবং বঙ্গের পল্লী অঞ্চলের মধ্য-বিত্ত গৃহস্থগণের স্ত্রী "পান্তা" ভাতের অম্লাস্বাদ অত্যন্ত ভাল বাসেন। পূর্ব্ববঙ্গে লঙ্কার প্রচলন সমধিক। আস্বাদ প্রিয়তার এরূপ বিভিন্নতার কারণ অভ্যাস। কোন কোন পীড়ায়

আস্বাদের শক্তির বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ কর্ণে অস্ত্রচিকিৎসা এবং হিস্টিরিয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুই পীড়ায় জিহ্বা অম্ল আস্বাদ শক্তি হীন হয়, মিষ্ট আস্বাদ শক্তি সমান থাকে। অনেক অনেক সময়ে অম্লের সহিত তিক্তের গোলমাল করেন। কোন সময়ে এক নবতি বয়স্কা বৃদ্ধা সমস্ত খাদ্যেই মিষ্ট প্রয়োগ করিতেন, কেন না তিক্তে তাঁহার অত্যন্ত ভয় ছিল। কোন কোন সময়ে অনেক বৃদ্ধ বিশেষতঃ যাঁহাদের আস্বাদ শক্তি অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা বিশ্রী খাদ্য খাইয়া থাকেন। কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক জিহ্বার অগ্রভাগে মিষ্ট এবং অন্যান্য স্থানে অন্য অন্য আস্বাদ অনুভূত হয়। আবার কোমল তালুর আস্বাদ গ্রহণ শক্তির সমাবেশ জিহ্বার ঠিক বিপরীত। এই সমস্ত কারণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মুখে বিভিন্ন আস্বাদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্নায়ু সমাবিষ্ট হইয়া আছে।

শরীরের কোনরূপ অবস্থান্তর না হইয়াও জিহ্বার শক্তির হ্রাস হইবার কারণ সর্দ্দি, কাশী, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা এবং জিহ্বার ঘা ইত্যাদি। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের শক্তির বিষয় লিখিত হইতেছে —জিম্‌নেমিক দ্রাবক মিষ্ট এবং তিক্ত আস্বাদের শক্তি দূরীভূত করে। এই দ্রাবক ব্যবহার করিয়া এক ঘণ্টা কাল পরে কুইনিন ও চিনির আদৌ আস্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু মিষ্ট এবং লবণাক্ত দ্রব্যের আস্বাদের কোনরূপ বিপর্য্যয় হয় না। কোকেন, ইউকেইন, ইরিওডিটীয়ন, ম্যুটিনোসাম্ ইত্যাদি প্রথমে তিক্ত পরে অন্যান্য আস্বাদ দূরীভূত করে। কোন দ্রব্যের সুপরিষ্কৃত এবং স্বাভাবিক আস্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত।

(১) দ্রব্যের পরিমাণ এরূপ প্রচুর হওয়া উচিত যে, খাদ্য যেন আস্বাদ কাঁটার প্রায় সমস্তগুলির সংস্পর্শে আসিতে পারে।

(২) স্বাদু জিনিষের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইলে জিহ্বা রীতিমত আলোড়িত করিয়া খাদ্য জিহ্বার সর্ব্বত্র লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

(৩) মুখে দিয়াই খাদ্য গলাধঃকরণ করিলে চলিবেনা; খাদ্য কিছুকাল জিহ্বায় থাকা আবশ্যক।

(৪) খাদ্যের উত্তাপ উপযুক্ত পরিমাণে হওয়া প্রয়োজনীয়। ৫০ হইতে ৬০ ডিগ্রি ফার্ণহিট উত্তাপই আস্বাদ গ্রহণের উপযুক্ত উত্তাপ। বরফ ও ১২২ ডিগ্রি ফার্ণহাট উত্তাপের খাদ্য মুখে থাকিলে দশ সেকেণ্ডে অম্ল ব্যতীত জিহ্বার অন্য সমস্ত আস্বাদ শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(৫) যদি কয়েকটি পদার্থের উপর্য্যুপরি আস্বাদ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে একটির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া জল দ্বারা জিহ্বা রীতিমত ধৌত করিয়া অর্থাৎ আস্বাদের সমস্ত অনুভূতি সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া তবে, দ্বিতীয় পদার্থের আস্বাদ গ্রহণ করা উচিত। অথবা জিহ্বা ধৌত করিয়া এমন একটা পদার্থ চর্ব্বণ করা উচিত যাহাতে

মুখে প্রচুর লালা নির্গত হইতে পারে। রুটীর টুকরা চর্ব্বণ করিলে মুখে প্রচুর লালা নিসৃত হয়।

(৬) মনের বিকারের সহিত আস্বাদ শক্তির সম্পর্ক রহিয়াছে। যে সমস্ত ব্যক্তি মানসিক ও স্নায়বিক দুর্ব্বল, তাহাদের রসনার শক্তিও অল্প। বিশেষতঃ মৃগী রোগ-ক্রান্ত ব্যক্তির রসনা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তবে অভ্যাসের উপরেই আস্বাদ শক্তির তীক্ষ্ণতা বাড়িয়া থাকে। যাহারা আস্বাদ গ্রহণ দ্বারা খাদ্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির করেন তাঁহাদের শক্তি, —অভ্যাসও স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করে।

(৭) যে সমস্ত লোকের স্নায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ অতি সামান্য কারণেই উদ্রিক্ত হইয়া উঠে (sensitive), তাঁহাদের রসনার শক্তিও সেইরূপ তীক্ষ্ণ।

(৮) যাঁহারা আস্বাদের দ্বারা খাদ্য দ্রব্য পরীক্ষা করেন তাঁহাদের জিহ্বায় যেন ক্ষত বা ঘা না থাকে, এবং আস্বাদের শক্তির অপচয় করিতে পারে মুখের এরূপ অবস্থা যেন না হয়। শিথিল দন্ত, মুখের ঘা, কিম্বা জিহ্বায় যেন কোন রূপ গলিত খাদ্য জনিত আবরণ না থাকে।

জীবনধারণের বিভিন্ন অবস্থার জন্য কেবল বিভিন্ন জাতির মধ্যে নহে, একই জাতীয় লোকের মধ্যে রসনার শক্তি বিভিন্ন হয়। যে সকল দেশে কাঁচা তামাক পাতা চর্ব্বণ করা অভ্যাস আছে, সে দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের লোকের তুলনা করিলে রসনার শক্তি প্রায়ই বিভিন্ন হয়। খাদ্য ব্যবসায়ীগণ দ্রব্যের আস্বাদ পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করেন, সেই সমস্ত পরীক্ষক যে দেশে সেই খাদ্য ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের অধিবাসী হওয়া উচিত। অবশ্য ইহা ব্যবসায়ীর পক্ষে সম্ভবপর নহে।

চার আস্বাদ পরীক্ষা করিয়া চার গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত থাকে এইরূপ অনেক খাদ্য ব্যবসায়ে পরীক্ষক নিযুক্ত হয়। এই সমস্ত লোকের শক্তি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অভ্যাস করিলে রসনার শক্তি প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

FOOD.

Translated from Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose's book on Food.

(4)

The Digestive Organs and Digestion.

The food we take must undergo a change in the system before it becomes fit for nourishing the body. Rice, *dal*, fish, meat, milk or bread, whatever be the substance we eat, it can not mix with our blood in an unchanged condition and contribute to the repair and growth of the body. By the action of the various digestive organs and

the digestive principles contained in their secretions, food is altered from its original condition in such a way as to make it easy of absorption and assimilation.

Our digestive tract may aptly be likened unto a tunnel with two openings, the entrance being our mouth and its exit the anus. The various structures situated within the mouth, such as the tongue, the teeth, the salivary glands, &c., help directly or indirectly, in the process of digestion.

Teeth.—An adult person has a set of 16 teeth in each of his jaws which materially help the digestion of food. A child depending solely upon milk for its nourishment does not require the use of teeth; but when solid food is taken in any form, we can not do without the teeth. With the loss of teeth in old age, we suffer great inconvenience in taking and relishing our food and we often hear old people complaining bitterly of it. There is a common saying in Bengali that "it is only when the teeth are lost that we begin to appreciate their value." The chief function of the teeth is to break down the solid food and to reduce it to minute fragments. Unless this is done, the food cannot be intimately brought to the action of the various digestive juices; the digestion would thus be imperfect and much delayed. Our teeth are the only organs to effect this minute division of the food.

The functions of the various teeth vary according to their shape. The four front teeth in each jaw are flattened and pretty sharp like the blade of a spade; they help us in cutting the food and are called the *incisors.* Next to them is a blunt-pointed conical tooth, calledthe canine, one on each side of the jaw. These attain great development in size, strength and sharpness in carnivorous animals, such as tigers, cats and dogs, and are also numerically strong in these animals. They are altogether absent in herbivorous animals, such as horse, cow, sheep, buffalo, &c. We have got four such teeth, but they are very much stunted in their growth. These teeth help the carnivorous animals to tear away the flesh from bones, and naturally they are very strong and sharp in them. In our case, they merely supplement the action of the incisor teeth. Behind the canines, there are five broad-capped strong teeth on each side of the jaw which are called the bicuspids and the molars. We have got these in common with the herbivora in which they exist in larger number and are much stronger. With the help of these teeth, these animals are capable of crushing down the hard stems and branches of trees which largely form their food. The solid food we take is reduced to a pulp by means of these teeth. We shall discuss in the proper place whether there is any causal relation between the kind of teeth possessed by an animal and its food.

Tongue.—The food, as we have just observed, on entering the mouth is first finely divided by the teeth. The tongue helps the action of the teeth by collecting, by its rapid movement, the scattered portions of the food within the mouth and bringing the same to the teeth to be worked upon by them. We must not do injustice to the tongue by supposing that it is busy in enjoying the taste of

the food; it faithfully performs the duty allotted to it by nature and it thus worthily enjoys the fruits of its own labour.

Salivary glands.—The food not only becomes finely divided within the mouth, but it gets thoroughly mixed with the saliva. This is a thin, colorless, slightly opalescent fluid secreted by the three principal salivary glands situated at the base and on each side of the lower jaw and which communicate by means of narrow tubes with the cavity of the mouth. These glands become excited at the entrance of food into the mouth and commence secreting their juice which pours into the mouth thorough these tubes and throughly mixes with the masticated food. The saliva not only softens the food but transforms the starch of rice, bread, potato and other foods of a similar kind into sugar by the action of a special ferment called *ptyalin* contained in it. Saliva, therefore, plays a most important *role* in the process of digestion. Here in India, most of our foods contain starch; it is therefore very necessary that we should keep the food in the mouth as long as possible in order that the action of saliva on it may be exerted to the fullest extent. It we masticate our food slowly and do not swallow it too quickly, this action of saliva on food is fully maintained. Too rapid gulping down of food is very injurious to health, being one of the chief causes of indigestion. It gives no time for the conversion of starch into sugar, so necessary for the digestion of this particular kind of food. Hence indigestion is one of the results of too quick eating. Besides, much valuable food is not utilised in the system but thrown out as refuge. It has been asserted on very high medical authority that slow eating in one of the best and simplest remedies for indigestion. The common practice of stuffing the mouth with food and forcing it down as quickly as possible is open to serious objection. Sir Michael Foster, the great Physiologist, has made the following interesting observations on this point:—

"The adoption of the habit of thorough insalivation of the food was found to have a remarkable and striking effect on appetite making this more discriminating and leading to the choice of a simple dietary, and in particular in reducing the craving for flesh-food. The appetite, too, is beyond all question fully satisfied with a diet considerably less than is ordinarily demanded. The experiments showed clearly that perfect mastication produces great economy in nutrition and a remarkable improvement in the condition of the whole intestinal tract. The waste products of the bowels were not only markedly reduced in amount but actually became odorless and inoffensive." *Tropical Hygiene.*

We thus see that if we chew our food properly, we not only can keep away diseases, but could actually save much money which is lost on food thrown out of the body with the waste products. It is real economy in every sense of the term.

The three glands which are principally concerned in secreting the saliva are the *parotid*, the *sub-maxillary* and the *sub-lingual*. The parotid glands are situated, one on each side of the ear, behind the ascending portion of the lower jaw; the other two lie against the

inner surface of the body of the lower jaw, one on each side. All three communicate with the interior of the mouth by narrow pipes which are called the ducts of the glands. The disease commonly met with in children and known as Mumps, is caused by the inflammation of the parotid glands. Besides these, there are a large number of glands of smaller size from which a kind of slightly viscid fluid is secreted which makes the bolus of food slippery and helps its easy passage downwards.

Pharynx.—The back part of the cavity of the mouth forms the pharynx from which a narrow tube, the *gullet* (Æsophagus), begins, joining it with the stomach. The muscular lining of the pharynx, by its contraction, pushes the food backwards and downwards into the gullet. There are numerous glands in the pharynx which throw out a viscid secretion which makes the lumps of food more slippery, so that they can easily pass through the gullet.

Gullet.—This is the narrowest part of the digestive canal. It is about 9 or 10 inches long and about ¾ inch in diameter. It commences from the pharynx and going down behind the wind-pipe opens into the stomach. There are circular muscles in its walls which, by contraction, help the passage of the lump of food in its downward course. The opening of the wind-pipe lies just in front of the upper opening of the gullet. The food, therefore, must pass over the opening of the wind-pipe before it reaches the gullet. If any particle of food, by accident, gets into the wind-pipe, a violent fit of coughing sets in, which is only an attempt on the part of nature to throw it out. There is, however, a wonderful mechanism by which such accidents are prevented. A kind of lid-like structure overhangs the air-passage, which is called the *epiglottis*. Now, when the food reaches the back part of the pharynx, the lid quietly drops down of its own accord and completely shuts the wind-pipe. The lump of food slides over the upper surface of the lid in its passage to the gullet. If from any cause, the lid does not fall at the time of swallowing the food, there is great risk of the food entering the air-passage and causing great distress and sometimes more serious results. Mothers should take great care not to put milk or any other food into the child's mouth while it is crying, as the air-passage remains open during the act of crying and there is great risk of food slipping down there and choking the child.

Stomach.—The next part of the digestive canal takes the shape of a water-carrier's miniature leather-bag forming the link between the gullet and the intestine. It is situated on the left side of the abdomen, its upper part being narrower than the lower. There are muscles within its walls, which, by contraction, cause the food to move from place to place within its cavity, thus helping the thorough mixing of its contents with the special digestive juice secreted by the stomach. Under the miscroscope, the inner surface of the stomach has the appearance of a honey-comb and within each compartment may be seen minute openings which are the mouths of tubes leading from glands whom function is to secrete the *gastric juice*. It contains two digestive principles, the *pepsin* (a soluble ferment or enzyma) and the *hydrochloric acid* without which nitrogenous food like meat, fish,

white of egg, cheese, *dal*, &c., can not be digested. The albumen of these foods is converted into soluble *peptone* by the gastric juice and in this condition it is readily taken up by the blood vessels distributed over the walls of the stomach and the intestine. Besides these, there is another digestive principle called *Rennin*, secreted by the stomach which causes clotting of the ingested milk. During the digestion of the food in the stomach, the lower opening of the stomach which is called the *pylorus*, remains tightly closed, so that so long as the digestion in the stomach is not completed, the altered food, soft and pultaceous and known by the name of chyme, is not allowed to enter the intestine.

Intestine.—The intestine is next to the stomach and forms the longest part of the canal measuring about 27 feet, and is thrown into many folds to accommodate itself within the small space of the abdomen. It consists of two parts, the small and the large intestines, of which the former measures about 21 feet in length and is much narrower than the large intestine which is only 6 feet long. The small intestine is again subdivided into 3 parts. The part next to the stomach which measures about 8 or 10 inches only is called the *duodenum* A tube opens into this part of the canal which is the common duct of the liver and the pancreas which are situated on the right and left sides respectively of the upper part of the abdomen. The liver secretes the bile and the pancreas the pancreatic juice and these reach this part of the intestine through the common duct and freely mixes with the chyme as it leaves the stomach. The pancreatic juice is principally concerned in the digestion of fat and starch (the portion not acted upon by saliva). It also helps the digestion of proteid food. It contains three digestive principles which are of the nature of ferments, the *trypsin*, the *amylopsin* and the *steapsin* and these respectively help the digestion of proteids, starch and fat. The bile also slightly helps the digestion of all kinds of food. Besides, it is an antiseptic fluid and prevents decomposition of the food in the intestine; it has also a slight laxative action. The pancreatic juice and the bile help the fine division (emulsification) of fat which in this condition, is absorbed by certain small tubes called lacteals situated in the villi to be presently described.

The next two parts of the small intestine are the *jejunum* and the *ileum* measuring 8 feet and 11 feet in length respectively. These contain innumerable glands which pour into their cavity a juice called the *succus entericus*. This completes the digestion of the food which now turns into a milky fluid called the *chyle*. In these parts of the intestine, innumerable minute prominences which give the intestine a velvetty appearance are to be seen. These structures are called the *villi* and they are lined with fine-blood vessels called capillaries and contain pipes called lacteals communicating with blood-vessels. The chyle is rapidly absorbed by these and carried into the blood-stream. The completely digested food is next carried by the blood to all parts of the body and appropriated by them according to their requirements. The undigested portion which gradully acquires a more and more thick consistence passes into the large intestine through an opening protected by a valve which prevents the back-

ward passage of the food into the small intestine once it gets into the large bowels. The large intestine is 6 feet long and is much more capacious than the small intestine. Here the contents undergo a process of fermentation by the action of certain minute organisms called bacteria which give it an offensive odour and convert the rejected portion of the food into fæces. This finds exit through the lower opening of the tunnel which is called the anus. Any traces of liquid food left unabsorbed in the small intestine is taken up here. It was formerly thought that cellulose which constitutes the hard coating and fibrous portions of many vagetable substances and which is allied to starch in its composition, can not be digested by men. The herbivorous animals live chiefly on cellulose, straw, grass, branches of trees abounding in this material. It is now admitted that cellulose to a certain extent is utilized by men as food in the large intestine. There are circular muscular fibres in the walls of the small and large intestines which, by contraction, help the onward passage of the food. This is the peristaltic action of the intestines and it helps the act of defæcation.

(*To be continued*)

কাজের জিনিষ।

হস্তিদন্ত বক্র করিবার উপায়।--প্রথমে benzine দিয়া হস্তি দন্তকে সম্পূর্ণ তৈল শূন্য করিতে হইবে, পরে ইহা ফুটন্ত গরম জলে রাখিতে হইবে, হস্তি দন্তের পাতলা দ্রব্য ১৫।১৬ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। মোটা দব্য গুলিও ২০ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নয়। নরম হইলেই গরম জল হইতে বাহির করিয়া বাঁকাইয়া লইতে হয়, এবং পরে ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা করিতে হয়। আবার অন্য উপায়ে হস্তি দন্ত বাঁকান যায়। phopshoric acid এ ভিজাইলে নরম হয়, নরম হইলেই acid হইতে তুলিয়াই উত্তমরূপে জলে ধৌত করিয়া বাঁকাইয়া লওয়া যায়, পরে গরম জলে রাখিয়া দৃঢ় করিলেই হইল। এইটুকু দেখা প্রয়োজন যে, গরম জলে দিয়া দৃঢ় করিবার সময় দুই তিনটি যেন পরস্পর সংলগ্ন না হয়।

পিপে বা এইরূপ কোন দ্রব্যের লিখিবার কালী।—একটা কেট্‌লীতে দশ সের রজন গলাইয়া লও, তাহাতে আস্তে আস্তে, অল্পে অল্পে অর্দ্ধ সের পানে ব্যবহারের চুণ মিশাইয়া দাও। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মিশ্রিত পদার্থ পরিষ্কার না হয়, ততক্ষণ ফুটাইতে থাক; তাহার পর এক সের তিসির তেলের বার্ণিস ঢালিয়া দিয়া অল্পকাল নাড়িতে থাক, এবং অগ্নি হইতে নামাইয়া লও। রীতিমত ঠাণ্ডা হইলে ছয় সের বাজারের বেনজোল ঢালিয়া দিয়া ক্রমাগত নাড়িতে থাক। ইহাতে দেড় সের তিসির তৈলে কোন ধাতব রংএর দ্রব ঢালিয়া দাও। অবশেষে ৯ সের বাজারের বেনজিন ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। এই রংএর বিশেষত্ব এই যে, পিপার গায়ে লিখিবা মাত্র কালী শুষ্ক হইয়া যায়। কাজেই মুছিয়া যাইবার ভয় থাকে না।

বিখ্যাত মিল্ক অফরোজ।—শুভ্র বাদাম $1\frac{1}{2}$ আউন্স, বাদামের তৈল $1\frac{1}{2}$ আউন্স, গায়ে মাখিবার সাবান (মূল্যবান এবং শ্বেত বর্ণ) ১ ড্রাম ; গোলাপজল $\frac{3}{4}$-পাইট। সমস্ত গুলি মিশ্রিত করিয়া একটা মলমের মত প্রস্তুত কর। এসেন্স অফ রোজ $\frac{1}{2}$ ফ্লুইড ড্রাম ও রেকটিফাইড স্পিরিট $2\frac{1}{2}$ ফ্লুইড আউন্স মিশ্রিত কর। পরে গোলাপজল ঢালিয়া ১ পাইট কর। কেহ কেহ এই রেকটিফাইড স্পিরিট এ অয়েল অফ বারগামট, অয়েল অফ ল্যাভেণ্ডার ও গোলাপের আতরের কয়েক ফোঁটা মিশাইয়া দেয়। ইহাতে মিল্ক অফ রোজের সৌরভ বৃদ্ধি পায়, এবং ব্যবহারে পরম তৃপ্তি হয়।

গাত্র চর্ম্ম পরিষ্কার রাখিবার উপায়।—সোহাগা ৬ ড্রাম, গ্লিসারিণ $\frac{3}{4}$ আউন্স, গোলাপ জল ১২ আউন্স ; স্নানের পর গা মুছিয়া পরিষ্কার স্পঞ্জের দ্বারা উক্ত দ্রব্য কয়েকটির মিশ্রণ গায়ে লাগাইয়া অল্প পরে মুছিয়া ফেলিলে চর্ম্মের কোমলত্ব ও শুভ্রত্ব বৃদ্ধি পায়, বা সংরক্ষিত হয়।

লেই প্রস্তুত প্রণালী।—গঁদ দিয়া কাগজ যুড়িলে অনেক সময়ে গঁদ শুকাইয়া যাইলেই কাগজ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। বর্ষায় কুঞ্চিত না হইলেও শীতে প্রায়ই কুঞ্চিত হইয়া যায়। কাজেই যোড়া খুলিয়া যায়। ময়দার লেই দিয়া কাগজ জুড়িলে কাগজ অত্যন্ত মোটা হইয়া উঠে। লাইব্রেরী, আফিস ইত্যাদি কার্য্যালয় সমূহে কাগজ, চিঠি,পত্র ইত্যাদি ময়দার লেই দিয়া যুড়িয়া পুস্তকাকারে রাখা হয়, ইহার ফলে কাগজের একদিক অত্যন্ত মোটা হইয়া উঠে। কিন্তু ময়দার লেইএ কাগজ কুঞ্চিত হয় না। এইরূপ নানা অসুবিধার জন্ম লোকে সাধারণতঃ "গ্রয়" ইত্যাদি মূল্যবান পেষ্ট ক্রয় করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত উপায়ে লেই বা পেষ্ট প্রস্তুত করিলে ব্যয় অতি অল্প হয়, অথচ ইহা বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পেষ্ট অপেক্ষা কোন অংশেই হীনতর নহেঃ—শ্বেত বিশুদ্ধ ডেক্‌স্‌ট্রিন (white dextrine)—$2\frac{3}{4}$ পাউণ্ড, জল—২ কোয়ার্ট, অইল অফ উইণ্টারগ্রীণ (oil of wintergreen) ০.৮ কিউবিক সেণ্টিমিটার, লবঙ্গ তৈল (oil of cloves) ০·৮ কিউবিক সেণ্টিমিটার। জলকে প্রথমে ১৬০ ডিগ্রি ফারনহিট উত্তাপে উত্তপ্ত কর। তাহাতে ডেক্‌স্‌ট্রিন্ দিয়া অতি ধীরে ধীরে নাড়িতে থাক। জলের উত্তাপ যেন কিছুতেই ১ ডিগ্রির অধিক এদিক ওদিক না হয়। যখন ডেক্‌স্‌ট্রিন্ জলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হইয়া যাইবে তখন উপরোক্ত তৈলদ্বয় ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক। কিন্তু সর্ব্ব সময়ই কাচদণ্ড বা ঐরূপ কোন পরিষ্কৃত দণ্ড দিয়া নাড়িতে হইবে। পরে এই মিশ্রিত তরল পদার্থকে শীতল কর। অবশেষে বোতলে রাখিয়া ছিপি যুক্ত কর। কোন এক স্থানে এই বোতলগুলিকে এক সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ রাখিয়া দাও। এই সময়ের মধ্যে পেষ্ট অল্প জমাট বাঁধিয়া যাইবে। জমাট বাঁধিলে ইহা স্বচ্ছ শ্বেত বর্ণ ধারণ করিবে। তখনই ইহা ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। ব্যবহার করিবার সময় যদি পেষ্ট অত্যন্ত "থক্ থকে" হইয়া যায় তবে সামান্য জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। বুরুশ দিয়া এই পেষ্ট লাগাইতে হয়। ডেক্‌স্‌ট্রিন

বিশুদ্ধ হওয়া অতি প্রয়োজনীয়। এই পেষ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যাপার এই যে জলে ডেক্‌স্‌ট্রিন্‌ দিবার পরে জলের তাপমাত্রা যেন কিছুতেই ১৬০ ডিগ্রি ফারনহিটের অধিক বা অল্প না হয়। এই তাপমাত্রাতেই ডেক্‌স্‌ট্রিনের এক বিশেষ আণবিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে।

বিবিধ।

সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ।—স্বাস্থ্য-বিভাগের কমিসনার ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত সংযোজিত থাকিবে ও মেডিক্যাল সারভিসের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর অধীনে পরিচালিত হইবে, এই মীমাংসা হইবার পরেই সুপ্রিম গভর্ণমেণ্ট স্বাস্থ্য-বিভাগের কিরূপ পুনর্ব্বন্দোবস্ত ও বিভাগকে কিরূপে বিস্তৃত করিবেন, তাহা স্থিরীকৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যতগুলি চিকিৎসক রহিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট যাহাতে এই সমস্ত কর্ম্মচারিগণের যথাযথ পরিচালন করিতে পারেন, তাহার জন্য উহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারী মেডিক্যাল অফিসারের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, কাজেই স্বাস্থ্য-বিভাগে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে বলিয়া উচ্চ পদগুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট দেশীয় ও বিদেশীয় ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েটগণ হইতে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক গ্রহণ করিবেন। এইরূপ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সারভিস উপাধিধারী চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্য বিভাগে প্রবেশ করিতে আদৌ রাজি হইতেছেন না। কেননা তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের চাকুরী ব্যতীত আর পৃথক ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা চালাইবার অধিকারী থাকিবেন না, এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসকগণকে ক্রমাগতই পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইবে। বর্ত্তমান সংখ্যার উপর আর ৮ জন ডেপুটি কমিসনার নিযুক্ত হইবেন। এই ৮ জনের মধ্যে ২ জন মাদ্রাজ, ২ জন যুক্ত প্রদেশ, ২ জন বঙ্গ দেশ, এবং যে দুই জনের পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে যাইবার বন্দোবস্ত ছিল তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র আসামে গমন করিবেন, সেখানে বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া কমিসনার নিযুক্ত হইবে না। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন; তবে স্বাস্থ্য-বিভাগ যে সমস্ত পদপ্রার্থিগণকে নির্ব্বাচিত করিয়া দিবেন, তাহাদের মধ্য হইতেই স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পুনর্নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। মাসিক বেতন বর্ত্তমানে ৫০০৲ টাকা, ক্রমে ক্রমে ১০০০৲ টাকা হইবে, (ইহারা পৃথকভাবে আর চিকিৎসা করিতে পারিবেন না)। প্রথমতঃ ২ বৎসর শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে। তবে যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে, ২ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে কর্ম্মে স্থায়ী হইতে পারিবেন।

ডেপুটি স্যানিটারী কমিসনার ব্যতীত প্রত্যেক বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিতে হেল্‌থ অফিসারের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইবে। ইহাদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা হইবে। বৃটিশ কিম্বা ভারতীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উপাধিধারিগণ দ্বারা প্রথম বিভাগ পূর্ণ হইবে। দ্বিতীয় বিভাগে যে সমস্ত ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে চিকিৎসক হইতে হইবে না। গ্রাজুয়েট কিম্বা ননগ্রাজুয়েটগণ হইতেই ইঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, নির্ব্বাচিত হইলে স্বাস্থ্য-বিভাগে কিছুকাল থাকিয়া বিভাগের কার্য্যাবলী শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। প্রথম বিভাগের বেতন মাসিক ৩০০৲ টাকা হইতে ক্রমে ক্রমে ৫০০৲ এবং দ্বিতীয় বিভাগে ১৫০৲ হইতে ৩০০৲। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, এবং নিয়মমত কয়েক বৎসরের জন্য তাঁহারা পদত্যাগ করিতে পারিবেন না, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া লইবেন। ভারতগভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতে স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের কার্য্যের জন্য লোক নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। এইরূপে কর্ণেল কিং মাদ্রাজের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

প্রাদেশিক সানিটারি বোর্ডের বন্দোবস্তের ভার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত রহিল। পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত ইত্যাদি ব্যয়সাপেক্ষ কার্য্য সম্বন্ধে বোর্ড সমূহ গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন। যাহা হউক ভারতের স্বাস্থ্য যাহাতে উন্নত হয়, গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

মেজর জে, সি, রবার্টসন গত ১৫ই মে হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের নূতন স্যানিটারী কমিসনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যাট প্রস্তুত।—ব্যাট বল অনেকেই খেলিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ কাষ্ঠে ব্যাট প্রস্তুত হয় তাহা অনেকেই জানেন না। উইলো নামক এক প্রকার বিলাতি বৃক্ষ আছে। আমাদের দেশেও আজকাল এইরূপ গাছ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় বাগানে এই গাছ রোপণ করা হয়, দেখিতে বিশেষ কুদৃশ্য নহে। ডাল পালা সর্ব্বদাই অবনত, মনে হয় সর্ব্বদাই বিষণ্ণ (weeping willow)। সেই জন্য আমাদের দেশে ও সর্ব্বত্রই সাহেবদের সমাধিক্ষেত্রে ইহার প্রাচুর্য্য অধিক। গাছটি ১৫ইঃ মোটা হইলে ব্যাটের জন্য কাটা হয়। শীতকালেই গাছ কাটা হয়, কারণ বৃক্ষের রস তখন অতি নিম্নে থাকে। ডাল পালা বাদ দিয়া কেবল কাণ্ড কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। ব্যাটের দীর্ঘতার মাপে গুঁড়ি গুলিকে টুকরা টুকরা করা হয়। যদি একটি এক সের ভারি ব্যাট প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ ২০ সের ওজনের কাষ্ঠ খণ্ড প্রয়োজন হয়।

তৎপর ব্লেডগুলিকে মজাইতে দেওয়া হয় (seasoning) অর্থাৎ রৌদ্র বা আর্দ্রতা লাগিলে যেন বক্র বা অন্য কোনরূপ না হয়। এইরূপে কাঠগুলি ১ বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়। তাহার পরে বাটালী দিয়া কাঠগুলিকে ব্লেডের ন্যায় সুডৌল করা হয়।

এইটী অত্যন্ত পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য। তাহার পরে কাঠগুলিতে চাপ প্রয়োগ করা হয়। কারিকরগণ বলিয়া থাকে যে একটি ব্যাট হইতে একটা ছোট বাটির এক বাটী তৈল নিঃসৃত করা হয়।

আটটা কিম্বা অল্প সংখ্যক বেত্র সিরিস দিয়া জুড়িয়া ব্যাটের হাতল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখণ্ড রবার দেওয়া থাকে। পরে হাতলের মুখ সূক্ষ্ম করিয়া ব্যাটের ব্লেডে প্রবেশ করাইয়া অতি উৎকৃষ্ট শিরীস দ্বারা সংযুক্ত করা হয়। যখন ব্লেড ও হাতল এক হইয়া যায়, তখন তাহাকে কুঁদ যন্ত্রে ফেলিয়া হাতলকে গোল করিয়া লওয়া হয়।

দানা বাঁধা কুইনাইন।—হাইড্রোব্রোমাইড অফ কুইনাইনের জলীয় দ্রাবণ একটি পাত্রে রাখিয়া সেই পাত্র জলে ফুটাইবার সময় কুইনাইনের ভিতর দিয়া য়্যামোনিয়া সংমিশ্রিত বাতাস চালাইলে কুইনাইন দানা বাঁধিয়া যায়। হইড্রোব্রোমাইডের দ্রাবণে কিঞ্চিৎ য়্যামোনিয়া দিয়া দ্রাবণকে ক্ষার গুণ সম্পন্ন করতঃ এসিটোন মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলে দীর্ঘ সূচিকা আকার দানা অধঃস্থ হয়। কিন্তু এই দানা অল্প পরেই আবার ধুলির ন্যায় হইয়া যায়।

আলুমিনিয়াম এবং পারদ।—মারকিউরিক ক্লোরাইডের জলীয় দ্রাবণে আলু-মিনিয়াম নিমজ্জিত করিতে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এবং ক্লোরাইড প্রচুর পরিমাণে থাকিলে আলুমিনিয়াম অক্সিজেনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই ধাতুর সহিত অন্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে কিম্বা অবিশুদ্ধ হইলে, ক্লোরাইডের সহিত ইহার কোন ক্রিয়া হয় না। অনেক সময়ে এলুমিনিয়ম তৈজসে তাম্র মিশ্রিত থাকে। তৈজস বিশুদ্ধ এলু-মিনিয়মের প্রস্তুত কিনা, তাহা এই প্রকারে বুঝিতে পারা যায়।

সুরায় আরসেনিক এবং শিশক।—যদি দ্রাক্ষারসে অত্যধিক পরিমাণ লেড আর-সিনেট সহযোগে সুরা উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ইহাতে আরসেনিক ও শীশকের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। যদি উপযুক্ত পরিমাণে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাদের অস্তিত্ব ধরা যায় না। কিন্তু উভয়বিধ মদের পিপাতেই প্রচুর পরিমাণে শীশক ও আরসেনিক থাকে, এবং পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে।

কালা জ্বর। বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মার্চ্চ তারিখে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে, কালাজ্বর সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিয়া ক্যাপ টেন প্যাটন, আই, এম এস, যে সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের চ্যানসেলার লর্ড কারমাইকেল (বঙ্গের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ক্যাপটেন প্রথমেই কালাজ্বর যে কিরূপ মারাত্মক পীড়া, তৎসম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করেন। সার উইলিয়াম লিশমান প্রথমে এই পীড়ার কারণ যে এক প্রকার পরান্তঃপুষ্ট আণবিক জীব (parasite) তাহা আবিষ্কার করেন। পরে মেজর

রজার্স্ এই জীব, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে শরীরের কি অবস্থান্তর হয়, তাহা নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত আণবিক জীব প্রথমে কোন শোণিতপায়ী জীব দ্বারা কালা জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর হইতে গৃহিত হইয়া ঐ সমস্ত শোণিতপায়ী জীব দ্বারা অন্য সুস্থ ব্যক্তির শরীরে নীত হয়। যে সমস্ত জীব রক্তপায়ী, তাহারাই এইরূপে পীড়া দেশ ব্যাপী করিয়া তুলে। এই সমস্ত রক্তপায়ী জীবের মধ্যে ছারপোকাই প্রধান।

প্রাপ্তি স্বীকার।— আর্য্যাবর্ত্ত— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; আলোক— অগ্রহায়ণ ১৩১৮; অবসর— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; আলোচনা— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; অর্ঘ্য— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; অর্চনা— আষাঢ় ১৩১৯; আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; ভারতী— শ্রাবণ, ১৩১৯; ভারত মহিলা— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; ভক্তি— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; বামাবোধিনী— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; বসুধা— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; বঙ্গদর্শন— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; চিকিৎসাসম্মিলনী— চৈত্র, ১৩১৮; চিকিৎসা প্রকাশ— আষাঢ় ১৩১৯; The Calcutta University Magazine—May, 1912; দেবালয়— বৈশাখ, ১৩১৯; The Dawn & Dawn Society's Magazine— July, 1912; Food & Drugs— No. 3. vol. II; গৃহস্থ— বৈশাখ ১৩১৯; Hindu Spiritual Magazine— May, 1912; হিন্দুসখা— বৈশাখ ১৩১৯; হিতবাদী—; হিন্দুপত্রিকা— আষাঢ় ১৩১৯; জগজ্জ্যোতিঃ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; জন্মভূমী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; কুশদহ— আষাঢ়, ১৩১৯; কৃষক— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; কর্ম্মকার বন্ধু— বৈশাখ, ১৩১৯; কোহিনুর— শ্রাবণ, ১৩১৯; কাজের লোক— April, 1912; কায়স্থ পত্রিকা— আষাঢ়, ১৩১৯; কৃষি সম্পদ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; মহাজন বন্ধু— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; মেদিনীপুর হিতৈষী—; মুকুল— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; নির্মাল্য— বৈশাখ, ১৩১৯; নব্যভারত— বৈশাখ, ১৩১৯; নাট্য মন্দির— বৈশাখ, ১৩১৯; প্রকৃতি— আষাঢ়, ১৩১৯; প্রসূন—; পল্লিচিত্র— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; প্রজাপতি— বৈশাখ, ১৩১৯; পতাকা— বৈশাখ, ১৩১৯; প্রতিভা— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; শান্তিকণা— অগ্রহায়ণ, ১৩১৮; সমাজ— আশ্বিন, ১৩১৮; সাহিত্য-সম্বাদ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; শিল্প ও সাহিত্য— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; স্বাস্থ্যসমাচার— আষাঢ়, ১৩১৯; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— আষাঢ়, ১৩১৯; ত্রিশূল—; তত্ত্বমঞ্জরী— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) আগষ্ট, ১৯১২। ৮ম সংখ্যা।

কৃত্রিম রবার।

বহুকাল হইতে কৃত্রিম উপায়ে রবার উৎপাদন করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য বহুদিন ধরিয়া অনেক অভিজ্ঞ রাসায়নিক রীতিমত-পরীক্ষা করিতেছিলেন। অল্প দিন হইল ম্যান্‌চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্কিন্ সাহেব ঘোষণা করেন যে, কৃত্রিম উপায়ে রবার প্রস্তুত সম্ভব হইয়াছে, এবং এই কৃত্রিম রবারের ব্যবসা পরিচালনও সম্ভব। এই আবিষ্ক্রিয়ায় ইংরাজ রাসায়নিকগণ জর্ম্মানদিগের অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই কার্য্যে সাফল্যের জন্য অনেক জার্ম্মান রাসায়নিকও বিশেষ পরীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারাও ইংরাজদিগের ন্যায় একই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের পেটেণ্ট গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্ক্রিয়ার ৩ মাস পূর্ব্বে ইংরাজগণ কৃত্রিম রবার প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রবার প্রস্তুত কালীন এসিটোন নামক যে পদার্থ উৎপাদিত হয়, বাণিজ্যে তাহাই একটা জাতীয় উন্নতির মধ্যে পণ্য। কেননা কর্‌ডাইট প্রস্তুত প্রণালীর প্রধান উপাদান এসিটোন। এসিটোন এক প্রকার তরল পদার্থ, ইহাতে ফলের গন্ধ পাওয়া যায়। বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে অতি সামান্য পরিমাণে এসিটোন পাওয়া যায়। ১০০ ভাগ কাষ্ঠ হইতে মাত্র ১ ভাগ এসিটোন উৎপন্ন হয়। নাইট্রো গ্লিসারিন্ (ডিনামাইট), গানকটন এবং ভেস্‌লিন মিশ্রিত করিয়া কর্‌ডাইট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই তিনটি পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনের জন্য এসিটোন প্রয়োজন হয়। এসিটোন প্রয়োগ না করিলে এই তিনটি পদার্থ আপনি আপনিই বিস্ফোটিত হইয়া পড়ে। কোন এক ফরাসী রণতরীতে এইরূপে বিস্ফোটিত হইয়া ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই অবধি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সমস্ত স্ফোটনশীল পদার্থে এসিটোন ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

গ্রেভিল উইলিয়াম্‌স্ নামক একজন ইংরাজ রাসায়নিক ১৮৬০ খৃঃ অব্দে আইসো-প্রিন্ হইতে রবারের অনুরূপ এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করেন। পরে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বুশার্ডে নামক একজন ফরাসী রাসায়নিক লক্ষ্য করিলেন যে, আইসোপ্রিন্‌কে রবারে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। ১৮৮২, ১৮৮৪, এবং ১৮৯২ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়াম এ টিল্‌ডেন এ বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করেন। অবশেষে তিনি দেখিলেন যে, অকৃত্রিম রবারের ন্যায় এই কৃত্রিম বরারকে ভল্‌কানাইজ করা যাইতে পারে। তিনিই প্রথমে রবার ব্যতীত অন্য পদার্থ হইতেও আইসোপ্রিন্ পাওয়া যাইতে পারে, ইহা লক্ষ্য করেন। ইহা হইতেই রাসায়নিকগণ বুঝিতে পারিলেন যে, কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে। তবে ইহার জন্য অতি সুলভে প্রচুর আইসো-প্রিন্ উৎপাদন আবশ্যক। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রথমে এরূপ কার্য্য দুরূহ বলিয়া মনে হইল। কেননা আইসোপ্রিনকে প্রায় সকল সময়ে রবারে পরিণত করা সম্ভবপর হইল না। তবে বর্ত্তমানে যে প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রবার প্রস্তুত একবারে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে।

ভুট্টা এবং এই জাতীয় শ্বেতসার-বিশিষ্ট (starchy) পদার্থ, আলু ইত্যাদিকে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় ও রাসায়নিক আরকে ফেলিয়া কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে। এই প্রণালী আবিষ্কারের জন্য রাসায়নিকগণকে বহু বৎসর ধরিয়া কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। যদি একজন রাসায়নিক চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় সমস্ত জীবন ব্যাপী পরিশ্রমেও তিনি সফল হইতে পারিতেন না। ইহার জন্য বহু রাসায়নিক সমবেত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। ইহার প্রথম কার্য্য ভুট্টা বা আলুকে গাজাইয়া তোলা। কোন এক নির্দ্দিষ্ট প্রথায় গাঁজাইলে এই সমস্ত পদার্থ হইতে ফিউজেল অইল (fusel oil) উৎপাদিত হয়, অথবা অন্যতর এবং বিভিন্ন উপায়ে গাজাইলে এসিটোন উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই প্রণালী অধ্যাপক ফার্ণব্যাক আবিষ্কার করেন। তিনি প্যারিসে প্যাস্‌টুর ইন্‌স্টিটিউটের একজন সভ্য। এই দুই পদার্থের কোন একটি লইয়াই কার্য্য চলিতে পারে; তবে ফিউজেল অয়েলেই কার্য্য সুবিধাজনক ও উৎকৃষ্ট হয়। ইহাতে যে সুরাসার (alcohol) থাকে, তাহাকে দূরীভূত করিবার জন্য ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশাইয়া উত্তপ্ত করিতে হয়। এইরূপ করিলে মনোক্লোরাইড উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে যে সমস্ত পারিভাষিক বাক্যের (technical terms) প্রয়োজন, তাহা আদৌ ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। উক্ত মনোক্লো-রাইডকে পুনরায় ক্লোরিন সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া ডাইক্লোরাইড প্রস্তুত করা হয়। এই ডাইক্লোরাইডকে একরূপ নূতন উদ্ভাবিত ক্র্যাকার নামক যন্ত্রের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিয়া লওয়া হয়। এই যন্ত্রে সোডা-লাইম থাকে। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত ডাইক্লোরাইডকে সম্পূর্ণরূপে হাইড্রোক্লোরিক এসিড শূন্য করা। এরূপ

করা হইলে যে তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাই আইসোপ্রিন্। এই তরল পদার্থ চল্‌চলে এবং কৃত্রিম রবারের উৎপাদক বা জনক।

অতঃপর সর্ব্বশেষ প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয়। আইসোপ্রিন্‌কে একটি মুখ বন্ধ করা পাত্রে রাখা হয়। ইহাতে সোডিয়ামের তার সংযুক্ত থাকে। তিন দিবসের মধ্যে সোডিয়াম তার সংযুক্ত আইসোপ্রিন্ রবার হইয়া যায়। স্বাভাবিক রবার বৃক্ষ হইতে যখন গৃহীত হয়, তখন যেরূপ্ মোটা তৈলের ন্যায় থাকে, ইহাও দেখিতে ঠিক সেইরূপ। এই তৈল ক্রমে ক্রমে থক্ থকে হইয়া উঠে। ইহার বর্ণ শুভ্র, এমন কি সময়ে সময়ে বেশ স্বচ্ছও হয়। স্বাভাবিক রবারের বর্ণ যে পাঁশুটে বা কৃষ্ণ তাহার কারণ এই যে, রবারের আঠা বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হইবার পরে শুষ্ক করিবার জন্য অগ্নির উত্তাপ প্রয়োজন হয়, এই অগ্নির ধুম লাগিয়া রবারের বর্ণ কৃষ্ণ হইয়া যায়।

এই কৃত্রিম রবার স্বাভাবিক রবারের সম্পূর্ণ অনুরূপ, কোন প্রভেদ নাই। রাসায়নিক, প্রাকৃতিক, সর্ব্ববিষয়ে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম রবার সমতুল্য। ব্যবসা-ব্যাণিজ্যে কৃত্রিম রবার প্রস্তুত করিতে কিরূপ ব্যয় হওয়া সম্ভব, তাহা ল্যাবরেটরীতে (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার) সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত রবারের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু ১ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধসের রবারের দাম যে এক শিলিং বা প্রায় বার আনা হওয়া সম্ভব, তাহা একরূপ মোটা মুটি হিসাবে বুঝিতে পারা যায়।

কোন রবারই ৬ মাস বা ১ বৎসর পরীক্ষা না করিয়া কাজে লাগান যায় না। ইতি-মধ্যেই কৃত্রিম রবারের উৎকৃষ্টতাও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, এখনও প্রতি সপ্তাহে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে। জার্ম্মাণিতে কোন মোটর গাড়ীতে একটি চক্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্যারা রবার (স্বাভাবিক রবারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট) ও আর একটিতে কৃত্রিম রবার সংযোজিত হইয়াছিল। ফলে ৬ মাস পরে দেখা গেল যে, প্যারা রবার সম্পূর্ণ ক্ষয়িত ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কৃত্রিম রবারের তখনও কিছুই হয় নাই। অবিষ্কারকগণ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর রূপ ইহার স্থায়িত্বের বর্ণনা করিয়া থাকেন।

রবার প্রস্তুতের শেষ প্রক্রিয়া (অর্থাৎ সোডিয়াম সংযোগ) ডাক্তার এফ, ই, ম্যাথিউস্, পিএচ্ ডি, কর্ত্তৃক উদ্ভূত হয়। জার্ম্মাণির সহিত ইংলণ্ডের এই বিষয় একটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া গিয়াছে। ম্যাথিউস্ যে প্রণালী উদ্ভাবন করেন, জার্ম্মাণিতে রবার উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাক্তার কার্ল হ্যারিস্‌ও সেই প্রণালী স্বাধীন ভাবে উদ্ভাবন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ্যারিসের ৩ মাস পূর্ব্বে উক্ত প্রথা ম্যাথিউস্ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কাজেই সমগ্র জগতে ইংরাজগণই এই বিষয়ে পেটেন্ট গ্রহণে অধিকারী।

সম্প্রতি মেসার্স ষ্ট্রেঞ্জ এবং গ্রেহামের কারখানায় রবার প্রস্তুত হইতেছে। ঠিকানা ৫০ নং সিটিরোড, লণ্ডন। মিষ্টার ই, হ্যালফোর্ড ষ্ট্রেঞ্জ, এম, এস সি, যে সমস্ত রাসায়-

নিকগণ রবার প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সার উইলিয়ম র‍্যামজে উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন। অধ্যাপক পার্কিন, এফ, আর, এস, (ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়) রবার উদ্ভাবনে প্রভৃত কার্য্য করিয়াছেন, এবং তিনি সোসাইটি অফ কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রী নামক সভায় গত ১৭ই জুন তারিখে রবার উৎপাদন ঘোষণা করেন।

আইসোমিল-সুরাসার হইতে রবার উৎপাদন।

আইসোমিল সুরাসার
| + হাইড্রোক্লোরিক এসিড
আইসোমিল ক্লোরাইড
| + ক্লোরিন
আইসোমিল ডাইক্লোরাইড
| — ২ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড
আইসোপ্রিন্
| সোডিয়াম সহযোগে
কৃত্রিম রবার।

শ্বেতসার ইত্যাদি গাঁজাইয়া যে জলীয় পদার্থ পাওয়া যায় তাহা একটি প্রকাণ্ড পাত্রে রাখিয়া (vat) এবং পাত্রের মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া চুয়াইয়া ফেলিলেই ফিউজেল অয়েল উৎপাদিত হয়।

একটী লৌহ নলের মধ্যে চুণ পূর্ণ করিয়া, তাহার ভিতর আইসোমিল ডাইক্লোরাইড ঢালিয়া দিয়া এবং উত্তাপ প্রয়োগে লৌহনল উত্তপ্ত করিলে আইসোপ্রিন্ বায়বীয় অবস্থায় বাহির হইয়া আইসে এবং তাহাকে বরফ সহযোগে তরল করিলেই আইসো-প্রিন পাওয়া যায়। এই আইসোপ্রিন্ কাচের পাত্রে রাখিয়া সোডিয়ামের তার সংলগ্ন করাইলেই ৪।৫ দিনের মধ্যে রবারে পরিণত হয়।

মক্ষিকা।

গৃহস্থের নিকট মক্ষিকার পরিচয় বা আকৃতির বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের অধিকাংশ পীড়ার উৎপত্তির কারণ মক্ষিকা। আজকাল সমস্ত সভ্য জগতেই মক্ষিকা ধ্বংশের জন্য বৈজ্ঞানিকগণ নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি পার্লিয়ামেন্ট মহা সভায়, আফ্রিকা মহাদেশের স্লিপিং সিক্‌নেস সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে সিসি (tsetse) নামক একপ্রকার মক্ষিকা দ্বারা এই রোগের বীজ সুস্থ শরীরে নীত হয়।

দূর দেশের কথা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের দেশেই লোকে মক্ষিকার তাড়নায় আলাতন হইয়া উঠিতেছে। একরূপ মক্ষিকা আমাদিগকে রোগা-ক্রান্ত করে; অন্যরূপ আমাদের শস্য ধ্বংস করে, পুষ্প বৃক্ষ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, খাদ্য দ্রব্য রোগের আধার করিয়া রাখে, আমাদিগকে প্রতিপদে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। প্রকৃতির বনরাজিও মক্ষিকার নিদারুণ কবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। শত শত

পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে দুষ্টের সাধারণ মক্ষিকা (মাছি) এক স্থানের পীড়া ক্রোশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত করিয়া মড়কের সৃষ্টি করে। মক্ষিকা পচা দুর্গন্ধ, অখস্ত পদার্থ ভোজন করিয়া আসিয়া, এবং পদ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা গলিত পদার্থকণা বাহিত করিয়া আনিয়া আমাদের খাদ্যে উপবেশন করে,—খাদ্য কতক্ষণ অবিকৃত থাকিতে পারে? সাধারণের চক্ষে মক্ষিকা কোন কিছু ক্ষতি করিতেছে না বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষিতের নিকট মক্ষিকার ন্যায় মানব জীবনের প্রধান শত্রু অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়। মক্ষিকা যক্ষা, টাইফইড, এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর ব্যাধির বীজ খাদ্যে মিশাইয়া দেয়, আমরা সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া পীড়িত হই।

মক্ষিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রধান উপায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। যে স্থানে ময়লা থাকিবে, মাছির দৌরাত্ম্যও সেই স্থানে বৃদ্ধি পাইবে। ময়লাতেই মক্ষিকার সন্তান সন্ততি বর্দ্ধিত হইবার সুবিধা পায়। গোময় স্তূপ, অশ্বশালার আবর্জ্জনা, বা এই-রূপ সমস্ত পদার্থ কিছুতেই আবাসের নিকটে রাখা উচিত নহে। এ সমস্ত পদার্থ উন্মুক্ত করিয়া রাখা আদৌ কর্ত্তব্য নহে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে বোধ হয় পল্লী অঞ্চলের অর্দ্ধেক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে, এবং অর্দ্ধেক পীড়া হ্রাস পায়।

ভারতবর্ষে প্লেগের ভয়ে বিগত কতিপয় বৎসর লোকে কিরূপ উৎপীড়িত হইয়াছে, তাহার পরিচয় অনাবশ্যক। এখনও স্থানে স্থানে এই দারুণ মহামারী করাল বদন বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই পীড়ার কারণও এক প্রকার মক্ষিকা; এই মক্ষিকা ইন্দুরের গাত্র হইতে রোগ-কণিকা গ্রহণ করে, এবং মানুষকে দংশন করিয়া রোগাক্রান্ত করিয়া তুলে।

জন্ম গ্রহণ করিবার অল্প পরেই স্ত্রী মক্ষিকার সন্তান উৎপাদনের বাসনা অত্যন্ত বলবতী হয়। মক্ষিকার জীবনের উদ্দেশ্যই এই। অন্যান্য ইতর জীবের ন্যায় তাহার তিনটি কার্য্যে জীবন ব্যয়িত হয়। ১ম খাদ্য গ্রহণ, ২য় ভুক্ত খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় অংশের পরিত্যাগ, ৩য় সন্তান উৎপাদন বা ডিম্ব প্রসব। মক্ষিকার জীবন অল্পক্ষণ স্থায়ী। ৫ সপ্তাহের মধ্যেই তাহার জীবনের অবসান হয়।

একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ থলিতে মক্ষিকার ডিম্ব পূর্ণ থাকে। অশ্বশালার আবর্জ্জনা, কিম্বা পুরাতন রাবিশ স্তূপ, অর্থাৎ অল্প গরম, আর্দ্র স্থানই মক্ষিকার প্রসব সূতিকা-গৃহ।

একটি মক্ষিকা প্রতিবারে ১০০ হইতে ১৫০টি ডিম্ব প্রসব করে। যদি তাহার জীবনে কোনরূপে দুর্ঘটনা না ঘটে, যদি মানুষে না মারিয়া ফেলে, টিকটিকি, গিরগিটি বা, অন্যান্য জীবে যদি তাহাকে না খাইয়া ফেলে, অর্থাৎ যদি মক্ষিকা স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনে ৫।৬ বার ডিম্ব প্রসব করে।

প্রথম সন্তান উৎপাদনের পরে অতি অল্প কালেই সে পৌত্র প্রপৌত্র ইত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। কেননা ডিম্ব হইতে অতিশীঘ্র সন্তান সন্ততি বহির্গত হয়, এবং সন্তান সন্ততির অতি অল্পকালেই যৌবন সমাগত হয়। বৃদ্ধা মক্ষিকার জীবন কালেই ২০,০০,০০০ কিম্বা ৩০,০০,০০০ বিশ বা ত্রিশ লক্ষ আত্মীয় কুটুম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ডিম্ব প্রসূত হইবার পরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিম্ব হইতে কীট বাহির হইয়া আইসে। যদি অল্প গরম স্থানে প্রসূত হয়, তাহা হইলে আট ঘণ্টার মধ্যেই ডিম্ব হইতে কীট নির্গত হয়। এইরূপ ভাবেই এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া যায়। আবর্জ্জনা ভক্ষণ করিয়াই কীটগুলি জীবিত থাকে। ক্রমশঃ কীটগুলি মোটা ও দীর্ঘ হয়। ইহা অধিক দীর্ঘ হয় না। এই সময়ে কীটগুলি "খোলস" পরিত্যাগ করে, এবং ইহাদের ক্ষুধা মান্দ্য উপস্থিত হয়। বর্ণ শ্বেত হইয়া উঠে, শরীর সঙ্কুচিত হয়; এবং বাদামী বর্ণের গুটি (chrysalis) বাঁধিয়া যায়। তিন দিনের মধ্যে আর একরূপ পরিবর্ত্তন হয়,—গুটি ভাঙ্গিয়া যায় এবং পূর্ণাঙ্গ মক্ষিকা গুটি হইতে বাহির হইয়া আইসে। ৮ দিনের মধ্যেই সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তবে খাদ্যের প্রাচুর্য্য থাকা, উত্তাপের পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা মক্ষিকার প্রাথমিক জীবনের ব্যাপার তত ভাল করিয়া লক্ষ্য করি না। সে অবস্থায় তাহারা দেখিতেও সুদৃশ্য নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে মক্ষিকা সুন্দর না হইলেও নিতান্ত কুদৃশ্য নহে। মক্ষিকার পদতলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুল সন্নিবিষ্ট থাকে; এই সুদৃশ্য মক্ষিকাই আমাদের বিপদের কারণ। ইহার পদতলে, পদের চুলে, ক্ষুদ্র শরীরের অভ্যন্তরে, মানবের মৃত্যু ও পীড়া লুকায়িত থাকে।

একটি মক্ষিকায় ৬৬,০০,০০০ রোগ বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। একবার ৪১৫টি মক্ষিকা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, গড় পড়তা প্রত্যেকটিতে ১২,২০,৫৭০ রোগ বীজাণু ছিল। কোন সময়ে টাইফয়েড জ্বরের বীজাণুতে একটি মক্ষিকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মক্ষিকা বীজাণু ক্লমষ্টির উপর বসিয়া তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইয়া একটি জিলাটিনের পাত্রে উপবেশন করে। সেই পাত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তাহাতে ৩০,০০০ বীজাণু পতিত হইয়াছে। এই বীজাণুর মাত্র কয়েকটি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য।

উদ্ভিদের হরিৎ-বর্ণ।

বসন্ত সমাগমে প্রত্যেক বৃক্ষই নূতন কিশলয়ে সজ্জিত হইয়া থাকে। প্রথমে অনেক পত্রের বর্ণ হরিৎ থাকে না; কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই সমস্ত পত্রিকার বর্ণই সবুজ হইয়া যায়। বসন্তে বৃক্ষ-লতার সৌন্দর্য্য যেরূপ চিত্তাকর্ষক ও মনোহর হয় এরূপ বোধ হয় আর কোন ঋতুতেই হয় না। বর্ষায় বা অন্য ঋতুতে পত্রের বর্ণ সবুজ থাকে বটে, কিন্তু কোমলত্ব নষ্ট হয়, কাজেই বায়ু প্রবাহে তত দ্রুত স্পন্দিত না হওয়ায় তত নয়নাকর্ষক হয় না। হরিৎ প্রকৃতি দেবীর মৌলিক বর্ণ। হরিৎ ভিন্ন অন্য যে কোন বর্ণে চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, কিন্তু স্বাভাবিক সবুজ বর্ণ চক্ষুর তৃপ্তিকর, এবং অনেক-ক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টি করিলেও চক্ষুর পীড়াদায়ক হয় না। বৃক্ষ পত্র বা উদ্ভিদে যে হরিৎ-বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজী নাম—ক্লোরোফিল, (Chlorophyll)। বাঙ্গালায় ইহাকে উদ্ভিদ-হরিৎ বলা যাইতে পারে। ক্লোরোফিল শব্দের প্রকৃত অর্থ পত্রের হরিৎবর্ণ। কিন্তু সময়ে সময়ে এই হরিৎ বর্ণ পত্র ভিন্ন বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্য-ঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই পত্র হরিৎ অপেক্ষা উদ্ভিদ হরিৎ বলাই যুক্তি সঙ্গত। উদ্ভিদের সহিত এই হরিৎ বর্ণের যে সম্পর্ক তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যদি আমরা একটি পত্রকে রীতিমত পরীক্ষা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, পত্রের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপরি ভাগেই সবুজ বর্ণের আধিক্য রহিয়াছে। পত্রের উপরিভাগ ও নিম্ন-ভাগ কাহাকে বলে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। সমস্ত পত্রই শায়িত ভাবে (horizontal) বৃক্ষ কাণ্ডে বা শাখা প্রশাখায় সজ্জিত থাকে। অবশ্য কোন কোন বৃক্ষে ইহার ব্যতিক্রম হয়। পত্রের যে অংশে সূর্য্যের কিরণ লম্বভাবে পতিত হয় অর্থাৎ আকাশ-অভিমুখ দিক্ পত্রের উপরিভাগ, এবং তাহার বিপরীত দিক অর্থাৎ পৃথিবীর অভিমুখী দিক্ নিম্নভাগ। পত্রের উপরিভাগই অধিকতর সবুজ। পত্রের আড়া আড়ি ভাবে এক অতি পাতলা (প্রায় স্বচ্ছ) অংশ ক্ষুর সহযোগে কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ত্তিত অংশের দুই প্রান্তর আণবিক প্রকোষ্ঠগুলি (cell) হরিৎ বর্ণের কণায় পূর্ণ। উপর অপেক্ষা নিম্নে হরিৎ কণার পরিমাণ, অল্পতর।

প্রয়োজন না হইলেও বৃক্ষের আণবিক প্রকোষ্ঠে (cell) কি কি থাকে, তাহা দেখা যাউক। যদি বৃক্ষের কোন অংশ হইতে (মূল, কাণ্ড, পত্র, ইত্যাদি) অতি পাতলা করিয়া একটি অংশ কর্ত্তন করিয়া অণুবীক্ষণ সহযোগে দর্শন করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে কর্ত্তিত অংশের অভ্যন্তর ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বিনির্ম্মিত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের চতুঃসীমা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীর গুলি অতিশয় পাতলা। প্রকোষ্ঠ অর্দ্ধ তরল ও কণার ন্যায় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ। এই প্রকোষ্ঠ গুলি গোল,

চতুষ্কোণ, ষট্‌কোণ ইত্যাদি নানা অবয়ব-বিশিষ্ট। অনেকেই মধুচক্র (মৌচাক) দেখিয়াছেন। প্রকোষ্ঠগুলি দেখিতে অনেকটা সেইরূপ। বৃক্ষের কচি অংশ হইতে কর্ত্তন করা হইলে প্রকোষ্ঠগুলি প্রোটোপ্ল্যাজম দ্বারা পূর্ণ থাকে। প্রোটোপ্ল্যাজম কি? উদ্ভিদ হউক বা জীবই হউক, সমস্ত চেতন পদার্থের চৈতন্যের বা জীবনী-শক্তির মৌলিক উপাদান প্রোটোপ্ল্যাজম্। আমাদের শরীরে বা উদ্ভিদের শরীরে প্রোটোপ্ল্যাজম্ রহিয়াছে বলিয়াই জীব ও উদ্ভিদ জীবিত। উদ্ভিদের যে অংশ পরীক্ষিত হইতেছে সেই অংশ যদি সবুজ হয়, তাহা হইলে প্রান্তের প্রকোষ্ঠ গুলিতে কতকগুলি সবুজ কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই কণাগুলি গোলাকার। প্রোটোপ্ল্যাজমের কোন বর্ণ নাই; ইহা স্বচ্ছ। উদ্ভিদের সবুজ বর্ণ এই প্রোটোপ্ল্যাজমে নিহিত থাকে। এই উদ্ভিদ হরিৎ জলে দ্রবণীয় নহে। কিন্তু সুরাসার প্রয়োগে উহা দ্রবীভূত হয়। একটি হরিৎ পত্রের কোন অংশ পাতলা করিয়া কাটিলে পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ভিদ হরিৎকণা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৃক্ষের প্রকৃতি ভেদে উপযুক্ত সময় পরিমাণে উক্ত কর্ত্তিত অংশ সুরাসারে ডুবাইয়া রাখিয়া পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, পত্রের গঠনের কোন বিপর্য্যয় হয় নাই কিন্তু প্রোটোপ্ল্যাজমে নিহিত উদ্ভিদ-হরিৎ সম্পূর্ণ নিঃসৃত হইয়া প্রোটোপ্ল্যাজম গুলি স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়িগণ এইরূপে পত্রিকার সবুজ বর্ণ নিষ্কাশিত করিয়া নানাবিধ কার্য্যে লাগাইয়া থাকে। রাসায়নিকগণ এই সবুজ বর্ণকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দুইটি পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, একটির নাম ক্যারোটিন (carotin) অপরটি জ্যান্থোফিল (Zanthophyll)। জ্যান্থোফিল দেখিতে বাদামী বর্ণের, তাহাতে সামান্য হরিদ্রার আভা আছে। অনেক পত্রে হরিৎ ব্যতীত অন্য বর্ণও দেখিতে পাওয়া যায়,—লাল, হরিদ্রা, ইত্যাদি। জ্যান্থোফিল হইতেই এই সমস্ত বর্ণ উৎপাদিত হয়। এই সমস্ত বর্ণও সবুজ বর্ণের ন্যায় প্রোটোপ্ল্যাজমে নিহিত থাকে। অন্য বর্ণযুক্ত প্রোটোপ্ল্যাজমের নাম ক্রোমোপ্ল্যাষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বিভিন্ন বর্ণেও হরিৎ বর্ণ লুক্কায়িত থাকে। সূর্য্যালোক বা বিশুদ্ধ শুভ্র আলোক ব্যতীত উদ্ভিদ হরিৎ উৎপন্ন হয় না। একটি মটর গাছকে অন্ধকারে অঙ্কুরিত করিয়া অন্ধকারেই বর্দ্ধিত করিলে দেখা যায় যে, গাছটি অত্যন্ত লম্বা হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত কৃশ, নিস্তেজ এবং তাহার বর্ণ আদৌ মনোরম হরিৎ নহে, হরিদ্রাভ শ্বেত। কাজেই হরিৎ বর্ণের জন্য সূর্য্য-রশ্মি বা আলোক প্রয়োজন এবং বৃক্ষের পুষ্টি ও শক্তির জন্য হরিৎ বর্ণ প্রয়োজন। একই ভার বিশিষ্ট দুইটি মটর বীজ একইরূপ মাটীতে রোপণ করিয়া একটিকে আলোকে এবং অপরটিকে অন্ধকারে রাখিলে দেখা যায় যে, অন্ধকারের গাছটি লম্বা, হরিদ্রাভ শ্বেত, নিস্তেজ ও বিশ্রী হইয়া গিয়াছে; আলোকের গাছটি খর্ব্ব, মনোরম হরিৎ, সবল এবং সুশ্রী হইয়াছে। অন্ধকারের গাছটি কিছু দিন পরে মরিয়া যাইতে পারে; কোন

বিঘ্ন না হইলে আলোকের গাছটি সবল ও সুস্থ থাকিয়া ফল উৎপাদন করিবে।

বৃক্ষের ছালে অনেক ছিদ্র আছে, সেগুলি অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক। ইংরাজিতে ইহাদিগকে লেণ্টিসেল (lenticell) বলে। উদ্ভিদের যে অংশ সবুজ অর্থাৎ কচি শাখা প্রশাখা ও পত্র তাহাতেও ছিদ্র থাকে, কিন্তু তাহারা লেণ্টিসেল নহে; তাহাদের নাম ষ্টোমা; এই ষ্টোমাই বৃক্ষের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র স্বরূপ। জীবিত পদার্থ মাত্রেরই অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। আমরা নিশ্বাস দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করি। সেইরূপ ষ্টোমা ও লেণ্টিসেল দিয়া অক্সিজেন উদ্ভিদের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং অবিশুদ্ধ খাদ্য সমূহকে শোধিত করিয়া উদ্ভিদের শরীর পোষণের উপযোগী করে। ষ্টোমা দ্বারা আরও একটি বায়বীয় পদার্থ প্রবিষ্ট হয়, ইহা কারবন্-ডাইঅক্সাইড। কারবন্-ডাইঅক্সাইড কিরূপ বায়বীয় পদার্থ তাহা অনেকেই জানেন। আমরা শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করি, কারবন্-ডাইঅকসাইড পরিত্যাগ করি। কারবন্-ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত নহে, কিন্তু ইহার শ্বাস গ্রহণ করিলে আমরা হাঁপাইয়া পড়ি, অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হই। কারবন ও অক্সিজেন সংযুক্ত হইয়া কারবন্-ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত হয়। কোন পদার্থ পুড়িয়া যাইতেছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে, পদার্থ অক্সিজেনের সহিত সম্মিলিত হইতেছে। কারবন অর্থাৎ অঙ্গার বা কয়লা দগ্ধ করিলে, ইহা অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক সম্মিলিত হয়; এবং দগ্ধকালে যে বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই কারবন-ডাইঅকসাইড। আমাদের শরীরে অক্সিজেন প্রবেশ করিয়া, শোণিতের অবিশুদ্ধ অংশকে দগ্ধ করিয়া প্রশ্বাসরূপে বহির্গত হয়। শোণিত খাদ্য-কণা দ্বারা প্রস্তুত। কাজেই শোণিতে উদ্ভিজ্জের উপাদানই অধিক। উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাত্রেই অঙ্গারক (Carbon) পদার্থ অধিক। অক্সিজেন এই অঙ্গারক পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া প্রশ্বাসরূপে ফিরিয়া আসে। কাজেই আমরা গ্রহণ করি অক্সিজেন, পরিত্যাগ করি কারবন-ডাইঅক্সাইড।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উদ্ভিদের অধিকাংশই অঙ্গার (কারবন); মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ যে খাদ্য পায় তাহাতে অঙ্গার থাকে না; খনিজ যৌগিক ও অন্যান্য পদার্থের দ্রাবণ মিশ্রিত থাকে। তবে বৃক্ষের অঙ্গার কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? এই সমস্ত ষ্টোমা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ব্যতীত কারবন্ ডাইঅক্সাইডও বৃক্ষের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উদ্ভিদের সবুজ অংশে উদ্ভিদ হরিৎ বর্ত্তমান আছে। এই উদ্ভিদ হরিৎ বৃক্ষের ত্বকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী আণবিক প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান থাকে, এবং ষ্টোমা ত্বকেই (epidermis) বর্ত্তমান থাকে। কারবন-ডাইঅক্সাইড ষ্টোমা দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াই যে সমস্ত আণবিক প্রকোষ্ঠে উদ্ভিদ হরিৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে তথায় প্রবেশ করে। প্রবেশ করিলেই আলোকের সাহায্যে উদ্ভিদ হরিৎ এই কারবন-ডাইঅক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কারবণ অর্থাৎ অঙ্গার গ্রহণ করে এবং অক্-

সিজেন পরিত্যাগ করে। আলোক বা উদ্ভিদ হরিৎ না থাকিলে কারবন্-ডাইঅক্-সাইড বিশ্লিষ্ট হয় না। সেই জন্যই অন্ধকারে বর্দ্ধিত গাছ পালা রুগ্ন ও নিস্তেজ হইয়া যায়। চলিত কথায় আমরা বলিয়া থাকি— গাছে "আওতা" লাগিয়াছে। অর্থাৎ গাছে আলোক রীতিমত পতিত না হওয়ায় ইহার শরীর পুষ্টির জন্য রীতিমত অঙ্গারক খাদ্য পাইতেছে না, কাজেই মৃত প্রায় হইয়া আসিতেছে।

কারবন্-ডাইঅক্সাইড হইতে গৃহীত অঙ্গার বৃক্ষের অভ্যন্তরে নানাবিধ প্রক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্বেতসার (starch) ও শর্করায় পরিণত হয়। বিশ্লিষ্ট বিশুদ্ধ অক্সিজেন বায়ু-মণ্ডলে ফিরিয়া আসে।

দেখা যাউক এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জগতের কি মহান কল্যাণ সাধিত হইতেছে। জীবিত পদার্থ দুই প্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম; স্থাবর—উদ্ভিদ; জঙ্গম— প্রাণী। প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন অতিশয় প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদের শরীর পোষণের জন্য কারবন-ডাইঅক্সাইড সেইরূপ প্রয়োজনীয়। আমরা বায়ু-মণ্ডল হইতে অক্-সিজেন গ্রহণ করি, কারবন-ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করি; বৃক্ষ কারবন-ডাইঅক্-সাইড গ্রহণ করে, অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। যদি এইরূপ স্বাভাবিক আদান প্রদান না থাকিত, তাহা হইলে বায়ু-মণ্ডল অক্সিজেনে অথবা কারবন-ডাইঅক্-সাইডে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। পৃথিবীও জীব জন্তু উদ্ভিদাদি চেতন পদার্থের আবাস ভূমী হইতে পারিত না।

আলোক না থাকিলে উদ্ভিদ কারবন-ডাইঅক্সাইড বিশ্লিষ্ট করিতে পারে না। অন্ধকারে অর্থাৎ রত্রিতে উহোরা প্রাণিগণের ন্যায় ঠিক শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে, অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং কারবন-ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। সেই জন্য দিবসের প্রচণ্ড আলোকে বৃক্ষতলে বাস স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি বিধায়ক, এবং রজনীতে বিঘ্নকারক না হইলেও মঙ্গল প্রদ নহে

এরূপ অনেক উদ্ভিদ রহিয়াছে যাহাদের আদৌ উদ্ভিদ হরিৎ নাই। একরূপ পরগাছা (Parasite) আছে, তাহাদের বর্ণ আদৌ হরিৎ নহে। ছত্রক (ব্যাঙ্গের ছাতা— Mushroom) ইত্যাদিও একরূপ উদ্ভিদ; ইহাদেরও বর্ণ হরিৎ নহে। ইহারা কারবণ ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে না। অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং কারবণ ডাই অকসাইড পরিত্যাগ করে।

উদ্ভিদ হরিৎএর ব্যাপার হইতে আমরা একটি অমূল্য নীতি শিক্ষা পাই। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতিদেবী নীরবে এবং সম্পূণ গোপনে ও এক মুহূর্ত্তের জন্য অখণ্ড বিধাতৃ বিধান লঙ্ঘন না করিয়া জীবজগতের কি মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া যাইতেছেন। এই নিয়মানুবর্ত্তিতাই জগদীশ্বরের মহান আদেশ।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

জড়জগতের সহানুভূতি।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যে কয়েকটি মানসিক ধর্ম্ম জীবজগতের ক্রিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে নিয়ত বিপথ হইতে টানিয়া আনিয়া গন্তব্য পথের পথিক করিয়া দিতেছে, তন্মধ্যে সহানুভূতির সর্ব্বাধিক প্রভাব লক্ষিত হয়। জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত মানবের স্বার্থ-চিন্তার পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে; আত্মচিন্তার সহিত লোকে পরিবারের বিষয় চিন্তা করে; ক্রমে ইহা আত্মসমাজ চিন্তা হইতে মানব-সমাজ-বিষয়ক চিন্তায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কুসংস্কার-বিমুক্ত সহানুভূতির চরম-পরিণতিও এইরূপ। ইহাই সমাজের বন্ধন; বস্তুতঃ, চিত্তের এই মহতী বৃত্তিটির সাহায্যে বিধাতা বিবিধ কৌশলে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধিত করিতেছেন। এই বৃত্তি একদিকে যেরূপ সমাজের স্তম্ভস্বরূপ প্রতীয়মান হয়, অনুধাবন করিলে ইহাকেই আবার সমাজের বিবিধ অনিষ্টোৎপত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানব স্থূলদৃষ্টি; বৈষম্যের মধ্যে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা সুনিরূপিত করা আমাদের সর্ব্বথা সুসাধ্য নহে; সেই জন্যই বোধ হয়, পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হয় নাই; অথবা সুখ ও দুঃখের মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য নাই; উভয়ই চিত্তের বিকারজনিত।

যাহা হউক, কোনরূপ দার্শনিক কিম্বা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে; সুতরাং আর অনর্থক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিব না।

মানব এবং মানবের মত প্রাণীর চিত্তে যে সহানুভূতি বর্ত্তমান সেইরূপ কোন বৃত্তি জড়জগতে বিদ্যমান কিনা আমরা তাহার তথ্যানুসন্ধান করিতে বসি নাই। বৃত্তির উল্লেখ করিতে হইলে আমাদিগকে বিজ্ঞানের বিচারালয়ে প্রথমে জড়ের চিত্তের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে; এবং যদিও উদ্ভিদের প্রাণ আছে সত্য বটে, তথাপি এ যাবত আমরা উদ্ভিদের চিত্তের বিষয় কিছুই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই।

তবে জড় জগতে সহানুভূতি কিরূপ? তারের বাদ্য যন্ত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, যদি একসুরে দুইটি তার বাঁধা থাকে, তবে একটি বাজাইলে সেই সুরে স্বতঃই অপরটি বাজিয়া উঠে।

গম্ভীরনাদি-সাগরোপকূলে দাঁড়াইয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ অনন্তবিস্তার নীলাম্বুরাশির মাহাত্ম্যমহিমা দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতিতনয়া দর্শনে নবীন ভাবুকের চিত্তে যে ভাবের উদয় হইল তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

"বিচিত্র হৃদয় যন্ত্রের তন্ত্রীমিচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণী-কণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয় বিশিষ্ট হয়।"

কবি বর্ণিত একস্বরে বাঁধা চিত্তের উচ্ছ্বাসের কোন অপরূপ সাদৃশ্যের অনুভূতি বশতঃ কবিত্বের ভাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া যদি আমরা পাঠকের বিরক্তি-ভাজন হইয়া থাকি, তবে সহৃদয় পাঠক আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। জড়জগতে সহানুভূতির উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা কোনরূপ মৌলিক গবেষণা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। যাহা হউক, তারের যন্ত্রের যে ধর্ম্মটি লক্ষিত হইল, উহা যে শুদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের শ্রেণী-বিশেষেই আবদ্ধ এরূপ নহে। যন্ত্র মাত্রেই এই ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। হারমোনিয়মে একটি স্বর বাজাইলে তৎসন্নিহিত অন্য যন্ত্রেও সেই স্বর ধ্বনিত হয়; আবার প্রত্যেক স্বরের (tone) সহিত তাহার অষ্টম (octave) পঞ্চম (fifth) প্রভৃতি স্বরপরম্পরা (over tones) অতিশয় ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হয়; সঙ্গীত বাদ্যবিশারদ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। শ্রুতিশক্তি যথাযথ অনুশীলিত ও শক্তি-সম্পন্ন হইলে (musical eduction) এই শ্রেণীর মিশ্র স্বর (note) বিশ্লেষণ (analysis) করিতে সমর্থ হয়। এরূপ অনুশীলন ও শিক্ষা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সচরাচর যে সকল স্বর শ্রুত হয় সেগুলি অবিমিশ্র নহে। ফুস্‌ফুস সাহায্যে যে সকল যন্ত্র (vocal instruments) বাদিত হয়, সেগুলির পক্ষেও উল্লিখিত মন্তব্য প্রযোজ্য।

বাদ্যযন্ত্রের এই ধর্ম্মটী সমগ্র বিজ্ঞান রাজ্যেই প্রভূত প্রভাবশালী।

আমরা একটী গল্প শুনিয়াছি যে, কোন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবাদ্যবিশারদের একমাত্র পুত্র প্রত্যহ বিদ্যালয় হইতে পলাইয়া পিতার অনুপস্থিতি সুযোগে গীতবাদ্যে সময় নষ্ট করিত। একদিন সন্ধ্যাকালে সঙ্গীত বাদ্যাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বাদ্যযন্ত্রগুলি দারুময় তক্তাপোষের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নিকটস্থ মৃদঙ্গে আঘাত করিবা মাত্র যুগপৎ সমস্বরে যন্ত্র সমূহ বাজিয়া উঠিল। পিতা অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন যে দ্বিপ্রহরে পুত্র যন্ত্রগুলি বাঁধিয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতে তিনি পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্ত্তে সঙ্গীত শাস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ইহার মূলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে তবে উহা উক্ত সহানুভূতিমূলক ধর্ম্মের (resonance) ভিত্তির উপর স্থাপিত। আহত মৃদঙ্গে যে তরঙ্গশ্রেণী উৎপন্ন হইল, তাহা কাষ্ঠের ভিতর দিয়া পরিবাহিত হইয়া বিভিন্ন যন্ত্র সমূহে তুল্য ধর্ম্মাক্রান্ত ঊর্ম্মিপরম্পরা সৃজন করিল। যে কারণে একস্বরে বাঁধা দুইটি তারের মধ্যে একটি বাজাইলেই অপরটি বাজিয়া ছিল, সেই কারণেই এ ক্ষেত্রে যন্ত্রসমূহ ধ্বনিত হইল।

অর্দ্ধহস্তপরিমিত ব্যাসবিশিষ্ট একটি দীর্ঘ জলপাত্রের উপর একটি স্পন্দনশীল পদার্থ ধরিয়া সেটিকে আঘাত করিয়া যদি শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করা যায়, এবং জলপাত্রটিকে ধীরে ধীরে জলপূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে পরিশেষে এরূপ দৈর্ঘ্য পাওয়া যাইবে যাহা স্পন্দনশীল দ্রব্যটির তুল্য শব্দতরঙ্গ উৎপাদনে সক্ষম। তখন জলপাত্রটিও কম্পমান পদার্থের তুল্য শব্দতরঙ্গ উত্থিত করিয়া সমস্বরে ধ্বনিত (resonate) হইতে থাকিবে।

পর্ব্বতের গুহায় বাতাস লাগিলে অনেক সময়ে এরূপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে স্পন্দনশীল পদার্থ বায়ু।

ফুস্‌ফুস্‌সাহায্যে যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাদিত হয়, সে গুলির শব্দোৎপত্তির হেতু উক্ত ধর্ম্মে নিহিত।

এই শ্রেণীর যন্ত্রগুলি দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণীতে রীড নাই; অপরে রীড আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বাদ্যে রীডের কার্য্য অধরোষ্ঠ সম্পন্ন করে। আমরা চেষ্টা করিয়া এরূপ ভাবে ফুঁ দিই যে, মুখ নিঃসৃত বায়ু প্রতি সেকেণ্ডে যতবার স্পন্দিত হয়, নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট যন্ত্রবিবরস্থ বায়ু সেই সংখ্যক স্পন্দনক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃ শব্দায়িত হইতে সক্ষম হয়।

কিরূপে ইহা সংঘটিত হয় নিম্ন লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে তাহার স্থূল ধারণা করা যাইতে পারে।

মনে করুন দুইটী সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সূত্রের প্রান্তভাগে দুইটি ক্ষুদ্র লৌহগোলক বাঁধিয়া রবার নির্ম্মিত অবলম্বন হইতে লম্বমান ভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। এক্ষণে একটি গোলককে মৃদুভাবে আঘাত করিলে সে'টি ঘটিকা যন্ত্রের পেণ্ডুলামের ন্যায় আন্দোলিত হইতে থাকিবে; সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গোলকটি প্রথমে মৃদুভাবে স্পন্দিত হইতে হইতে পরিশেষে প্রথমটির ন্যায় বেগে আন্দোলিত হইতে থাকিবে। দ্বিতীয় পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্য যদি প্রথমটির দৈর্ঘ্য হইতে ভিন্ন হইত তাহা হইলে এরূপ বেগে সেটি আন্দোলিত হইত না; উভয়ের স্পন্দনের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইত। এক সময়ে উভয়ে একদিকে স্পন্দিত হইত; অন্য সময়ে বিপরীত দিকে স্পন্দিত হইত: সুতরাং একের স্পন্দন অপরের পক্ষে সর্ব্বদা অনুকুল হইত না।

ইহার কারণ এই যে, পেণ্ডুলামের একবার স্পন্দিত হইতে যে সময় লাগে তাহা উহার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্যের সহিত যে স্পন্দনের সময় বৃদ্ধি পাইতে থাকে ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মনে করুন একটী পেণ্ডুলাম স্থির-ভাবে ঝুলিতেছে; এক্ষণে গোলকটিকে মৃদুভাবে আঘাত করা গেল; ফলে পেণ্ডু-লামটি ধীরে ধীরে দুলিতে থাকিবে; দোদুল্যমান পেণ্ডুলাম যখন সম্পূর্ণ স্পন্দনক্রিয়া সমাধা করিয়া পুনর্ব্বার সম্মুখে অগ্রসর হইবে, সেই মুহূর্ত্তে গোলকটিকে যদি আহত করা যায়, তাহা হইলে স্পন্দনবেগ বর্দ্ধিত হইবে; কিন্তু, ইহাতে সময়ের (period) তারতম্য হয় না; শুদ্ধ স্পন্দনের আনুকূল্য সাধিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে পেণ্ডুলামটি অধিক স্থান জুড়িয়া দুলিতে থাকে। পূর্ব্ব পরীক্ষায় যে পেণ্ডুলাম প্রথমে দোদুল্যমান হইল সেটি একবার স্পন্দিত হইয়া যখন দ্বিতীয়বার স্পন্দিত হইবার উপক্রম করিল তখন একটি তরঙ্গ রবার নির্ম্মিত অবলম্বনের ভিতর দিয়া পরিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় সম-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পেণ্ডুলামটিকে আঘাত করিল; ফলে দ্বিতীয় পেণ্ডুলাম অতিশয় ধীরে

দুলিতে থাকিল; দ্বিতীয়ের দৈর্ঘ্য প্রথমটীর দৈর্ঘ্য হইতে অভিন্ন হওয়াতে দ্বিতীয়-স্পন্দন উভয়ে এক সময়ে সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার একদিকে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সুতরাং পূর্ব্ববৎ আর একটি তরঙ্গ প্রথমটি হইতে আসিয়া দ্বিতীয়টিকে আঘাত করিল, এবং দ্বিতীয়টি হইতেও একটী তরঙ্গ একসময়ে প্রথমটিতে সঞ্চালিত হইল। এইরূপে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যলব্ধ বেগ নিজস্ব করিয়া লইয়া উভয়ে পরিশেষে তুল্যবেগে দোদুল্যমান হইল। এ ক্ষেত্রে সূত্রের দৈর্ঘ্যের ভিন্নতা থাকিলে যে সর্ব্বদা উভয়ে উভয়ের স্পন্দনের পক্ষে অনুকূল তরঙ্গ পরম্পরা প্রেরণ করিত না এবং ফলে স্পন্দনের বিঘ্ন ঘটিত ইহা সহজেই অনুমেয়।

পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের সহিত পূর্ব্বপরীক্ষায় বর্ণিত "জলপাত্রের" দৈর্ঘ্য তুলনীয়।

সেতারের একস্বরে বাঁধা দুইটি তার এই কারণেই একটি বাজাইলেই অন্যটি বাজিতে সক্ষম হয়। আহত তারের স্পন্দননিবন্ধন যে তরঙ্গ পরম্পরা যন্ত্রের দারুময় শরীরের মধ্য দিয়া অনাহত তারে পরিবাহিত হইল, উহা উভয়ের স্পন্দনের পক্ষেই অনুকূল। সুতরাং দ্বিতীয় তারটিও কম্পিত হইতে থাকিল। এইরূপ যুক্তি-প্রয়োগে পূর্ব্ববর্ণিত "জলপাত্রের" শব্দান্বিত হইবার হেতু নির্ণীত হইতে পারে।

তাপবিজ্ঞানেও এই সহানুভূতিমূলক ধর্ম্মের প্রভাব লক্ষিত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গৃহমধ্যে কোন উত্তপ্ত পদার্থ থাকিলে নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকল পদার্থই অল্পবিস্তর পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। সৌরকরজালে কাষ্ঠখণ্ড ও লৌহখণ্ড স্থাপিত হইলে, দ্বিতীয় পদার্থ অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হয়। এই তারতম্যের হেতু উক্ত সহানুভূতিমূলক ধর্ম্মেই নিহিত।

শব্দবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার একপ্রকার স্থূল ধারণা করা যাইতে পারে।

মনে করুন একটি স্পন্দনশীল পদার্থ হইতে কিয়দ্দূরে আর একটি স্পন্দনশীল পদার্থ স্থাপিত হইল। দ্বিতীয় পদার্থ যদি প্রথমটির অনুরূপ হয়, তাহা হইলে প্রথমটি স্পন্দিত হইলে তৎপ্রেরিত তরঙ্গসংঘাতে দ্বিতীয়টিও স্পন্দিত হইতে থাকিবে। দ্বিতীয়ের স্পন্দনের বেগ প্রথমে মন্দ হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে দ্রুত হইবে; ফলে প্রথমটির শক্তির (energy of vibration) অপচয় ও দ্বিতীয়ের বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; পরিশেষে যখন উভয়ে সমভাবে স্পন্দিত হইবে, তখন পরস্পরের ক্ষতি এবং লাভের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে।

এ ক্ষেত্রে স্পন্দনশীল ও নিশ্চল পদার্থ যথাক্রমে উত্তপ্ত ও শীতল পদার্থের সহিত তুলনীয়। পদার্থের অণুসমূহ (molecules) অসংখ্য স্পন্দনশীল বস্তুর সহিত তুলনীয়। শীতল পদার্থকেও অনুরূপ স্পন্দনক্ষম দ্রব্যসমষ্টিরূপে ধারণা করিতে হইবে। উত্তপ্ত পদার্থের অণুগুলি ঘটিকার পেণ্ডুলামের ন্যায় অতিক্রত স্পন্দিত হইতেছে; ইহার সমুদ্র তরঙ্গান্বিত হইয়া শীতল পদার্থের অণুসমূহে তাপতরঙ্গ সঞ্চালিত করিতেছে;

শীতল পদার্থের যে সকল অণু উত্তপ্ত পদার্থের কম্পমান অণুর অনুরূপ সেগুলি তাপ-তরঙ্গ গ্রহণ (absorb) করিয়া স্পন্দিত হইতে থাকিবে; সুতরাং একের শক্তি ব্যয়িত ও অপরের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। অর্থাৎ উত্তপ্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া শীতল পদার্থকে উত্তপ্ত করিবে; পরিশেষে, উভয়ের তাপমাত্রা সমান হইবে।

এই সহানুভূতিমূলক ধর্ম্ম প্রভাবেই বিংশ শতাব্দীতে তড়িদ্বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি বিধান সম্ভবপর হইয়াছে। যে সকল যুগান্তকারী পরীক্ষা সাহায্যে বর্ত্তমান যুগে তারহীন টেলিগ্রাফি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে, সেই সকলের মূলে একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নীতির প্রভাব লক্ষিত হয়। যদি অবিকল অনুরূপ দুইটি বিদ্যুত্তরঙ্গোৎপাদক যন্ত্র নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে একটিতে তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ বাহির করিলে, ইথার আন্দোলিত হইয়া দূরস্থ যন্ত্রটিকে তরঙ্গাহত করিবে; সেটিতেও অনুরূপ স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইব। ইহার মূলে যে নীতি বর্ত্তমান, তাহারই সাহায্যে তারহীন টেলিগ্রাফি সম্ভবপর হইয়াছে।

আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কয়েকটিমাত্র বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তির উপর সংস্থাপিত; তন্মধ্যে সহানুভূতিমূলক ধর্ম্ম (principle of resonance) অন্যতম। বৈজ্ঞানিক নীতিসমূহের সংখ্যার হ্রাসসাধন করতঃ বিজ্ঞানকে একটিমাত্র নীতির উপর গঠিত করা বিজ্ঞানানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীনির্ম্মল কুমার সেন।

ময়দা আটা ও সূজি।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে জাঁতা দ্বারা গম চূর্ণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত হইত। বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থলে এখনও উক্ত প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহাতে ময়দা অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হয় ও ময়দাতে অনেক বালি, কাঁকর ইত্যাদি থাকিয়া যায়। কলিকাতা ও অনেক বড় বড় সহরে আজকাল তড়িৎ-শক্তি দ্বারা গম হইতে ময়দা প্রস্তুত হয়, কিন্তু সে ময়দা প্রায়ই লাল; কেননা, যে সমস্ত প্রথা অবলম্বন করিলে ময়দা শুভ্র ও পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, ইহাতে তাহা অবলম্বন করা হয় না।

আজকাল আমাদের দেশের প্রধান প্রধান নগরে বৈজ্ঞানিক মতে প্রস্তুত আধুনিক যন্ত্রাদি সাহায্যে ময়দা প্রস্তুত হইতেছে। ইউরোপের দেশ-সমূহে ময়দা প্রস্তুত করিবার জন্য যে গম সংগৃহীত হয়, তাহাতে প্রথম হইতেই অন্য কোন পদার্থের বীজ

বা অন্য কিছু মিশ্রিত থাকে না। কেননা কৃষকগণ উন্নত প্রণালীতে গম সংগ্রহ করে। আমাদের দেশে এখনও প্রাচীন ও মৌলিক প্রথানুসারে গম সংগৃহীত হয় বলিয়া, গমে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

কলে যে ময়দা প্রস্তুত হয়, তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন কালেই হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। গম বাছাই, ছাঁটাই, যাহা কিছু সমস্তই কলের দ্বারা আপনা আপনি সম্পন্ন হয়। সমস্ত যন্ত্রাদি অতি যত্নের সহিত চাপা দেওয়া থাকে। কলের গাত্রে বা কলের আবরণের গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা থাকে; সেই সমস্ত জানালা সাহায্যে কলের তত্ত্বাবধারক ইচ্ছা করিলে, যখন তখন ময়দার অবস্থা দেখিয়া লইতে পারেন। কল পরিচালিত হইলে কল-ঘরে ময়দার গুঁড়া বা ধূলা বা বালী যাহাতে আদৌ উড়িতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা থাকে। সমস্ত দিবা রাত্রিই কল পরিচালিত হয়। একটা সাধারণ কুল হইতে প্রতিদিন প্রায় ২৭০০ মণ ময়দা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ময়দা বিশুদ্ধ শুভ্র করিতে হইলে ও ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে হইলে, ময়দার জন্য সংগৃহীত গম হইতে অন্যান্য শস্য বা শস্যের বীজ, কর্দ্দম, ঢিল, প্রস্তর বা কঙ্কর বিদূরিত করা বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আমাদের দেশে অতি প্রাচীন ও মৌলিক প্রথানুসারে গম সংগৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া, এই সমস্ত অনাবশ্যক জঞ্জাল গমের সহিত প্রচুর পরিমাণে থাকিয়া যায়। গম ঝাড়িবার সময় ও গম গাছ কাটিবার সময় সাবধান হইলে, জঞ্জাল অনেক পরিমাণ অল্প হইয়া থাকে। জঞ্জাল থাকে বলিয়া, বিশুদ্ধ শুভ্র ময়দা প্রস্তুত করিবার জন্য, গম হইতে জঞ্জাল দূর করিবার নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। জঞ্জাল সমেত গম প্রথমে "সেপারেটর" (separator) নামক এক প্রকার যন্ত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা গম হইতে যাবতীয় রাবিশ, কঙ্কর, ঢিল, ইত্যাদি দূরীভূত হইয়া যায়। এমন কি গম গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাঁটা, অন্যান্য শস্যের বীজ, মটর, ছোলা, সরিসা, বালুকা ইত্যাদিও দূরীভূত হয়। পরে বাষ্পের দ্বারা পরিচালিত একটা পাখার সাহায্যে তুঁষ, অল্পভার গম, এবং গম অপেক্ষা লঘুতর পদার্থ উড়াইয়া দেওয়া হয়।

এইরূপ জঞ্জাল শূন্য গমকে অতঃপর অন্য একটি যন্ত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্র সাহায্যে গম হইতে খড়, যব, যৈ নিষ্কাশিত হয়। অন্য একটি যন্ত্র দ্বারা সরিসার দানা, ডাইল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর এবং গম অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনের পদার্থ দূরীভূত হয়। পরে অন্য একটি যন্ত্রে ফেলিয়া দিলে গম অপেক্ষা অল্প দৃঢ় অথচ চূর্ণতা-প্রবণ পদার্থ,—যেমন মাটী ইত্যাদি, চূর্ণ হইয়া যায় এবং পাখার সাহায্যে সেই সমস্ত চূর্ণ পদার্থ বিদূরিত হয়। মাটি ইত্যাদি বিদূরিত হইলে এই যন্ত্র দ্বারাই গম গুলিকে পালিশ করিয়া (ছাঁটাই) লওয়া হয়। এইরূপ তিনটি যন্ত্রের দ্বারা গম জঞ্জাল নির্মুক্ত হইলে, গমগুলি হইতে প্রস্তর বিদূরিত করিবার জন্য আর একটি যন্ত্রে ঢালা হয়। এই যন্ত্রে বড় বড় প্রস্তর

দূরীভূত হয়. এবং অবশেষে গমগুলি রীতিমত ধৌত হইয়া যায়। আর একটি যন্ত্রে ফেলিয়া গমের গাত্র হইতে যাবতীয় জল নষ্ট করা হয়।

অবশেষে শুষ্ক করিবার যন্ত্রে গমগুলিকে ফেলিয়া অত্যুত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত করা হয়, এই বাতাস সংস্পর্শে গমগুলি সম্পূর্ণ নীরস হইয়া উঠে। এইরূপে শুষ্ক হইলে পুনরায় আর একটি যন্ত্রে গম গুলিকে ঢালিয়া দেওয়া হয়, এই যন্ত্রে গম গুলিকে পালিশ করিবার বুরুশ থাকে; গমগুলি হইতে এই বুরুশ সাহায্যে অবশিষ্ট খোসা ইত্যাদি এবং যাবতীয় ময়লা বিনষ্ট হয়। এইবারে গমগুলি জাঁতার উপযুক্ত হয়।

পুরাতন প্রথা অনুসারে গমগুলিকে জাঁতায় ফেলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে গমগুলিকে "রোলার"এ (roller) ফেলিয়া দেওয়া হয়। দুইটি স্থূল, দৃঢ়, গোলাকার লৌহের চোঙ্গা পাশাপাশি শায়িত থাকে। দুইটি চোঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানের হ্রাস বৃদ্ধি করিবার উপায় আছে। এই ব্যবধানের মধ্য দিয়া গমগুলি গমন করে। গমন করিবার কালে চোঙ্গাগুলি আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আবর্ত্তন-কালে গমগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। চোঙ্গা দুইটির ব্যবধান ৪ প্রকার করা যায়। প্রথম ব্যবধানে অর্থাৎ দুই চোঙ্গার ব্যবধানের দূরত্ব যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে, তখন গমগুলি তাহার ভিতর দিয়া গমন করিলে গমগুলি সামান্য চূর্ণ হয়। এই অল্প চূর্ণ গম চালুনী যন্ত্রে ফেলিয়া দিলে যে গম চূর্ণ বাহির হইয়া আইসে, তাহাই সুজী। সুজী বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ গমগুলিকে যন্ত্রে ফেলিয়া দিয়া ব্যবধানের আধিক্য হ্রাস করা হয়। এই ব্যবধানের মধ্য দিয়া চূর্ণ গমগুলিকে উপর্য্যুপরি ৪ বার চালান হয়। গমের গাত্রের খোসাগুলি যন্ত্রে সংলগ্ন চটের থলিতে আসিয়া জমা হয়, এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য রক্ষা করা হয়।"

গম হইতে সুজী উৎপাদিত হইলে সুজীগুলিকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রকে "সুজী-সংশোধক" যন্ত্র বলে। সুজীতে নানারূপ জঞ্জাল মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে ময়দার খোসা, আটা, ধূলীকণা, কঙ্করচূর্ণ ইত্যাদিই প্রধান। এই সংশোধক-যন্ত্রে একটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর চালুনী এবং একটি পাখা থাকে। এই পাখা অতি দ্রুত আবর্ত্তিত হইয়া অতি প্রবল বায়ুবেগ উত্থিত করে। এই বায়ু-প্রবাহ সাহায্যে যাবতীয় ধূলী, বালি ও অন্যান্য জঞ্জাল নিষ্কাশিত হইলে চালুনী সহযোগে সুজী ছাঁকা হইয়া যায়। সুজীই গমের সর্ব্বাপেক্ষা মোটা দানা।

অতঃপর এই সুজীকে সুমসৃণ রোলারের মধ্য দিয়া চালিত করা হয়। তখন সুজীগুলি সামান্য চূর্ণ হইয়া যায়। এই চূর্ণতর সুজীকে একটি সেণ্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে (centrifugal flour-dressing machine) ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রে অতি সূক্ষ্ম একটি রেশমের চালুনী থাকে। এই চালুনী দ্বারা ছাঁকা হইলে যাহা বাহির হইয়া আইসে, তাহাই অতি সুপরিষ্কৃত সূক্ষ্ম ময়দা। ময়দা বাহির হইয়া আসিলে

যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত মোটা ছাঁকনীর দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া হয়। যে গুলি অপেক্ষাকৃত মোটা, সেগুলিকে পুনরায় সংশোধক যন্ত্রে ঢালিয়া এবং অবশেষে রোলারে চূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। অবশেষে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে পুনরায় ঢালিয়া দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া মিহি ময়দা বাহির করা হয়। অতঃপর ময়দাকে বস্তাবন্দী করিয়া বিক্রয়ার্থে গুদামজাত করা হয়। অবশিষ্ট মোটা দানা ময়দাকে আটা বলে।

ময়দার কারখানায় কোন দ্রব্যই বৃথা নষ্ট হয় না। যে সমস্ত কঙ্কর বাহির হয়, সেগুলি ধনবানগণের উদ্যানের পথ সজ্জিত করে। খোসাগুলি গবাদি গৃহ পালিত জন্তুর অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ময়দার কারখানায় অনেক লোক বা শ্রমজীবি নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। যন্ত্রাদিতে তৈল প্রদান করা, ময়দা কলে ঢালিয়া দেওয়া, অথবা বস্তাবন্দী করিয়া ময়দাকে গুদাম জাত করা, এই কয়েকটি কার্য্য ব্যতিরেকে অন্য কার্য্যের জন্য লোকের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ময়দার মূল্য কিছু অধিক, এবং আটা ও সুজীর মূল্য কিছু অল্প। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ময়দার সের ৵ আনা। গম ক্রয় করিবার সময় গমে যে জঞ্জাল থাকে, সেই সমেত ক্রয় করিতে হয়। কাজেই তিন আনায় এক সের উৎকৃষ্ট ময়দা অধিক দাম বলিয়া মনে হয় না। জঞ্জাল না থাকিলে ময়দা সেরকরা এক আনা সুলভ হইতে পারিত।

ময়দা ছাঁকিবার জন্য যে রেশমের ছাঁকনী ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এক গজের মূল্য প্রায় ১৫৲ টাকা। প্রতি মাসে ২০০ গজ এইরূপ রেশমের ছাঁকনী প্রয়োজন হয়। এতদ্ব্যতীত যন্ত্রাদি খরিদ, মেরামত, কারখানার তত্বাবধারক, কল পরিচালক, শ্রমজীবিগণের বেতন রহিয়াছে। ময়দার কারখানায় কখনও অত্যধিক লাভ হওয়া সম্ভবপর নহে।

ভারতীয় লৌহ।

ভারতে প্রাচীন কালে ইঞ্জিনিয়ারিংএর (Engineering) যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রাচীন উন্নতির চিহ্ন এখনও নানাস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। বিশালকায় লৌহের কড়ি ও স্তম্ভ ভারতের অনেক প্রাচীন সৌধে সন্নিবিষ্ট আছে। তবে লৌহ নির্ম্মিত এই সমস্ত পদার্থই পেটা লৌহ, ঢালাই নহে। দিল্লী সহরে একটি প্রাচীন লৌহ-স্তম্ভ আছে, তাহার দৈর্ঘ্য ২৩ ফিট ৮ ইঞ্চ, এবং ব্যাস ১৬$\frac{১}{২}$ ইঃ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া ১২ ইঞ্চ হইয়াছে। ইহার ভার প্রায় ১৬২ মণ। মধ্য ভারতের ধর প্রদেশে আর একটি

লৌহ-স্তম্ভ আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪৩ ফিট। ইহা গোলাকার নহে, প্রথমে সমচতুরস্র এবং শেষে অষ্টভুজ। বাহুর পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ ইঞ্চ ও ১১ ইঞ্চ। ইহার ভার প্রায় ১৮৯ মণ। উড়িষ্যা দেশে পুরীক্ষেত্র হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে কারনাক নগরের "কৃষ্ণ-মন্দিরে" অনেক গুরুভার লৌহ রহিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তমের দৈর্ঘ্য ২৩½ ফিট এবং ক্ষেত্র পরিমাণ ১১ ইঃ × ১০½ ইঃ, ভার প্রায় ১০৮ মণ। ইহার শেষ অংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং ভগ্ন অংশ কোথায়ও পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই ইহার দৈর্ঘ্যের বাস্তবিক পরিমাণ কত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দিল্লির যে লৌহ স্তম্ভের উল্লেখ করা হইল, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই স্তম্ভ সম্ভবতঃ ১০০ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধর প্রদেশের স্তম্ভের আকৃতি অংশতঃ চতুরস্র ও অষ্টভুজ দেখিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ইহা খুব সম্ভবতঃ ৩২০ খৃঃ অব্দে বা ঐরূপ কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ধর হইতে ২২ মাইল দূরে মণ্ডু নামক স্থানে ইহা প্রথমে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে ১৩০৪ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ ইহাকে ফেলিয়া দেন, সেই সময়ে ইহা দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। ১৫৩১ খৃঃ অব্দে ইহাকে পুনরায় খণ্ডিত করা হয়, কাজেই বর্ত্তমানে ইহা ৩ খণ্ড হইয়া আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ৪ ভাগ হইয়াছিল, এবং মধ্যবর্ত্তী কোন একভাগ হারাইয়া গিয়াছে। এই বিনষ্ট অংশ পাওয়া যাইলে, ইহার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০ ফিট হইত। ইহার মস্তকভাগ গোলাকার এবং উপরিভাগ সমতল। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার উপর কোন কিছু অবস্থিত ছিল। কাহারও প্রতিমূর্ত্তী থাকাই সম্ভব। তলভাগ কন্দের ন্যায়, দেখিলেই মনে হয়, যেন কোটরে (socket) লাগাইয়া দিয়া দণ্ডায়মান করান হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার ভিত্তিতে একটি কোটরও রহিয়াছে। সেই কোটরের গভীরতা ২০ ইঞ্চ। তিনটি সুবৃহৎ গোলাকার প্রস্তর খণ্ড লৌহ দণ্ড দ্বারা দৃঢ় সংযুক্ত করিয়া তাহার উপর স্তম্ভ দণ্ডায়মান ছিল। এই স্তম্ভের গাত্রে নানা বিবরণী খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম তাহার তারিখ চতুর্দ্দশ খৃষ্ট শতাব্দী। অন্য একটি বিবরণীর তারিখ ১৬০০ খৃঃ শতাব্দী। স্তম্ভ ভগ্ন হইলে এই শেষোক্ত খোদিত হইয়াছিল কেননা স্তম্ভটিকে দণ্ডায়মান করান হইলে লেখাগুলি উল্টাইয়া যায়। কনরকের প্রসিদ্ধ মন্দির সম্ভবতঃ নবম হইতে ত্রয়োদশ খৃঃ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের কড়ি লৌহ নির্ম্মিত ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টি কড়ি রহিয়াছে। এই কড়ির জন্যই এই মন্দির বিখ্যাত। বর্ত্তমান কালে মন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কড়িগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মন্দিরের খিলানের মধ্য-প্রস্তর হইতে বাহির দিকে পাটাতনের ন্যায় একটা অংশ বাহির করা ছিল। সেই পাটাতনের উপর মন্দিরের ছাদ রক্ষা করিবার স্তম্ভ সকল বর্ত্তমান ছিল। কোন সময়ে খিলানের সুবৃহৎ মধ্য-প্রস্তরগুলি অপসারিত করা হয়। সেই জন্য পাটাতন পড়িয়া যায়, সেই হইতেই

ক্রমশঃ মন্দির ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক দরজার মস্তকের খিলানের নিম্নে এই লৌহ কড়িগুলি গ্রথিত ছিল। কড়িগুলির উপকরণ ও নির্ম্মাণ প্রণালী ভাল ছিল না; কেননা মন্দিরের পতন কালে কড়িগুলি পড়িয়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, এবং কতকগুলিতে নানা কারণে প্রায় ½ ইঞ্চ গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত কড়ির অভ্যন্তর ভাগেও গর্ত্ত রহিয়াছে। কোন কোন গর্ত্ত কড়ির দৈর্ঘ্যের দিকের প্রান্ত হইতে ৭।৮ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কতকগুলিতে একবারে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। দুই সের বা তিন সের পরিমাণ লৌহ পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া এই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়ি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত সংযোগস্থল তত সুবিধাজনক হয় নাই কিন্তু বাহিরে কোনরূপে মিলাইয়া দিয়া সমস্ত কড়িটিকে একটির ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। দিল্লিতে যে লৌহ স্তম্ভ রহিয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন কালের (দশ খৃষ্টাব্দ) অতি অপদার্থ যন্ত্রাদির সাহার্য্য লইয়া কিরূপে এই স্তম্ভ বিনির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণের নিকট অনেক দিন ধরিয়া এক দুরূহ সমাধান ছিল। কিন্তু কনরকের লৌহ কড়ি দেখিয়া কিরূপে দিল্লিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহাও খণ্ড খণ্ড করিয়া সংযুক্ত হইয়াছিল, তবে কনরকের কারিকরগণ দিল্লির কারিকরগণে অপেক্ষা হীনতর কার্য্যকুশল ছিলেন।

বম্বে প্রদেশে "উজ" নামক এক প্রকার ইস্পাত প্রস্তুত হইত। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ডাক্তার পিয়ারসন এ সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিয়াছিলেন। পিয়ারসনের বিবরণী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উজ-ইস্পাতের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। অগ্নির উত্তাপে ইহাকে লোহিত করা যাইত বটে কিন্তু উত্তাপের মাত্রা অত্যন্ত অধিক করিলেও ইহার আর অন্য কোনরূপ অবস্থান্তর হইত না। তবে উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে এই জাতীয় দুইটি ইস্পাত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যাইত বা ইস্পাত চূর্ণ হইয়া যাইত। উজ-ইস্পাত অন্য কোন ইস্পাত বা লৌহের সহিত সংযুক্ত হইত না। এই ইস্পাতের অংশ অন্য যন্ত্রাদিতে বা গৃহ নির্ম্মাণে নিয়োজিত হইলে অন্য লৌহের বা ইস্পাতের সহিত স্ক্রু বা পেরেক দ্বারা সংযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাকে টেম্পার (temper) করিয়া অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠিন করা যাইতে পারিত। এই দৃঢ় উজ-ইস্পাত কামান, কুঁদযন্ত্রে লৌহ কাটিবার বাটালী, প্রস্তর কাটিবার যন্ত্র, ছেনী, উকা, করাত ইত্যাদি সুদৃঢ় যন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে উকা নির্ম্মাণের জন্য বার ইস্পাত ও হাণ্টস্মানের ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই দুই ইস্পাত অপেক্ষা উজ-ইস্পাতে উৎকৃষ্টতর উকা প্রস্তুত হইত। পেটাই করিবার পূর্ব্বে উজের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.১৬৬ এবং পেটা হইলে ৭.৬৪৭। হাণ্টস্মানের ইস্পাতের এই দুই অবস্থাতেই আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। লৌহকে খনি হইতে উত্তোলিত করিয়া রট আয়রণে (wrought iron) পরিবর্ত্তিত না করিয়াই একবারে

ইস্পাতে পরিণত করা হইত। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন ইজিপ্টবাসিগণ সুকঠিন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিবার জন্য ভারতীয় লৌহ যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন। নানা প্রমাণে এই অভিমত সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। হিথ (Heath) সাহেব এই সম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ সংগ্রহ করেন। ইনি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কার্য্যোপলক্ষে আগমন করেন। পরে উক্ত খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ শেফিল্ড নগরে একজন বিখ্যাত কর্ম্মকার হইয়া উঠেন। তিনিই "মাঙ্গানীজ ষ্টীল" নামক এক নূতন ইস্পাতের উদ্ভাবন কর্ত্তা। হিথ সাহেব লক্ষ্য করেন যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যজাতি টিন ও তাম্রের সহিত নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে ধাতব মিশ্রণ প্রস্তুত হইত, তাহা দ্বারাই কর্ত্তন করিবার যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতেন। গ্রীক এবং লাটিন ভাষার প্রাচীন উপাখ্যানে কোন স্থানেই ইস্পাত নির্ম্মাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য ধাতু কিরূপে উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায় ও পণ্ডিতগণ অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ইস্পাতের প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত ছিল। সভ্যতা বৃদ্ধির এই প্রধান উপাদান ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে পরিচালিত হয়। সিংহল দ্বীপে প্রাচীন অনেক জাতি পণ্য সম্ভার ক্রয় বিক্রয়ের জন্য গমনাগমন করিতেন। এমন কি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীনকালে সিংহলে যখন ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা প্রচারের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই রাবণের যুগে অর্দ্ধসভ্য সিংহলও মণি মুক্তাদির জন্য অনেক প্রাচীন সভ্যজাতি সিংহলকে বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে ফিনীসীয়গণ সমুদ্র গতায়াত বিষয়ে অত্যন্ত পরিপক্ক ছিলেন। এমনও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় নাবিকগণও ভারত মহাসাগরের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বাণিজ্য করিতেন। তবে এ বিষয়ে ফিনীসীয়গণ অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক হয় ফিনীসীয়গণ দ্বারাই হউক অথবা ভারতবাসীগণ স্বয়ং, ইজিপ্টে ভারতীয় ইস্পাতের প্রচলন প্রবর্ত্তন করেন। পরে ভূমধ্য সাগরের নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশে, পরে গ্রীসে ও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে প্রথমে লৌহ পরে ইস্পাতের ব্যবহার বিস্তৃত হইয়া উঠে। ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইজিপ্টের যত কিছু প্রসিদ্ধ প্রস্তর মূর্ত্তি বা প্রস্তর অট্টালিকা বর্ত্তমান আছে, তাহাদের নির্ম্মাণের জন্য হয় ভারতীয় কারিকর বা প্রস্তর কর্ত্তনের উপযোগী ভারতীয় যন্ত্রাদি ইজিপ্টে দেশে নীত হইয়াছিল। ডামাস্কাসের প্রসিদ্ধ খড়্গ ভারতীয় ইস্পাতে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালী ক্রমশঃ পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরোপীয়গণ ইহার উৎপাদন প্রণালীর জ্ঞান লাভ করিয়া ইহার যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি সাধন করিয়া আসি-

তেছেন, তাহারই জন্ত ইস্পাতের জন্মভূমীর গৌরব (ভারতবর্ষ) একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সিংহলে ডাক্তার কুমারস্বামী এই সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণা করিতেছেন। তিনি ভারতের প্রাচীন লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে নানা বিবরণী ও ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন। প্রাচীন প্রথায় কিরূপে খনিজ লৌহ হইতে একবারে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহা অনেক কর্মকার এখনও পরিজ্ঞাত রহিয়াছেন। তাহাদের নিকট ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালীর সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন, যন্ত্রাদির আলোক-চিত্র গ্রহণ করিতেছেন, এবং প্রাচীন কালের বিবরণী সম্পূর্ণ করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিত নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে নানাবিধ ধাতব পদার্থের বিষয় রীতিমত আলোচিত হইত। বস্তুতঃ ভারতই পৃথিবীতে লৌহ ও ইস্পাত প্রচলনের প্রথম পথ প্রদর্শন করেন। প্রাচীন জগতের স্থানে স্থানে যে সমস্ত প্রস্তর কীর্তি এখনও বর্তমান রহিয়াছে, ভারতবর্ষের যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত না।

হাড়।

বৈজ্ঞানিক জগতে প্রায় কোন দ্রব্যই বৃথা নষ্ট হইতে দেওয়া হয় না। পরিত্যক্ত মৃতপ্রাণীর হাড়ও নানা প্রকার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত অনেক টাকার হাড় প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। হাড়কে আমরা সাধারণতঃ নিরেট কঠিন পদার্থ বলিয়াই জানি। কিন্তু পরীক্ষা করিলে বুঝা যাইবে যে, কেবল ইহার বহিরাবরণই কঠিন, ভিতর ফোঁপরা। প্রাণীর জীবিতাবস্থায় হাড়ের এই ফোঁপরা ভাগ লাল বর্ণের চর্বি জাতীয় এক প্রকার পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহাকে "বোন্ম্যারো" (Bone marrow) বলে। আজকাল ডাক্তারেরা এই বোনম্যারো ঔষধরূপে যথেষ্ট ব্যবহার করিতেছেন। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর।

হাড়ের রাসায়নিক উপাদানকে প্রাণীজ ও ধাতব এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হাইড্রোক্লোরিক দ্রাবকে ডুবাইলে হাড়ের ধাতব অংশ পৃথক হইয়া দ্রবীভূত হইয়া যায়। কেবল মাত্র প্রাণিজ অংশ পড়িয়া থাকে। ইহাতে হাড়ের আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না, কেবল ইহা নরম হইয়া থাকে মাত্র। এই অবস্থায় হাড়কে সহজেই বাঁকাইতে পারা যায়।

ধাতব অংশ পৃথক করিয়া হাড়কে জলে উত্তমরূপে ফুটাইলে সমস্তটাই জিলাটিন্ বা সিরিশে পরিণত হয়।

হাড়ের ধাতব উপাদানকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়াম ফস্ফেট (অধিকাংশই)
ম্যাগনেসিয়াম ফস্ফেট
ক্যালসিয়াম কারবনেট
ম্যাগনেসিয়াম কারবনেট
ক্যালসিয়াম ফ্লুরাইড্
ক্যালসিয়ম সালফেট (অতি অল্প মাত্র)

দ্রাবকে ডুবাইলে যেমন কেবল প্রাণীজ পদার্থ পড়িয়া থাকে, অপর দিকে তেমনি হাড়কে ভস্ম করিলে কেবল মাত্র ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়। সাবধানে পুড়াইলে হাড়ের আকৃতি ঠিক থাকে, কিন্তু স্পর্শ করিলে গুড়া হইয়া যায়।

চিরুণি, বোতাম, ছুরির হাণ্ডেল, পেপার কাটার, কৌটা, কলমের হাণ্ডেল, নানারূপ খেলনা, পশম বুনিবার কাটি ও অনেক যন্ত্রের অংশ বিশেষ প্রস্তুতের জন্য হাড় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হাড় সিদ্ধ করিয়া যে জিলাটিন্ বা সিরিশ পাওয়া যায়, তাহা বস্ত্ররঞ্জনের কারখানা এবং নানারূপ ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয়।

হাড়ের গুঁড়া ও ভস্ম জমির সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হাড় পুড়াইয়া কয়লা প্রস্তুত করা হয়। এই কয়লা দেখিতে কাঠের কয়লার অনুরূপ।

হাড়ের কয়লার বিশেষ গুণ এই যে, ইহা প্রায় সকল প্রকার বর্ণ বিশিষ্ট উদ্ভিজ্জ ও ও জান্তব তরল পদার্থের বর্ণ নষ্ট করিতে পারে। চিনির বর্ণ পরিষ্কারের জন্য অনেক স্থলে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। অনেক সময় কেশ তৈল ও ঔষধাদি হাড়ের কয়লায় সাহায্যে পরিষ্কৃত করা হয়।

হাড়ের কয়লা নানারূপ উপায়ে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ হাড় ছোট ছোট টুকরা করিয়া লৌহপাত্রে রাখা হয়। এইরূপে কয়েকটি পাত্র পূর্ণ হইলে তাহাদিগকে চুল্লীর মধ্যে সাজাইয়া দেওয়া হয়। চুল্লীতে অগ্নি সংযোগ করিলে হাড় হইতে প্রভূত পরিমাণ ধুম নির্গত হইতে থাকে। এই ধুম অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। ইহা জমাইয়া অনেক সময় আলকাতরার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। অনেক স্থলে এই ধুম চুল্লীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে হাড় পুড়াইবার সময় কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। হাড়ের কয়লা প্রস্তুতের জন্য বড় বড় কারখানা আছে।

হাড়ের কয়লা একবার ব্যবহৃত হইলেই তাহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কিছু কষ্ট করিলে ব্যবহৃত কয়লাকে পুনরায় কার্য্যোপযোগী করা যাইতে পারে।

ব্যবহৃত কয়লা প্রথমে দিনকতক আবৃত পাত্রে রাখিয়া দিলে তৎসংলগ্ন পদার্থ সমূহ অর্থাৎ চিনি প্রভৃতি পচন (Fermentation) দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। পরে একবার হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রাবকে ডুবাইয়া জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করা হয়। এই কয়লা একবার চুল্লী মধ্যে পুড়াইয়া লইলে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী হয়।

হাড়ের কয়লার গুঁড়া হইতে ছাপার কালি ও চিত্রকরের রং ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু।

আলোক-চিত্রণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আলোর দ্বারা চিত্রের কোমলত্ব (softness) ও অবয়বের সুগোলত্ব (roundness) যাহাতে হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য; এবং যাহাতে সমালোকিত (flatness) বা অন্য পক্ষে আলোকের কর্কশতা (hardness) না হয় তাহা দেখিতে হইবে। মুখের মধ্যে কোন যায়গায় সমানরূপ আলোকে আলোকিত হওয়া বা মুখের মধ্যে ছায়া ও আলোকের সুন্দর সমাবেশ না হওয়াকে ফ্লাটনেশ (flatness) বা সমালোকিত বলা হইল; এবং মুখের একদিকে খুব আলো ও অপরদিকে খুব অন্ধকার থাকে তাহাকে কর্কশতা (hardness) বলা হইল।

এখন সাধারণ ঘরে কি প্রকারে ছবি তোলা যায় তাহার কথা লিখিব। চেষ্টা করিতে করিতে ফটোগ্রাফারের ষ্টুডিও, যেমন ভাল ছবি তোলা যায় ঘরের মধ্যে তেমনি ছবি উঠান যাইতে পারে। পয়সা খরচ করিয়া ষ্টুডিও প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই। যিনি বলেন যে তিনি ষ্টুডিও নাই বলিয়া ভাল ছবি তুলিতে পারেন না, তাঁহার ছবি তুলিয়া কাজ নাই, কারণ তাঁহার ষ্টুডিও হইলেও ভাল তোলা হইবেনা।

ধরিয়া লওয়া গেল যেন একটি ২০ ফিট লম্বা ও ১৫ ফিট চওড়া ঘরে কাহারও প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার জন্য ইচ্ছা হইয়াছে। ইহাতে একটি জানালা আছে; তাহা তিন ফিট আট ইঞ্চি চওড়া। যাহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে হইবে, এই ঘরের মধ্যে নানা যায়গায় তাহাকে বসাইয়া ঠিক করিয়া দেখিতে হইবে তাহার মুখে কি ভাবে আলো পড়িতেছে। পরপৃষ্ঠা লিখিত চিত্রে অনেকটা বুঝা যাইবে।

এখন ক চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া জ চিহ্নিত স্থানে যাহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে হইবে তাহাকে বসান গেল ও তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দিকে রিফ্লেক্টার বসান গেল। এই অবস্থায় খুব সুন্দর ও মনোমতরূপ আলোক দ্বারা আলোকিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আলোর তেজ খুব কম বলিয়া বেশী একপোসার দিতে হয়। তৎপরে

সে ব্যক্তিকে ঝ চিহ্নিত স্থানে বসাও। এখানে বসাইবার কারণ এই যে এ স্থানে বসিলে আলোকের খুব নিকট হইবে সে জন্য কম একস্‌পোসার লাগিবে; কিন্তু এ স্থানে মুখের এক দিকে খুব বেশী আলো হয় ও অপর দিকে অন্ধকার থাকে, রিফ্লেক্টর লাগাইলেইও সে অন্ধকার কমে না। এই দোষ ফটোগ্রাফ তুলিলেই বেশী টের পাওয়া যায়, ছবি তুলিবার সময় চক্ষে দেখিয়া টের পাওয়া যায় না। সে জন্য অনেকটা অভ্যাসের পর এ দোষ টের পাওয়া যায়। এখন যদি ট স্থানে বসান যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যেরূপ আলো হইয়াছে তাহা খুবই সন্তোষ জনক হইয়াছে এবং একস্‌পোসারও বেশী দিতে হইবে না।
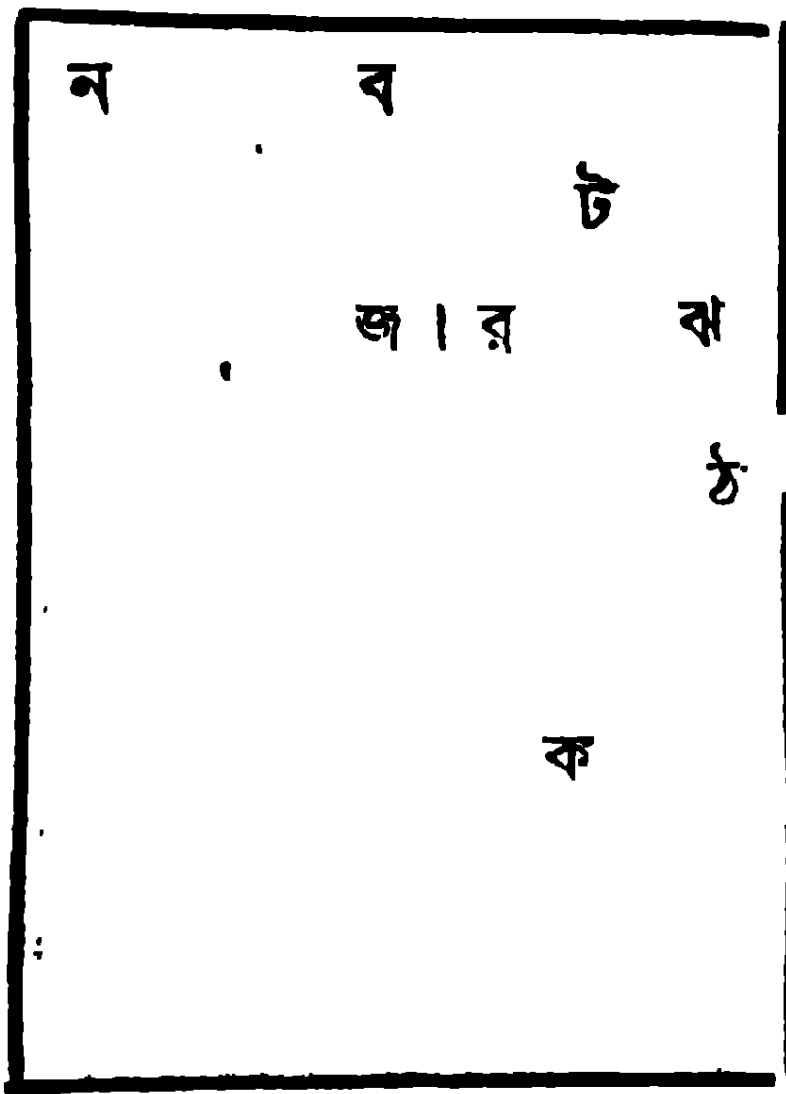
কোন স্থানে বসিলে প্রতিমূর্ত্তি বেশ কোমল ও সুষ্ঠু (harmonious) আলোকিত হইবে, তাহা ঠিক হইয়াছে, এখন কোন দিক হইতে ছবি তুলিতে হইবে তাহা ঠিক করা উচিত। মুখের তিন ভাগে আলো এক ভাগে ছায়া কিম্বা এক ভাগে আলো ও তিন ভাগে ছায়া হইলে সুন্দর ও মনোমত ফল হয়। শেষোক্ত রূপে ছবি তুলিলে তাহাকে ইংরাজীতে rembrandt বলে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দাঁড়ান ছবি তুলিতে হইলে ঘরের এক পার্শ্বে সরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু বুক পর্য্যন্ত ছবি তুলিতে হইলে ঠ ও ন চিহ্নিত স্থানের মধ্যে যে কোন স্থান হইতে ছবি তোলা যাইতে পারে, বোধ হয় ঠ চিহ্নিত স্থান হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছবি উঠে। কিন্তু যদি rembrandt ছবি তুলিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ন চিহ্নিত স্থানের দিকে সরিয়া যাইতে হয়। তবে এই সময় যাহাতে জানালার আলো লেন্সের উপর না পতিত হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য ও সে জন্য সে দিকে কোন প্রকারে ছায়া করিতে হয়। ব্যাকগ্রাউণ্ড চিহ্নিত স্থানে ও রিফ্লেক্টর ক চিহ্নিত স্থানে ও যাহার প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে হইবে তাহাকে ট চিহ্নিত স্থানে বসাইয়া, এবার ঠ চিহ্নিত স্থানে ক্যামেরা বসাইলে বেশ চলিতে পারে। যাহাতে রিফ্লেক্টর অধিক না উঠে সে জন্য সে ব্যক্তির নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে হয়, অথচ যতটা কাছে রাখিলে ইহা কার্য্য হয় ততটা কাছে রাখিতে হইবে।

তাহার পর যে প্রকারে বসাইলে ভাল দেখায় সেইরূপ করিয়া বসাইতে হইবে। কোন্ লোককে কি প্রকারে বসাইলে ভাল ও ঠিক দেখায় তাহা ঠিক করা অভ্যাসের কাজ। কেহ কেহ head-rest বা মাথা রাখিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করেন। ইহার প্রয়োজন বড় নাই, ইহা কেবল মাথা হেলান দিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

যদি ঘরে বেশী জানালা থাকে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত, কেন না দুই তিন দিক হইতে আলো আসিয়া মুখে লাগিলে বড় খারাপ হয় ও চক্ষুতে কেমন এক প্রকার আলো আসিয়া পড়ে।

প্রত্যেক লোকের ছবি তুলিতে বিভিন্ন প্রকারে আলোকিত করা প্রয়োজন হইতে পারে। (১) তাহার মুখের বিশেষ ভাব বা সৌন্দর্য্যকে পরিস্ফুট করা। কিন্তু যাহাতে ছবিতে কর্কশতা (harshness) না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। (২) যাহাতে মুখখানা আলো ও ছায়ার যথা বিহিত সমন্বয়ে বেশ সুগোল দেখায়, যাহাতে কেবল সমুখ হইতে মুখের উপর আলোক পড়িয়া চেপ্টা না দেখায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (৩) যাহাতে ব্যাকগ্রাউণ্ডের সহিত ছবি না মিলিয়া যায় অর্থাৎ যাহাতে প্রতিমূর্ত্তি হইতে ব্যাকগ্রাউণ্ডের দূরত্ব প্রকাশ পায় তাহা দেখা উচিত। এই সব প্রকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ক্রমে ছবি তুলিবার উৎকর্ষ হইতে পারে।

অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তিই আণ্ডার এক্সপোসার বা কম সময় এক্সপোস করার দরুণ খারাপ হইয়া যায়। তজ্জন্য ছবি কর্কশ (harsh) হয়, কোমলত্ব থাকে না, সুগোলত্ব থাকেনা, নাক, চোখ ও কানের দূরত্ব বুঝা যায় না। কোন কোন ছবির স্থানে স্থানে আলো লাগার জন্য খারাপ হয়, কোন কোনটির উপর দিক হইতে খুব বেশী আলো লাগিয়া খারাপ হয়, আবার কোনটির বা কাঁধে হাতে ও কাপড়ে বেশী আলো লাগে বলিয়া আগেই সেই সকল স্থানেই চক্ষু পড়ে ও সেজন্য ভাল দেখায় না।

তৈয়ারী ব্যাকগ্রাউণ্ড না হইলেও সাধারণ গৃহের সকল স্থানেই ছবি তোলা যাইতে পারে। যেমন, কোন ভদ্রলোক ডেস্কে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন বা কেহ জানালার ধারে পাঠে নিবিষ্ট রহিয়াছেন; তবে এই সময় ছোট ডায়ফ্রাম ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা হইলে যে ছবি উঠিবে তাহা খুব স্পষ্ট হইবে। ইহার মধ্যে একটা বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে,—ইহা চিত্র রচনা বা চিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবার জন্য নানা জিনিষের সমাবেশ। সে জন্য উপরিলিখিত চিত্রে যদি গৃহের মধ্যে আয়না বা অন্যান্য উজ্জল দ্রব্য, কাচের বা চিনা মাটির জিনিষ থাকে তাহা হইলে ছবি দেখিলে প্রথমেই এই উজ্জল দ্রব্য গুলির উপর দৃষ্টি পড়ে এবং সেজন্য যাহা প্রধান অর্থাৎ যে ব্যক্তির ছবি তোলা হইয়াছে তাহার প্রতি চক্ষু আকৃষ্ট হয় না।

কোন কোন লোক যখন তিনি কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তখনকার ছবি

তুলাইতে চান। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেই অবস্থাতেই তোলা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে যেন বে-মানান ও সৌন্দর্য্যাভাব না হয়।

যদি কখন শর্টফোকাস লেন্স (short focus lens) অর্থাৎ যে সকল লেন্স ব্যবহার করিলে ক্যামেরার বেলো বেশী বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না, সেই লেন্স ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যে সমস্ত জিনিষ ক্যামেরার দিকে বেশী আগাইয়া থাকে সেগুলি অসম্ভব বড় দেখায়। অর্থাৎ হস্ত পদাদি যদি শরীর হইতে বেশী অগ্রে থাকে তাহা হইলে সেগুলি শরীরের সহিত তুলনায় অসম্ভব বড় দেখায়।

গ্রীন হাউস্ (greenhouse)—যদি কোন শিক্ষার্থীর চারা ও কোমল গাছ রক্ষার গৃহ থাকে তাহা হইলে এই স্থানে মনোমত ষ্টুডিও করা যায় ও সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি তোলা যাইতে পারে। এই ঘরে দরজা জানালা বা পর্দ্দা আঁকা ব্যাকগ্রাউণ্ড না দেওয়াই ভাল বরং সাধারণ এক রঙের ব্যাকগ্রাউণ্ড সুদৃশ্য হয়। গ্রীন হাউসে একটি সুবিধা হয় যে এখানে আলোক খুব উজ্জ্বল না হইয়া বেশ কোমল হয় অথচ আলোর তেজ কমিয়া যায় না বলিয়া দ্রুত এক্স্পোসার দেওয়া যায়। কিন্তু একটি দোষ এই যে উপর হইতে খুব বেশী আলো আসে তজ্জন্য চোক, নাক ও চিবুকের নীচে সুপষ্ট ছায়া পড়ে সে জন্য ছবি বড় বিশ্রী দেখায়। গৃহের বাহিরে ছবি তুলিলেও এ দোষ প্রায়ই হয়। এই দোষ স্খালন করিতে হইলে আলোর তেজ কমাইবার জন্য মস্তকের উপর সাদা কাপড়ের একটি পর্দ্দার প্রয়োজন।

একটা দশ ফুট লম্বা ও বেশ মোটা বেত ক্রয় করিয়া গোল চাকার মত করিতে হইবে এবং কিছু নয়নসুখ কাপড় কিনিয়া এই চাকাটির উপর এক ফেরতা করিয়া মুড়িয়া সেলাই করিতে হইবে, ভিতরটা যেন বেশ টান হইয়া থাকে। এই চাকায় একপার্শ্বে একটা দুই হাত লম্বা বাঁশ বা কাঠ, পেরেক দিয়া আটকাইতে হইবে। এখন এই হাতলটি ধরিয়া পর্দ্দাটি উপবেশকের মাথার উপর ধরিয়া বা কোন প্রকারে অন্য কোন জিনিষের সহিত বাঁধিয়া যাহাতে মাথার উপরে ইহা থাকে তাহা করিতে হইবে এবং ইহার জন্য উপরের আলোর তেজ কমিয়া যাইবে এবং কথিত সকল স্থানের ছায়া কমিয়া যাইবে। উপবেশক যে স্থানে বসিয়াছে তাহার চতুর্দ্দিকে সাদা কাগজ মাটিতে পাতিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে নীচ হইতে আলো প্রতিফলিত হইয়া যে সকল স্থানে ছায়া পড়িয়াছিল, তাহাতে লাগিয়া তাহার গভীরতা কমাইয়া দিবে।

যদি এই মস্তকের উপরের পর্দ্দা ব্যবহার করা হয় ও ইহার প্রতি মনোযোগ করা হয় তাহা হইলে গৃহের বহিরের ছবি তোলা বেশী শক্ত হইবে না। অবশ্য স্থান বিশেষে বা আলোর কম বেশী তেজ বুঝিয়া ঠিক করিতে হইবে যে কয় ফেরতা কাপড় দিলে আলোর তেজ সুবিধা মত হইবে।

অবশ্য বাহিরে ছবি তুলিতে হইলে উপবেশকের ঠিক পিছনে গাছ বা অন্য কিছু না থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহা না হইলে অনেক সময় ছবি তালা হইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যেন মাথা হইতে গাছ বাহির হইতেছে। প্রতিমূর্ত্তি তুলিতে সূর্য্যালোক যেন কখন ব্যবহৃত না হয়, অধিক সূর্য্যালোক যেন কখন উপবেশকের মুখে না পড়ে, কারণ তাহা হইলে ভ্রুকুঞ্চিত ও চক্ষু ছোট হইয়া যায়। যদি কখন গাছ তলায় ছবি তোলা যায় তাহা হইলে পাতার ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া শরীরের নানাস্থানে পড়ে ও তজ্জন্য সাদা সাদা গোল গোল দাগ হইয়া যায় তজ্জন্য বড় ভাল দেখায় না।

ছবির মধ্যে উপবেশকের স্বাভাবিক চেহারা যতটা আনা যায় ততই ভাল। অস্বাভাবিক উপবেশন বা এরূপভাবে বসান যাহাতে উপবেশকের কষ্ট হয়, এ সকল পরিবর্জ্জন করাই প্রয়োজন কারণ তাহা হইলে মুখের ভাল ভাব থাকে না। উপবেশককে মনোমতরূপ বসাইতে কৌশল ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। কখন এক্স্‌পোসার দেওয়া হইল বা হইবে তাহা উপবেশককে না জানিতে দেওয়াই ভাল, কারণ উপবেশক, কখন এক্স্‌পোশ করিবে, এজন্য উদ্বিগ্ন থাকে ও সেজন্য মুখের ভাব অন্য রকম হয়।

গৃহের ভিতর ছবি তোলার প্রধান অসুবিধা এই যে বেশীক্ষণ এক্স্‌পোস করিতে হয় ও আলোর কর্কশ বৈসাদৃশ্য পরিহার করা কষ্টকর হয়। গৃহের ভিতর ছবি তুলিতে হইলে একজনের বেশী লোকের তোলা উচিত নয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

প্রতিমূর্ত্তিতে ব্যাক গ্রাউণ্ড একটি প্রধান জিনিস এবং ইহা যত সাজসজ্জা বিহীন ও সাদাসিদা হয় ততই ভাল। ছবি তুলিতে মানুষের মুখ ও সমস্ত অবয়বই প্রধান ও অন্যান্য জিনিষগুলির স্থান ইহার পরে। যখন কোন মাথা ও কাঁধ বা বুক পর্য্যন্ত ছবি তুলিতে হইবে তখন সমানুক্রমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড (gradated background) ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মুখের যে দিকটায় ছায়া পড়ে তাহার পশ্চাৎ দিকের ব্যাকগ্রাউণ্ড যেন ফিকা হয় ও যে দিকে আলো পড়ে তাহার পশ্চাৎ দিকের ব্যাকগ্রাউণ্ড যেন গভীর বর্ণ হয়। এ ব্যবস্থা এই gradated background করিলে হয়।

যে সকল লোক প্রতিমূর্ত্তি তোলাইতে আইসে, তাহাদের মুখের গড়ন দেখিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয় যে তাহাদিগকে কি প্রকারে বসাইলে ভাল হয়। সাধারণতঃ মুখ তিন ভাগ ক্যামরার দিকে ফেরান থাকিলেই ভাল ছবি হয়। কাহারও কাহারও মুখের একদিকের ছবি তুলিলেই ভাল হয়; কাহারও বা আবার সম্মুখ হইতে কিম্বা একটু পাশ হইতে ছবি তুলিলেই ভাল হয়। ক্যামেরা সর্ব্বদা মুখের সহিত এক সমতলে থাকা ভাল, যদি ক্যামেরা উঁচুতে থাকে ও প্রতিমূর্ত্তি তুলিবার জন্য লেন্সের

মুখ নীচু করিয়া দিতে হয় তাহা হইলে কপাল বড় বোধ হয় ও নাক, মুখ এবং চিবুক সরু হইয়া যায়। যদি লেন্সের মুখ উপর দিকে থাকে তাহা হইলে চিবুক মুখ ও নাকের ফুটা চওড়া দেখাইবে এবং কপাল ও নাক ছোট ও সরু দেখাইবে।

শিক্ষার্থীর মাটীর বা মার্বেলের মূর্ত্তির উপর এই সকল পরীক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত। ইহা দ্বারা দোষগুণ ও কোন্ অবস্থায় ছবি লইলে কতটুকু আলো পড়িবে ও ভাল ছবি হইবে বুঝিতে পারিবেন। অনেকেই জানেন না যে মানুষের মুখের দুই দিক একই রকম নহে, এবং যদি তাহা থাকে তাহা খুব কম লোকেরই আছে। সে জন্য মুখের কোন্ দিক হইতে ছবি তুলিলে ভাল দেখায় তাহা শিক্ষার্থীর ঠিক করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত মুখের কোনও দিকে যদি কাটা দাগ, আঁচিল বা অন্য কোন রকম দাগ থাকে তাহা হইলে যাহাতে সেই টুকু বাদ দিয়া ছবি তোলা যায় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ইহার জন্য মুখ ফিরাইয়া যে প্রকারে বসিলে সেগুলি দেখা না যায় সেই প্রকারে বসাইয়া ছবি তুলিতে হইবে। যে সকল লোকের নাক খুব বেশী উঁচু বা উপরের ঠোট খুব লম্বা তাহাদের ছবি তুলিবার সময় যদি ক্যামেরা একটু উঁচু করিয়া, উপর হইতে ক্যামেরার মুখ নিচু করতঃ ছবি তোলা যায়, তাহা হইলে সাধারণ ভাবে ছবি তোলা অপেক্ষা আরও সুন্দর ছবি উঠিবে। অবশ্য সাধারণতঃ ছবি তুলিতে হইলে উপবেশকের চক্ষুর সহিত ক্যামেরা এক সমতলে রাখিয়া ছবি তোলাই যুক্তিযুক্ত।

শিক্ষার্থীর উত্তোলিত প্রতিমূর্ত্তিতে সাধারণতঃ একটা এই ভুল হয় যে উপবেশকের মুখ যে দিকে ফেরান থাকে, চক্ষু সেদিকে না থাকিয়া প্রায়ই অন্য দিকে ফেরান থাকে। ইহাতে ছবি দেখিতে বিশ্রী হয়। যাহাতে এই প্রকার না হয় তাহা করিতে হইলে একটা আয়না লইয়া উপবেশকের সম্মুখে ধরিতে হয়, ইহাতে উপবেশক নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। অবশ্য আয়নাখানা যেন ফটোতে না উঠে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার দ্বারা মাথা যে দিকে ফিরান থাকিবে চক্ষু-সে দিকে ফিরান থাকিবে ও এতদ্ব্যতীত উপবেশক সচারাচর যে অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থায় থাকিবেন।

গৃহের ভিতর অপেক্ষা গৃহের বাহিরে ছবি তোলাই সুবিধা জনক। বাহিরে খুব কম এক্সপোজার দিতে হয়, কিন্তু মনোমতরূপে আলোর ব্যবস্থা হয় না ইহাই অসুবিধা। সূর্য্যালোক হইতে দূরে বসিবার স্থান করিতে হয় ও আলোক সম্মুখ হইতে না পড়িয়া; যাহাতে মুখের একপার্শ্বে বেশী আলো পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। যদি ব্যাকগ্রাউণ্ড না পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেওয়ালের সম্মুখের বা গাছের বেড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছবি তুলিলে বেশ হয়। অবশ্য এই ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব ছায়ার মধ্যে থাকা দরকার, তাহা না হইলে প্রতিমূর্ত্তি ও ব্যাকগ্রাউণ্ড একইরূপ আলোকে আলো-

মিত হওয়ার দরুণ, ব্যাকগ্রাউণ্ড ছবির অঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, সেজন্য বিশেষ দেখিবার মাথার ঠিক পিছনে যেন এমন কোন জিনিষ না থাকে যাহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

যদি group বা একাধিক লোকের ছবি তুলিতে ইচ্ছা থাকে তবে ইহা তোলার জন্য কিছুদিন অভ্যাস করিতে হয়। তজ্জন্য নানা প্রকার পুস্তকে group এর ছবি দেখিতে হয় ও ইহা দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারা যায় কি প্রকারে লোকগুলিকে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া ছবির জন্য সাজাইতে হয়। প্রথম প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একজন লোকের ছবিতে আলোকের বন্দোবস্ত করিতেই অনেক কষ্ট পাইতে হয়, সেজন্য অনেকগুলি লোকের ছবিতে আলোকের প্রতি ভাল দৃষ্টি বা প্রত্যেককে ভাল করিয়া বসান, যাহাতে প্রত্যেকের মুখে ভাল ও মনোমতরূপ আলো পড়ে, তাহা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টকর এমন কি অসম্ভবও হয়। যদি গ্রুপ তোলাই প্রয়োজন হয় তাহা হইলে গৃহের বাহিরে তোলাই উচিত। সমস্ত লোকের ছবি যাহাতে ফোকাসে আসে সে জন্য ছোট ডায়াফ্রাম ব্যবহার করা উচিত। এই জন্যই সাধারণতঃ গ্রুপে বেশী এক্‌স্‌পোসার দিতে হয়; ও গৃহের ভিতর ছবি তুলিতে যাহারা জানালার দিকে থাকে তাহাদের মুখেই আলো ও যাহারা জানালা হইতে দূরে থাকে তাহারা একবারে অন্ধকারে পড়ে।

গ্রুপ তুলিতে হইলে সকলেই যাহাতে এক দিকে চাহিয়া না থাকে বা একই রকম করিয়া না বসে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহাকেও সম্মুখে মাটিতে বসাইয়া কাহাকেও পশ্চাতে দাঁড় করাইয়া কাহাকেও হেলাইয়া বসাইয়া দিয়া যাহাতে দেখিতে ভাল হয় ও আলো মুখের উপর ভাল করিয়া পড়ে তাহা দেখা উচিত। যাহাতে সকলেই ক্যামেরার দিকে চাহিয়া না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ লোক সকলকে এমন করিয়া বসান যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাঁহারা কথা বলিতেছেন, এ ব্যবস্থা ও মন্দ নয়। যাহাতে সকল লোকের মাথা এক লাইনে না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও পিরামিডের আকারে সাজাইতে হইবে কিন্তু ঠিক সমকোণ না হইয়া একটু বেঁকা বা অন্য কোন ভাবে হইলে আরও ভাল হয়। গ্রুপের যত ভাল ছবি দেখিলেই দেখা যাইবে যে প্রায় সকল গুলিই পিরামিড আকারের। অবশ্য পিরামিড আকারে সাজাইতে গেলে যাহাতে এদিকে বেশী লোক অপর দিকে কম লোক না হয় তাহা দেখা উচিত।

যখন খুব বেশী লোক থাকিবে, তখন অধিক সংখ্যক পিরামিড প্রস্তুত করিতে হইবে, অবশ্য প্রত্যেকটি ঠিক এক রকম করিলে ভাল দেখাইবেনা। গ্রুপের দুই পার্শ্ব একই রকম যেন না হয়। সকলেই এক রকম করিয়া যেন না বসেন ও যাহাতে সকলের মাথা এক লাইনে না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

বিশেষতঃ অনেক লোকের গ্রুপে সম্মুখ হইতে আলো মুখের উপর পড়িলেই ভাল।

অবশ্য একটু পাশ হইতে পড়িলেও ভাল হয় কারণ তাহা হইলে আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণ থাকিবে ও সে জন্য মুখ (flat) দেখাইবে না। ক্যামেরার মুখ গ্রুপের মধ্যভাগে ফিরান থাকিবে, এবং ক্যামেরাটি গ্রুপের সামনে মধ্যস্থলে থাকিবে।

যাহাতে ওভার একস্‌পোসার না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যদি ফিকা রংয়েরও সাদা কাপড় পরা অনেক লোক থাকে তাহা হইলে যাহাতে তাহারা সকলে এক যায়গায় না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদিগকে অন্যান্য রংয়ের কাপড় পরা লোকের মধ্যে মিশাইয়া দিতে হইবে। নিল রং খুব ঘোর না হইলে প্রায় সাদা দেখায়। এই প্রকার করার কারণ এই যে যদি সাদা রঙের কাপড় পরা সকলে একস্থানে মিলিত হন, তাহা হইলে সেই ছবির স্থানটি ওভার এক্‌সুপোস্‌ড্‌ হইয়া যাইবে।

শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাতেই আপাততঃ বেশ কাজ চলিবে, ইহা অপেক্ষা যাহা কিছু বেশী শিখিবার আছে তাহা পরে লিখিব। আগে ইহাই অভ্যাস করা উচিত। আগামী বারে দৃশ্য তুলিবার সম্বন্ধে লেখা যাইবে।

ইংরাজির বাংলা ব্যাখ্যা। ষ্টুডিও—ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য বিশেষ করিয়া ঘর প্রস্তুত করা হয়। এই ঘরের উপরদিকে কাচ দেওয়া আছে ও আলোকের তেজ কমাইবার ও বাড়াইবার নানা প্রকার বন্দোবস্ত আছে। ব্যবসায়ী ফটোগ্রাফারগণ এই প্রকার ঘরেই ছবি তোলেন।

ব্যাকগ্রাউণ্ড—প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে যে পর্দ্দা দিতে হয়।

রিফ্লেক্টর—আলো প্রতিফলিত করিবার জন্য ইহার ব্যবহার করিতে হয়।

ফ্ল্যাট—আলো ও ছায়ার সংমিশ্রণে নাক, চক্ষু, কান প্রভৃতির দূরত্ব ও উঁচু নীচু না থাকে ও তজ্জন্য ছবির মুখ খানা এক সমতলে আছে ও মুখের সর্ব্বত্র সমান আলো আছে এরূপ বোধ হয়, তাহা হইলে সেই চিত্রকে ফ্ল্যাট বলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

ভারতে সোরার কারখানা।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে সোরা (potassium nitrate—পোটাসিয়াম নাইট্রেট) উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্বের কোন নির্ভুল বিবরণী পাওয়া যায় না। এই ব্যবসায়ে বিভিন্ন কালে নানারূপ উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে। ৫০ কিম্বা ৬০ বৎসর পুর্ব্বে কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর ৩০,০০০ টন সোরা বিদেশে রপ্তানি হইত, কিন্তু সাধারণতঃ বহুকাল ধরিয়া রপ্তানির পরিমাণ গড়পড়তা

প্রতি বৎসর ২০,০০০ টন রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মোট বাৎসরিক উৎপাদন-পরিমাণের হ্রাস সূচিত হইলেও, এই হ্রাস পরিমাণ অত্যন্ত অধিক নহে। মূল্য প্রায়ই সমান রহিয়াছে, এবং সহসা হ্রাস হইয়া যাওয়ার কোন সূচনা দেখা যাইতেছে না। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে :—

সময়	বাৎসরিক গড়পড়তা রপ্তানি-পরিমাণ	প্রতি হন্দরের গড়পড়তা মূল্য
	টন	
১৮৯৪—৯৮	২০,৪০০ ...	... ... ১২
১৯০২—০৬	১৮,৪০০ ...	... ... ১০।৶
১৯০৭—১০	১৮,৪০০ ...	... ... ১১।০

ভারতবর্ষের উৎপন্ন সোরার পরিমাণ সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন পরিমাণের অতি সামান্য অংশ মাত্র ; কিন্তু বাজারে পোটাসিয়াম নাইট্রেটের মূল্যের সর্ব্বদা এক ভাব, এমন জারমান দেশে (Germany) চিলি দেশীয় সল্ট পিটারের (salt petre) সহিত পোটা-সিয়াম ক্লোরাইড (potassium chloride) মিশ্রিত করিয়া যে পোটাসিয়াম নাইট্রেট উৎপাদিত হয়, তাহার প্রাচুর্য্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বাজারে পোটাসিয়াম নাইট্রেটের বিলক্ষণ কাটতি রহিয়াছে।

পল্লী অঞ্চলের পুরাতন এবং অধুনাতন জমীর মৃত্তিকা হইতে যে অপরিষ্কৃত উপাদান সংগৃহীত হয়, তাহা হইতেই ভারতীয় কারবার পরিচালিত হইতেছে। "নুনিয়া" বা "লুনিয়া" নামক এক দরিদ্রজাতি অতি সামান্য পরিমাণে এই মৃত্তিকা চাঁচিয়া সংগ্রহ করে ও এই মৃত্তিকা হইতে সোরা নির্মুক্ত করে। এই মৃত্তিকায় যে সোরা থাকে, তাহা নিশ্চয়ই মলমূত্রাদি, জান্তব পরিত্যক্ত পদার্থ, উদ্ভিজ্জ-জঞ্জাল ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বস্তুতঃ আমাদের আর কোন জ্ঞানই নাই। এই মৃত্তিকায় যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া সোরা উৎপাদিত হয়, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাক্‌টিরিয়ার (bacteria) সংঘটন রহিয়াছে কিনা; তৎসম্বন্ধে কোন পরীক্ষা সাধিত হয় নাই। ফলতঃ কোন এক পল্লীর কতিপয় ভূখণ্ড ব্যতীত অন্যত্র কেন সোরা উৎপাদিত হয় না, তাহা আমরা অবগত নহি। এই পল্লীমৃত্তিকা হইতে নুনিয়াগণ অতি অবিশুদ্ধ সোরা উৎপাদন করে, অতঃপর যে সমস্ত ব্যবসায়িগণ এই অবিশুদ্ধ সোরা সংশোধন করেন, তাঁহারা ইহা ক্রয় করিয়া ল'ন, এবং ইহা হইতে অপেক্ষাকৃত পরিশোধিত সোরা প্রস্তুত করেন, এই পরিশোধিত সোরাই রপ্তানি হইয়া থাকে।

এই লুনিয়াগণ ও অবশেষে সংশোধকগণ যে প্রথা অবলম্বন করিয়া সোরা উৎপাদন করে, প্রথমতঃ তাহা বিবৃত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। অবশেষে পুষার কৃষি বিদ্যালয়ে অবিশুদ্ধ সোরাকে পরিশোধিত করিবার জন্য যে যন্ত্রাদি ও নূতন প্রথা উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহাও বিবৃত হইবে।

এই কারবারের বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে "লবণ" এই বাক্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "লবণ" বলিলে ইহাই বুঝায় যে, মানব ও যাবতীয় জীব জন্তু যে পদার্থ খাদ্যের সহিত সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন রাসায়নিক এই সোরা-সম্বলিত মৃত্তিকা পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি লক্ষ্য করিবেন যে, ইহাতে কেবল মাত্র এক জাতীয় লবণ রহিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু নানাবিধ লবণের মধ্যে "সাধারণ লবণ"ও একটি। কোন্ জাতীয় পদার্থকে রাসায়নিকগণ লবণ আখ্যা দেন, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা এই প্রবন্ধে যে সমস্ত পদার্থের উল্লেখ করিব, তাহার সমুদায়কেই রাসায়নিকগণ "লবণ" (salts) বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত গুলিই বিশেষ প্রয়োজনীয়ঃ—

(১) পোটাসিয়াম নাইট্রেট (potassium nitrate) বা ভারতীয় সোরা।

(২) সোডিয়াম নাইট্রেট (sodium nitrate) বা চিলী প্রদেশের সোরা।

(৩) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট (calcium nitrate)

(৪) সোডিয়াম ক্লোরাইড (sodium chloride) বা "সাধারণ লবণ"

(৫) সোডিয়াম সালফেট (sodium sulphate) বা গ্লবারের লবণ।

সোরার কারখানা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার রূপে বুঝিতে হইলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক ঃ—দ্রবণীয় (soluble), দ্রবণীয়তা (solubility), অনুসিক্ত দ্রাবণ (saturated solution)। হিন্দুস্থানী ভাষায় "গল্ জানা" এই ক্রিয়ার অর্থ গলিয়া যাওয়া; এবং দ্রবীভূত হওয়ার ব্যাপার সোরা সংশোধকগণের রীতিমত পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত তালিকা লিখিত যাবতীয় লবণই জলে দ্রবণীয়। কিন্তু সোরা সম্বন্ধীয় আরও গভীর বিষয় সমূহের অবতারণা কালে, এবং নির্দ্দিষ্ট কত পরিমাণ জলে পূর্ব্বোক্ত লবণ সমূহের কত পরিমাণ দ্রবীভূত হয়, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা কালে, লবণ-সমূহের মধ্যে এরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইবে যে, এই সমস্ত পার্থক্য সোরা উৎপাদনের বর্ণনীয় প্রণালীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রথমতঃ পোটাসিয়াম নাইট্রেট বা ভারতীয় সোরা পরীক্ষা করা হউক। যদি ১০০ ভাগ উৎকৃষ্ট কূপ জলে অল্প অল্প করিয়া উক্ত লবণ ঢালা হয়, তাহা হইলে এই লবণ, জলে ক্রমাগত দ্রবীভূত হইতে হইতে খানিকটা পরিমাণ ঢালা হইলে, এমন

হইয়া উঠিবে যে, ঐ জলে লবণ আর দ্রবীভূত হইবে না। ভারতবর্ষে কূপের জলের সাধারণতঃ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় ১০০ ভাগ জলে ৩৭ ভাগ লবণ বিগলিত হয়। এইরূপ দ্রাবণকে ২৫ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় "অনুসিক্ত" দ্রাবণ কহে। জল অধিকতর উত্তপ্ত হইলে, উদাহরণ স্বরূপ ধরা গেল যে জলের তাপ মাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড, তাহা হইলে ১০০ ভাগ জলে ৪৮ ভাগ সোরা বিগলিত হয়। ইহা ৩২ ডিগ্রি তাপমাত্রায় "অনুসিক্ত" দ্রাবণ। এই পরীক্ষা হইতে দুইটি বিষয় নিরূপিত হইতেছে। প্রথম,---"অনুসিক্ত" দ্রাবণ এই কথার সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইল; দ্বিতীয়,—উত্তাপ, জলের লবণ দ্রবীভূত করিবার শক্তির উপর৭কিরূপ প্রতিক্রিয়া করে, তাহারও একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

এক্ষণে এই প্রবন্ধে যে সমস্ত লবণ আলোচিত হইবে, তাহাদিকে পরীক্ষা করা যাউক। পোটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা এইরূপ:—জলের উত্তাপ ২৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড হইলে ১০০ ভাগ জলে ৩৬ ভাগ, ৩২ ডিগ্রি হইলে ৩৮ ভাগ এবং ১০০ ডিগ্রি হইলে ৫৬ ভাগ পোটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হয়। ২৫ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় ১০০ ভাগ জলে যতটুকু পোটাসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত হয়, পোটাসিয়াম নাইট্রেট বা ভারতীয় সোরাও প্রায় তত টুকুই দ্রবীভূত হয়। শীতল জল অপেক্ষা উত্তপ্ত জলে ক্লোরাইড সমূহ অধিক দ্রবীভূত হইয়া থাকে। এস্থলে উত্তাপ প্রয়োগে কি ফল হয়, তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। উত্তপ্ত জলে নাইট্রেট যতটুকু দ্রবীভূত হয়, ক্লোরাইড তাহার এক পঞ্চমাংশ মাত্র দ্রবীভূত হইয়া থাকে। পদার্থ মাত্রেরই অতি সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, শীতল জলে যে পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত হয়, উত্তপ্ত জলে তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া থাকে।

সাধারণ লবণে তাপ প্রয়োগে যে ফল হয়, তাহা অতি সামান্য। ১০০ ভাগ জলে, ২৫ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় ৩৬ ভাগ, ৩২ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় ৩৭ ভাগ, ১০০ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় ৪৭ ভাগ মাত্র সাধারণ লবণ দ্রবীভূত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে দ্রবণীয়তা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়। যেমন সোডিয়াম সালফেট। ১০০ ভাগ জলে ২৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৮ ভাগ, ৩৩ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় ৫০ ভাগ এবং ১০০ ডিগ্রি তাপ মাত্রায় ৪০ ভাগ সোডিয়াম সালফেট দ্রবীভূত হইয়া থাকে। এই লবণের বিশেষত্ব এই যে, ইহা ৩৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা অপেক্ষা শীতলতর বা উত্তপ্ততর জলে অল্প পরিমাণ দ্রবীভূত হয়।

আবার কখনও কখনও এরূপও হয় যে, জলে কোন এক জাতীয় লবণ বর্ত্তমান থাকিলে, অন্য দ্বিতীয় লবণ যত টুকু বিগলিত হয়, প্রথম লবণ না থাকিলে ততটুকু হয় না। সাধারণ লবণ শূণ্য ফুটন্ত উত্তপ্ত জল অপেক্ষা সাধারণ-লবণ-মিশ্রিত ফুটন্ত উত্তপ্ত জলে, ভারতীয় সোরা $\frac{১}{২}$ গুণ অধিকতর বিগলিত হয়। অন্যথা ভারতীয় সোরা বর্ত্তমান থাকিলে পোটাসিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণীয়তা অল্প হইয়া যায়। বিশুদ্ধ জলে সোডিয়াম

সালফেট বা প্রকার লবণ যতটুকু দ্রবীভূত হয়, সাধারণ লবণ জলে মিশ্রিত থাকিলে ততটুকু হয় না। বিভিন্ন দ্রব্যের দ্রবণীয়তার এই সম্পর্ক সোরার কারখানায় অতীব প্রয়োজনীয়। পরে এই সমস্ত বিবৃত হইবে। *

FOOD.

Translated from Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose's book on Food.

(5)

Alimentary principles and their functions.

We have, before this, briefly considered the need for food and the process of digestion. We now propose to deal with the alimentary principles of the various food-stuffs, their respective functions and the part each plays in the repair of waste and the growth of the body. But before we consider these food-principles, we must first find out what materials our bodies are made of, because the food we take goes to make up for the constant loss of these materials from the system.

The different kinds of matter we see all around us can be classed under two principal heads, *viz.*, the *elements* and the *compounds*. Gold, Silver, Copper, Iron, Sulphur, Carbon, Phosphorus &c., each of these is an *element* or *simple substance*, because nothing simpler than itself can be obtained out of any of them. Up to this time, there have been discovered 77 elements only.

A *compound* substance, on the other hand, is made up of two or more *simple* substances and their number is unlimited. Sand, wood, lime, stones, animals, plants &c., which constantly come under our observation, are examples of compound substances. Water, for example, is formed by the chemical union of the two elements, Oxygen and Hydrogen; it is therefore a compound substance. So is also the common salt which is an indispensable article of food and which is formed by the union of Sodium and Chlorine. Bones, skin, muscles, blood, blood-vessels, nerves, ligaments, fat and such other tissues as enter into the composition of our body, are, each and all, examples of compound substances.

Of the 77 *elements*, sixteen are to be found in the human body and among them, Carbon, Oxygen, Nitrogen and Hydrogen are the most important ones. On an average, for every one part of Oxygen present in the human body, there is $\frac{1}{3}$ part of Carbon, $\frac{1}{8}$ of Hydrogen and $\frac{1}{32}$ of Nitrogen. Besides these four elemnts, there are others such as Phosphorus, Sulphur, Chlorine, Sodium, Potassium, Calcium, Iron &c., present in greater or less proportions in our body. With the exception of Oxygen, all other elements exist in the body in the form of compounds. Oxygen alone is present both as an element and as a compound.

The *elements* composing the human body must, all of them, be present in our food. But it will not do to take them as food in

---

* পুসা কৃষিবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "The Indian Saltpetre Industry" নামক পুস্তিকা হইতে Agricultural Adviser to the Government of India র অনুমতিক্রমে কেবল মাত্র "বিজ্ঞানের" জন্য শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস কর্তৃক অনূদিত।

their *simple* form. For instance, Nitrogen in the elementary form is one of the constituents of the air and it is present there in abundant quantity. Again charcoal or coal forms one of the *elementary* forms of Carbon and may easily be obtained in any quantity. But to get the required supply of Nitrogen and Carbon for the body, it would not do if we take air or eat charcoal. Plants are capable of drawing their nourishment from the air or the soil on which they stand, but animals can never do so. They must obtain their nourishment from complex substances formed in the bodies of plants and animals. Flesh, eggs, milk, starch, fat, oils, sugar and other similar food-stuffs are highly elaborated products of either animal or vegetable origin. By taking them as food, we are able to obtain the elements required for the building up of our body.

It must be noted here that the primary source of food of all animals is the vegetable world. The plants obtain their food in an *elementary* form from the air and the soil, elaborate these in their tissues and store the finished products in the form of different kinds of vegetable albumen, sugar, oil, starch &c., in their roots, stems, leaves, fruits and seeds. These are eaten by the herbivorous animals such as cow, sheep and goat, and are transformed into muscles, fat, blood, bones and other tissues in their body. Carnivorous animals live on the flesh of the herbivorous and threfore indirectly on products originally elaborated in the bodies of plants. We thus see that the foods stored in plants directly support the lives of herbivorous and indirectly of carnivorous animals.

The All-merciful God has stored a complete and pure food for the helpless infant in the breasts of its mother. Milk is the only complete food found in nature, because it contains in due proportions all the ingredients necessary for the repair of waste and the growth of the body.* Some people can maintain good health by taking milk only, but it is not convenient for most people to live on milk alone. We must, therefore, use such other food-stuffs in which all the component parts of milk are present. Let us now see what we have in milk which help to support the body.

If we add some acid substance, such as lime-juice, to milk, we notice that it gets curdled and a solid mass which is called casein *(chhana)* is thrown down. Besides casein, milk contains butter, sugar, salts and water. When milk is churned under suitable conditions, butter is obtained. When both casein and butter are separated from milk, the watery portion left behind contains the milk-sugar and various kinds of salts in solution. What remains after the separation of the sugar and the salts is water only. We thus see that the different ingredients of milk which nourish the body are the casein, the butter, the milk-sugar, the salts and the water. They possess quite different properties and they differ from one another in their functions as food. Water being an inorganic substance, it is convenient to place it under the head of salts; we can

* Egg is considered to be another complete natural food, as chicks do not require any other sustenance for their development. But as carbohydrates are practically absent from eggs, they lack in completeness as food when compared with milk.

then classify the food-principles of milk under the following heads :—

(1) Proteids ... ... (representing the *casein* of milk).
(2) Fats ... ... (" *butter* ").
(3) Carbohydrates ... (" *sugar* ").
(4) Salts ... ... (" *ash* and *water* ").

Now, whatever food we take, it should contain all the above four principles, as otherwise the nutrition of the body will suffer. As *casein* is the proteid-principle in milk, so is *myosin* in flesh, *albumen* in eggs, *legumin* in *dals*, *gluten* in flour and *fibrin* in oatmeal. Proteids repair the waste and help the growth of muscles and other tissues; hence this kind of food is also called the *flesh-former*. As Nitrogen is one of the principal ingredients of proteid-foods, they are also known by the name of *nitrogenous* or *albuminous* foods. Meat and fish are principally proteid-foods but they also contain fats and salts but no carbohydrates. Rice, on the other hand, is very rich in carbohydrates (starch) but poor in proteids, fats and salts. Sugar is purely a carbohydrate and contains neither proteids, fats or salts. Butter and oils are pure fats and contain no other food-principles. In *dal*, flour, oatmeal &c., both proteids and carbohydrates are present in good proportions, but they are generally difficient in fats and salts. *Dal* is even considered superior to meat in respect of the proteid-principle but it contains very little fat and we have to add *ghee* or oil at the time of cooking it.

It will thus be seen that in milk only, all the different alimentary principles are present in due proportions and that therefore no other food is needed for children. But it is not convenient for grown-up people to live on milk only, because a large quantity of milk would then have to be taken and this would entail the ingestion of water and some of the other food-principles considerably in excess of what is required for the maintenance of good health. Besides, the food becomes too monotonous and the appetite loses its sharpness which is a necessary condition of health. Of course, the alimentary principles contained in the milk are, each and all, indispensably necessary for the repair of waste and the growth of the body, but we can obtain these in required quantity from food-stuffs other than milk, such as rice, *dals*, meat, fish, flour, oils, sugar &c. We shall now briefly consider the respective functions of each of these alimentary principles.

Proteids.—These are found in considerable quantity in fish, meat, white of eggs, cheese, *chhana*, and the various kinds of pulses *(dal)*. Other food-stuffs such as rice, flour &c., also contain proteids in much smaller proportions. The principal function of this kind of food is to repair the waste of muscles and other tissues and help their growth. Our body is made up of countless numbers of cells too minute to be seen by the naked eye. A kind of jelly-like substance called *protoplasm* constitutes the formative material of these cells. Proteids contribute to the replenishment of protoplasm, hence they form the most important constituent of our food for the nourishment and the growth of the muscles and other tissues of the body. They also help the forming of the various secretions of the body and to some extent contribute to the formation of fat and the production of heat and energy.

Fats.—These include butter, ghee, lard and the various kinds of animal and vegetable oils used as food. They do not contain Nitrogen but consist of Carbon, Hydrogen and Oxygen only, but less Oxygen than is found in carbohydrates. The chief function of this kind of food is to generate the body-heat from which we also obtain the energy to work. Fish and meat are much inferior to these as regards their heat and energy-producing power. It is from fats and carbohydrates that we obtain all supply of energy. Some people have got the mistaken notion that meat is the principal source of our strength. Proteids go to make up for the waste of muscles and other tissues and contribute to their growth but the energy for any kind of work is yielded by fats and carbohydrates. Fats also help the formation of fat in the body, and to some extent, the digestion of food.

Carbohydrates.—These comprise starches and sugars and are present in rice, potato, flour, sugar, arrow-root, barley and a number of other common food-stuffs. There is total absence of nitrogen in carbohydrates; they contain carbon, hydrogen and oxygen only and are principally concerned in the production of body-heat and energy. In this respect, they are inferior to fat. They principally help the formation of fat in the body, and people taking too much of this kind of food generally grow stout.

Salts.—We have placed water among this class of food. There is about 70 per cent. of water in our body. It is constantly being lost from the system with urine, perspiration and evacuation from the bowels. We replace the loss by taking food such as milk, meat, fish &c., all of which contain more or less water and by drinking water and other fluid substances. There is much water in our blood which keeps it in fluid condition and enables it to flow easily to all parts of the body carrying the digested food which is taken up by the tissues for their growth and repair of waste. Water softens and dilutes the food to a thinner consistence facilitating its digestion and rendering it easy for the blood to absorb it. Besides, it helps the elimination of the refuge of the food and of other impurities which are constantly being formed in the body as the result of metabolism.

Like water, oxygen is also placed under the head of salts. Of all the elements entering into the composition of the human body, oxygen is the only one which we take in an elementary form. It is present in the free condition in air which we inhale, and although it does not directly act as a food, it helps the oxidation of the digested food and in this way, it generates body-heat and energy. We can not live without oxygen. Besides that contained in the air, we also get oxygen from all kinds of food in which it exists in combination with other elements.

Common salt (Sodium chloride) which is daily taken by us with our food is one of the most important salts required for the nourishment of the body. We do not take it directly with some kinds of food such as milk and fruits &c., because it is present there in sufficient quantity and no extra quantity is required. But certain food-stuffs contain very small proportion of common salt and we mix

salt in more or less quantity with [illegible] to supply the difficiency and to make the food palatable. Sodium chloride is present in blood, muscles and in all the other tissues of the body. When taken with food, it increases the flow of saliva, helps the liver to put out a liberal supply of bile and is principally concerned in the manufacture of the acid constituent of the gastric juice. Besides common salt, our food-stuffs contain a good many other salts such as those of lime, iron, phosphorus, potash &c.; these contribute to the formation of the bones and other tissues of the body. The red blood-cells contain an appreciable quantity of iron which helps them to absorb oxygen from the inhaled air and to maintain the slow combustion in the body which is the source of our body-heat and energy. For the proper maintenance of health, salts are essentially necessary. These are present in abundant quantity in vegetables and fruits and they help to purify the blood. If fresh fruits and vegetables are absent from our diet for sometime, the blood gets vitiated and a very obstinate disease, called Scurvy, sets in which can be cured by the use of lime-juice and fresh vegetables only.

We thus see that even if we do not take milk, we can easily obtain all the four food-principles from food-stuffs other than milk. For example, we can get the flesh-forming principle (casein of milk) from such food-stuffs as fish, meat, eggs, *dals* &c.—the fats (butter of milk) from ghee, butter, lard and vegetable oils &c.—the carbohydrates (sugar of milk) from rice, bread, potato, sugar, barley and other starchy and saccharine substances. The salts naturally present in these foods together with the quantity we add to them in the course of their preparation and the water we drink go to supply the place of salts and water present in the milk. The absence of milk from the diet of an adult person is, threfore, not at all harmful.

I have already stated that, except in milk, the materials required for the growth and nourishment of our body do not exist in due proportions in other food-stuffs and that milk is not always a very convenient article of food for people other than children. It is, therefore, necessary to make a careful selection of our food-stuffs in order that we might obtain the required quantity of the different food-principles for the maintenance of health. Such food-stuffs are either of animal or of vegetable origin. Fish, meat, eggs, milk, fat, &c. belong to the first class and rice, flour, *dals*, sugar, vegetable oils &c. come under the second category. Milk, casein and butter, although strictly of animal origin, are generally regarded in this country as non-[illegible] food. We can not maintain good health by eating meat or rice alone, because although the former contains considerable quantities of proteids and fats, it is more or less deficient in the other principles of food; while the latter, though containing a very large amount of carbohydrates is very difficient in proteids, fats and salts. So either of these taken alone as food does not supply the needs of the body. It is only by making a careful selection of the different food-stuffs that we are able to maintain our body in a state of good health.

(To be continued.)

কলিকাতা ৫১ নং পটলডাঙ্গা, সংস্কৃত প্রেস্ হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) সেপ্টেম্বর, ১৯১২ ৯ম সংখ্যা।

আলোক-চিত্রণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দৃশ্য।

দৃশ্য তুলিতে হইলে প্রথমে কিসের ছবি তুলিতে হইবে তাহা স্থির করাই প্রথমে কর্ত্তব্য। কেহ কেহ কোন দৃশ্যের অবিকল ছবিটি তুলিয়াই সন্তুষ্ট; কেহ বা, ইহার সহিত যথা সম্ভব চিত্র-কলার ভাব সংযোগ করিয়া, ফটোর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন; অপরে, চিত্রকলার ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করেন; এবং তজ্জন্য যে স্থানের ফটো তুলিলে কেবল চিত্রোপযোগী হয়, তাহারই ফটো তুলেন এবং অন্যান্য স্থান বাদ দেন।

মনে কর, কোন জায়গায় বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি গাছ দেখিয়া বেশ ভাল মনে হইল। তখন কি উহার দিকে ক্যামরার মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি ফাইণ্ডারের দিকে দেখিয়াই বোতাম টিপিয়া দিব, বা গাছগুলির দিকে চাহিয়া তাহার মধ্যে কোন জিনিষটা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষণ করে তাহাই বিবেচনা করিব? গাছ সাধারণতঃ চিত্তাকর্ষণ করে বলিয়াই কি ফটো তুলিতে হইবে? তাহা নহে, কিন্তু ফটোগুলি যেন চিত্তাকর্ষণ করে, যেন আমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানের প্রতি appeal করে। যদি কোন ছবি নিজের নিকট ভাল লাগে, তাহা হইলে ইহা অপরের নিকটও ভাল লাগিবে। আমরা নিজেরা যাহা অনুভব না করি, তাহা ছবিতে প্রকাশ করা অসম্ভব। সেজন্য প্রথমে দেখা উচিত যে, যে দৃশ্যের ছবি তুলিলে সত্যই তোমার মনে ভাল বোধ হয়, তোমার সৌন্দর্য্য জ্ঞানকে জাগাইয়া তোলে, যেন ইহা দেখিয়াই মনে হয় যে তোমার সম্মুখে খুব একটা সুন্দর জিনিষ রহিয়াছে, সেই দৃশ্যেরই ছবি তোলা উচিত।

পূর্ব্বকথিত সমস্ত বিষয়গুলি শিক্ষার্থীর অভ্যাস করিয়া লওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বেই ফটোর সহিত চিত্রকলার সম্বন্ধ বিষয়ে বলা হইয়াছে; তবে এ বিষয়টি খুব শক্ত, ও যাঁহারা উচ্চাঙ্গের ফটোগ্রাফি শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্য উচ্চাঙ্গের প্রতি-মূর্ত্তি, দৃশ্য ও অন্যান্য জিনিষের ফটো তোলা সম্বন্ধে পরে বিবৃত হইবে। চিত্রের সহিত ফটোগ্রাফীর প্রধান পার্থক্য এই যে, চিত্রে নানা বর্ণ থাকে, ফটোতে তাহা থাকে না। কেবল বর্ণের সাহায্যে চিত্রের যে কোন স্থানের গভীরতার তারতম্য করা যায় কিন্তু ফটোতে তাহা হয় না, গভীরতার জন্য কেবল আলো ও ছায়ার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। অনেক সময়ে ক্যামেরার গ্রাউণ্ড গ্লাসে বর্ণ বৈচিত্রের জন্য কোন কোন দৃশ্য খুবই সুন্দর দেখায়, কিন্তু ফটো তোলার পর এক রঙ্গের হয় বলিয়া দেখিতে কোন কাজেরই হয় না। গৃহ, জন্তু, ফুল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জিনিষের ঠিক ছবিটি তোলা কেবল ফটোগ্রাফ দ্বারাই সম্ভব। অবশ্য চিত্রের কথা বলিতেছি না, তবে, উৎকৃষ্ট করিয়া ফটো তুলিবার সময় যতদূর সম্ভব সুন্দর করিয়া তোলাই উচিত। যদি কেবল চিত্রোপযোগী করিয়া ফটো তুলিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ফটোগ্রাফের চিত্র-রচনার মূল তথ্যগুলি জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। চিত্রোপযোগী বস্তু সকলের সংগ্রহ, তাহাদের সমাবেশ এবং আলো ও ছায়ার সুব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। উৎকৃষ্ট চিত্রে এই সকলই পরিস্ফুট হইয়া থাকে।

চিত্রে যেমন মনের ভাব প্রকাশ করা যায় ফটোতে সেরূপ হয় না। আমা-দিগের প্রথমে দেখা উচিত কোনগুলিতে প্রীতি ও ঐক্য সম্পন্ন 'লাইন' ও সুন্দর আলো ও ছায়ার সমাবেশ আছে এবং কোনগুলি অল্প প্রীতিকর। কোন দৃশ্যে কেবল উদ্ভিদাদি দ্বারাই ছবি পূর্ণ হইলে বড় বিশ্রী বোধ হইবে। সে জন্য আমাদিগকে চতুর্দ্দিক একবার মনোযোগ সহকারে পরিদর্শন করিতে হইবে; তাহা গ্রাউণ্ড গ্লাসে বা ভিউ ফাইণ্ডারে দেখিয়া করিলেই সুবিধা হইবে। এইখানেই আমরা দেখিতে পাইব যে, কতকগুলি লাইন এমন ভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, সেগুলি সকলে মিলিয়া বেশ প্রীতিকর সমষ্টি হইয়াছে আবার কতকগুলি লাইন ইহার মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া এই সকলের সৌন্দর্য্য হইতে চক্ষুকে বিক্ষিপ্ত করে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন অযোগ্য স্থানে খানিকটা যায়গা খুব বেশী আলোকে আলোকিত হয়, বিশেষতঃ যদি তাহা ছবির একপার্শ্বে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহা ঠিক স্থানে পড়ে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা চিত্র রচনার সাহায্য হইতে পারে। চিত্রকর তাহার চিত্রে 'লাইন' বা পুঞ্জীকৃত গাছ পালাদি (masses) ' বদল বা চিত্রের অন্য অংশে সরাইয়া লইয়া আঁকিয়া মনোমত করিয়া লইতে পারেন। ফটোগ্রাফারও ক্যামেরা নড়াইয়া বা অন্য স্থানে বসাইয়া নিজের মনোমত করিয়া লইতে পারেন এবং ইহা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে লাইন ও সুন্দর বস্তুর রাশিকে mass, ও এই সকলকে প্রীতিকররূপে সজ্জিত করাকে চিত্র রচনা (composition) বলে। আলো ও ছায়ার তারতম্য করিয়া সাজান বা সমন্বয়কে chiaroscuro বা আলো আঁধার বলে।

বর্ণের সুবিধা না থাকায় ফটোগ্রাফার আলো ও ছবির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কোন প্রকার স্বাভাবিক ছবি তোলা অসম্ভব। সম্মুখে যে সকল বস্তু থাকে তাহা ছবিতে উঠে বটে কিন্তু নয়নরঞ্জক হয় না, চিত্র হয় না; সেজন্য চিত্র রচনা ও আলো ও ছায়ার (chiaroscuro) প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্য প্রকারে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমরূপ,—কেবল স্বভাবের চিত্র তোলা, আমরা চারিদিকে যাহা দেখি তাহার প্রতিরূপ; দ্বিতীয়রূপ,—যেমন একটা নক্সা, যাহা কেবল সাজাইবার জন্য সুন্দর দেখায় কিন্তু ছবির বিষয়টির প্রতি কোন দৃষ্টি রাখা হয় নাই।

ফটোতে চিত্র-সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে হইলে তাহাতে এই দুটিই থাকা প্রয়োজন। একই সময়ে ইহা স্বাভাবিক ও সাজসজ্জায় পূর্ণ হইবে। তবে গ্রাউণ্ড গ্লাসের প্রতি দেখিবার সময় যেন কোন দৃশ্যকে কেবল স্বভাবের চিত্ররূপে নহে, কিন্তু সাজসজ্জার প্রতিও যেন দেখিতে মনে থাকে। যখন গ্রাউণ্ড গ্লাসে কোন দৃশ্যের প্রতিফলিত ছবি দেখিয়া তাহার দোষগুণ ঠিক করা হইল, তখন আমরা দেখিতে পাই যে তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ যে দৃশ্যের ছবি তুলিতে হইবে তাহার বৃক্ষাবলি খুব বড় হইলে গ্রাউণ্ড গ্লাসের অনেকটা যায়গা অধিকার করে। দুই প্রকারে ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে, আমরা short-focus lens—অর্থাৎ যে লেন্স ব্যবহারে ক্যামেরার বেলো বেশী বাড়াইতে হয় না—তাহাই ব্যবহার করিতে পারি; ইহা দ্বারা গ্রাউণ্ড গ্লাসে প্রতিফলিত সমস্ত বস্তুই ছোট হইয়া যাইবে, এবং long-focus lens দ্বারা চারিদিকের যে সকল বস্তু গ্রাউণ্ড গ্লাসে প্রতিফলিত হইয়াছিল তাহাপেক্ষা বেশী জিনিষ প্রতিফলিত হইবে। যদি এই উপায় দ্বারা সন্তোষজনক ফল না হয় অথবা আমাদিগের নিকট অন্য কোন lens না থাকে তাহা হইলে আমরা যে দৃশ্যের ছবি তুলিতে ইচ্ছা করিয়া যে স্থানে ক্যামেরা স্থাপন করিয়াছি তাহা হইতে আরও পশ্চাতে ক্যামেরা সরাইয়া লইব।

দ্বিতীয়তঃ, যদি গাছের সমষ্টি (group) খুব ছোট ও সামান্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা হয় সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারি, না হয় long focus-lens ব্যবহার করিতে পারি। rectilinear বা symmetrical lens এর অর্দ্ধেকটা ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু এই দুইটিতে একই রকম ফল হইবে না। মনে করুন যেন গাছের পাশ্চাতে দূরে এক পাহাড়ের আছে, ক্যামেরা সম্মুখে বা

পশ্চাতে একশত গজ সরাইয়া৷ এই গাছাছের প্রতিফলিত ছবির আকারের কোন তারতম্য হইবে না। কিন্তু ইহাতে গাছের আকারের অনেক তফাৎ হইবে। Long focus lens এসমান ভাবে সকল জিনিষকেই বড় করিবে। এই দুই উপায়ে, যে সকল জিনিষ দ্বারা আমাদের চিত্র প্রস্তুত হইতেছে, তাহাদিগের আকার সকলরূপেই আমরা ঠিক মনোমত করিয়া লইতে পারি।

ভাল চিত্র মাত্রেরই একটা মিল বা ঐক্য থাকে ; তাহাতে একটা প্রধান বস্তু কিম্বা ভাব প্রকাশ করা উচিত। কেবল একটাই উদ্দেশ্য (motive) থাকা প্রয়োজন। ছবিটি তুলিতে হইলে, তাহার মধ্যে নানা বস্তুর সমাবেশ ও চিত্র গঠন দেখিয়াই ছবির 'উদ্দেশ্য' যেন পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায়। নানা বস্তুর এমন ভাবে সমাবেশ করিতে হইবে, যেন তাহাতে ছবির প্রধান উদ্দেশ্যই ফুটিয়া উঠে ; সে জন্য ছবি সুন্দর করিতে অবশ্য-দেয় যে সকল বহুবিধত্বের প্রয়োজন, তাহার সবই থাকা উচিত। কিন্তু এগুলি গৌণ ভাবে থাকিলে তবে মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। গৌণ ভাবে বা অপ্রধান ভাবে থাকে বলিয়া প্রধান জিনিষ হইতে মনোযোগ এই সকল গুলির দিকে পড়েনা। অর্থাৎ একটা ছবিতেই যদি এমন দুইটা জিনিষ থাকে যাহাদিগকে সমান প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেই ছবির প্রতি দৃষ্টি করিলে, একটা জিনিষের প্রতি দৃষ্টি না পড়িয়া দুইটির প্রতি পড়ে বলিয়া মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায় ; সে জন্য ছবি তত সুন্দর হয় না। কথাটা বোধ হয় ভাল বোধগম্য হইল না ; ধরা গেল যেন একটা ছবির একপাশে একটা বৃহৎগাছ আছে ও অন্য পাশে প্রায় একই মাপের একটা ঘর আছে, সেজন্য ছবির প্রতি দৃষ্টি করিলে দুইটির প্রতিই মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যদি বাড়ীটি খুব পশ্চাতে ও ছোট থাকে তাহা হইতে অবশ্য কিছু অল্প দেখাইবে। কিন্তু গাছটি প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে ; সেজন্য গাছটিই প্রধান জিনিষ। চিত্রের মত ফটো তুলিতে হইলে ফটো তুলিবার আগে আলো ও ছায়া, বস্তুর গঠন ও লাইন প্রভৃতির উপযুক্ত সমাবেশ করিয়া লইতে হইবে। এই সমাবেশ জন্য ছবির মধ্যে কোন বস্তু প্রধান কিম্বা গৌণ স্থান প্রাপ্তি হয়।

দেখা যাইতেছে যে, ছবির মধ্যে কোন বস্তু কোন বিশেষ স্থান অধিকার করার জন্য কতকটা প্রধানত্ব লাভ করে। চিত্রের মধ্যভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ স্থান (weak position) অর্থাৎ চিত্রের মধ্যভাগে যদি প্রধান জিনিষটি থাকে তাহা হইলে ইহা এই স্থানে থাকিবার জন্য তেমন ভাল দেখিতে হইবে না। কিন্তু যদি একটু ডাহিনে কি বামে থাকে তাহা হইলে ছবিটি তেমন নিস্তেজ বোধ হইবে না। এই স্থানকে সতেজ স্থান (strong point) বলে। বোধ হয় একটু দুরূহ বোধ হইল ; নীচের লাইনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বেশী বুঝা যাইবে।

কেহ কেহ ইহাকে পাঁচভাগ করেন আবার কেহ সাতভাগও করেন। তাদের

অন্য কিছু আসে যায়না ; প্রধান জিনিষটির স্থান ঠিক হইলেই হইল। ধরা যাক যেন একটা ছবি লইয়া তাহাকে উপরের মত লম্বা ও পাশ ভাবে তিন ভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে ক. চ, ট বা ত লাইনের স্থানে যদি কোন বস্তু থাকে
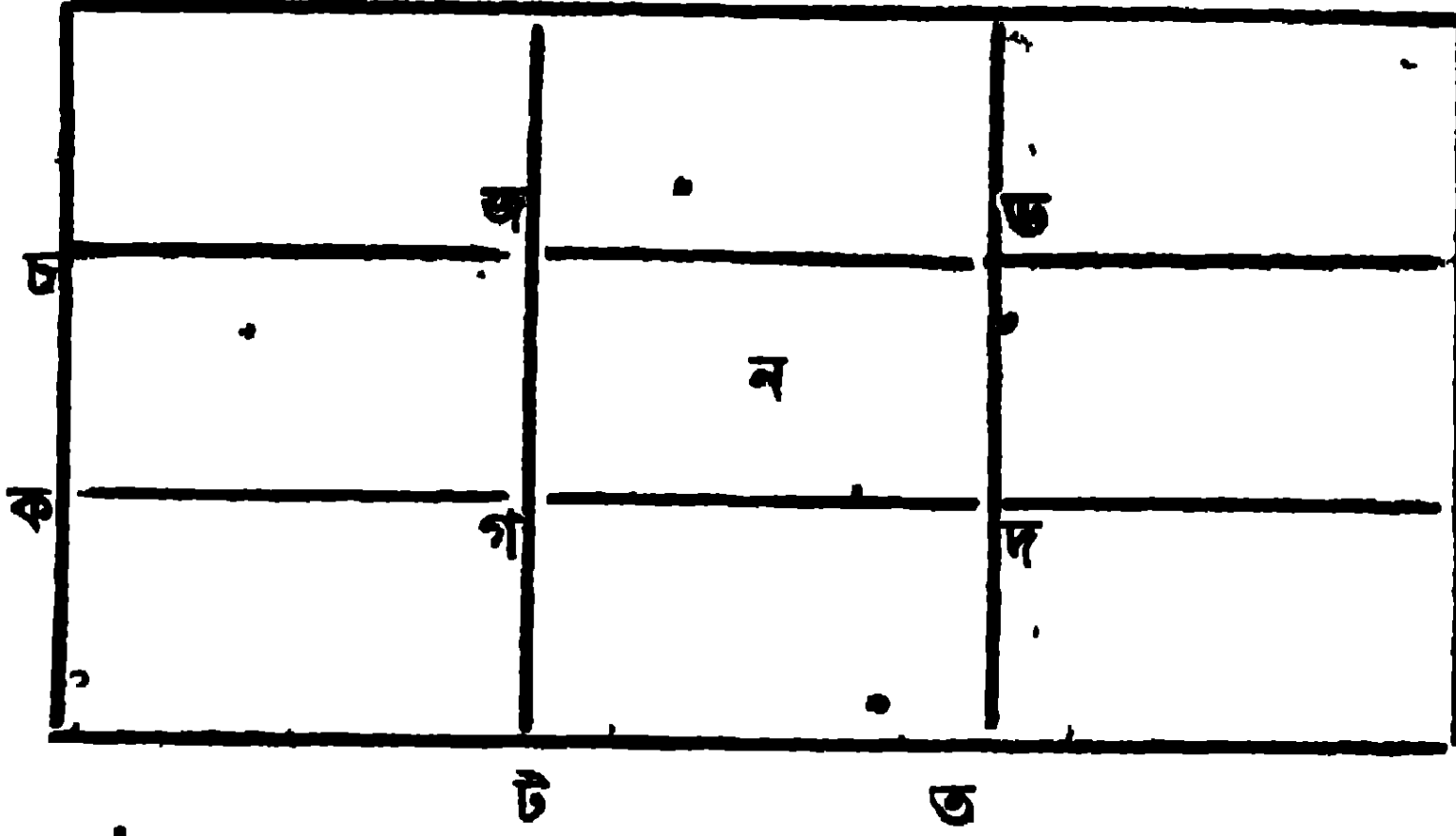
তাহার উপর স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কিন্তু এই সকল গুলির মধ্যে গ, জ, ড, দ এই গুলিই সর্ব্বাপেক্ষা সতেজ স্থান বা strong position ; উপরের নীচের ও দুইধারের চতুষ্কোণে যদি প্রধান জিনিষটি থাকে তাহা হইলে ইহার অবস্থিতির স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর strong position হয়, মধ্যের চতুষ্কোণটি weak point এবং মধ্যস্থলের ন চিহ্নিত স্থান সর্ব্বাপেক্ষা weak point।

এই যে প্রধান স্থানের কথা বলা গেল, ইহার স্থান যে কেবল নির্দ্দিষ্ট স্থানেই রাখিতে হইবে, তাহার মধ্যে যে কোন নড় চড় হইতে পারিবে না এরূপ নয়, কিন্তু প্রধান জিনিষের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর একটা জ্ঞান হইবার জন্যই উক্ত রূপ লিখিত হইল। উপরে যে প্রকারে দাগ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এই প্রকারে ক্যামেরার গ্রাউণ্ড গ্লাসে লাইন টানিয়া লইতে হইবে। ছবি তুলিবার সময় দেখিতে হইবে, যেন দিগন্তবৃত্ত বা horizon ছবির মধ্যভাগে না পড়ে ; তাহা যেন হয় ক লাইনে না হয় চ লাইনে পড়ে। যদি পাঁচ ভাগ করা থাকে তাহা হইলে নিম্ন হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয় লাইনের উপর horizon line পড়িবে। ক, চ, ট, ত এই চারিটে লাইনের মধ্যে যে কোন লাইনের উপর প্রধান বস্তুর চিত্রটি হওয়া উচিত ও সেই সঙ্গে সমান্তরাল লাইনের উপরও পড়া উচিত। Horizon ও প্রধান জিনিষ ঠিক কোন্ স্থানে বসিবে তাহা ছবির একপার্শ্বের সহিত অপর পার্শ্বের সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ ছবির একদিকে যদি বেশী বস্তু অর্থাৎ গাছপালাদি থাকে কিম্বা একদিকে যদি প্রধান জিনিষ থাকে তাহা হইলে অপর দিকে কোন অপ্রধান বস্তু থাকা প্রয়োজন ; ইহাতে ছবির মধ্যে সমতা প্রায়ই ঠিক থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে balance of the picture অর্থাৎ ছবির সামঞ্জস্য বা সমতা পরিরক্ষণ বলে।

নিখুঁত দৃশ্যের ছবি মাত্রেই সম্মুখ জমী বা পাদভূমী (fore ground), মধ্যভাগ (middle distance), দূরবর্ত্তী ভাগ (distance), ও প্রধান বস্তু (principal object) থাকে। প্রধান বস্তু মধ্যভাগে (middle distance) বা তাহার নিকটে বা সম্মুখজমীতে (fore ground) অবস্থিত। দূরে থাকিলেই ফটোগ্রাফী নিষ্ফল হয়, দূরের জিনিষ যাহা চোখে বেশ সুন্দর দৃশ্য বলিয়া মনে হয়, ফটোতে ছোট ও অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। দৃশ্যের খুব দূরের জিনিষের ছবিতে দূরত্ব বুঝাইবার জন্য কতকটা অস্পষ্টতা থাকা প্রয়োজন এবং যেরূপে এই দূরত্ব বুঝান যায় তাহার উপর চিত্রের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। সাধারণতঃ চোখে যে দূরের জিনিষ অস্পষ্ট বোধ হয়, তাহা ক্যামেরাতে আরও বেশী হয়, সে জন্য পূর্ব্ব হইতেই তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ছবিতে বৈচিত্র বা বহুবিধত্ব (variety) রক্ষা করিবার জন্য যাহাতে আলো ও ছায়া কিম্বা চিত্র রচনা (composition of a picture) একইরূপ (symmetrical) না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; এইজন্য এবং যাহাতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না হয় সেজন্য দুইটি প্রধান জিনিষ (prominent object) যাহাতে ছবির দুইধারে একই ভাবে না থাকে তাহা করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যদি কোন প্রবল বস্তু (prominent object) দ স্থানে থাকে তাহা হই লে, গ স্থানে যেন ঐরূপ আর একটি prominent object না থাকে।

যদি কখনও বাড়ীর ছবি তুলিতে হয় তবে তাহা যেন ছবির ঠিক মাঝখানে না বসাইয়া একটু পাশ ভাবে লওয়া হয়, এবং সম্মুখে ক্যামেরা না বসাইয়া একটু কোণ হইতে তুলিলেই ভাল হয়; কারণ ইহা দ্বারা বৈচিত্র ও বহুবিধত্ব পরিস্ফুট হয় বলিয়া ছবি আরও ভাল দেখায়। যদি কোন রাস্তার ছবি তুলিতে হয় তাহা হইলে তাহার ক্রমঃঅন্তর্হিত সীমা (vanishing point) ছবির ঠিক মাঝখানে না হইয়া একটু পাশের দিকে হইলেই ভাল হয়। যাহাতে ছবি সমচতুষ্কোণ, সমত্রিকোণ, প্রভৃতি না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

গৃহের বাহিরে ছবি তুলিতে হইলে ফটোগ্রাফারের ইচ্ছা মত আলো ও ছায়া থাকে না, কিন্তু স্থান বিশেষ হইতে বা দিনের বেলা এমন কি মাস বিশেষে কোন দৃশ্যের ছবির আলো ও ছায়া ঠিক স্বাভাবিক ও মনোমত রূপে পাওয়া যায়; অর্থাৎ কোন দৃশ্যের ছবি তুলিতে হইলে যদি নিকট হইতে সুবিধা না হয় তাহা হইলে ক্যামেরা পশ্চাতে সরাইয়া বা দক্ষিণে কিম্বা বামে সুবিধামত সরাইয়া মনোমত ছবি তুলিতে পারা যায়, এবং তাহাতেও যদি আলো ও ছায়ার সুবিধা না হয় তাহা হইলে সকালে বিকালে কিম্বা দ্বিপ্রহরে তুলিলে কোন সময়ে বোধ হয় মনোমত আলো পাওয়া যাইতে পারে। এমন কি শীত গ্রীষ্মকালে তুলিলে দৃশ্যের উপর আলো ও ছায়ার ব্যতিক্রম হয়। কারণ শীতকালে দক্ষিণায়ন হওয়ার জন্য শীতকালে দৃশ্যের দক্ষিণ দিকে বেশী আলো হয়।

যদি সূর্য্যের দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছবি তোলা হয় তাহা হইলে ছবি flat উঠিবে, এবং ছায়া ইত্যাদি বড় একটা দেখা যাইবে না কিন্তু যদি সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া ছবি তোলা হয় তাহা হইলে কেবল ছায়াই বেশী দেখা যাইবে। ইহা ব্যতীত সূর্য্যের আলো যেন ঠিক একপাশ হইতে না আসে অর্থাৎ ক্যামেরার সহিত সমকোণ (right angle) করিয়া একপাশ হইতে আলো আসিয়া দৃশ্যের উপর না পড়ে। যদি ক্যামেরার পশ্চাৎ দক্ষিণে কি বামে, কিম্বা ক্যামেরার সম্মুখে দক্ষিণে বা বামে সূর্য্য থাকে তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল হয়; অর্থাৎ সম্মুখ, পশ্চাৎ কিম্বা পাশ হইতে আলো না আসিয়া যদি কোণাকুণি ভাবে আলো আসিয়া দৃশ্যের উপর পড়ে তাহা হইলে ভাল ফল হয়।

সূর্য্য যদি একটু সম্মুখে রাখিয়া ছবি তোলা যায় তাহা হইলে ছায়াটি বেশ সুন্দর হইয়া উঠে, ছবিতে ছায়ার মূল্য খুব বেশী; কিন্তু এই ব্যবস্থা করিতে গিয়া সূর্য্যালোক
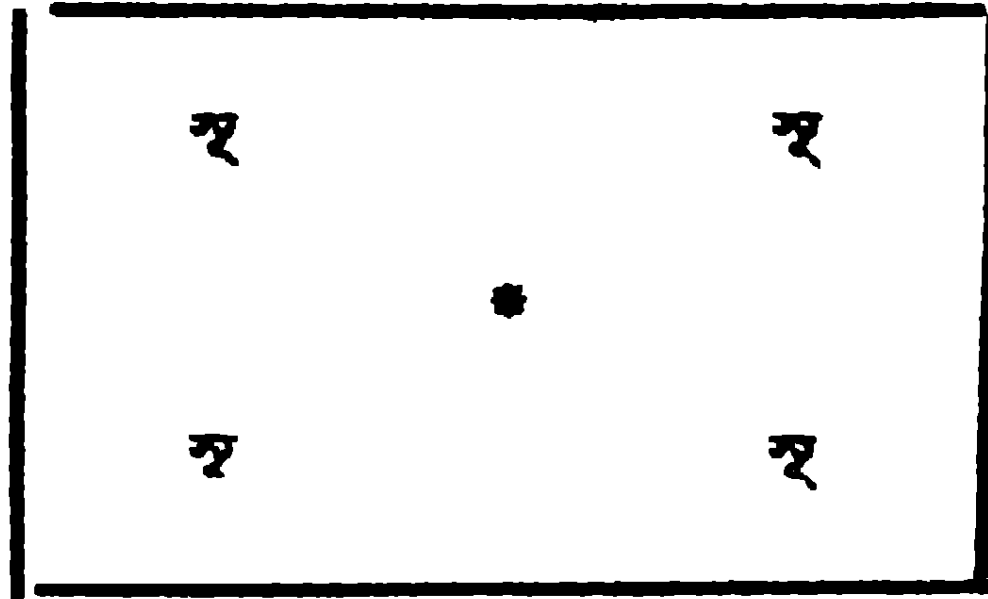
যেন লেন্সের উপর না পড়ে; তাহা হইলে ছাতা কিম্বা হাত দিয়া ছায়া করিতে হইবে। যদি নিম্ন লিখিত ছবি অনুসারে ফটো তোলা যায় তাহা হইলে সুন্দর স্পষ্ট করিয়া উঠে। ইহা গৃহাদির ছবি তুলিলে বেশী বুঝা যায়।
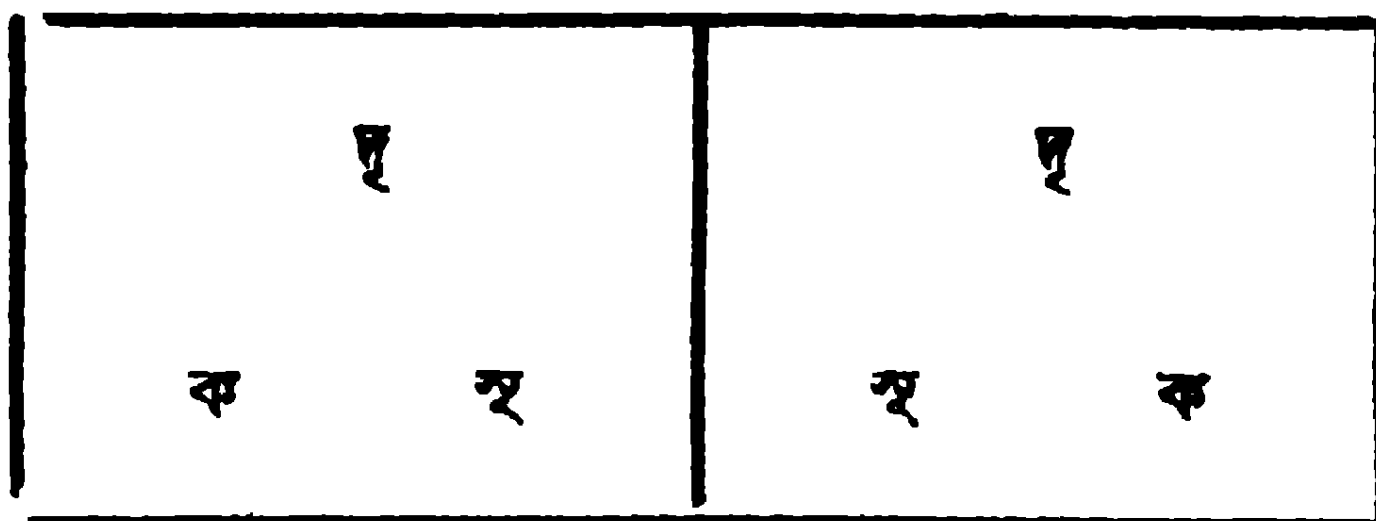
বহু বিধত্ব (variety) রক্ষা করিতে গিয়া যেন ছবির অত্যাবশ্যক জিনিষ, balance বা সমতা নষ্ট না হইয়া যায়। ছবির এক দিক হইতে যদি লাইন থাকে তাহা হইলে উল্টা দিক হইতে লাইন দ্বারা ছবির balance রক্ষা করিতে হইবে। যদি ছবির কোন কোণ হইতে লাইন থাকে তাহা হইলে লম্বভাবে দণ্ডায়মান (vertical) লাইন দ্বারা কিম্বা সমান্তরাল (horizontal) লাইন দ্বারা ছবির balance রক্ষা করিতে হইবে; যদি ছবির এক পার্শ্বে খুব ছায়া ও আলো থাকে তাহা হইলে অন্যান্য পাশেও আলোও ছায়ার দ্বারা balance রক্ষা করিতে হইবে। সামঞ্জস্য (balance) না থাকিলে মনে হয় যেন ছবিটি অরক্ষিত ভাবে রহিয়াছে, যেন ছবিটি পড়িয়া যাইবে। কোন কোন

ছবিতে প্রধান বস্তুর অবস্থিতির উপর balance নির্ভর করে। বাড়ীর ছবি তুলিবার সময় তাহার সম্মুখটার উপর balance নির্ভর করে অর্থাৎ বাড়ীর কোণ হইতে ছবি তুলিবার সময় যতখানি সম্মুখ দিকটা তুলিতে পারা যায় তাহাই ভাল, কারণ balance বাড়ীর সম্মুখ দিকেই ঠিক হয়, একথা যেন স্মরণ থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

বৈজ্ঞানিক কৃষি-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

ভারত কৃষি-প্রধান দেশ। সুতরাং এদেশে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। "বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস" একটি চিরপ্রচলিত কথা। কৃষিজাত সামগ্রী লইয়াই ভারতের বাণিজ্য। তাই আমরা ধান্যকে লক্ষ্মী বলিয়া পূজা করি। যে শিল্পের উন্নতিতে আজ ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, সেই শিল্পের উন্নতিও কৃষি-সাপেক্ষ। কেননা কৃষি-জাত সামগ্রী হইতেই শিল্পের উপাদান সংগৃহীত হইয়া থাকে। এ হেন কৃষি-কার্য্য আজ এ দেশে শিক্ষিতগণের অনাদৃত ও উপেক্ষিত। যে "সুচর্ষণী" (উত্তম চাষা) নামে এক-দিন দেবরাজ ইন্দ্র সম্পূজিত হইতেন, সেই "চাষা" শব্দ এখন মূর্খ ও বর্ব্বরের নামান্তর। সুতরাং এদেশে কৃষিবৃত্তি যে এক্ষণে নিরক্ষর মূর্খের বৃত্তি মধ্যে পরিগণিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু লক্ষ্মীর ক্রীড়াভূমী পাশ্চাত্য দেশে কৃষি-বৃত্তি ও কৃষককুলকে সকলে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। প্রাচীন কালে এদেশে বেদ-মন্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণ যেরূপ স্বহস্তে হলচালন করিতেন, বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিত-মণ্ডলী, ধর্ম্মপ্রচারক ও ধনী সকলেই সেইরূপ কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত। তাই প্রাচীন ভারত উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, এবং নবীন পাশ্চাত্য দেশ জগতে অভ্যুদয়ের নূতন পথ প্রদর্শন করিতেছেন। ইউরোপীয়গণ নিরক্ষর বেতন-ভোগী ভৃত্যের হস্তে কৃষিকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। সেই জন্যই ইউরোপে দিন দিন কৃষিকার্য্যের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইতেছে। তথায় একটি শস্য-বীজের স্থানে যিনি দুইটি বীজ উৎপাদন করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত পক্ষে দেশের বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যিনি যত বাক্য-বাগীশ, তিনিই তত দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

অনেকে মনে মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের লোক কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে এদেশে কৃষি-বিজ্ঞানের আলোচনার কোন প্রকার প্রয়োজন নাই; বিজ্ঞানে যাহা শিক্ষা দিবে, ভূয়োদর্শনে এ দেশের কৃষকেরা তাহা আপনারাই শিক্ষা করে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এদেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এত ঘন ঘন হইত না, এবং বিদেশের কৃষিজাত সামগ্রী দ্বারা এদেশবাসীর অভাব পূরণ করিতে হইত না। অবশ্য দুর্ভিক্ষের নানাবিধ কারণ রহিয়াছে সত্য, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের প্রকৃত কৃষি-কার্য্যে অনভিজ্ঞতাও দুর্ভিক্ষের একটি অন্যতম কারণ। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে এদেশে কৃষি-কার্য্যের কিরূপ অবনতি হইতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। এই ইক্ষু রস হইতে যে চিনি প্রস্তত হইত, প্রাচীনকালে তাহা পৃথিবীর সকল দেশে প্রেরিত হইত। আজ সেই ভারতবর্ষের লোক চিনির জন্য যবদ্বীপ, ইয়াইদ্বীপ প্রভৃতি বিদেশের মুখাপেক্ষী। মান্ধাতার আমল হইতে যে প্রণালীতে ভারতে ইক্ষুর আবাদ ও চিনি প্রস্তত হইয়া আসিতেছে, তাহার কোনরূপ উন্নতি সাধিত না হওয়াতেই এদেশের এই একটি বিশেষ লাভ-জনক ব্যবসা নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। যবদ্বীপের চিনির আমদানী ভারতে দিন দিন কিরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অবগত হইলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশের ইক্ষুর আবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে চিনির ব্যবসায়ের কিরূপ অবনতি হইতেছে। যবদ্বীপ হইতে এদেশে গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ চিনি আমদানী হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১৯০৫—'০৬	সালে	...	৮৪,৩০০ টন।
১৯০৬—'০৭	,,	...	১,৬৫,২১৮ ,,
১৯০৭—'০৮	,,	...	৩,২৫,৩৮৭ ,,
১৯০৮—'০৯	,,	...	৩,০৩,৫৭১ ,,

বৈদেশিক চিনির এইরূপ আমদানী বৃদ্ধিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভারতজাত চিনিতে আর ভারতবাসীর অভাব পূরণ হয় না। কিরূপে ভারতের ইক্ষুর আবাদের এইরূপ দুরবস্থা হইল ও সে জন্য চিনির উৎপত্তি হ্রাস হইল এবং পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র যবদ্বীপ কিজন্য তাহার উৎপন্ন চিনি দেশে বিদেশে চালান দিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইল, ভারতের কৃষক সে সংবাদ কিছুমাত্র রাখে না। কেবল কৃষক নহে, যাঁহারা ভূস্বামী,—কৃষকের প্রমার্জ্জিত অর্থে যাঁহারা নানা সুখ-সম্ভোগ করেন,—তাঁহারাও সে সংবাদ রাখা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহারা যদি ইহার অনুসন্ধান লইতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন যে, যে ভূমিতে ইক্ষু উৎপন্ন হয় সেই ভূমি

ক্রমাগত বহুকাল ধরিয়া ইক্ষুর পরিপুষ্টি সাধন করিয়া এতাদৃশ হীনশক্তি বা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, যে উহা পূর্ব্বের ন্যায় ইক্ষুর পরিপুষ্টি সাধনে অসমর্থ। যবদ্বীপের কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে তথাকার ভূমী ইক্ষুর পরিপুষ্টি সাধনে সর্ব্বদা সমর্থ হয়, তাহারা তাহার উপায় বিধানে যত্ন করে। তথাকার প্রত্যেক ইক্ষুক্ষেত্রে বা চিনির কুঠিতে একজন করিয়া রাসায়নিক নিযুক্ত থাকেন। ভূমীর পরিপোষণ শক্তি কি পরিমাণ হ্রাস হইতেছে, আবাদ উঠিলেই তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং যখন যে উপাদান হ্রাস হয়, তখন তাহা সরবরাহ করিয়া জমির পরিপোষণ শক্তি বৃদ্ধি অথবা রক্ষা করিয়া থাকেন। ইক্ষু ক্ষেত্রের রাসায়নিকদিগের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবার জন্য যবদ্বীপের ওলন্দাজ গভর্ণমেণ্টও কতিপয় সরকারী রাসায়নিক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কৃষি ক্ষেত্রের রাসায়নিকেরা তাঁহাদিগের কার্য্য যথাযথরূপে সম্পাদন করিতেছেন কিনা, তাঁহারা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ফসল উঠিলেই তাঁহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে, ভূমী হইতে কোন উপাদান কি পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছে। তথাকার কৃষি বিবরণীতে প্রকাশ যে ২৭ মণ চিনি প্রস্তত হইবার উপযোগী ইক্ষু-ভূমি হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ উপাদান শোষণ করিয়া থাকে।

পটাশ	১ মণ ১৪ সের।
নাইট্রোজেন	অর্দ্ধ মণ।
চুণ	১৭ সের।
ফসফরিক এসিড	৬॥০ সের।

সুতরাং এই হারে তাঁহারা ভুমিতে উল্লিখিত উপাদান সকল সরবরাহ করিয়া থাকেন। ইহাতে ভুমির শক্তি হ্রাস হইতে পায়না, বরং ঐ সকল উপাদান নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করাতে উহার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তদ্দ্বারা ইক্ষুতে চিনির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হওয়াতেই এইরূপ সুফল লাভ হইয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবেই আমাদের দেশের কৃষি কার্য্যের এতাদৃশ দুরবস্থা এবং দেশবাসিগণের দারিদ্র্য। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, কেবল হল-চালনা করিয়া বীজ বপন ও শস্য উৎপাদনই কৃষকের এক মাত্র কার্য্য নহে। শস্য উৎপাদনের জন্য যে মূলধন নিয়োজিত হয় এবং কর্ষণাদি কার্য্যে যে পরিশ্রম করা হয়, ফশল দ্বারা সেই মূলধন ও পরিশ্রমের উপযুক্ত লাভ পাওয়া গেল কিনা, তাহা হিসাব করিয়া দেখা কৃষকের প্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের কৃষকেরা তাহাদের কৃষিজাত সামগ্রীর দ্বারা কোনরূপে দিন "গুজরাণ" হইলেই

সন্তুষ্ট। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অদৃষ্টকে দোষ দিয়া তাহারা মহাজনের শরণাপন্ন হয় এবং তাহার ঋণ পরিশোধের জন্য আজীবন পরিশ্রম করে। যে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পাশ্চাত্য দেশের লোক প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, আমাদের দেশের লোক সেই কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আজীবন ঋণ-গ্রস্ত।

সত্য বটে আমাদিগের দেশের কৃষকেরা নিরক্ষর, কিন্তু তাহারা নির্ব্বোধ নহে। কোন্ সময়ে ভূমি কর্ষণ করা প্রয়োজন, কোন্ ভূমিতে কি প্রকার বীজ বপন করা আবশ্যক, এ সকল তত্ত্বে তাহারা বিশেষ রূপ অভিজ্ঞ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে তাহাদিগের সেই অভিজ্ঞতা একটি নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ বৃত্ত মধ্যে কেন্দ্রীভূত। তাহারা চিরদিন যে প্রণালীতে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছে, অবস্থা ভেদে যে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ইহা তাহারা বুঝে না। তাহারা চিরদিন যে লাঙ্গলে আবাদ করিয়া আসিতেছে এবং ভূমিতে যে সার যে পরিমাণে দিয়া আসিতেছে, তাহার অন্য আচরণ করিতে প্রস্তুত নহে। ভূমিতে কোন্ উপাদান সরবরাহের অধিক প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জ্ঞানের অভাবে তাহারা চিরপ্রচলিত প্রথায় সার দিয়া আসিতেছে। তাহাতে আশানুরূপ ফসল হইলে আনন্দিত হইল, না হইলে দৈব-নিগ্রহ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-সম্পন্ন কৃষক সেরূপ ভাবে কাজ করেন না। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখেন যে, কোন্ ভূমিতে কোন্ বীজ এবং কিরূপ ভাবে বীজ বপন করিবেন, কোন্ প্রকারের সার কি পরিমাণ প্রদান করিবেন এবং কোন্ সময়ে ফসল তুলিয়া লইয়া সেই একই ভূমিতে আর একটী ফসল আবাদ করিয়া মূল ধন বৃদ্ধি করিবেন। বাস্তবিক এক ভূমি হইতে দুইটী ফসল উৎপাদন করিতে এ দেশের কৃষকেরা এক প্রকার অনভিজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশে একখণ্ড ভূমিতে বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ দুইটী ফসল আবাদ করিয়া কৃষকেরা প্রভূত লাভবান হইতেছেন। ইহাতে কৃষকের বিচার শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। কোন্ ঋতুতে কোন্ বীজটী বপন করিয়া কখন তাহার ফসল কাটা যাইবে এবং তাহার পর কোন্ ফসলের আবাদ করিয়া যথা সময়ে সে ফসল উঠান যাইবে, সে বিষয়ে কৃষককে বিশেষরূপে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয়। এদেশের সরকারী আদর্শ ক্ষেত্র-সমূহে পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এক ক্ষেত্রে বৎসরের মধ্যে পাট ও ধানের দুইটি আবাদ হইতে পারে এবং একটি আবাদ করিতে যে ব্যয় হয়, প্রায় সেই ব্যয়েই দুইটি ফসল পাওয়া যায়, তাহাতে প্রচুররূপে লাভবান হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অল্প কৃষকই এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত। *

বীজ নির্ব্বাচনের উপর যে শস্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিশেষরূপে নির্ভর করে, ইহা

* একই জমীতে একই বৎসরে ধান ও পাট আবাদের সমীচিনতা ও অসমীচিনতা সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। বিঃ, সং।

সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদিগের দেশের কৃষকেরাও এতথ্য অবগত আছে। কিন্তু জানিলে কি হইবে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে তাহারা অনেক সময়ে বীজ রক্ষা করিতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, কৃষক তাহার ফসল হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাল-বীজ রাখিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু বপন করিবার সময় সেই বীজে পোকা ধরিয়াছে বা অন্য কারণে উহা এরূপ নষ্ট হইয়াছে যে তাহাতে আশারূপ শস্য লাভ অসম্ভব। এই বীজ-রক্ষার জ্ঞানের অভাবেই আমাদের দেশের ফসল দিন দিন হীন হইতেছে, ও অনেক ফসল একেবারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। দেশী গোল আলু ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্য দেশে এই বীজ রক্ষার জন্য নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হয়। বীজ-নির্ব্বাচন ও বীজ-রক্ষার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে দেখা যায়, আমাদের দেশে তাহার শতাংশের একাংশও দৃষ্ট হয় না। বীজ নির্ব্বাচন ও রক্ষায় পাশ্চাত্য কৃষকদিগের এতাদৃশ যত্ন ও মনোযোগ যে, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাতেও শস্যোৎপন্ন হইবার ব্যাঘাত ঘটে না। শীত-প্রধান দেশে অনেক সময়ে তুষারপাতে শস্য নষ্ট হইয়া থাকে। যাহাতে তুষারপাতেও শস্য হানি না হয়, এজন্য আমেরিকার এক জন কৃষক তাহার উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হন। একবার তিনি দেখিলেন যে, অতিরিক্ত হিমানিপাতে তাহার ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে দুই একটা শীষ দেখা দিয়াছে। তিনি সেই শীষ গুলিকে যত্ন করিতে লাগিলেন এবং তাহা পরিপক্ক হইলে, সে গুলিকে অন্যান্য বীজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেন। পর বৎসর তিনি সেই বীজগুলি ক্ষুদ্র একখণ্ড ভূমিতে বপন করিলেন এবং তাহার একাংশে কতকগুলি সাধারণ বীজ বপন করিলেন। শস্য সংগ্রহের সময় দেখিলেন, তুষার পাতেও যে শস্য রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারই বীজে উৎকৃষ্ট ফসল হইয়াছে; সুতরাং সেই ফসল বিক্রয় বা ব্যবহার না করিয়া তাহা বীজরূপে রাখিয়া দিলেন এবং পুনরায় তাহা বপন করিয়া তাহার ফল দেখিলেন। এইরূপে উত্তরোত্তর পরীক্ষায় যখন দেখিলেন যে, তুষার পাতেও এই বীজের ক্ষতি হয় না তখন দেশময় উহার প্রচার করিলেন। আমেরিকার সর্ব্বত্রই এখন এই Frost resisting বীজের আদর হইয়াছে এবং তাহা হইতে কৃষকেরা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিতেছে। কৃষিবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা হেতু য়ুরোপ ও আমেরিকার কৃষি ব্যবসায়ীরা কৃষিকার্য্যের এইরূপ কত যে উন্নতি করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সকলেই জানেন সোরাজান বা নাইট্রোজেন উদ্ভিদের শরীর পোষণের একটি প্রধান উপাদান। যদিও বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে, তথাপি উদ্ভিদ উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। এই জন্য নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগিক পদার্থ মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। উদ্ভিদ মাটি হইতে সেই নাইট্রোজেন

শোষণ করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করে। ক্ষেত্রস্থ শস্তকে নাইট্রোজেন দ্বারা পরিপুষ্ট করিবার জন্যই জমীতে গোবরসার দিবার ব্যবস্থা, কেননা পশ্বাদির মলমূত্রে নাইট্রোজেন বর্ত্তমান। কৃষিক্ষেত্র উত্তরোত্তর আবাদ করিতে করিতে ভূমীর নাইট্রোজেন ক্রমশঃ নিঃশেষ হয় এবং ভূমি নিঃস্ব হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে গোবর সার দিয়াও ভূমির এই নাইট্রোজেন হীনতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় না। এমন কি একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, পৃথিবীতে একই ভূমির যেরূপ উত্তরোত্তর আবাদ হইতেছে তাহাতে এমন এক দিন আসিবে যে ঐ সকল ভূমি সম্পূর্ণ নাইট্রোজেনবিহীন হইয়া অনুর্ব্বর হইয়া পড়িবে। যাহাতে পৃথিবীর এই মহদনিষ্ট সাধিত না হয়, তজ্জন্য একজন জর্ম্মাণ-বৈজ্ঞানিক-কৃষিতত্ত্ববিৎ উদ্ভিদকে নাইট্রোজেন দ্বারা পরিপুষ্ট করিবার একটি আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কি প্রণালীতে তিনি উদ্ভিদের প্রাণ-রক্ষার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। কৃষিবিজ্ঞানের আলোচনার দ্বারা পাশ্চাত্য দেশে কৃষি-কার্য্যের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য ইহার উল্লেখ করিলাম। এই কৃষি-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞতাই আমাদের দেশে কৃষি-কার্য্যের এত দুরবস্থা এবং দুর্ভিক্ষ ও অন্ন কষ্ট এত অধিক। ইউরোপ বা আমেরিকায় দুর্ভিক্ষের কথা কেহ কখন কি শুনিয়াছেন? অতএব আমাদের দেশের অন্নকষ্ট দূর করিতে হইলে, যাহাতে ভূমীর উর্ব্বরতা নষ্ট না হয় এবং উহা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সমূহ অতিক্রম করিয়া শস্য প্রদানে সমর্থ হয়, সে জন্য দেশবাসিগণের চেষ্টা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতিরেকে সে চেষ্টা সম্ভব নহে। অতএব আমাদিগের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ বিশেষতঃ জমীদার সন্তানগণ যদি বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষায় যত্নশীল হন তাহা হইলে দেশের দৈন্য দুর্গতি বিদূরিত হয়। জন সমাজ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষি-জাত সামগ্রীর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যে দেশ সুলভে উৎকৃষ্ট সামগ্রী উৎপাদনে অসমর্থ হইবেন তাহাকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে এবং যাঁহারা তাহাতে সমর্থ হইবেন তাঁহারাই লাভবান হইবেন। এমন এক সময় ছিল, যখন অনেক কৃষিজাত সামগ্রী ভারতের একচেটিয়া ছিল, এখনও দুই একটি পদার্থের উৎপাদন ভারতে প্রায় এক চেটিয়া হইয়া আছে। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার প্রসারে অন্যান্য দেশ সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনের যেরূপ চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে সেই এক চেটিয়া যে অধিক দিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি বাঙ্গালার প্রধান এক পাট ব্রহ্মদেশ ও অন্যত্র উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে। মার্কিনে ধানের চাষের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। জামেকা দ্বীপে ভারতের অনেক সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি জামেকার কৃষি-বিভাগের জন্য নানা জাতীয় ধান্যের নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম।

এতদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি-বিদ্যা না শিক্ষা করিলে ভারতবাসীকে কৃষিবিষয়েও ক্রমে অন্যান্য দেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। যাহাতে ভারতের সেই দুর্দ্দিন উপস্থিত না হয় সে জন্য দেশ হিতৈষী মাত্রেরই যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। নিরক্ষর কৃষকদিগের হস্তে কৃষি-কার্য্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া যাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষি-কার্য্যে অনুরাগ জন্মে সে জন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দেশের ধনী সম্প্রদায় বিশেষতঃ ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে যত্নবান না হইলে গভর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা ফলবতী হওয়া সম্ভব নহে।

শ্রীতিন কড়ি মুখোপাধ্যায়।

বায়ু-মণ্ডল।

পৃথিবীর উপরিভাগে যে বায়বীয় তরল পদার্থের আবরণ রহিয়াছে, তাহাই বায়ু-মণ্ডল। পৃথিবী প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। বায়ু-মণ্ডলও পৃথিবীর সহিত পৃথিবীস্থ অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতেছে। অন্যান্য পদার্থ, পৃথিবী আবর্ত্তিত হইলেও, নিশ্চল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বায়ুও এইরূপ নিশ্চল থাকিত, কিন্তু স্থানীয় নানা কারণে ইহার গতি এবং প্রবাহ উপস্থিত হয়। কাজেই পৃথিবীর সহিত আবর্ত্তন-জনিত গতি ভিন্ন, বায়ুর নিজস্ব এবং পৃথক একটা গতি আছে।

পৃথিবী হইতে নক্ষত্র দেশ পর্য্যন্ত আমরা যত দূর দেখিতে পাই, তাহাকে সাধারণতঃ শূন্য বলিয়া মনে করি। শূন্য বলিলে ইহাই বুঝায় যে, ইহার মধ্যস্থলে কোন পদার্থ নাই। মানবের স্থূল দৃষ্টিতে বাস্তবিকই ইহা মহা-শূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; কিন্তু প্রকৃতিতে কোন স্থানই পদার্থ-শূন্য থাকিতে পারেনা। সমস্ত স্থানই পদার্থ-পূর্ণ। এই আপাতঃ প্রতীয়মান মহাশূন্যও পদার্থ পূর্ণ। এস্থানে বায়ু ও আর একটি অলৌকিক বস্তু সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই শেষোক্ত বস্তুর নাম ইথার।

বায়ু বস্তুতঃই একরূপ পদার্থ। কিন্তু পদার্থ বলিলেই, আমাদের মনে সহসা এরূপ একটা ধারণা হয় যে, তাহার কোনরূপ আকৃতি আছে বা তাহা নয়নের প্রত্যক্ষীভূত। বায়ু সেরূপ নহে;—কাজেই আমরা বায়ুকে পদার্থ বলিয়া স্থির করিতে পারি না। কিন্তু বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অনায়াসে ধারণা করিতে পারি। বায়ু প্রবাহিত হইলেই, আমাদের শরীর তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। কুসুমের মৃদুল আন্দোলনে, পত্রের মর্ম্মর ধ্বনীতে, তড়াগের মৃদুল হিল্লোলে আমরা অনায়াসে বায়ুর অস্তিত্ব বুঝিতে

পারি ;—ইহার জন্য কোন পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। ফলতঃ আমরা বায়ু সমুদ্রে ডুবিয়া আছি।

আমরা বায়ুকে সহসা পদার্থ বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও, বৈজ্ঞানিকগণ আকৃতি-হীন ও অদৃশ্য কোন কিছুকেও পদার্থ নামে অভিহিত করেন। যাহার বিস্তার বা Extension, অবরোধকতা বা Impenetrability, বিভাজ্যতা বা Divisibility, ছিদ্র সমাকুলতা বা Porosity, স্থিতি-স্থাপকতা বা elasticity, ভার বা gravity, ইত্যাদি ধর্ম রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণের মতে তাহাই পদার্থ।

বায়ুর বিস্তার আছে। যে পদার্থ অনন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহার বিস্তার সহজেই অনুমেয়।

ইহা যে স্থান অবরোধ করিয়া থাকে, তাহা আমরা প্রতিদিন শত শত বার লক্ষ্য করিয়া থাকি। একটি ঝারীতে জল প্রবেশ কালীন, ঝারীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিলে, ঝারীর নল দ্বারা জল কিছুতেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কলসী উল্টাইয়া, জল পূর্ণ করা বস্তুতঃই অসম্ভব। ভিতরের বায়ু স্থান-অবরোধ করিয়া থাকে, এবং তাহার নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়াই, কলসী বা ঝারীতে জল প্রবেশ করিতে পারে না।

বায়ুর ন্যায় বিভাজ্যতা ধর্ম-সম্পন্ন অন্য পদার্থ অতীব বিরল। একই স্থানে কিছুতেই দুইটি পদার্থ থাকিতে পারে না। আমি যে স্থানে দাণ্ডায়মান আছি, সে স্থান হইতে বায়ু নিশ্চয়ই অপসারিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমি বায়ুকে বিভাগ করিয়া দণ্ডায়মান আছি। পণ্ডিতগণ পরীক্ষার জন্য ব্যোমযানের দ্বারা নানা উপায়ে, ঊর্দ্ধ-দেশের বায়ু-মণ্ডল হইতে বোতলে করিয়া বায়ু আনয়ন করেন। ইহা হইতেই বায়ুর বিভাজ্যতা সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

বায়ু স্থিতি-স্থাপক। পৃথিবীতে যাবতীয় পদার্থের মধ্যে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থিতি-স্থাপক। কলসী উল্টাইয়া জলে ছাড়িয়া দিলে, ভাসিতে থাকে। জল বা যাবতীয় তরল পদার্থের একটা বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহাদের উচ্চতা বা level সর্ব্বত্র সমান থাকে। ভাসমান কলসীর পৃষ্ঠে চাপ দিলে কলসী জলে ডুবিতে থাকে, এবং ভিতরে জল প্রবেশ করিয়া বাহিরের জলের সমান উচ্চ হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু কলসীর ভিতরে বায়ু থাকে বলিয়া, জল প্রবেশ করিতে পারে না, জলও কলসীর বদ্ধ বায়ুতে চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। জলের চাপে বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া অল্পায়তন হইয়া পড়ে। কিন্তু কলসী পৃষ্ঠ হইতে চাপ অপসারিত করিলে, সঙ্কুচিত বায়ু সহসা পূর্ব্বের ন্যায় প্রসারিত-অবয়ব ধারণা করে, কলসীও তীব্র বেগে জল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

বায়ুর ভার আছে। বায়ু যে একরূপ পদার্থ, এবং অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুরও যে পদার্থ-সূচক ধর্ম রহিয়াছে, তাহা গ্যালিলিও প্রথম প্রমাণ করেন। একটা ভারি

পাত্রে ঘনীভূত বায়ুকে বদ্ধ করতঃ ওজন করিয়া বায়ুরও ভার আছে বলিয়া, তিনিই প্রথমে নির্দ্দেশ করেন। একটা কাচের গোলক হইতে, বায়ু নিস্কাশিত করিলে গোলকের যে ভার হয়, উহাতে বায়ু প্রবিষ্ট করাইয়া পুনরায় ওজন করিলে উহার ভার বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুর এতগুলি পদার্থত্ব-সূচক গুণ রহিয়াছে, অতএব বায়ু একরূপ পদার্থ।

পদার্থ ত্রিবিধ :— কঠিন তরল ও বায়বীয়। পদার্থের এরূপ আবয়বিক বিভিন্নতার কারণ কি ?

রাসায়নিক ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ উভয়েই স্থির করিয়াছেন যে, আমরা পদার্থ বলিলে যাহা বুঝি, তাঁহা নিরবচ্ছিন্ন নহে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত। একখণ্ড কাচ চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হইতে এমন অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যে, আর বিভক্ত হয় না। এই ক্ষুদ্রতম কণার নাম অণু, ইংরাজী নাম molecule। অণুও আবার দুই বা ততোঽধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণুকে ইংরাজীতে atom বলে। পরমাণু একক পৃথক থাকিতে পারে না। পদার্থ মৌলিক হইলে দুই বা ততোঽধিক একজাতীয় পরমাণু এবং পদার্থ যৌগিক হইলে, যে যে পদার্থ সম্মিলিত হইয়া যৌগিক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থের প্রত্যেকের এক বা অধিক সংখ্যক পরমাণু পরস্পর মিলিত হইয়া অণুরূপে অবস্থান করে। যদি সুবর্ণ অণু গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, একই সুবর্ণ পরমাণু দ্বারা সুবর্ণ অণু গঠিত। অণু যে কিরূপ ক্ষুদ্রায়তন তাহা সহজেই অনুমেয়। পণ্ডিত প্রবর লর্ড কেলভিন্ ইহার আয়তনের একটা অনুমান করিয়াছেন, তাঁহার মতে যদি এক বিন্দু জলকে পৃথিবীর সম প্রকাণ্ডতম আয়তন বিশিষ্ট করা যায়, এবং জলের অণুগুলিও সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এক একটি অণুর আকৃতি এক একটি ক্রিকেট বলের অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর হইবে বা ছট্‌রা গুলি অপেক্ষা কিছু বৃহত্তর হইবে। যদি পদার্থ পরমাণু গঠিত, এই অভিমতই সত্য হয়, তাহা হইলে পদার্থ কিরূপে অবয়ব ধারণ করিতে পারে, তাহা চিন্তনীয়। পণ্ডিতগণ বলেন যে পদার্থের অণুগণের মধ্যে পরস্পরের একটা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বলেই পদার্থের অণুসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় না, কাজেই পদার্থ অবয়ব ধারণ করিতে সক্ষম হয় ; অর্থাৎ পদার্থ অণুর ন্যায় স্বতঃই চূর্ণ হইয়া যায় না।

যে সমস্ত পদার্থে অণু-সমূহের আকর্ষণের পরিমাণ অধিক, তাহারাই কঠিন পদার্থ। যে সমস্ত পদার্থে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সমান তাহাই তরল ; কাজেই তরল পদার্থের নির্দ্দিষ্ট কোন অবয়ব নাই। যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের আকৃতি অনুযায়ী আকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। আবার যে সমস্ত পদার্থের অণুর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণ

অধিকতর, তাহাই বায়বীয় পদার্থ। কাজেই বায়বীয় পদার্থ ক্রমাগত অবয়ব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। যদি একটি পাত্রকে একবারে শূন্য-গর্ভ করা যায়, এবং পরে তাহাতে এক বিন্দু বায়বীয় পদার্থ প্রবিষ্ট করান হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অণুসমূহের পরস্পর হইতে বিকর্ষণ-জনিত স্বাভাবিক সম্প্রসারণ-শীলত্বের জন্য, সেই শূন্য-গর্ভ পদার্থে এক বিন্দু বায়ুও সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিবে। এক্ষণে ত্রিবিধ অবস্থায় পদার্থের অণু-সমূহ কিরূপ কার্য্য করে, তাহা বর্ণিত হইল।

পূর্ব্বে ইথারের কথা একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইথার কি? "ইহা একরূপ কল্পিত পদার্থ, এবং প্রাকৃতিক তেজঃ-সমূহ, অর্থাৎ আলোক, উত্তাপ, ইত্যাদি পরিবাহিত হইবার মার্গ-স্বরূপ। ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং পাতলা। ইথার মহাকাশের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া এমন কি পদার্থের পরমাণুদ্বয় মধ্যবর্ত্তী স্থানেও পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, ইথার গঠনে একরূপ বায়বীয় পদার্থের ন্যায়, কিন্তু বায়বীয় হইলেও, ইহা কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা-বিশিষ্ট, অথচ বায়বীয় পদার্থের ন্যায় স্থিতিস্থাপক ধর্ম্ম-সম্পন্ন। কেহ কেহ ইহাকে সমস্ত স্থান পরিব্যাপক জেলীর ন্যায় মনে করেন, এবং ইহাতে আলোক, অন্যান্য দীপ্তিমান প্রাকৃতিক তেজঃ-সঞ্জাত তরঙ্গ-মালা ক্রমাগত স্পন্দিত হইতেছে। সাধারণ পদার্থের কণিকা সকল অনায়াসে এবং নির্ব্বিঘ্নে ইথারের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইতেছে। পদার্থের অণু মধ্যস্থিত স্থানেও ইথার বর্ত্তমান। কোন স্থান হইতে, কোন শূন্য গর্ভ স্থান হইতে এমন কি যে স্থান হইতে বায়ু সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়াছে, এরূপ স্থান হইতেও ইথার নিষ্কাশিত করা অসম্ভব। ইথার গঠনে এবং প্রকৃতিতে মানবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর জটিলতা-শূন্য, নিরবচ্ছিন্ন, এবং সর্ব্বত্র সম-নিবীড়তা বিশিষ্ট। অধিক চাপ প্রয়োগ করিলেও ইহা আদৌ সঙ্কুচিত হয় না, সমস্ত স্থান পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকিলেও ইহাকে বিভিন্ন করা যাইতে পারে না, কিম্বা ইহা অন্য কোন যৌগিক পদার্থেও মিশ্রিত হয় না। বাস্তবিকই ইহা সমস্ত জগৎ জুড়িয়া অবিভিন্ন, অদ্বিতীয়, সূক্ষ্ম, অনমনীয়, ব্যোম-পথ-পরিব্যাপক এবং প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ পরিবাহিত হইবার মার্গ স্বরূপ"। (বিজ্ঞান, ১ম সংখ্যা)

আমরা মোটামুটি বুঝিতে পারি যে, যাহা অনন্ত শূন্য তাহা বায়ু ও ইথারে পূর্ণ রহিয়াছে। বায়ু কিরূপ তাহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, এবং ইথার কিরূপ তাহাও পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইথারের মধ্য দিয়া পদার্থের কণিকা সকল স্বচ্ছন্দে চালিত হইতে পারে এবং পদার্থের অণুদ্বয় মধ্যেও ইথার বিদ্যমান আছে। কাজেই যে স্থানে বায়ু রহিয়াছে, ইথারও সে স্থানে বিদ্যমান আছে।

এখানে বায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। তরল ও

বায়বীয় পদার্থ উভয়েরই কতকগুলি সমান ধর্ম্ম রহিয়াছে। তবে কোন কোন ধর্ম্ম তরল পদার্থে অধিক শক্তি বিশিষ্ট, কোন কোন ধর্ম্ম বায়বীয় পদার্থে অধিক শক্তি বিশিষ্ট। প্রথমতঃ উভয়েরই কণিকা অতি সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। কিন্তু বায়বীয় পদার্থে এই ধর্ম্ম যত অধিক, তরল পদার্থে তত নহে। জল রাশি হইতে এক বিন্দু জল তুলিতে হইলে, জল রাশির খানিকটা জল, বিন্দুর সহিত অগ্রসর হয়, এবং অবশেষে যেন ছিঁড়িয়া যায়। উভয়কেই চাপ প্রয়োগে সঙ্কুচিত করা যায়। কিন্তু বায়বীয় পদার্থ অতি সহজে সঙ্কুচিত হয়, তরল পদার্থ সেরূপে হয় না। যদি বায়ু ও তরল পদার্থের উপর ১৫ সের চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে বায়ু সেই চাপে অর্দ্ধেক সঙ্কুচিত হইবে, কিন্তু তরল পদার্থ তাহার আয়তনের বিশ সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র সঙ্কুচিত হইবে। উভয়েরই ঘনত্ব রহিয়াছে। কিন্তু তরল পদার্থের অধিক, বায়বীয় পদার্থের অল্প। জলই তরল পদার্থের উদাহরণ স্থল। জল, বায়ু অপেক্ষা ৭৭০ গুণ অধিক ভারী। তরল ও বায়বীয় পদার্থের নিজের কোন আকৃতি নাই। যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রেরই অবয়ব ধারণ করে। এই দুই জাতীয় পদার্থের প্রধানতম প্রভেদ এই যে, বায়বীয় পদার্থের সম্প্রসারণ-শীলত্ব অনন্ত। যদি একটা প্রকাণ্ড গম্বুজকে বায়ু শূন্য করা সম্ভব হইত, এবং তাহার মধ্যে এক বিন্দু বায়ু প্রবেশ করান যাইত, তাহা হইলে এক বিন্দু বায়ুও সমস্ত গম্বুজে সম্প্রসারিত হইয়া উঠিত।

যদি দুইটি পদার্থ দূরে সরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চাপ দিলে তাহারা একত্র বা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। বায়বীয় পদার্থের অণুর প্রকৃতিই এই যে. তাহারা ক্রমাগত পরস্পর হইতে বিপ্রকৃষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছে। যদি তাহাদিগকে অতি নিকটস্থ করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পদার্থকে শীতল করিলে ও চাপ প্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ উহার আয়তন হ্রাস পায়, অর্থাৎ অণুগুলি পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয়। বায়বীয় পদার্থে চাপ প্রয়োগ এবং উহার উত্তাপের হ্রাস করিলে বায়বীয় পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয়। যদি তরলীকৃত বায়বীয় পদার্থে আরও শীতলতা প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। উত্তাপ প্রয়োগে পদার্থের আয়তনের বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ অণুগুলি আরও দূরে সরিয়া যায়। যদি জলে উত্তাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে জল বাষ্পীভূত হইয়া, বায়বীয় আকার ধারণ করে। ইহাকে শীতল করিলে পুনরায় জল এবং আরও শীতল করিলে বরফে পরিণত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ প্রথমে কেবল শীতলতা প্রয়োগ করিয়া বায়বীয় পদার্থকে তরল করিতে চেষ্টা করেন। এই উপায়ে অনেক বায়বীয় পদার্থ তরলও হইয়াছিল। কিন্তু বায়ু কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। তখন পণ্ডিতগণ স্থির করিলেন যে, বায়ুর

আকার চির বায়বীয় থাকিবে, অর্থাৎ ইহা permanent gas। কিন্তু পরে চাপ ও শীতলতা উভয়ই প্রযুক্ত হওয়ায় বায়ু প্রথমে তরল ও শেষে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন ব্যবসা ও নানা কাজে লাগাইবার জন্য তরলীকৃত বায়ু ও অন্যান্য বায়বীয় পদার্থ প্রচুর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এক চৌবাচ্চা জলে, যদি একখানি থাল খাড়া করিয়া আড়াআড়ি চালনা করা যায়, তাহা হইলে থাল খানি জলের ভিতর চালাইতে একটু জোর লাগে, কিন্তু থাল খানি পাশ ভাবে চালাইলে সামান্য বল-প্রয়োগে অনায়াসে পরিচালিত হয়। জলের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইলে, এই পরিচালিত পদার্থ বাধা প্রাপ্ত হয়। আড়া আড়া চালাইলে অনেকটা জল অপসারিত করিতে হয় বলিয়া, জল অধিকতর বাধা প্রদান করে, এই জন্য নৌকার দাঁড়, হাল ইত্যাদি চ্যাপ্টা করা হয়। উচ্চ স্থান হইতে নিমজ্জন প্রিয় ব্যক্তি-সমূহ উচ্চ স্থান হইতে শায়িত ভাবে জলে পতিত না হইয়া লম্ব বা বক্রভাবে পতিত হয়, কারণ তাহা হইলে জল অনায়াসে বিভিন্ন হইবে। আমরা জলে সন্তরণ করিবার সময় হস্ত দুইটি আড়াআড়ি ভাবে চালাইয়া অগ্রসর হই, মৎস্যও সেইরূপ পাখনা দুইটি নাড়িয়া অগ্রসর হয়। একটি দৃঢ় বদ্ধ খুঁটি ধরিয়া, খুঁটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিলে, খুঁটি যেরূপ আমাদের নিকটস্থ হয় না, বরং আমরাই খুঁটির দিকে অগ্রসর হই, সেইরূপ হাত বাড়াইয়া দূরের জলে হস্ত প্রবেশ করাইয়া, সেই জলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিলে জল আকৃষ্ট না হইয়া আমরা অগ্রসর হইয়া পড়ি। বায়ুও সেইরূপ বাধা প্রদান করিতে পারে। আমরা চলিবার সময় হাত নাড়ি, এ সময়েও ঠিক সন্তরণের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি। হাত বাঁধা থাকিলে দৌড়াইতে যত কষ্ট হয়, হাত খোলা থাকিলে তদপেক্ষা অনেক অল্প কষ্ট হয়। বায়ু-মণ্ডল এইরূপ বাধা প্রদান করে বলিয়াই ব্যোমযান হইতে যাত্রী পারা-সুট ধরিয়া অবতীর্ণ হয়।

বায়ুর একটা ভার রহিয়াছে। যদি কাহারও ভার থাকে, সেই ভারের জন্য সেই পদার্থ, অন্য পদার্থের উপর আরোপিত হইলে, তাহাতে চাপ প্রয়োগ করে। দেখা যাউক বায়ু-মণ্ডল চাপ প্রয়োগ করে কিনা? মনে করুন, একটা প্রকাণ্ড চোঙ্গা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪।৫ মাইল। বায়ুর পাতলা পাতলা স্তর দিয়া এই চোঙ্গা পূর্ণ করা হইয়াছে। তাহা হইলে সর্ব্ব নিম্ন পাতের উপর, উপরিস্থিত পাত সমূহের চাপ পড়িতেছে। কাজেই নিম্নস্থিত পাত গুলি, উপরিস্থিত পাতের ভারে অত্যন্ত সঙ্কুচিত অর্থাৎ অত্যন্ত ঘন হইয়া রহিয়াছে। কাজেই সর্ব্ব নিম্ন প্রদেশের বায়ু অত্যন্ত ঘন। এবং এই ঘন বায়ু ক্রমে ক্রমে পাতলা হইতে হইতে ঊর্দ্ধ দেশে গমন করিয়াছে। সর্ব্বনিম্ন প্রদেশ কোথায়? জল ঢালিয়া দিলে গড়াইতে গড়াইতে যাইয়া যেখানে বিশ্রাম করে, তাহাই নিম্নতম প্রদেশ। জলের এই

শেষ বিশ্রাম স্থান—সমুদ্র। অতএব সমুদ্রের বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা ঘন, এবং পর্ব্বতাদি প্রদেশের বায়ু পাতলা। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অতি ঊর্দ্ধে গমন করিলে, আকাশের শরীর ফুলিয়া উঠে, এবং নাসিকা, চক্ষু ইত্যাদি হইতে রক্ত স্রাব হইবার উদ্যোগ হয়। ফলাদির কুঞ্চিত পৃষ্ঠ সুগোল হইয়া উঠে। ইহার কারণ এই যে ঊর্দ্ধে গমন করিবার সময় ফলের ভিতর অত্যন্ত চাপ-গ্রস্ত নিম্ন প্রদেশের বায়ুই আবদ্ধ ছিল। সেই চাপ-গ্রস্ত বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করিবা মাত্র, চাপ হীন হওয়ায় সম্প্রসারিত হইবার চেষ্টা করে। কাজেই কুঞ্চিত ফল স্ফীত হইয়া উঠে। অনেক বালক বালিকা কাগজের ঠোঙ্গা পাইলে, ঠোঙ্গার মুখ ছোট করিয়া, তাহাতে নিজের মুখ লাগাইয়া, ঠোঙ্গার ভিতরের বায়ু টানিয়া লয়, টানিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঙ্গাটি সঙ্কুচিত হয়। ইহার কারণ এই যে, ঠোঙ্গার ভিতরের বায়ু নিষ্কাশিত হইবা মাত্র বায়ু-মণ্ডলের চাপে, ঠোঙ্গার প্রাচীর একত্র হইয়া যায়। ঠোঙ্গাটি সঙ্কুচিত হইবার সময়, যদি বেশ করিয়া লক্ষ্য করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, ঠোঙ্গাটি কেবল উপর হইতেই সঙ্কুচিত হইতেছে না, পরন্তু চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছে। অর্থাৎ বায়ুর চাপ শুধু উপর হইতেই পড়িতেছে না, পার্শ্বে, নীচে, উপরে, সর্ব্বত্রই বায়ু, চাপপ্রয়োগ দ্বারা ঠোঙ্গাকে সঙ্কুচিত করিয়া দিতেছে। ম্যাগ্‌ডিবার্গের বিচারপতি স্বনামধন্য অটোভন গেরিক দুইটি ধাতব অর্দ্ধ গোলক প্রস্তুত করেন। সেই অর্দ্ধ গোলক দুইটি জুড়িয়া দিলে, একটি গোলকের ন্যায় হইয়া যায়। সংযুক্ত করিয়া দিলেও এই দ্বিখণ্ডিত গোলক হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিবার পথ থাকে। সংযুক্ত গোলক হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে, প্রচুর শক্তি প্রয়োগ করিয়া টানা টানি করিলেও আর পৃথক করা যায় না। যদি বায়ু মণ্ডল কেবল উপর হইতেই চাপ প্রয়োগ করিত, তাহা হইলে, এই গোলককে কিছুতেই মৃত্তিকা হইতে উত্তোলিত করা যাইত না। ইহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করা বা যে কোন দিকে ঘুরান ফিরান সহজ, কিন্তু দুইটিকে পৃথক করা অসম্ভব। বায়ু চারিদিক হইতে গোলকে চাপ প্রয়োগ করিতেছে, এবং চাপের গতি সর্ব্বদা বিপরীত মুখী। অর্থাৎ ঊর্দ্ধের বায়ু নিম্নের দিকে, নিম্নের বায়ু ঊর্দ্ধ দিকে, দক্ষিণের বায়ু উত্তরে, পূর্ব্বের বায়ু পশ্চিমে চাপ প্রয়োগ করিতেছে। কাজেই একের চাপ অন্যের চাপে নিরাকৃত হইতেছে। এক্ষণে গোলকের ভিতরে বায়ু নাই; কাজেই গোলকের ভিতরের দেওয়ালে চাপ দিবার কেহ নাই। কিন্তু বাহিরের দেওয়ালে প্রচুর চাপ পড়িতেছে। এই জন্য টানাটানি করিলেও, কিছুতেই গোলকার্দ্ধদ্বয়কে পৃথক করা যায় না। গেরিক দুই ফিট ব্যাসবিশিষ্ট দুইটি গোলকার্দ্ধ সংযুক্ত করিয়া, বায়ু নিষ্কাশন করিয়াছিলেন। [illegible] অশ্ব বিপরীত দিকে টানিয়া তবে গোলকার্দ্ধদ্বয়কে পৃথক করিয়াছিল।

বায়ু যে ঊর্দ্ধ দিকে চাপ প্রয়োগ করে, তাহা অনায়াসে পরীক্ষা করা যায়। জল

অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আশ্রয় শূন্য হইলেই, পৃথিবীর আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। যদি একটী সরু কাচের নল জলে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিয়া, নলের উপরের মুখ অঙ্গুলীর দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়, এবং নীচের মুখ খোলা থাকে, তাহা হইলে নল সোজা ও খাড়া করিয়া ধরিলেও, নলের ভিতরের জল পড়িয়া যাইতে পারে না। কিন্তু উপরের মুখ হইতে অঙ্গুলি অপসারিত করিলেই, জল তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি? নল যখন খোলা থাকে, তখন নলের উপরের মুখে বায়ু চাপ প্রয়োগ করে, নিম্নের মুখেও চাপ প্রয়োগ করে। কাজেই এই দুইটি চাপ পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় নষ্ট হইয়া যায়। জলও মাধ্যাকর্ষণ বেগে পড়িয়া যায়। কিন্তু নলের উপরের মুখ অঙ্গুলী দ্বারা বন্ধ করিলে, জল উপরে কোনরূপেই বায়ুর চাপ পায় না। কাজেই নিম্নের বায়ু মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত দিকে জোর করিয়া জলকে ঠেলিয়া নলের ভিতরে রাখে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বায়ু মণ্ডলের চাপ রহিয়াছে, এবং যত ঊর্দ্ধে গমন করা যায়, ততই চাপ অল্প হইয়া যায়। এখন এই চাপ পরিমাপ করিবার উপায় কি? বৈজ্ঞানিকগণ বায়ু মণ্ডলের চাপ মাপিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। মহাত্মা গ্যালিলিওর ছাত্র টরিচেলী বায়ুর চাপ মাপিবার প্রথম চেষ্টা করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তরল পদার্থের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, অহারা পরস্পর সংযুক্ত দুই বা ততোঽধিক বাহু বিশিষ্ট কোন পাত্রে রক্ষিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহারা সমস্ত বাহুতেই এক লেভেলে বা সম-উচ্চতায় উঠিয়া যায়। কোন বাহুতে অল্প বা কোন বাহুতে অধিক থাকে না। পারদ একরূপ তরল ধাতব পদার্থ। এই পদার্থেরও অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় ধর্ম্ম রহিয়াছে। যদি একটি পারদ পূর্ণ পাত্রে, কাঁচের একটি দুই মুখ খোলা নল ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে পাত্রে ও নলের ভিতরে পারদ সমান লেভেলে থাকিবে। কিন্তু এক মুখ বন্ধ কোন নলের খোলা মুখ পারদ পাত্রে ডুবাইলে, পারদ নলের ভিতর প্রবেশ করে না। কেননা নলের ভিতরে বায়ু রহিয়াছে। এই ভিতরের বায়ুও যেরূপ, বাহিরের বায়ুও সেইরূপ, অর্থাৎ উভয়েরই সমান চাপ প্রস্ত। এই ভিতরের বায়ুকে যদি অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে বাহিরের বায়ু, পারদের উপর যে চাপ প্রয়োগ করিতেছে, সেই চাপ প্রভাবে নলের অভ্যন্তরেও পারদ প্রবেশ করিবে। এখন নলকে সম্পূর্ণ বায়ু নির্মুক্ত করিলে, পারদ নলের কতটা ঊর্দ্ধে উঠে, তাহা জানিতে পারিলেই, বায়ু-মণ্ডল বহিঃস্থ পারদ চাপ প্রয়োগে, কতটা পারদ নলের ভিতর ধারণ করিতে পারে, তাহা বুঝা যাইবে।

একটি একমুখ বন্ধ ৩২ ইঃ দীর্ঘ কাচের নলের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পারদ পূর্ণ করিলাম। নলের মধ্যে বা পারদে মিশ্রিত এক বিন্দুও বায়ু নাই। নলের খোলা মুখটি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা রীতিমত বন্ধ করিয়া, যদি পারদ পূর্ণ একটি পাত্রে, অঙ্গুষ্ঠ সমেত নলের খোলা মুখটি পারদে ডুবাইয়া, অতঃপর অঙ্গুলি অপসারিত করা যায়, তাহা

হইলে দেখা যাইবে যে, নলের ভিতরে পারদ কয়েকবার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ প্রায় ৩০ ইঃ উর্দ্ধে স্থির হইয়া পড়িয়াছে। নলের উপরের অংশ শূন্য হইয়া রহিল। নলের ভিতরে এই শূন্য যায়গায় বায়ু নাই। কাজেই নলের ভিতরে পারদের উপরে কোনরূপ চাপ নাই। অতএব বায়ু-মণ্ডলের চাপ, পারদ পাত্রের পারদে প্রযুক্ত হওয়ায়, এই চাপ গ্রস্ত পারদ নলের ভিতরে ৩০ ইঞ্চ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত, পারদকে ধারণ করিতে সক্ষম। বায়ু-মণ্ডলের এই চাপের পরিমাণকে ১ পরিমাণ বায়ু চাপ বা one atmospheric pressure বলে। এবং এই যন্ত্রটির নাম বায়ু চাপমান যন্ত্র বা barometer। এই চাপের পরিমাণ কত? যে নল লইয়া ব্যারোমিটার প্রস্তুত করা হইয়াছে, মনে করুন তাহার মুখের আয়তন পরিমাণ ১ বর্গ ইঃ। নলের ভিতরে ৩০ ইঃ পর্য্যন্ত পারদ রহিয়াছে। কাজেই এই পারদের আয়তন পরিমাণ ৩০ ঘন ইঞ্চ। ৩০ ঘন ইঞ্চ পারদের ওজন প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা ৭৷৷০ সের। তাহা হইলে বায়ু-মণ্ডল প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে /৭৷৷০ সের চাপ প্রয়োগ করিতেছে। কিন্তু বায়ুর নিজের ওজন ১ ঘন ফুট = ০.০৮০৭১ পাউণ্ড।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল নানাবিধ ব্যারোমিটার নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাদের বর্ণনা সম্প্রতি অনাবশ্যক।

একজন সুগঠিত মধ্যমাকৃতি মানবের অবয়বের উপরি ভাগের পরিমাণ প্রায় ১৬ বর্গ ফিট। তাহা হইলে মানবের শরীরে মোট বায়বীয় চাপের পরিমাণ প্রায় ৪০৫ মণ। কিন্তু এত ভার আমরা যে সহ্য করি ইহা সহসা বিশ্বাস হয় না। বস্তুতঃই আমরা প্রতি নিয়ত ৪০৫ মণ বোঝা বহিতেছি। তবে যে আমরা এত বড় বোঝায় নিষ্পেশিত হই না তাহার কারণ বায়ুর চাপ চারি দিকেই প্রযুক্ত হইতেছে, কাজেই এই সমস্ত চাপ পরস্পরের প্রতিক্রিয়ায় বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি চারি দিকেই চাপ তবে আমাদের শরীর চূর্ণ হইয়া যাইতেছে না কেন?—ইহার কারণ এই যে, আমাদের শরীরের ভিতর যে বায়বীয় পদার্থ রহিয়াছে তাহাও ভিতর হইতে বাহিরের দিকে সমভাবে চাপ প্রয়োগ করিতেছে। আমাদের শরীর ঠিক একটা বায়ু ভরা বোতলের ন্যায়। ইহার বাহিরে ভিতরে উভয়ত্রই সমান চাপ। কাজেই আমরা এত চাপ প্রয়োগ কিছুই বুঝিতে পারিনা। যদি বায়ুর এই সূক্ষ্ম স্থিতি সাম্য বা Dynamical equilibrium না থাকিত, তাহা হইলে শুধু মানব নহে, পর্ব্বতাদি যাবতীয় পদার্থ চূর্ণ হইয়া যাইত।

আমাদের পদের উপরিভাগে একটি গাঁইট আছে। এই গাঁইট কোমরের হাড়ের একটি কোটরে প্রবিষ্ট করান থাকে। কুক্ষির নিকট হস্তও এইরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

উভয়ত্রই বায়ু চাপ বশতঃ আমাদের হাত ও পা নড়িয়া থাকে। পেশী সমূহকে তত অধিক কার্য্য করিতে হয় না। এই বায়ু চাপের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রোগ নিবারণ কল্পে নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়।

ভারতে সোরার কারখানা। *

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর।)

প্রথম অংশ।

মিশ্রিত ও অপরিষ্কৃত সোরা প্রস্তুত প্রণালী।

যে সমস্ত মৃত্তিকা হইতে মিশ্রিত ও অপরিষ্কৃত সোরা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেক-টিতে অতিশয় বিভিন্ন পরিমাণ নাইট্রেট (nitrate) অর্থাৎ সোরা বর্ত্তমান থাকে। মিষ্টার হুপার (Mr. Hooper) † বহু সংখ্যক নমুনা বিশ্লেষণ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই মাটিতে শত করা ১ ভাগ হইতে ২৯ ভাগ পর্য্যন্ত সোরার পরিমাণ দৃষ্ট অল্পাধিক্য হইয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ এই সমস্ত মৃত্তিকায় শতকরা ৩ ভাগ হইতে ৫ ভাগের অধিক সোরা থাকে না। সোরা বা নাইট্রেট ব্যতীত ক্লোরাইড এবং সালফেটও (chloride and sulphate) এই মৃত্তিকায় শতকরা কয়েক ভাগ থাকে।

যে প্রথা অবলম্বন করিয়া নুনিয়াগণ সোরা নির্মুক্ত করে, তাহা বিশেষ সুবিধা-জনক ও চিত্তাকর্ষক।

এই প্রণালীর বর্ণনায় "ম্যাসিরেশন্‌" (maceration) এবং "লিক্সিভিয়েশন্‌" (lixiviation) ‡ নামক দুইটি ইংরাজী বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এ দুইটি বাক্য আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করে। যদি মৃত্তিকায় জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় বা ম্যাসিরেট (macerate) করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকার পরিমাণ যত

* পুসা কৃষিবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "The Indian Saltpetre Industry" নামক পুস্তিকা হইতে Agriculturl Adviser to the Government of India র অনুমতিক্রমে কেবল মাত্র "বিজ্ঞানের" জন্য শ্রীশরৎ চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক অনুদিত। প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট চিত্রাবলীর ব্লকগুলি Agricutural Adviser মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

† Agricultural Ledger, 1906, page 23.

‡ Maceration শব্দের অর্থ—কোন দ্রব্য হইতে তাহার কোন উপাদান নির্মুক্ত করিবার জন্য সেই দ্রব্যকে কোন তরল পদার্থে ভিজাইয়া নরম করা বা "জাবকান"। Lixiviation শব্দের অর্থ—জল ঢালিয়া কোন পদার্থ হইতে ক্ষার জাতীয় পদার্থের নিষ্কাশন।

প্রায় তত পরিমাণ জল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সেই জন্য এই দ্রাবণে শত করা মাত্র ৫ ভাগ বা তদপেক্ষা প্রায়ই অল্পতর পরিমাণে সোরা বর্ত্তমান থাকে। অধিকন্ত মূল্যবান যন্ত্রাদি ব্যতীত এই দ্রাবণ হইতে মৃত্তিকা কিছুতেই রীতিমত পৃথক করিতে পারা যায় না। এই নুনিয়াগণ এরূপ মূল্যবান যন্ত্রাদির ব্যয়ভার বহনে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

নিম্নে নুনিয়াগণের অবলম্বিত প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল:—

নুনিয়াগণ প্রথমতঃ ভিজা মাটী দ্বারা একটি মৃত্তিকার গৃহ নির্ম্মাণ করে। ইহাকে ইহারা "কুঁড়িয়া" বা "কোটি" বলে। অতঃপর এই গৃহ শুষ্ক হইতে থাকে। এই গৃহ গুলির প্রাচীর ৫।৬ ফিট দীর্ঘ ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার অথবা আয়ত ক্ষেত্রের ন্যায়। এই গৃহগুলির তল (মেঝে) পশ্চাৎ দিক হইতে সম্মুখের দিকে ঢালু। সম্মুখের দেওয়াল ভেদ করিয়া একটি গর্ত্ত থাকে। এই গর্ত্ত গৃহের তলের সহিত সমান লেভেলে বা উচ্চতায় থাকে। এই গর্ত্ত দিয়া নাইট্রেট দ্রাবণ ক্রমশঃ নিস্সৃত হইয়া আইসে। (১ম ও ২য় চিত্র)। এই ঘরের তল ভাগের উপরে, এলোমেলো ভাবে বিন্যস্ত কয়েকটি ইষ্টকের উপর বাঁশ ও চেটাই বিছাইয়া আর একটি কৃত্রিম তল প্রস্তুত করা হয়। সময়ে সময়ে আমি ঘাস দিতেও দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাতে কার্য্য তত সুচারুরূপে হয় না। খুব সম্ভবতঃ ছিন্ন চেটাইএর গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিবার জন্যই ঘাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই চেটাইএর উপর সল্টপিটার বা সোরা মিশ্রিত মাটী স্থাপিত করিয়া তাহার উপরে জল ঢালা হয়। এই কুঁড়িয়াগুলি উক্ত মাটী দ্বারা পূর্ণ করার রীতি বা ধরণের উপরেই নুনিয়াগণের সল্টপিটার নির্ম্মুক্ত করিবার অবলম্বিত প্রণালীর কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। যদি মাটী স্থাপন করায় কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর জল ঢালিলে, এই স্থাপিত মাটীতে ফাটল বা ফাঁক হইয়া যায় এবং কেবল কর্দ্দমাক্ত জল নিম্নে প্রবাহিত হয়। কাজেই কুঁড়িয়া গুলিকে মাটীর দ্বারা অতি সাবধানতার সহিত পূর্ণ করা হয়। মাটী অতি অল্প পরিমাণে আর্দ্র থাকে; এবং ইহা হইতে যত দূর সম্ভব খোলা, খাবরেল, ইষ্টকচূর্ণ, প্রস্তর ইত্যাদি দূরীভূত করা হয়। এক একটী কুঁড়িয়াতে যত মাটী রাখা হয়, তাহার প্রায় $\frac{1}{8}$ পরিমাণ প্রথমে চেটাইএর উপর অতি যত্নের সহিত বিছাইয়া দেওয়া হয়। তাহাকে নুনিয়াগণ বিশেষ সাবধানতার সহিত পদ দ্বারা দলিত করিয়া বসাইয়া দেয়। (২য় চিত্র)। এই প্রথমাংশের উপর আবার মাটী বিছাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সাবধানতার সহিত পদদলিত করা হয়, এবং যতক্ষণ ৬ বা ৮ ইঞ্চ পুরু স্তর বিদ্যমান না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ করা হইয়া থাকে। এই মাটী কুঁড়িয়াতে দিবার পূর্ব্বে অধিকাংশ স্থলেই চুলী হইতে কাঠের ভস্ম (ছাই) এই মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া
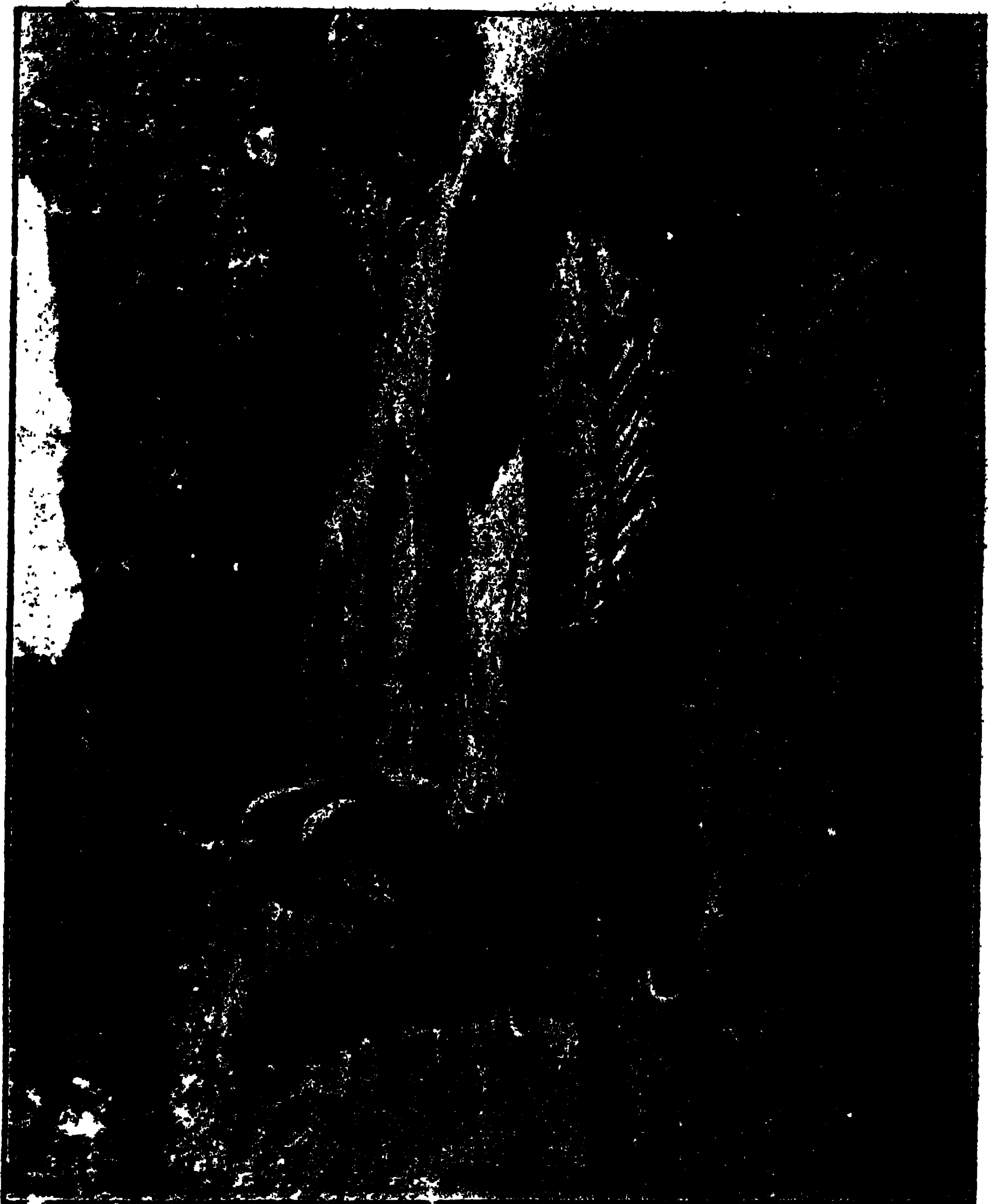
১ম চিত্র।
কুঁড়িয়ার শ্রেণী।
কুঁড়িয়া হইতে দ্রাবণ নিঃসৃত করিবার প্রণালী।

হয়। এই মাটীতে প্রায়ই ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট (calcium and magnesium nitrate) এবং পোটাসিয়াম নাইট্রেট বা সোরা (Potassium nitrate) মিশ্রিত থাকে। এই কাঠের ভস্মে পোটাসিয়াম কার্বনেট থাকে, এবং ইহা ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম্ নাইট্রেটের সহিত মিলিত হইয়া পোটাসিয়াম নাইট্রেট অর্থাৎ সোরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এক্ষণে এই সজ্জিত মাটীর উপরিভাগে জল ঢালা হয়।
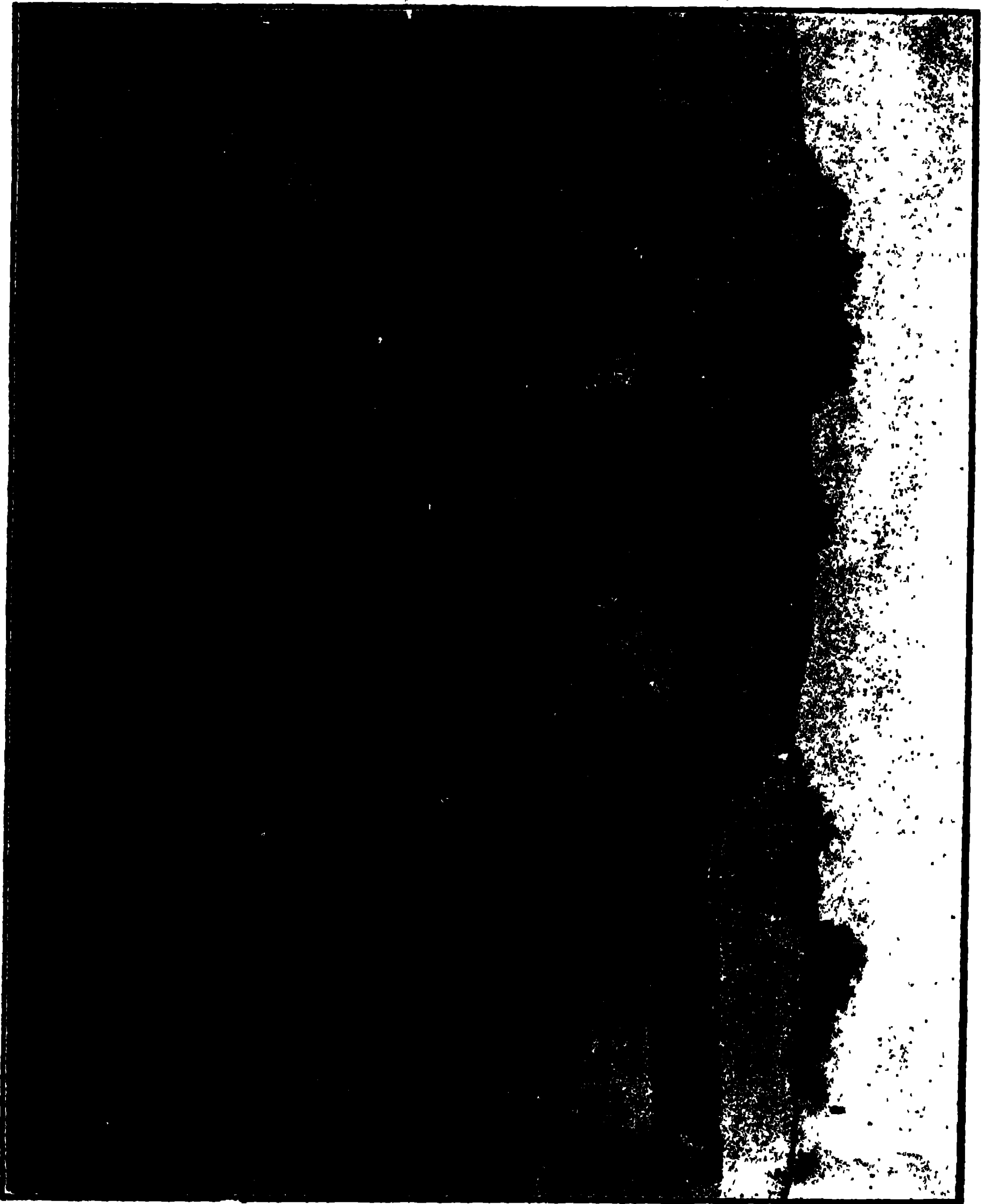
৩২য় চিত্র।

কুঁড়িয়া-সমূহ সোরা মিশ্রিত মাটী দ্বারা পূর্ণ করিবার প্রণালী।

জল ঢালিবার কালে যাহাতে মৃত্তিকা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া যায়, তাহার জন্ত মাটীতে একটা চেটাই চাপা দেওয়া হয়। মাটীর উপরে প্রায় ১ ইঞ্চ জল দাঁড়াইলে জল ঢালা বন্ধ করা হয়। প্রথমে যে জল ঢালা হয় তাহা বেশ অল্প সময়ের মধ্যেই পরিশোষিত হইয়া যায়, এবং অল্প কাল পরেই পরিশোষণ মৃদুতর হইয়া আইসে, তখন মধ্যে মধ্যে জল ঢালা হয়।

জল ক্রমাগত শোষিত হইয়া নিম্নের দিকে গমন করে। কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত

হইলে জল নিম্নের চেটাইএর উপর উপস্থিত হয়, সেই স্থান হইতে কুঁড়িয়ার তলে গমন করে, এবং পার্শ্বের গহ্বর দ্বারা বহির্গত হইয়া আইসে। মৃত্তিকার মধ্যদিয়া গমন কালে, মৃত্তিকায় দ্রবণীয় যাবতীয় লবণ,—যথা, নাইট্রেট (nitrates) বা সোরা, ক্লোরাইড (chlorides), সালফেট (sulphates)— দ্রবীভূত হইয়া জলের সহিত নিম্নে বাহিত হয়। এই প্রথম-প্রবাহিত জল নাইট্রেট বা সোরা এবং ক্লোরাইডের অধিকাংশ গ্রহণ করে। কাজেই মাটী, জল দ্বারা অতঃপর মিশ্রিত বা ম্যাসিরেটেড (macerated) করিলে তাহাতে যে পরিমাণ নাইট্রেট বা সোরা থাকে, তাহা অপেক্ষা এই প্রথম প্রবাহিত জলে অধিকতর পরিমাণ নাইট্রেট থাকে। কুঁড়িয়া নিক্রান্ত এই জল লবণ সমূহের প্রায়ই অণুসিক্ত দ্রাবণ। ইহা অতি ধীরে ধীরে চুয়াইয়া আইসে বলিয়া মাটী বিশৃঙ্খল হয় না। কাজেই ইহা সাধারণতঃ অতি স্বচ্ছ থাকে। লবণ ব্যতীত বাদামী (brown) জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহও এই জলের সহিত দ্রবীভূত হইয়া আইসে। সেই জন্য ইহার বর্ণ বাদামী হয়।

অতএব, যে জল চুয়াইয়া আইসে, তাহাতে অধিকতর পরিমাণ লবণ দ্রবীভূত থাকে, এবং যে জল মৃত্তিকায় মিশ্রিত করিয়া রাখা হয়, তাহাতে অতি অল্পই লবণ দ্রবীভূত থাকে। শেষোক্ত হইতে লবণ বাহির করিয়া লইবার জন্য জলকে বাষ্পীভূত করিতে যে পরিমাণ কাষ্ঠের প্রয়োজন হয় প্রথমোক্ত হইতে তদপেক্ষা অনেক গুণ অল্পতর হইয়া থাকে।

আমরা এতক্ষণ পর্য্যন্ত "কুঁড়িয়া" হইতে যে দ্রাবণ প্রথম নিঃসৃত হইয়া আইসে, তাহারই আলোচনা করিয়াছি। লুনিয়াগণ এই অংশই গ্রহণ করিয়া পাত্রে রক্ষা করে। জল যতই মৃত্তিকার ভিতর দিয়া চুয়াইয়া আসিতে থাকে, ততই মৃত্তিকা মিশ্রিত নাইট্রেট বা সোরা দ্রবীভূত হইয়া অল্পতর হইতে থাকে, কাজেই পরবর্ত্তী দ্রাবণে অতি অল্পই নাইট্রেট থাকে। প্রথম দ্রাবণ বাহির হইয়া আসিবার পরেও যদি মাটীর উপরে জল ক্রমাগত ঢালা হইত, তাহা হইলে সম্পূর্ণ নাইট্রেট এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লবণও দ্রবীভূত হইয়া কুঁড়িয়া হইতে বাহির হইয়া আসিত। কিন্তু যে দ্রাবণে অধিক পরিমাণ নাইট্রেট দ্রবীভূত থাকে, তাহা জাল দিয়াই লুনিয়াগণ পরিশ্রমোচিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। যে সমস্ত দ্রাবণে অল্প পরিমাণ নাইট্রেট মিশ্রিত থাকে, তাহা জাল দিয়া সোরা বাহির করিবার উপযুক্ত জালানী কাষ্ঠের ব্যয়-ভার বহনে লুনিয়াগণ অতিশয় অসমর্থ। এই কারণে লুনিয়াগণ অধিক পরিমাণে লবণ-মিশ্রিত-দ্রাবণ পাইবার জন্য "কুঁড়িয়া"র মধ্যস্থিত মাটীতে উপযুক্ত পরিমাণে জল ঢালিয়া দেয়। কাজেই যখন এই প্রণালী নিঃশেষ হয়, অর্থাৎ কুঁড়িয়ার ভিতর হইতে যখন জল নিঃসরণ স্থগিত হয়, তখন লুনিয়াগণ—১ম, জাল দিয়া সোরা আদায় করিবার উপযুক্ত কাষ্ঠের ব্যয়ভার বহন করিতে সক্ষম, এরূপ দ্রাবণ ; ২য়, প্রথমোক্ত অপেক্ষা অল্পতর পরিমাণ সোরার দ্রাবণ ; ৩য়, "কুঁড়িয়ার" মধ্যস্থিত আর্দ্র মাটী—এই তিন প্রকার পদার্থ প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, যদিও ১ম, প্রকার

দ্রাবণে, মুনিয়াগণ কুঁড়িয়ায় যে মাটী স্থাপন করিয়াছিল তাহার সহিত মিশ্রিত নাইট্রেটের অধিকাংশই দ্রবীভূত হইয়া আসিয়াছে, তথাপি ২য় প্রকারে অর্থাৎ ক্ষীণ দ্রাবণে ও ৩য় প্রকারে অর্থাৎ কুঁড়িয়াস্থিত ভিজামাটীতেও যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রেট দ্রবীভূত ও মিশ্রিত থাকে। যাহাতে এই নাইট্রেট নষ্ট না হয়, তজ্জন্য ২য় প্রকার অর্থাৎ ক্ষীণ দ্রাবণ কারখানার জমীর উপর ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ৩য় প্রকারে অর্থাৎ কুঁড়িয়ার মাটী খনন করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। অবশেষে কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা ভগ্ন করিয়া, অর্থাৎ কুঁড়িয়া-নিক্রান্ত বিগত বারের ক্ষীণ দ্রাবণ মিশ্রিত শুষ্ক মাটী পুনরায় কুঁড়িয়ায় স্থাপন করিয়া নাইট্রেট বাহির করিয়া লওয়া হয়। বস্তুতঃ এই প্রণালীতে কার্য্য করায়, মৃত্তিকা হইতে কখনও নাইট্রেট নিষ্কাশন সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় না। কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা দেখিলেই মনে হয় যে, এই মাটী হইতে অংশতঃ সোরা আদায় করা হইয়াছে, এবং ইহাতে অল্প পরিমাণ ক্ষীণ দ্রাবণ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

তাহা হইলে এই সমস্ত কারখানার মাটী এইরূপেই কি সর্ব্বদাই সোরায় পরিবর্ত্তিত (nitrification) * হইয়া আসিতেছে? যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে কুঁড়িয়া সহযোগে এই মাটী হইতে সোরা যতবার নির্ম্মুক্ত করিয়া লওয়া হইত, মাটীর সোরাও তত অল্পতর হইয়া উঠিত। নাইট্রিফিকেশন বলিলে ইহাই বুঝায় যে, নাইট্রোজেন ঘটিত মৃত পদার্থের—উদ্ভিদ বা প্রাণী—নাইট্রাইট বা নাইট্রেটে পরিবর্ত্তন। কিন্তু মুনিয়াগণ মাটীর সহিত কোনরূপ জান্তব পদার্থ সংযুক্ত করেনা। তবে মুনিয়াগণ প্রায়ই কারখানায় পল্লী অঞ্চল হইতে কতকটা নূতন মাটী আনয়ন করে। এই মাটীকে সচরাচর এবং প্রায়ই কুড়িয়ার স্থাপন করিবার সময় পুরাতন মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পুরাতন মাটীতে খানিকটা নূতন সোরা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। বস্তুতঃ প্রত্যেক কারখানাতেই সর্ব্বদা নূতন মাটী মিশ্রিত হইতেছে, এবং সর্ব্বদা সোরা নির্ম্মুক্ত করা হইতেছে। ইহা হইতে এরূপ অনুমান সম্ভবপর যে, এরূপে নূতন মাটী মিশ্রিত করিলেও যদি কারখানার মাটীর উপাদানে, সোরায় পরিবর্ত্তিত হইবার কোন কিছু উপায় না থাকিত, তাহা হইলে সময় ক্রমে এই মাটীতে সোরা নিশ্চয়ই ক্রমশঃ অল্পতর হইতে থাকিত। ইহার একটা মীমাংসা এই হইতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার ক্রমাগত পরিশোষিত হইতেছে। এই অভিমত অভ্রান্ত হইলেও ইহা সত্য যে, যে কারণে কারখানার মাটী বায়ু-মণ্ডলের নাইট্রোজেন পরিশোষণ করে, সেই কারণের শক্তি এত অল্প যে কারখানার মাটীকে আবার সোরা প্রদান করিবার উপযুক্ত করিতে, ইহার সহিত নূতন মাটীর সংযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত অভিমত সম্পূর্ণ কল্পিত। এরূপ অভিমতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা অনায়াসে বলিয়া থাকি বটে যে,

* নাইট্রিফিকেশন— নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের উপাদানের নাইট্রেট বা নাইট্রাইটে পরিবর্ত্তন।

সোরার কারবার জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপাদানের সোরায় পরিবর্ত্তন হইবার উপরেই নির্ভর করিতেছে. তথাপি কারখানার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যাপার দেখিয়া এই পরিবর্ত্তন প্রণালীর কারণ অনায়াসে মীমাংসা করা যায় না। এই ব্যাপারে ব্যাকটিরিয়া * সংক্রান্ত পরীক্ষা ও রীতিমত গবেষণা প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে খুঁড়িয়া হইতে যে প্রথম দ্রাবণ নিঃসৃত হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই দ্রাবণকে মৃত্তিকা বা লৌহ পাত্রে ঢালিয়া আগ দিয়া জলকে বাষ্পীভূত করা হয়। কিম্বা ইষ্টক দ্বারা খুঞ্চিয়ার স্তায় ছোট ছোট অল্প গভীর পাত্র গাঁথা থাকে। তাহাতে এই দ্রাবণ ঢালিয়া দিলে, রৌদ্রে জল বাষ্পীভূত হইয়া দ্রাবণ আপনা আপনি ঘন হইতে থাকে। এই শেষোক্ত প্রাণালী পাঞ্জাব দেশে প্রচলিত আছে।

এই দ্রাবণ যখন ঘন হইতে থাকে, বিশেষতঃ যখন অগ্নি সহযোগে ইহাকে ঘন করা হয়, তখন সর্ব্ব প্রথমে সাধারণ লবণ অধঃস্থ হইয়া থাকে। পরে যখন এই দ্রাবণ যথেষ্ট ঘন হয়, তখন ঠাণ্ডা করিলেই সোরা দানা বাঁধিয়া যায়। এই সাধারণ লবণ ও সোরার মিশ্রণ, দ্রাবণ হইতে পৃথক করিয়া সোরা সংশোধকগণকে বিক্রয় করা হয়। অবশিষ্ট দ্রাবণ কারখানার মটীতে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। এই উপায়ে সাধারণ লবণ প্রথমে পৃথক হইয়া যাইলেও দুইটি কারণে লুনিয়াগণ ইহাকে সোরা হইতে পৃথক করে না। প্রথমতঃ সরকারী লবণ বিভাগের নিয়মানুসারে তাহারা লবণ পৃথক করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যদি তাহাদিগকে লবণ পৃথক করিবার ক্ষমতা দেওয়াও হইত, তাহা হইলেও তাহারা লবণ পৃথক করিত না। কেননা, তাহাতে লাভ অল্প হইবার সম্ভাবনা।

কাজেই এই মিশ্রিত সোরার উপাদান স্বভাবতঃই নানারূপ হইয়া থাকে। নিম্নে উদ্ধৃত বিশ্লেষণ-তালিকা † হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে :—

	ফরাকাবাদ		ওকরা		মজঃফরপুর	বরহানপুর
	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা
পোটাসিয়াম নাইট্রেট বা সোরা	৬৬·০৭	৪৪·৯২	৫৩·০০	২৬·৮৬	৪৯·৩৬	৬৮·৪০
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট (calciucm nitrate) ...	...	...	২·৬০	...	৩·২৮	২·৬০
ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট (magnesim nitrate)	০২·৫৪	৪·৮০	...	১২·২৪	৭·৪৪	২·১২
সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ ...	২১·৮৪	৩৫·৩৮	৩৪·২২	৩৪·৮০	১৬·৮২	১৭·৯৮
সোডিয়াম সালফেট (sodium sulphate) ...	৩·৬৫	১০·০০	৩·৮৮	১১·২০	১৪·৬০	৩·৪০
অদ্রবণীয় পদার্থ	০·৯০	১·২০	১·১০	১·৪০	১·৫০	১·৭০
জল	৫·০০	৩·৭০	৫·২০	১৩·৫০	৭·০০	৩·৮০

(ক্রমশঃ)

* ব্যাকটিরিয়া (bacteria) একরূপ ইতর উদ্ভিদ বিশেষ। ইহা একটি মাত্র কোষ (cell) নির্ম্মিত। ইহা এত ক্ষুদ্র যে, অতি তীক্ষ্ণ শক্তি বিশিষ্ট অণুবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্ট হয় না।

† Agricultural Ledger, vol. xii, page 31.

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান

শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমৃত লাল সরকার এল এম এস, এফ সি এস, কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভায় "Introductory Lecture on Botany" নামক ইংরাজী বক্তৃতার শ্রীশরৎ চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মর্ম্মানুবাদ।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ইংরাজী নাম Botany,—ইহার মূল গ্রীক। ইহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, পাশ্চাত্য জগতে উদ্ভিদবিজ্ঞানের সূত্রপাত প্রাচীন গ্রীকগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সীমা অতি প্রশস্ত। উদ্ভিদের অতি স্থূল সহজ-দর্শনীয় বহিরাকৃতি, অতি সূক্ষ্ম অভ্যন্তরাকৃতি, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতা, উদ্ভিদাদির বিভাগ, পৃথীবীতে উদ্ভিদ সমূহের বিন্যাস, আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ রাজ্যের প্রকৃতি - এমন কি অতি প্রাচীন যুগের যে সমস্ত উদ্ভিদ প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের আলোচনাও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্তর্গত। ব্যাক্‌টিরিয়া আদি (bacteria) একটি কোষবিশিষ্ট (unicellular) উদ্ভিদ হইতে গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের আলোচনা, এই সমস্ত উদ্ভিদের উৎপত্তি, বিকাশ, পূর্ণতা, জীবন ধারণ প্রণালী, জীবন রক্ষার কৌশল ইত্যাদিও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সীমান্তর্গত। প্রস্তরীভূত প্রাচীন বৃক্ষাদির সহিত বর্ত্তমান উদ্ভিদ রাজ্যের কি সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের অনুধাবনও উদ্ভিদ বিজ্ঞান। বস্তুতঃ উদ্ভিদ সম্পর্কিত যাবতীয় পদার্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যাপারই উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সীমার অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীস্থ যাবতীয় দেশই অল্পাধিক পরিমাণে বৃক্ষলতায় সুশোভিত। কাজেই অতি প্রাচীন কালে, মানবের জ্ঞানোন্মেষের প্রথম সময় হইতেই উদ্ভিদ রাজ্য মানবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীন কালে উদ্ভিদাদির সম্যক আলোচনা ও পর্য্যবেক্ষণ ছিল। তবে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় কোন দেশেই উদ্ভিদ বিজ্ঞান এরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ যতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, ততই উদ্ভিদাদির গুণাবলী পরীক্ষায় মনোনিবিষ্ট করিয়াছিলেন। চরক, সুশ্রুত, ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের চিকিৎসা প্রসঙ্গে নানাবিধ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হইয়াছে। বোধসৌকার্য্যার্থে তাহাদিগকে ঋষিগণ শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত শ্রেণী বিভাগ অন্যরূপ।

বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া উদ্ভিদের গণ বা বর্গ নির্দ্দেশ (classification) করিয়াছেন, প্রাচীন কালে সেরূপ ছিলনা। এখন সাধারণতঃ বৃক্ষাদির আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াই গণ-বিভাগ হইয়া থাকে। তখন দ্রব্যগুণাভিধানই উদ্ভিদের বর্গ নির্দ্দেশক ছিল। কাজেই গণ বা বর্গে প্রাচীন ও নবীন গণের ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না। গুণানুসারে বিভাগ অপেক্ষা, আকৃতি অনুসারী বিভাগই বিজ্ঞান সম্মত। স্মরণাতীতকালে খাদ্যাখাদ্য বিচারেই উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল। যাহা খাদ্য তাহাই গৃহীত হইত, অখাদ্য বা বিষ পরিত্যক্ত হইত। কিন্তু খাদ্যাখাদ্যত্বই যে উদ্ভিদের শ্রেণীর নির্দ্দেষক নহে তাহা এখন সহজ বোধ্য হইয়াছে। আম্র খাদ্য হইলেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে বিষবৎ কার্য্য করে। কুচলে ভয়ানক মারাত্মক বটে, কিন্তু অল্প মাত্রায় ঔষধে প্রযুক্ত হইলে রোগীর জীবনী শক্তি রক্ষা করে। পূর্ব্বে যাহা বিষাক্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইত, তাহাই এক্ষণে প্রভূত উপকারী বলিয়া সযত্নে গৃহীত হইতেছে। যাহা হউক প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের যে আলোচনা হইত তাহার প্রমাণ চরক, শুশ্রুত ইত্যাদি বৈদক গ্রন্থ ও কৃষিপরাশর ইত্যাদি কৃষি-বিষয়ক গ্রন্থে যথেষ্ট সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এমন কি অতি প্রাচীন, হিন্দুর যাবতীয় পবিত্র গ্রন্থের মূল গায়ত্রী "তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ইত্যাদি" এই কথাটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানের ন্যায় বোধ হয় ইহাতেও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুসন্ধিৎসু বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের যে ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় আর্য্যের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে ভাগ করিয়াছেনঃ—

(১) উদ্ভিদ গঠন-বিজ্ঞান (Structural Botany)—বহিরবয়ব (morphology), আভ্যন্তরিক অবয়ব (anatomy), অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালী, প্রয়োজনীয়তা, পরস্পরের সম্পর্ক, অণুবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে দর্শনীয় আভ্যন্তরীক অতি সূক্ষ্ম বিষয় সমূহের তাৎপর্য্য, ইত্যাদি উদ্ভিদের গঠন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার এই বিভাগের অন্তর্গত।

(২) সাইটোলজি (cytology)— উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক গঠনের (anatomy) মৌলিক উপাদান অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক কোষ। এই কোষ সমূহের বিন্যাস, গঠন, কার্য্যকারিতা, ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ইত্যাদির বর্ণনা এই বিভাগের অন্তর্গত।

(৩) ফিজিওলজি (Physiology)— সমস্ত উদ্ভিদটির জীবনের ক্রিয়া ও নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ও জীবন রক্ষা করে বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি কোন্ কোন্ কার্য্য সম্পাদন করে, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনাই এই বিভাগের অন্তর্গত।

(৪) উদ্ভিদ বর্গ বা গণ প্রকরণ।— এই বিভাগে নানাজাতীয় উদ্ভিদকে এক এক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(৫) ভৌগোলিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান— পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে এবং কোন্ জল বায়ুতে, কোন্ কোন্ বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মে, তাহারই বিবরণ।

(৬) প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ বিজ্ঞান— পৃথিবীর আভ্যন্তরিক স্তরে যে সমস্ত বৃক্ষাদি প্রস্তরীভূত হইয়া আছে, তাহাদের আলোচনা।

(৭) ইকলজি (Ecology)— প্রত্যেক উদ্ভিদের নিকটস্থ উদ্ভিদ সমূহের সহিত ও চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থার সহিত উদ্ভিদ সমূহের পরস্পরের কি সম্পর্ক তাহাই এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

(৮) ব্যবহারিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান— আরণ্য উদ্ভিদ, মানব জীবনে তাহাদের ও তৎসমুদায় হইতে উৎপন্ন যাবতীয় দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা, কৃষিবিদ্যা, ঔষধ বিজ্ঞান, বৃক্ষাদি হইতে মানবের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের অনুধাবন এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

ইউরোপের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যে জোরওয়াষ্টার * বৃক্ষাদি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সূচনা প্রাচীন পণ্ডিত সলোমনের † সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। তিনি লেবাননের সেডার বৃক্ষ হইতে প্রাচীর মৃত্তিকায় উৎপাদিত সুগন্ধী হিসপ বৃক্ষ সম্বন্ধেও কথা বলিয়াছিলেন। চালডিয়ান, ইজিপসীয়, গ্রীক জাতি সমূহ অতি প্রাচীন কালে নানা বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিলেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহারা অবহেলা করেন নাই। কিন্তু ইহা অতি যৎসামান্য। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত সমূহও অতি অস্পষ্ট ও কিরূপে উদ্ভিদ হইতে জীব উৎপন্ন হইতে পারে, এই সমস্ত অভিমতেই উদ্ভিদ বিজ্ঞান পূর্ণ। ৩০০ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে থিওফ্রাসটাস্ একখানি বৃক্ষের ইতিহাস রচনা করেন, এবং রোগ নিবারণ কল্পে ঔষধার্থে প্রায় ৫০০ জাতীয় বৃক্ষ বর্ণনা করেন। প্রাচীন গ্রীক লেখক ডাইঅস্কোরাইডস্ সম্রাট নিরোর সময়ে একখানি ভৈষজ্যতত্ত্ব

---

* জোরওয়াষ্টার— প্রাচ্য মহাদেশের একজন অতি প্রসিদ্ধ শিক্ষা-গুরু। প্রাচীন পারসীকগণের ধর্ম্ম সংস্থাপক। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ইঁহার জন্ম কাল বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধের ৫০০০ বা বিখ্যাত সম্রাট আরাক্‌সিস্‌এর ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে। নানা কারণে পণ্ডিতগণ ইঁহাকে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত ব্যক্তিগণের ন্যায় কর্ত্তকটা কাল্পনিক মনে করেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি বর্ত্তমান মিডিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সীমার নিকটবর্ত্তী আরাক্‌সিস্ নদীর পার্শ্বে আয়ান নামক জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। বিঃ, সং।

† সলোমন— (১০ পূর্ব্ব খৃষ্ট শতাব্দী) তিনি ইজরাইল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান, ধন, সম্পৎ, বুদ্ধি, বিবেক, মানবের আকাঙ্ক্ষিত যাহা কিছু সমস্তই অতুলনীয় ছিল। ধন সম্পৎ ও জ্ঞান গাম্ভীর্য্যের জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত। বিঃ, সং।

(materia medica) রচনা করেন। এল্‌ডার প্লিনি* সহস্রাধিক বৃক্ষ বর্ণনা করেন। এই সমস্ত বৃক্ষ ঔষধার্থে বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরব দেশীয় প্রচীন পণ্ডিতগণও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের আলোচনায় বিরত থাকেন নাই।

বস্তুতঃ ১৬ খৃষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সেরূপ কোন উন্নতি হয় নাই। এরূপ কথিত আছে যে, বার্ণ নগরের জনৈক চিকিৎসক অটো ব্রন্‌ফেল ইউরোপে এই বিজ্ঞানের পুনঃ সংস্থাপন করেন। ১৫৩০ হইতে ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে তিনি হারবেরিয়াম নামক একখানি গ্রন্থে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র দ্বারা মধ্য ইউরোপের অনেক বৃক্ষ বর্ণনা করেন। তাঁহার পরে লিঅনহার্ড ফাস্ (Leonhard Fuchs), হায়রোনিমাস্ বক্ (Hieronymus Boch) ইত্যাদি পণ্ডিতগণ চিত্রাদি দ্বারা অনেক বৃক্ষ বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫৫১ খৃঃ অব্দে উইলিয়াম টাবনাব "নিউ হারবেল" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা কবেন। ইনি ইংরাজ। বস্তুতঃ টাবনাবই ইংরাজিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পিতৃস্বরূপ। উদ্ভিদ বিজ্ঞানেব সূচনা কালে রচিত এই সমস্ত গ্রন্থে উদ্ভিদের ঔষধার্থে প্রয়োগই যথেষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ ও বিবৃত রহিয়াছে। যে সমস্ত বৃক্ষ সহজেই একরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, এই সমস্ত বৃক্ককেই কেবল মাত্র এক শ্রেণী বদ্ধ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রীতিমত উদ্ভিদ সমূহেব বর্গ বা গণ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনাই হয় নাই। জন জেরার্ড নামক জনৈক ডাক্তার ব্রিটিশ উদ্ভিদ সম্বন্ধে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনিই কতকটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণ-প্রকবণ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করেন। আন্দ্রিয়াস্ সিসাল্‌পিনাস্ নামক জনৈক ফ্লরেন্সেব পণ্ডিত (১৫১০—১৬০৩) ১৫২০ টি বৃক্ষ বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে ১৫ ভাগে ভাগ কবিয়াছিলেন। তিনি বৃক্ষের ফলের আকৃতি-সাম্য দেখিয়া বিভাগ করেন। জন্ রে নামক জনৈক পণ্ডিত (১৬২৭—১৭০৫) উদ্ভিদ বিজ্ঞানেব যথেষ্ট উন্নতি সাধন কবেন। তিনিই প্রথমে যে সমস্ত বৃক্ষের বীজ দ্বিখণ্ডিত থাকে, যেমন মটব, মুসুব, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি তাহাদিগকে এক ভাগে

---

* এল্‌ডার প্লিনি— গ্রন্থাদিতে প্লিনি নামে দুইজন পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহারা উভয়েই ইটালীর উত্তর অংশের অন্তর্গত "নোভাম্ কমাম্" নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। দুই জনের জন্ম স্থান এক হইলেও জন্মকাল এক নহে। এক জন ২৩ খৃঃ অব্দে এবং অপর জন ৬১ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। বোধসৌকর্য্যার্থে ২৩ খৃঃ অব্দের প্লিনিকে এল্‌ডার (Elder) প্লিনি এবং ৬১ খৃঃ অব্দের প্লিনিকে ইয়ংগার (Younger) প্লিনি বলা হইয়া থাকে। এল্‌ডার প্লিনিই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি Historia Naturalis নামক একখানি সুবৃহৎ ভূতত্ব, প্রাণিতত্ব, খনিজতত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ৮৯ খৃঃ অব্দে ভিসুভিয়স নামক প্রসিদ্ধ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় যখন পম্পী ও হারকিউলেনিয়ম্ নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছিল, তখন এল্‌ডার প্লিনি এই দৃশ্য দর্শন, ও এরূপ অগ্ন্যুৎপাতের কি কারণ তাহা অনুধাবন করিবার জন্য ষ্টবিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অগ্নিস্রাবের বিষময় বাষ্পে তাঁহার শ্বাস রোধ হয় এবং মৃত্যু ঘটে। বিঃ, সং।

এবং যে সমস্ত বীজ দ্বিখণ্ডিত থাকে; যেমন গম, যব, ধান, ভুট্টা, বাঁশ, কলা ইত্যাদি তাহাদিগকে অন্ত ভাগে বিভক্ত করেন। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতগণ বুঝিয়া করেন যে, স্বাভাবিক মতে বৃক্ষ সমূহকে বর্গ বা গণে বিভক্ত করিতে হইলে, অগ্রে তাহাদের বাহ্যিক অবয়ব ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সবিশেষ জ্ঞান প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমতা রহিয়াছে, তাহারাই এক শ্রেণীর অন্তর্গত।

বৃক্ষাদির বাহ্যিক অবয়বাদির দ্বারা গণ বা বর্গ নির্ণয় সম্প্রতি যেরূপ সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হইয়াছে, তাহাতে যে কোন বৃক্ষ পাইলেই ইহা কোন্ বর্গের অন্তর্গত তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৃক্ষের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী কিরূপ, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আদৌ অনুশীলিত হয় নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উদ্ভিদ মাত্রেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক সূক্ষ্ম কোষ (cell) বিনির্ম্মিত। মধুচক্র অনেকেই দেখিয়াছেন। উদ্ভিদের অভ্যন্তর ভাগও কতকটা এইরূপ সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণে দর্শনীয় মধুচক্র প্রকোষ্ঠের ন্যায়। এই এক একটি প্রকোষ্ঠকেই cell বা কোষ বলে। কেবল উদ্ভিদাদিই যে এইরূপ কোষ বিনির্ম্মিত তাহা নহে জীব জন্তু অর্থাৎ সমগ্র চেতন পদার্থই এই কোষ বিনির্ম্মিত। জীব ও উদ্ভিদ কোষে প্রভেদ এই যে জীব-শরীরের কোষের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নাই; উদ্ভিদের কোষ সমূহ প্রাচীর দ্বারা পরস্পর হইতে সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ উদ্ভিদাদিতে প্রত্যেক কোষ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই কোষ (cell) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক গঠন ও ইতর উদ্ভিদাদি (cryptogams) সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সেরূপ বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা। রবার্ট হুক নামক জনৈক ইংরাজ তৎকাল উদ্ভাবিত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কতকটা উন্নতি সাধন করেন। তিনিই প্রথমে ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে উদ্ভিদ শরীরের এই কোষ আবিষ্কার করেন। তিনি তাঁহার মাইক্রোগ্রাফিয়া নামক পুস্তকে এই কোষগুলির cell এই আখ্যা প্রদান করেন।* সেই হইতেই ইহা cell নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। হুক তাঁহার অণুবীক্ষণের শক্তির বিবরণেই ব্যস্ত ছিলেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বা তাহার আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। মাঁরসেলো ম্যালফিগি নামক জনৈক ইতালীয় এবং নেহিমিয়া গ্রু নামক জনৈক ইংরাজ এই উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালীর গবেষণা করিয়া উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এক নূতন শাখা স্থাপন করেন। এই শাখার ইংরাজী নাম Vegetable Histology †। ভন্ মোল, নাগেলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে কিরূপে কোষ হইতে কোষ বিনির্ম্মিত হয়, তৎসম্বন্ধে যাবতীয় ব্যাপার আবিষ্কার করেন। অণুবীক্ষণ উদ্ভাবিত না হইলে উদ্ভিদের

* Cell — আমরা এই ইংরাজী বাক্য "cell" কে বঙ্গভাষায় "কোষ" বলিয়া অভিহিত করিতেছি। বিঃ সং।

† Vegetable Histology— উদ্ভিদের অতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক আভ্যন্তরিক গঠন। বিঃ সং।

আভ্যন্তরিক গঠন বা উদ্ভিদের জীবনের ক্রিয়াবলী বস্তুতঃ মানবের কোন জ্ঞানই সম্ভবপর হইত না। বস্তুতঃ অণুবীক্ষণের উদ্ভাবন, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, এবং সূক্ষ্ম আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালী তন্নতন্ন মীমাংসিত হইয়াছে।

আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান (Bacteriology) অণুবীক্ষণের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হইয়াছে। আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহ প্রকৃতিতে কি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আজকাল প্রায় সকলের নিকটেই সুপরিচিত। পণ্ডিতেরা বলেন যে আমাদের পীড়া ও যাবতীয় সংক্রামক ব্যাধির একমাত্র কারণ এই সমস্ত আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ। টাইফয়েড, কলেরা, মেহ ইত্যাদি পীড়ার মূল একরূপ উদ্ভিদাণু। বাস্তবিকই মানব, এমন কি সর্ব্ব প্রকৃতি, ওতঃ প্রোতঃ ভাবে উদ্ভিদারাজ্যের সহিত বিজড়িত। আর জীবের সহিত উদ্ভিদের কি সম্পর্ক তাহা অল্প সময়ে বর্ণিত হওয়া অসম্ভব। জীবের খাদ্য উদ্ভিদ, সামর্থ্যের কারণ উদ্ভিদ, জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার মূল উদ্ভিদ, পীড়ার কারণ উদ্ভিদ, বস্তুতঃ জীব ও উদ্ভিদ রাজ্য পরস্পরের ক্রিয়ার সহিত এরূপ ভাবে সম্পৃক্ত যে উদ্ভিদ ব্যতীত জীব রাজ্য বা জীব ব্যতীত উদ্ভিদ রাজ্যের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র কল্পনা করা অসম্ভব। আমরা জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ উভয়ের মৌলিক প্রভেদ স্থির করা সম্ভবপর নহে। যখন উদ্ভিদের শরীর গঠন ও জীবনের কার্য্য প্রণালী অত্যন্ত জটীল হইয়া পড়ে, তখনই আমরা জীব ও উদ্ভিদে প্রভেদ দেখিতে পাই। কিন্তু এই উভয়বিধ চেতন পদার্থের মধ্যে যাহাদের জীবন প্রণালী সম্পূর্ণ জটীলতা শূন্য অর্থাৎ অতি ইতর জীব ও অতি ইতর উদ্ভিদ, এই উভয়ের পার্থক্য ও প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। এক অন্যের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, কাজেই উদ্ভিদ রাজ্যের ও জীব রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

উদ্ভিদ ও জীব ইহাদিগের পার্থক্য নির্দ্দিষ্ট করা অতীব দুরূহ, কিন্তু প্রাণহীণ ও প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের সীমা সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। বহিরাগত বা আভ্যন্তরিক কোনরূপ উত্তেজনা পাইলে জীবিত পদার্থ কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তদ্ব্যতীত অন্য পদার্থের কার্য্যকারিতা শক্তি তদনুরূপ দেখা যায় না। অতি সূক্ষ্ম, জটিলতাশূন্য, প্রাথমিক, প্রাণশক্তি-বিশিষ্ট পদার্থও এইরূপ উত্তেজনায় উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। আমরা আজ পর্য্যন্ত যত অজটিল প্রাণশক্তি-বিশিষ্ট পদার্থ জানি, তাহা অপেক্ষা হয়ত আরও জটীলতা-শূন্য, ঐরূপ পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব। এই পদার্থ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। তখন হয়ত আমরা অনায়াসে প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত প্রাণহীন-পদার্থের যোজনা করিতে পারিব। সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন যে, কোন জীবিত পদার্থ ব্যতীত জীবিত পদার্থ উদ্ভূত হইতে পারে না, অর্থাৎ জীবের স্বতঃ উৎপত্তি (spontaneous genration) মানবের অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতার বিপরীত। আরিষ্টোটল প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণের অভিমত ছিল যে, কর্দ্দম এবং

বালুকা হইতে অর্থাৎ প্রাণহীন পদার্থের সমষ্টি হইতে জীব জগৎ উদ্ভূত হইতে পারে। কিন্তু এই স্বতঃ উৎপত্তির মূলে সোয়ান এবং পাষ্টুর (Schwann and Pasteur) কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে ইতর জীব বা উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যে স্থানে সাধারণতঃ এরূপ মনে হয় যে, প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ স্বতঃই উদ্ভূত হইতেছে, সেই স্থানেও ঐ পদার্থের উৎপত্তি এবং বিবৃতি নষ্ট করা অতি সম্ভব। যদি এই স্থানের পূর্ব্বসম্ভূত প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থকে একবারে নষ্ট করা হয় এবং ঐরূপ পদার্থকে পুনঃ প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই স্থানে কিছুতেই আর প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ উদ্ভূত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, জীবিত পদার্থ অন্য জীবিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতগণের মনে একটা বিশ্বাস হইয়াছে যে, প্রাণ হীন পদার্থ হইতেও জীবিত পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ জান্তব ও অজান্তব এবং ধাতব পদার্থের একটা পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতেন, এবং তাঁহারা বলিতেন যে জান্তব পদার্থ, জীবের জীবনী শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। জান্তব পদার্থের রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মাবলীর সহিত, অজান্তব ও ধাতব পদার্থের রসায়ন শাস্ত্রের নিয়মাবলীর কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে রাসায়নিকগণ সম্পূর্ণ অজান্তব বা ধাতব পদার্থ হইতে জান্তব পদার্থ উৎপাদন করিতেছেন *।

এইরূপ নানা কারণে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায়, অর্থাৎ যখন পৃথিবীর গঠন আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময়ে অজান্তব পদার্থ হইতে জান্তব পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তথাকথিত প্রাণ-হীণ পদার্থ হইতেই প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস,—জগতে প্রাণ-হীন পদার্থ আদৌ নাই। কেবল উহাদের কার্য্যকারিতা-শক্তির তারতম্যেই আমরা উহাদিগকে প্রাণ-হীন বা প্রাণ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই কার্য্যকারিতা শক্তির তারতম্যের কারণ, কোন উত্তেজনার (stimulus) প্রয়োগ। আমাদের আর্য্য ঋষিগণের মতে—আত্মার বিকাশ।

---

* ১৮২৮ খৃঃ অব্দে উলার (Wöhler) আমোনিয়াম্ সায়ানেট (ammonium cyanate) নামক এক প্রকার অজান্তব পদার্থ হইতে ইউরিয়া নামক জান্তব পদার্থ উৎপাদন করেন। নির্দ্দোষ প্রস্রাবের সহিত স্ফটিকাকার এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়,—তাহাই ইউরিয়া। পরে অন্যান্য রাসায়নিকগণ, অজান্তব ও ধাতব পদার্থ হইতে অনেক জান্তব পদার্থ উৎপাদন করিয়াছেন। কাজেই এখন জান্তব রসায়ন ও ধাতব রসায়ন অর্থাৎ Organic Chemistry এবং Inorgnic Chemistry বলিয়া দুইটি গ্রন্থ নাই। বর্ত্তমানে Organic Chemistry বলিলে অঙ্গার রসায়ন (Chemisry of Carbon Compounds) বুঝায়। বিঃ সং।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান কাহাকে বলে এবং তাহার প্রসার কতটুকু তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এ বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। এক মাত্র জ্ঞান বিবৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার আলোচনা ও গবেষণা অত্যন্ত তৃপ্তিকর। অধিকন্তু প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ব অনুধাবন, ও সৃষ্টির রহস্যোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সমালোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পেও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানের (Bacteriology) প্রয়োজনীয়তা অল্প নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ বা সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির কারণই এই আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহ। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, শরীরের অভ্যন্তরে উপযুক্ত স্থানে এই সমস্ত আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ প্রবিষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ ইহা সংখ্যায় দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া জীবনী শক্তি ধ্বংশ করিয়া ফেলে। এ অভিমত সম্বন্ধে আমার একটু সন্দেহ আছে। কোন স্থানে জল বাহিত হইবার সময় সেই স্থানের চতুর্দ্দিক ক্রমাগত আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসিয়া শৈবাল উৎপাদনের উপযুক্ত হইয়া পড়িলে, শৈবাল বীজ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শৈবাল অনায়াসে বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শৈবাল উৎপন্ন হইলেই জল আসিয়া উপস্থিত হয় না, কিন্তু স্থান উপযুক্ত হইলেই শৈবাল আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগের বীজ আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীর রুগ্ন করে না, পরন্তু আমাদের শরীর রোগের উপযুক্ত হইলে তবে বীজ উপস্থিত হইয়া আমাদের অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও একটি ভাবিবার কথা আছে। বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি এক নূতন উপায়ে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। কাহারও কারবাঙ্কোল হইয়াছে। কারবাঙ্কোলের কারণ এক প্রকার রোগ বীজাণু। চিকিৎসকগণ বলেন যে, শরীরের আক্রান্ত স্থান হইতে কয়েকটি রোগ বীজাণু গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে বলবান করিয়া পুনরায় শরীরের মধ্যে প্রবেশিত করাইলে, এই সমস্ত বলবান রোগ বীজাণু শরীরস্থ অন্যান্য বীজাণুকে সম্পূর্ণ ধ্বংশ করিয়া ফেলে। কাজেই রোগ প্রশমিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমার অন্যরূপ মনে হয়:—

স্বভাবতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন স্থানে কোন ময়লা বা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ পতিত থাকিলে, তৎক্ষণাৎ নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ উদ্ভূত হইয়া অস্বাস্থ্যকর পদার্থের বিলোপ সাধন করে, এবং অপরিস্কৃত স্থান পুনঃ পরিস্কৃত হইয়া পড়ে। আমাদের শরীরের কোন স্থান অপরিস্কার, অস্বাস্থ্যকর বা বিষদুষ্ট হইলে, অমনই প্রকৃতি সে স্থানের বিষ নষ্ট করিবার উপযোগী কতকগুলি আণবিক জান্তব পদার্থ বা আমরা যাহাকে রোগবীজাণু বলি তাহাদিগকে প্রেরণ করে। এখন আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে এই সমস্ত রোগ বীজাণুর শরীরে বলাধান করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র বিষদুষ্ট স্থানকে পরিস্কৃত করিতে পারিবে। কাজেই আমার মনে হয়, শরীরের স্থানবিশেষ বিষদুষ্ট হইবার কারণ রোগ বীজাণু

নহে, পরন্তু বিষদুষ্ট হইলে তবে রোগ বীজাণু প্রবেশ করে; রোগ বীজাণু পীড়া বৃদ্ধি করেনা, পীড়া হ্রাস করিতে চেষ্টা করে; রোগ বীজাণুর বলাধান করিলে অজ্ঞাত দুর্ব্বল রোগ বীজাণু ধ্বংস হয় না, বলবান রোগ বীজাণু বিষদুষ্ট স্থানের বিষের অতি শীঘ্র বিলোপ সাধন করে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের অনেক চিন্তা করিবার বিষয় আছে।

বিবিধ।

বঙ্গীয় উন্মাদ-আশ্রমের কার্য্যবিবরণী।—(১৯০৯, ১০, ১১.) আলোচ্য ৩ বর্ষে বঙ্গদেশের আশ্রম-সমূহে পাগলের সংখ্যা ৯৩৭, গত ৩ বর্ষের সংখ্যা ৮৫১। প্রতি বৎসর আশ্রমে অধিকতর উন্মাদ প্রবিষ্ট হইতেছে। আলোচ্য কালে ২৯৬ জন লোককে আশ্রম হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২২০ জন নীরোগ হইয়াছিল। ২ জনের অবস্থা উন্নত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের ভার আত্মীয় স্বজনের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। পাগল আসামীর সংখ্যা আলোচ্য কালে মোট ২১১ জন। বায়ু গ্রস্ত (mania) উন্মাদের সংখ্যাই অধিক; তৎপরেই মানসিক অবসন্নতা (melancholia)। এই দুই জাতীয় উন্মাদই অধিকতর নীরোগ হইয়াছে। বুদ্ধি-বৈক্লব্য (dementia) জনিত উন্মাদ সর্ব্ব সমেত ২৩ জন প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ২ জন আরোগ্য হইয়াছিল। এই রোগ প্রকৃত হইলে কখনই আরাম হইতে পারে না; তবে ইহার বৃদ্ধি স্থগিত করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ যে ২ জন আরোগ্য হইয়াছিল, তাহাদের প্রকৃত এই রোগ হয় নাই। উন্মাদগণের পক্ষাঘাত রোগ ভারতে অতি অল্পই আছে। মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার জন্য (delusional) উন্মাদ মাত্র ৮ জন প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪ জন আরাম হইয়াছে। এই সমস্ত পাগলের উন্মত্ততার কারণ শারীরিক, নৈতিক, পৈতৃক, মদ্য পান, গাঁজা সেবন, নানারূপ নেশার আসক্তি ও শারীরিক আঘাত। শতকরা ৫৬·৭২ জন পাগল নানারূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। পাগলগণকে যত অধিক কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যায়, ততই তাহারা নীরোগ হইয়া থাকে। সম্প্রতি উন্মাদ আশ্রমের নানাবিধ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, এবং আলোচ্য কালে বঙ্গদেশস্থ সমস্ত আশ্রমেই সুচারু বন্দোবস্ত ছিল। পাগলগণের রীতিমত যত্ন লওয়া হইয়াছে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখান হইয়াছে, তাহাদিগকে আহারের ও বস্ত্রাদির অভাব আদৌ বুঝিতে দেওয়া হয় নাই। যক্ষা ইত্যাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষান্তে ওজন গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

বায়ুমণ্ডল।—প্রসিয়ার অন্তর্গত মারবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ওয়েগেনার (Alfred Wegener) বায়ুমণ্ডলের গঠন সম্বন্ধে এক নূতন অভিমত স্থাপন করিয়াছেন। মেঘমণ্ডলের উচ্চতা ৬ মাইল। ভূমণ্ডলের নিকটে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৭৮·১ এবং অক্সিজেন ২০·৯ ভাগ। ১২

মাইল উর্দ্ধে শতকরা ৮৫ ভাগ নাইট্রোজেন, ১৫ ভাগ অক্সিজেন। মেঘগুলের পরেই নাইট্রোজেন মণ্ডল। ইহার উচ্চতা ৬ মাইলের পর হইতে ৪৮ মাইল পর্য্যন্ত। সর্ব্বোচ্চে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৮৮ ভাগ, অক্সিজেন ১০ ভাগ, হাইড্রোজেন ১ ভাগ। ইহার পরেই হাইড্রোজেন মণ্ডল। ইহার উচ্চতা ৪৮ মাইলের পর হইতে ১৩২০ মাইল পর্য্যন্ত। ৬০ মাইলের পরেই নাইট্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, কিন্তু হাইড্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ। সূর্য্যমণ্ডলে করোনিয়াম নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ আছে। ৬০ মাইল উর্দ্ধে ওয়েগেনার করোনিয়ামের অনুরূপ একপ্রকার বায়বীয় পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন—জিওকরোনিয়াম। ৪৮ মাইল উর্দ্ধে এই জিওকরোনিয়াম শতকরা ১৭ ভাগ, ৬০ মাইল উর্দ্ধে ২৯ ভাগ, এবং ১২০ মাইল উর্দ্ধে হাইড্রোজেন এবং জিওকরোনিয়ামের অনুপাত সমান। এই জিওকরোনিয়াম মণ্ডল ৩১২ মাইল উর্দ্ধে। বৈজ্ঞানিকগণ উর্দ্ধ বায়ু মণ্ডলের প্রকৃতি, উল্কা, মেরুছটা ইত্যাদির আলোক বিশ্লেষণ করিয়া এবং শব্দ সম্ভূত ঘটনা পরম্পরা লক্ষ্য করিয়া স্থির করিয়া থাকেন। আমরা উল্কা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, পার্থিব বায়ু-মণ্ডলের উচ্চতা অন্ততঃ ৯০ মাইল। খুব সম্ভবতঃ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। উল্কা বিচ্ছুরিত আলোকের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, বৈজ্ঞানিকগণ যে হাইড্রোজেন মণ্ডল কল্পনা করিয়া লইয়াছেন তাহা সত্য। উল্কাপাত কি তাহা অনেকেই অবগত আছেন। নক্ষত্র মণ্ডলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ খণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহারা পৃথিবীর আকর্ষণের শক্তির মধ্যে আসিয়া পড়িলে পার্থিব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীর দিকে প্রধাবিত হয়। তাহাদের মূল গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ মাইল। বায়ু-মণ্ডলের বায়ু কণার সহিত সংঘর্ষে এই সমস্ত পদার্থে প্রভূত উত্তাপ সঞ্জাত হয়। এই উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে পদার্থ হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে, এবং পথে বায়বীয় পদার্থ এবং বাষ্পীয় পদার্থকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া আসে। সময়ে সময়ে এই উল্কা-গুলি ৩০ মাইল বা তদূর্দ্ধেই উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিয়ৎকাল পরে উল্কা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অন্তর্হিত হয়। প্রায় ৫০ হইতে ১০০ মাইল উর্দ্ধ প্রদেশেই উল্কার জ্যোতিঃ দেখা যায়। পিকারিং নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক এই সমস্ত উল্কা সংস্পর্শে উজ্জ্বল বায়ু মণ্ডলের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া একটি মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা হইতেই হাইড্রোজেন বায়ু মণ্ডলের অস্তিত্ব সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মেরু প্রদেশের বায়ু মণ্ডলে এক প্রকার আলোক বিকীর্ণ হয় তাহার নাম মেরু ছটা (aurora)। ইহার বিস্তৃত বিবরণ "বিজ্ঞানে" লিখিত হইয়াছে। মেরুছটার আলোক ৩৬ হইতে ৬০ মাইল উর্দ্ধ দেশে হইতে আগমন করে। এই আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, যত উর্দ্ধ দেশে গমন করা যায়, হাইড্রোজেন ততই বৃদ্ধি পায় ও নাইট্রোজেন কমিতে

থাকে। আলোক বিশ্লেষণ করিলে বিশ্লিষ্ট আলোকে, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি ব্যতীত আরও কয়েকটি পদার্থের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতার অনুপাতে এই চিহ্ন সকলের সংখ্যা ও স্পষ্টতা অধিক হয়। ক্রুপটন্ নামক এক প্রকার বায়বীয় পদার্থের চিহ্ন বিশ্লিষ্ট-আলোকে দেখা যায়। র‍্যামজে, স্টুয়ার এবং হাগিনস্ মনে করেন যে পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত ক্রুপটনের চিহ্নের সমতা রহিয়াছে। কিন্তু ক্রুপটন্ অত্যন্ত ভারী। পূর্ব্বোক্ত পদার্থের চিহ্ন ২২০ হইতে ৩০০ মাইল উর্দ্ধ দেশে পাওয়া যায়। এত উচ্চে ক্রুপটন্ থাকিতে পারে না। ওয়েগেনার স্থির করিলেন যে উর্দ্ধ প্রদেশ হাইড্রোজেন অপেক্ষা আরও লঘুতর একটি বায়ুতে পূর্ণ। তাহার নাম জিওকরোনিয়াম। এরূপ নাম দিবার কারণ এই যে সূর্য্য মণ্ডলের করোনিয়ামের সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার।— আর্য্যাবর্ত্ত— শ্রাবণ ১৩১৯; আলোক— অগ্রহায়ণ ১৩১৮; অবসর— ভাদ্র ১৩১৯; আলোচনা— ভাদ্র ১৩১৯, অর্ঘ্য— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; অর্চ্চনা— আশ্বিন ১৩১৯; আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী— শ্রাবণ ১৩১৯; অলৌকিক রহস্য— ভাদ্র ১৩১৯; ভারতী— ভাদ্র, ১৩১৯; ভারত মহিলা— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; ভক্তি— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; বামাবোধিনী— আশ্বিন ১৩১৯; বসুধা— ভাদ্র ১৩১৯; বঙ্গদর্শন— ভাদ্র ১৩১৯; ব্যবসা ও বাণিজ্য— বৈশাখ, ১৩১৯; বঙ্গরত্ন— ; চিকিৎসাসম্মিলনী— চৈত্র, ১৩১৮; চিকিৎসা প্রকাশ— ভাদ্র ১৩১৯; The Calcutta University Magazine— Aughst, 1912; দেবালয়— আশ্বিন, ১৩১৯; The Dawn & Dawn Society's Magazine— October, 1912; Food and Drugs—. No. 3. vol, II; গৃহস্থ— ভাদ্র ১৩১৯; Hindu Spiritual Magazine— September, 1912. হিন্দুসখা— ভাদ্র ১৩১৯; হিতবাদী— ; হিন্দুপত্রিকা— ভাদ্র ১৩১৯; জগজ্জ্যোতিঃ— ভাদ্র, ১৩১৯; জন্মভূমী— আষাঢ়, ১৩১৯; কুশদহ— আশ্বিন, ১৩১৯; কৃষক— শ্রাবণ, ১৩১৯; কর্ম্মকার বন্ধু— আষাঢ়, ১৩১৯; কোহিনুর— শ্রাবণ, ১৩১৯ কাজের লোক— April, 1912; কায়স্থ পত্রিকা— আশ্বিন, ১৩১৯; কৃষি সম্পদ— আষাঢ়, ১৩১৯; মহাজন বন্ধু— শ্রাবণ, ১৩১৯; মেদিনীপুর হিতৈষী— ; মুকুল— ভাদ্র, ১৩১৯; নির্ম্মাল্য— বৈশাখ, ১৩১৯; নব্যভারত— শ্রাবণ, ১৩১৯; নাট্য-মন্দির— আষাঢ়, ১৩১৯; প্রকৃতি— ভাদ্র, ১৩১৯; প্রসূন— ; পল্লিচিত্র— ভাদ্র, ১৩১৯; প্রজাপতি— ভাদ্র, ১৩১৯; পতাকা— আষাঢ়, ১৩১৯; প্রতিভা— ভাদ্র, ১৩১৯; রংপুর সাহিত্য-পারিষৎ পত্রিকা— ৬ষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা; শান্তিকণা ফাল্গুণ, ১৩১৮; সমাজ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯; সাহিত্য-সম্বাদ— আশ্বিন, ১৩১৯; শিল্প ও সাহিত্য— আষাঢ়, ১৩১৯; স্বাস্থ্যসমাচার— আশ্বিন, ১৩১৯; সাহিত্য সংহিতা— আষাঢ়, ১৩১৯; সঞ্জীবনী— ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— আশ্বিন ১৩১৯; ত্রিশূল— ; তত্ত্বমঞ্জরী— শ্রাবণ ১৩১৯; উদয়— ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; উপাসনা—।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) অক্টোবর, ১৯১২। ১০ম সংখ্যা।

বিজ্ঞান-নীতি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞানের প্রসার।

যে বিশাল বনস্পতি শাখাপ্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক মানবের মানসক্ষেত্রের এতখানি স্থান ব্যাপিয়া, স্নিগ্ধ প্রসারিত অনাতপ সহ দণ্ডায়মান আছে, তাহার পরিধির একটা সম্যক্ উপলব্ধি আবশ্যক। ক্ষুদ্র বীজ, ভূমি হইতে রসগ্রহণ করিয়া একটু বর্ষার স্নেহ-সিঞ্চন, একটু উষ্ণ রবিরশ্মি, হিল্লোলিত মলয়ার একটি মৃদুচুম্বন আহরণ পূর্ব্বক যেমন অঙ্কুরিত, মঞ্জুরিত ও বিকশিত হয়, বিজ্ঞানের প্রারম্ভ ও বিকাশ ঠিক সেইরূপ। মানবের জ্ঞানোন্মেষের সহিত একটা অনুসন্ধিৎসা স্বতঃই জাগিয়া উঠে। নৈসর্গিক জগতের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিয়া মানব যে একেবারেই তাহার যুক্তি ও অনুমান লইয়া আলোচ্য নিসর্গের (phenomenon) বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয় বা কখনও হইয়াছিল একথা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু যখন সে কোনও বিশেষ দৃক্‌বিষয়কে তাহার ন্যায় ও যুক্তির গণ্ডীর ভিতর আনিয়া, তাহাকে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক অনুশীলনে অভিনিবিষ্ট হয়, তখনই আমরা তাহার জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। প্রভাতের অরুণিমা যখন প্রাথমিক মানবের মানসক্ষেত্রে একটা কবিত্বের উৎস খুলিয়া দিয়াছিল, যখন সেই সৌন্দর্য্যমুগ্ধ মানবের প্রাণকে প্লাবিত করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবতরঙ্গ তাহার হৃদয়-তটে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, তখন তাহার উপভোগের অবস্থা। তখন প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হইতে পারে না। বিচার তখন তাহার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। তাহার পর— কতদিন পরে সে কথা এখন ঠিক বলা যায় না— যখন তাহার সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, জীবনের কঠোরতা যখন সে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, জগৎকে সে যখন একটা ভীষণ সংগ্রামস্থল বলিয়া বুঝিয়াছিল,

তখন তাহার মনে তাহার আততায়ীদের ক্রিয়া কর্ম অনুশীলনের একটা ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। এই ইচ্ছাই পরে অনুসন্ধিৎসায় বিকাশ লাভ করিয়া বিজ্ঞানের বীজ বপন করিয়াছে।

এখন দেখা গেল যে বিজ্ঞানের মূলে মানবের আত্মরক্ষাই বর্তমান। আপনাকে বাঁচাইবার জন্য, স্বজাতির রক্ষা ও পরিপোষণের জন্য তাহার যে বহির্মুখী প্রয়াস তাহাই আমাদের গরিমাময় বিজ্ঞানসম্পদ। ইহা কোনও ঐশ্বরিক দ্যোতনা হইতে উদ্ভূত নহে, বা কোনও গিরিগুহানিবাসীর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রসূত নহে। সমবেত মানবমণ্ডলীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রকৃতির বিশ্লেষণে বিজ্ঞানের সৃষ্টি। অতএব ইহার প্রারম্ভ মানবের সমাজবদ্ধ হইবার অনেক পরে। আরও ইহার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে বর্তমানে যে সকল মানব সমাজ যে পরিমাণে উন্নত, বিজ্ঞানের অনুশীলন তাহাদের মধ্যে ঠিক সেই পরিমাণে বিকশিত; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিকাশ সমাজের উন্নতির আনুপাতিক। আমাদিগের এই প্রস্তাবটী সার্ব্বজনীন্ সত্য, এবং আমরা যদি কোনও মানব সম্প্রদায় বিশেষে বিজ্ঞানের বিকাশ দৃষ্টে উক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থার বিচারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের বিশেষ ভুল হইবে না।

বিজ্ঞানের রাজ্য যদি মানবের স্বার্থ বৃত্তির উপব প্রতিষ্ঠাপিত হয়, ও বিজ্ঞান যদি সমবেত মানবমণ্ডলীর স্বার্থসিদ্ধির কৌশল মাত্র হয়, তাহা হইলে জীবনের পণ্য-বীথিকায় ইহাকে মহামূল্য বিবেচনা করিরার কাবণ আছে।

বিজ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা যদি আমরা আমাদের যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক দেখি, তাহা হইলে ইহাই আমাদেব উপলব্ধি হয় যে ইহা সাধারণ জ্ঞানাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অগ্রবর্ত্তী, অধিক নহে। নিসর্গসমূহের শ্রেণী বিভাগ করা, বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা তাহাদের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য প্রদর্শন কবা, এবং উক্ত বিভক্ত শ্রেণীর মধ্য জাতি ও বর্ণ গত পার্থক্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আলোচ্য নিসর্গ প্রকটিত দৃক্-বিষয়সমূহকে ধারানিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের চরম কার্য্য। বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা আর অগ্রবর্ত্তী হইতে চায় না। আর যতটুকু অগ্রবর্ত্তী হয় তাঁহাও অধিরোহণ প্রণালী দ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হয় একথাটা আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। পদার্থবিদ্যায় বিভিন্ন নিসর্গের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ ব্যতীত আর বেশী কিছু কি আমরা প্রাপ্ত হই? এই বিভাজন প্রণালী নিবদ্ধ দৃক্‌বিষয় সমূহের একটা ধারানিয়ন্ত্রিত বিশ্লেষণ ও অবভাবণই আমাদের পদার্থবিদ্যার ও অপরাপর বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। যখন আমরা আমাদিগের আলোচ্য-নিসর্গ-প্রকটিত দৃক্‌বিষয় সমূহকে একটা ধারাবদ্ধ করিতে সমর্থ হই, এবং অধিরোহণ প্রণালী অনুসারে যখন আমরা ভবিষ্যতে উক্ত নিসর্গের প্রকটন সম্বন্ধে নির্ভির ওজনে নিছক সত্যটুকু

পরিমাণ করিয়া বলিতে পারি, তখনই বিজ্ঞানের কার্য্য শেষ হইয়া যায় ; তাহার পর আর যে টুকু লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ মারামারি করেন, সেই ঔপপত্তিক (hypothetical) কারণসমূহ কল্পনা প্রসূত। সে কল্পনা বিজ্ঞানের প্রতিবেশিনী হইলেও কল্পনা মাত্র। বিজ্ঞান সত্যের সন্তান, তেমনই অপরিবর্ত্তনীয়, তেমনই অমর, তেমনই চিরনবীন ও ঠিক সেইরূপই কঠোর ও নির্ম্মম। বিজ্ঞানের যে অংশে কল্পনার প্রভাব যত বেশী, অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান যে পরিমাণে অনিয়ন্ত্রিত সেই অংশেই ইহা সেই পরিমাণে পরিবর্ত্তনশীল, অনিশ্চিত ও নামের অযোগ্য। এই জন্যই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান আজ অবধি তাহার মূল সূত্রগুলির ভিত্তি দৃঢ় করিতে পারে নাই। এই সম্বন্ধে একজন ফরাসী বিজ্ঞানবিতের মত * আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"C'est la honte eternelle de la philosophie de n'avoir pas jusqu'a présent mis an jour au resultat positif, un principe une fois pour toute reconnu et universellement admis. Bien mieux, il n'y a pas meme un resultat négatif, une defaite complète, irrèvocable d'une doctrine si réfutee quel'le soit."

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান যাহা, তাহার কারবার নিছক্ সত্য লইয়া। অনিয়ন্ত্রিত অনুমান, কল্পনার প্রস্ফুট সৌন্দর্য্য, কবির মুরলী-ধ্বনি তাহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ লইয়াই সে ব্যস্ত, তাহাতেই সে পরিতৃপ্ত এবং তাহাতেই তাহার সাফল্য।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার।

আলোক-চিত্রণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ফটোতে চিত্র-সৌন্দর্য্য প্রদান করিতে হইলে ফটোর প্রসার বা breadth থাকা প্রয়োজন। যে ছবিতে এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর ঐক্য আছে, যাহাতে অপর সকল বস্তু প্রধান বস্তুর (principal object) সহ কার্য্য করিয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করে, যাহাতে ছবির প্রত্যেক অংশ মিলিয়া এক সমন্বয় স্থাপন করে এবং সমস্ত বস্তুর দ্বারা ছবির 'উদ্দেশ্য' (motif) পরিস্ফুট করিয়া তুলে— তাহাকে প্রসার বা breadth বলে। যদি ছবিতে এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ না থাকে তাহা হইলে অসংলগ্ন ও প্রত্যেক বস্তু স্ব স্ব প্রধান বলিয়া বোধ হয় তখন

* Delbœuf ; *Essai de Logique scientifique, Liege*, 1865, p. 10. Comp. Kant : Prolegomena zu einer jeden kuenftigen Metaphysik.

বুঝিতে হইবে, যে চিত্রে প্রসার বা breadth নাই। ছবি তুলিবার সময় ক্যামেরা বসাইবার স্থান এমন যায়গায় ঠিক করিতে হইবে, যেন সেই স্থান হইতে লাইনগুলি বেশ লম্বাভাবে অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়; অন্যান্য বস্তু সকলের বেশ বিস্তৃতি থাকে অথচ অসংলগ্ন বা ছাড়া ছাড়া না হয় এবং এক বস্তুর সৌন্দর্য্য অন্যের উপর নির্ভর করে।

চিত্র রচনার প্রতি মনোযোগ যেমন প্রয়োজন দৃশ্যের উপর কি রকম আলো পড়িয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিও তেমনই প্রয়োজন। যদি সমস্ত ছবিতে নানা স্থানে কেবল খুব সাদা আলো (high lights) আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ছবি যেমন খারাপ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। সাধারণতঃ ছবিতে খুব সাদা আলোর (high light) ভাগ কমই থাকিবে এবং ছবির বেশী ভাগ ছায়া ও ক্রমিক ছায়া (half tone) দ্বারা পূর্ণ থাকিবে। এইস্থানে বলা উচিত যে ছবিতে সাদা স্থান ও ছায়ার মধ্যস্থিত অংশ যেখানে সাদা হইতে ক্রমে কাল হইয়া গিয়াছে বা কাল হইতে ক্রমে সাদা হইয়া গিয়াছে এই ক্রমিক ছায়া অর্থাৎ ছায়া হইতে আলো বা আলো হইতে ছায়াকে (half tone) বলে। যখন 'ছড়ান' আলো পরিহার করা অসম্ভব হয় তখন আলোর মধ্যে ছবির কোন সতেজ স্থানে (strong point) যদি এমন কোন বস্তু বসান যায় যাহাতে খুব সাদা আলো (high light) ও গভীর ছায়া পাশাপাশি থাকে তাহা হইলে খুব ভাল হয়; উদাহরণ স্বরূপ একটা কাল গরু ও তাহার সাদা বাছুর কিম্বা সাদা ধুতি ও চাদর পরিহিত কোন লোক। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা অতি আশ্চর্য্যরূপে ছবির ঐক্য স্থাপন হয়। ঐ সকল স্থানে সাদা পশ্চাৎ ভূমীর (background) উপর কাল কিম্বা কাল ব্যকগ্রাউণ্ডের উপর সাদা জিনিষ স্থাপন করিলে চলে; উজ্জ্বলালোকিত জলের উপর কাল নৌকা অথবা সাদা কাপড় পরিহিত কোন লোক যদি কাল প্রস্তর বা ঝোপের সম্মুখে দাঁড়ায় তাহা হইলেও চলিতে পারে। প্রতিমূর্ত্তি ও গ্রুপ তুলিতেও এই প্রকার ভঙ্গী (pose) 'লাইন',* সামঞ্জস্য (balance) প্রভৃতি রাখিয়া পশ্চাৎ ভূমী (background) ও অন্যান্য সরঞ্জামের সহিত সমন্বয় স্থাপন যাহাতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে

দৃশ্য তুলিতে হইলে তাহার মধ্যে আকাশের ছবি তোলা বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। আকাশের ছবি একবারেই উঠে না। যে এক্স্পোসারে দৃশ্যের ছবি বেশ উঠিয়াছে ও সেজন্য যে ছবিতে প্রতি জিনিষ বা সূক্ষ্মাংশ (detail) পরিষ্কাররূপে উঠিয়াছে তাহাতে আকাশে বেশী এক্সপোসার (over exposed) হইয়া যায়। কোন মেঘ দেখা যায় না, কেবল সমস্তটা সাদা দেখায়। মেঘের ছবি তুলিতে হইলে

* পূর্ব্বে 'লাইন' কথার উল্লেখ করা গিয়াছে—খালের ধারে যেখানে জল তীরে আসিয়া লাগে সেখানে তৃণাবৃত সমস্ত স্থানের পাশ দিয়া একটা লাইনের মত দেখায়। মাটি ও পর্ব্বতের পাদদেশেও লাইনের মত দেখায়। এই গুলিকে সংক্ষেপে 'লাইন' বলা হইয়াছে।

দুইবার ছাপা বা প্রিন্ট করা প্রয়োজন। ইহা পরে বিবৃত হইবে—যা কোন উপায়ে যাহাতে দৃশ্যের, বিশেষতঃ সম্মুখ জমীর (foreground) ঠিক এক্সপোসার হয় কিন্তু আকাশেরও কম এক্সপোসার হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। এ জন্য আজকাল এক রকম শাটার নির্ম্মিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বস্তুর ছবি দৃশ্যচিত্রে বেশ উঠে;—যে দৃশ্যে আলো ও ছায়ার সুন্দর তারতম্য আছে, সর্ব্বপ্রকার গাছ পত্র-শোভিত বা পত্রশূন্য। তবে পত্র থাকিলে বাতাসে তাহা নড়ে বলিয়া একটু অসুবিধা হয় কিন্তু খুব কমক্ষণ এক্সপোসার করিলে সে অসুবিধা থাকে না কিম্বা যে দিন বাতাস নাই সে দিন ছবি তোলা ভাল। সর্ব্ব-প্রকার হর্ম্ম্য ও ইমারতাদির ফটো অতি নিখুত ভাবে উঠে। যেখানে জল থাকে সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছবি হয়, যেমন কোন খাল বা বিলের উপর বৃক্ষাদির ছায়া কিম্বা নদীতে পালভরা নৌকা বা জাহাজ। যাঁহারা সৌন্দর্য্য পূর্ণ ফটো তুলিতে চান তাঁহাদের উপরোক্ত মতে চলিলে শিক্ষার সময় বেশ উপকার হয়। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলে নিজে ঠিক করিয়া চলিতে পরিবেন। ইহা ব্যতীত আজ-কাল একদল ফটোগ্রাফার হইয়াছেন, তাঁহারা এসকল কোন নিয়ম মানেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে 'প্রাকৃতিক' (naturalist) ফটোগ্রাফার বলেন। তাঁহাদের মতে চলিলে এত কষ্টের প্রয়োজন হয় না। আগামী বারে ছবি তুলিবার সময় কি করিতে হয় সে সম্বন্ধে লেখা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুকুমার মিত্র।

বায়ু-মণ্ডল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উত্তাপ প্রয়োগ করিলে বায়ু আয়তনে বৃদ্ধি পায়, পাতলা হয় ও অত্যন্ত লঘু হইয়া উঠে। এরূপ হইলে বায়ুর অবস্থা কিরূপ হয়, দেখা যাউক। যদি জল অপেক্ষা কোন লঘুতর পদার্থ জলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে সেই লঘু পদার্থ ভাসিতে থাকে। অন্য পদার্থ অপেক্ষা লঘুতর পদার্থ কিরূপ? ১ ঘন ইঞ্চ অর্থাৎ ১ ইঞ্চ লম্বা, ১ ইঞ্চ চওড়া, ১ ইঞ্চ গভীর জল এক ঘন ইঞ্চ তৈল অপেক্ষা অনেক ভারী। জলে যতটুকু পদার্থ থাকে, সম আয়তন তৈলে তদপেক্ষা অল্পতর পদার্থ থাকে, কাজেই জল অপেক্ষা তৈল লঘুতর। অতএব তৈল জলে ভাসিতে থাকে, অর্থাৎ তৈল জলের উপরে উঠে। বায়ুও লঘু হইলে অর্থাৎ উত্তাপ লাগিয়া পাতলা হইলে উপরে উঠে। যদি একটা আলোকের চিমনীর মুখে একখণ্ড সূত্র ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে সূত্র

ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ এই যে, চিমনীর মুখের বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উপরের দিকে উঠে, তাহার ঊর্দ্ধ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সূত্রও উত্থিত হইতে থাকে। এই একই কারণে ধূম ঊর্দ্ধে উঠে। ফানুসের মুখে যতক্ষণ অগ্নির উত্তাপ থাকে ততক্ষণ ঊর্দ্ধে গমন করে, এবং অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, বা অল্প শক্তি সম্পন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ নিম্নে গমন করে।

নানা কারণে পৃথিবীর উপরি ভাগ, স্থানে স্থানে অল্লাধিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। যে স্থান অধিকতর উত্তপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানের সংস্পৃষ্ট বায়ুও উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ত বায়ু চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা তরল ও লঘু বলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। এবং পার্শ্বস্থ শীতল বাতাস আসিয়া উদ্গত বায়ুর স্থান অধিকার করে। সে বায়ুও তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। পুনরায় পার্শ্বের বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে বায়ুর মধ্যে একটা গতি সঞ্চারিত হয়। এই জন্য বায়ু-মণ্ডলে সর্ব্বদা বায়ু প্রবাহ বর্ত্তমান। ভূভাগ যদি সর্ব্বত্র সমতাপ বিশিষ্ট বা সর্ব্বত্র সমান শীতল হইত, তাহা হইলে বায়ুর প্রবাহ কখনই সম্ভবপর হইত না। পৃথিবীর মেরু প্রদেশ শীতল, গ্রীষ্ম মণ্ডল উত্তপ্ত। সূর্য্যোত্তাপে স্থলভাগ শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, জলভাগ তত শীঘ্র হয় না। এইরূপ নানা কারণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমতাপ বিশিষ্ট নহে। অতি প্রাচীন কালে হিসিয়ড বায়ু-প্রবাহের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সূর্য্যোত্তাপের ক্রিয়া বশতঃই যে বায়ু মণ্ডলে প্রবাহ উপস্থিত হয়, তিনিই প্রথমে তাহা স্থির করেন।

বায়ুর গতি সাধারণতঃ অতি অল্প। কলিকাতায় বাৎসরিক গড় পড়তায়, প্রতি ঘণ্টায় ৪ মাইলের অধিক নহে। সাধারণ ঝড় ইত্যাদির গতিও ঘণ্টায় ২০।২৫ মাইলের অধিক হয় না। বায়ু-মণ্ডল কখন্ কোন্ দেশে কি পরিমাণে স্বভাবতঃ শীতল বা উত্তপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। শুধু পৃথিবী সংস্পৃষ্ট বায়ু নহে, ঊর্দ্ধ দেশস্থ বায়ুর তাপ কত; তাহাও অবরুদ্ধ ব্যোমযান বা Captive baloon এ তাপমান যন্ত্র প্রেরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারাই কখন্ কোন্ দেশে বা পৃথিবীর কোন্ স্থানে কিরূপ বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহা স্থির হইয়াছে। দক্ষিণসমুদ্র সমূহে বাণিজ্যের বাতাস বা Trade Winds নামক যে বায়ু নির্দ্দিষ্ট দিকে সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়, তাহার কারণও হইাই। প্রতি দিন সমগ্র জগতে বায়ুর তাপমান ও চাপমান জানিয়া বায়ুর গতির অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে, এবং মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কলিকাতা আলিপুরে "হাওয়া আফিস" বা Meteorological Office এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার সাহায্যে নাবিকগণ, কখন্ ঝড় হওয়া সম্ভব ইত্যাদি জানিতে পারিয়া, নৈসর্গিক বিপৎপাত হইতে সাবধান হয়।

উত্তপ্ত হইলে বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়, বায়ুর এই ধর্ম্ম মানব জীবনে অশেষ কল্যাণ প্রদ। একটি প্রশস্ত মুখ চিমনীর মধ্যস্থলে কতক দূর পর্য্যন্ত একটি কার্ডবোর্ড কোনরূপ আটকাইয়া চিমনীটি দুই ভাগ করিয়া একটি পাত্রে সামান্ত জল রাখিয়া অতঃপর জলের উপর একটি জলন্ত বর্ত্তিকা স্থাপন করতঃ পূর্ব্বোক্ত চিমনী চাপা দিলে দেখা যায় যে, কার্ডবোর্ডের এক পার্শ্ব দিয়া উত্তপ্ত বায়ু নির্গত হইয়া যাইতেছে। অন্য পার্শ্ব দিয়া শীতল বায়ু প্রবেশ করিতেছে। এই দুই ব্যাপার চিমনীর দুই দ্বারে একটি লঘু সূত্র ধরিলে, বেশ দেখা যায়। খড়, বিচালী, উলু প্রভৃতির দ্বারা যে গৃহের ছাদ নির্ম্মিত, সেই ছাদের মধ্যে প্রচুর ফাঁক থাকে। ঘরের ভিতর দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অবস্থান করিলে, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ও শরীরের উত্তাপে ঘরের বাতাস উত্তপ্ত হইয়া উঠে। উত্তপ্ত হইলেই বাতাস উপরের দিকে উঠিয়া, চালের কতকগুলি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং অন্যান্য ছিদ্র দিয়া বাহিরের শীতল ও নির্ম্মল বাতাস গৃহে প্রবেশ করে। ইটের বা পাথরের ঘরে সেরূপ হয় না। সেই জন্ত হাঁসপাতাল বা অন্যান্য জনাকীর্ণ গৃহ মণ্ডলের বায়ু সঞ্চালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কপাট, জানালা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিলেও যথেষ্ট ফাঁক থাকে সুতরাং ঐ ফাঁকের মধ্য দিয়া বায়ু সঞ্চালন হয়। উপরের অংশ দিয়া গরম বাতাস বহির্গত হইতে, এবং নিম্ন দিয়া শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দেখা যায়। ইহা একটি জলন্ত বর্ত্তিকা দ্বারা সপ্রমাণিত হইতে পারে। বর্ত্তিকাটি উপরে ধরিলে উহার শিখা ঘরের বাহিরে দিকে নত হয়, এবং নিম্নে ধরিলে ঐ শিখা ঘরের দিকে নত হয়।

বায়ুর সহিত শব্দের সম্পর্ক কি ?—প্রথমতঃ দেখা যাউক শব্দ কিরূপে উত্থিত হয়। কোন একটি পদার্থ কম্পিত হইলে, শব্দ উত্থিত হয়। সেই কম্পন বায়ু সহযোগে কর্ণে নীত হইলে কর্ণের পটহ কম্পিত হইয়া উঠে। সেই কম্পন-অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে, আমরা শুনিতে পাই। শব্দের বা শব্দজাত কম্পনের এই গতি বায়ুমণ্ডল ব্যতিরেকে কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। পদার্থের অণুসমূহ কম্পিত না হইলে, কিছুতেই শব্দ উত্থিত হইতে পারে না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা রহিয়াছে। এ প্রবন্ধে সে সমস্ত আলোচ্য নহে। এখন দেখা যাউক, এই কম্পন কিরূপে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। শব্দ পরিব্যাপ্ত হইবার জন্য একটা স্থিতিস্থাপক পদার্থ প্রয়োজন। একটা ২০ ফুট লম্বা কাষ্ঠ দণ্ডের এক প্রান্তে একটি ঘড়ি রাখিয়া অন্য প্রান্তে কাণ দিলে ঘড়ির টিকটিক শব্দ বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এ স্থলে ঘড়ির টিকটিক শব্দ জাত কম্পন কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা গৃহিত হইল। কাষ্ঠের অণু সমূহও কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই কম্পন পরিবাহিত হইয়া অবশেষে আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমার কর্ণ পটহ কম্পিত হইল, আমি শব্দ শুনিতে পাইলাম।

এখন সর্ব্বত্র শুনিবার এরূপ কাষ্ঠ-দণ্ড কোথায় পাওয়া যায় ? এস্থলে বায়ুই শব্দ

পরিবাহকের কার্য্য করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু স্থিতি স্থাপক। আমি কথা কহিলাম, আমার জিহ্বা কম্পিত হইল, সেই কম্পন জিহ্বাসংলগ্ন বায়ু গ্রহণ করিল, বায়ু দ্বারা কম্পন পরিচালিত হইয়া শ্রোতার কর্ণ পটহে প্রবেশ করিয়া কম্পন উৎপাদন করিল অর্থাৎ মানুষ শ্রবণ করিল। আমি যেমনই কথা কহিলাম, অমনই আমার জিহ্বা সংস্পৃষ্ট বায়ুর অণু, কম্পনের আঘাতে নিকটবর্ত্তী অণুকে আঘাত করিল এইরূপে আঘাত পরিবাহিত হইল। যখন একটি অণু অন্য অণুটিকে আঘাত করিল তখন অণু দুইটি ঘন হইল, এবং যে স্থান হইতে অণু অপসারিত হইয়া ছিল সেই স্থান বিরল হইয়া উঠিল। কিন্তু বায়ু স্থিতি স্থাপক বলিয়া বায়ুর অণু পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। কাজেই কথা কহিলে বা শব্দ হইলে বায়ু— ঘন, বিরল, ঘন, বিরল ক্রমাগত এইরূপ হইতে থাকে, অথবা বায়ুর মধ্যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, এবং এই তরঙ্গেই শব্দ পরিবাহিত হয়। স্থির নিশ্চল তড়াগের মধ্য স্থলে একটি ঢিল নিক্ষেপ করিলে যেরূপ তড়াগে কম্পন উপস্থিত হয়, সেইরূপ শব্দ করিবা মাত্র বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উত্থাপিত হয়।

নানা প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বায়ু ব্যতিরেকে শব্দ কিছুতেই পরিবাহিত হইত না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে স্থানে বায়ু নাই সে স্থানে শব্দ পরিবাহিত হইবে না। যদি একটি কাঁচ গোলকের অভ্যন্তরে ঘণ্টা সন্নিবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে গোলকের ভিতর যতক্ষণ বায়ু থাকিবে ততক্ষণ বেশ ঘণ্টা ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যদি গোলক হইতে বায়ু নিস্কাশিত করা হয়, তাহা হইলে শব্দ আদৌ শ্রুত হইবে না। শব্দের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ, সমস্তই বায়ুর উপর নির্ভর করে।

আমাদের উত্তাপের প্রধান মূল সূর্য্য। সূর্য্যের উত্তাপ অতি প্রচণ্ড। যদি সূর্য্যোত্তাপ একবারে পৃথিবীতে পতিত হইত তাহা হইলে পৃথিবী এত দিন দগ্ধ হইয়া যাইত। পৃথিবীতে বর্ত্তমানের ন্যায় চেতন পদার্থের অস্তিত্ব একবারেই অসম্ভব হইত। কিন্তু সূর্য্যের এই প্রচণ্ড তেজকে বায়ু মণ্ডল হ্রাস করিয়া দেয়। সূর্য্যের জ্বালাময় কিরণ সমূহ যখন জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু মণ্ডলের * মধ্য দিয়া গমন করে তখন তাহাদের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শোষিত হইয়া যায়। কিন্তু বায়ু নিজে আদৌ উত্তপ্ত হয় না। বায়ু যতক্ষণ উত্তপ্ত পদার্থের সংস্পর্শে না আসে ততক্ষণ কিছুতেই উত্তপ্ত হয় না। পৃথিবীতে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইবা মাত্র পৃথিবী তৎক্ষণাৎ তাহাকে শোষণ করিয়া ফেলে কাজেই উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এই উত্তপ্ত পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া তবে বায়ু উত্তপ্ত হয়, সূর্য্যের রশ্মির তীব্রতা হ্রাস করে বলিয়া বায়ু উত্তপ্ত হয় না। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বায়ু-মণ্ডল আছে কিনা তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে চন্দ্রে বায়ু-মণ্ডল ও জলীয় বাষ্প নাই, সেই জন্য সূর্য্যের উত্তাপরশ্মি চন্দ্রে পতিত হইলে চন্দ্র সমস্ত উত্তাপ শোষণ করিয়া অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠে। সাহারার বায়ু-

* বায়ু-মণ্ডলে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকে।

মণ্ডল অত্যন্ত বিরল ও জলীয় বাষ্পশূন্য, সেই জন্য সূর্য্যরশ্মির প্রাখর্য্য তত নষ্ট হয় না, কাজেই বালুকারাশি অগ্নি-কণার ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই বাষ্প মিশ্রিত বায়ু-মণ্ডল শুধু সূর্য্যরশ্মি গ্রাস করিয়াই বসিয়া থাকে না, পৃথিবী হইতে রজনী যোগে যখন উত্তাপ বিকীরিত হইয়া যায়, তখন একটি পর্দ্দার ন্যায় কার্য্য করে এবং তাপকে বিকীরিত হইতে বাধা প্রদান করে। চন্দ্রের বায়ু-মণ্ডল নাই। চন্দ্রের যখন যে অংশে সূর্য্যের কিরণ পতিত হয় না সেই অংশ হইতে উত্তাপ এত শীঘ্র বিকীরিত হইয়া যায় যে, উহা তুষারের ন্যায় শীতল হইয়া উঠে। শাহারা মরুভূমীতেও রজনীকালে উত্তাপ অতিশয় শীঘ্র বিকীর্ণ হইয়া যায়, কাজেই ঐ নিরক্ষান্তর রেখাস্থিত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রজনীতে শাহারা মরুভূমী অধিকতর শীতল। বায়ু-মণ্ডলের সহিত পৃথিবীর উত্তাপের কি সম্পর্ক তাহা এই কয়েকটি কথা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

আলোক পরিবাহণে বায়ুর সেরূপ কার্য্যকারিতা নাই, কেবল ইথারই আলোক-পরিবাহক। পূর্ব্বে শব্দ কিরূপে বায়ুকে তরঙ্গায়িত করিয়া পরিচালিত হয় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আলোক ঠিক সে ভাবে পরিচালিত হয় না। ইথারেও তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, কিন্তু শব্দ জনিত বায়ু-তরঙ্গ হইতে তাহা বিভিন্ন। মনে করুন একটা নিষ্কম্প পুষ্করিণীতে কতকগুলি ফুল ভাসিতেছে। তন্মধ্যস্থলে যদি একটি প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে সেই প্রস্তর তরঙ্গ উৎপাদন করে এবং সেই তরঙ্গ ধীরে ধীরে তটে উপস্থিত হয়, কিন্তু পুষ্পগুলি এক স্থানেই থাকিয়া ক্রমাগত দুলিতে থাকে, তাহারা তরঙ্গের সহিত কূলে নীত হয় না। সেইরূপ আলোক প্রজ্জলিত হইলে ইথারে তরঙ্গ উৎপাদিত হয় এবং সেই তরঙ্গ দ্বারা আমাদের নয়নের দর্শন স্নায়ু (retina) আঘাত প্রাপ্ত হইলে আমারা আলোকের অস্তিত্ব বুঝিতে পরি।

আধুনিক তার বিহীন তড়িৎ-বার্ত্তা-প্রেরণের মূলেও এই ইথার কম্পন নিহিত রহিয়াছে। যে স্থান হইতে সংবাদ প্রেরিত হইতেছে সেস্থানে ইণ্ডাক্সন কয়েল নামক একটি যন্ত্র থাকে। সেই যন্ত্রে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া ইথারে কম্পন উৎপাদন করে। সেই ইথার তরঙ্গ যে স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইবে তথায় উপস্থিত হইবা মাত্র কোহিয়ারার নামক একটি যন্ত্র কম্পন অনুভব করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা ধ্বনি বা অন্য কোনরূপ শব্দ হয়। প্রত্যেক শব্দের একরূপ অর্থ আছে। সেই অর্থ হইতে সংবাদের মর্ম্ম গৃহীত হইয়া থাকে।

অতএব বায়ু মণ্ডলেই শব্দ, উত্তাপ, আলোক, তড়িৎ ইত্যাদি যাবতীয় শক্তি বিকশিত হয়। বায়ু মণ্ডলই শক্তির আধার ও লীলাস্থল।

আকাশের বর্ণ নীল। এরূপ মনোমুগ্ধকর নীলিমা বোধ হয় আর কুত্রাপি সম্ভবপর নহে। আকাশের এরূপ বর্ণের কারণ কি? আমরা বুঝিয়াছি যে, আকাশে বায়ু আছে। সাধারণতঃ বায়ুর কোন বর্ণ নাই। তবে এ বর্ণ কোথা হইতে আইসে?

বায়ু-মণ্ডলে যে সমস্ত পদার্থ কণা উড়িয়া বেড়াইতেছে তাহা হইতে আলোক চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হয় বলিয়া আমরা পদার্থাদি দেখিতে পাই। যদি আকাশে সেরূপ কোন পদার্থ না থাকে তাহা হইলে আকাশ কিছুতেই আলোকিত হইতে পারে না। বস্তুতঃই আকাশ অন্ধকারময়। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া পণ্ডিতগণ তাহাই স্থির করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে বায়ু একত্রীভূত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া এরূপ নীল দেখায়। জল স্বচ্ছ, কিন্তু এক চৌবাচ্চা জল নীল। এস্থলেও জল একত্রীভূত বলিয়া নীল দেখায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, সমুদ্রের ও আকাশের বর্ণ বস্তুগত নহে। সূর্য্য কিরণ শ্বেত, ইহাতে সাতটি বর্ণ রহিয়াছে। ঘনীভূত বায়ুস্তরে সূর্য্যালোক পতিত হইলে তাহার নীল বর্ণ টুকু মাত্র প্রতিফলিত হয়, কাজেই আমরা নীল দেখি। নতুবা জল বা বায়ুর কোন বর্ণ নাই। এই অভিমতই অনেকটা সত্য, কেননা বায়ু বা জলের কোন বর্ণ থাকিলে নিশ্চয়ই এক ঘর বাতাস বা এক গ্লাস জলও নীল দেখাইত। আমাদের প্রাচীন বৈশেষিক দর্শনে এ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা রহিযাছে।

আমরা প্রভাতের পূর্ব্বের সময়কে উষা এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত কালকে গোধূলি বলি। উষার সংজ্ঞা এইরূপ ঃ—সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মধুর স্নিগ্ধ অন্ধকার বিমিশ্র যে আলোক তাহাই উষার আলোক। যে সময়ে এইরূপ আলোক উদিত হয় তাহাই উষা। গোধূলিও সূর্য্য অস্ত যাইবার পরে উদিত হয়। ইহাও মধুর স্নিগ্ধ অন্ধকার বিমিশ্র আলোক। আলোকের হেতু অদৃশ্য অথচ আলোক কেন দেখিতে পাওয়া যায়?

যদি এক চৌবাচ্চা জলে একটি লাঠি নিমজ্জিত করা হয়, তাহা হইলে মনে হয় যেন লাঠিটা মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেন এরূপ মনে হয়? বায়ু ও জল বিভিন্ন রূপ ঘন পদার্থ। যখন একরূপ ঘন পদার্থ বাহিয়া আলোক আসিতে আসিতে অন্যরূপ ঘন পদার্থ দিয়া বাহিত হয়, তখন আলোক বক্রীভূত হয়। লাঠি নিঃসৃত আলোক জল পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঘন পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া বাতাসে অর্থাৎ অল্পতর ঘন পদার্থে প্রবেশ করিল, অমনই আলোক বক্রীভূত হইল, আমরাও লাঠিটিকে আর সোজা দেখিলাম না—বক্র দেখিলাম। যদি জলের উপরিভাগে একটি লম্ব টানা যায়, তাহা হইলে আলোক ঘন পদার্থ অর্থাৎ জল হইতে অল্পতর ঘন পদার্থে অর্থাৎ বায়ুতে প্রবেশ করিবায় সময় লম্ব হইতে দূরে অপসারিত হয়। অর্থাৎ যে পদার্থ ঘন সেই পদার্থেই আলোক অধিক বক্র হয়। অল্প ঘন পদার্থ হইতে অধিকতর ঘন পদার্থে প্রবেশ করিলে আলোকের গতি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হয়। গতির এই খর্ব্বতার জন্যই আলোক বক্রীভূত হইয়া উঠে।

যেস্থানে বায়ু নাই সে স্থানে আলোকের গতি যত ক্ষীপ্র, যে স্থানে বায়ু আছে, সে

স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্পতর। সূর্য্য উদিত হইবার উপক্রম করিতেছে, এখনও দিগন্তের নিম্নে অবস্থান করিতেছে। সূর্য্য তখনও নিম্নে বলিয়া উর্দ্ধ দিকে আলোক রশ্মি প্রবাহিত হইল এবং বায়ু মণ্ডলের উপরি ভাগের বায়ু স্পর্শ করিল। উপরিভাগের বায়ু তরল, তাহার নিম্নবর্ত্তী বায়ু তাহা অপেক্ষা ঘন। আলোক রশ্মি পাতলা বায়ু স্তর হইতে যেমনই ঘন বায়ু স্তরে প্রবেশ করিল অমনই বক্র হইল। এইরূপে ক্রমশঃ আরও অধিকতর বক্র হইয়া অবশেষে পার্থিব পদার্থে পতিত হইল, সেখান হইতে আলোক ছড়াইয়া পড়িল, আমরা পদার্থ দেখিতে পাইলাম। আলোকও অন্ধকার বিমিশ্র মধুর হইয়া উঠিল। গোধুলিতেও ঠিক এইরূপ ব্যাপারই সংঘটিত হয়।

বায়ু মণ্ডলের বায়ু স্তরের ঘনত্বের বিভিন্নতার জন্য সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্য যে স্থানে প্রকৃত বর্ত্তমান থাকে, সে স্থানে দৃষ্ট হয় না, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। মৃগতৃষ্ণিকা কি? মরুভূমির প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে দিক্ সমূহ অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত হইলে পথিক তৃষ্ণায় যখন আকুল হইয়া উঠে, সেই সময়ে তাহার মনে হয় যেন অতি অল্প দূরে স্বচ্ছ সলিল পূর্ণ তড়াগ রহিয়াছে। উদ্ভ্রান্ত প্রলুব্ধ পথিক সেইদিকে সামান্য অগ্রসর হইলেই তড়াগ অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রকৃতির এই নিদারুণ উপহাসই মৃগতৃষ্ণিকা। এরূপ হইবার কারণ কি?

সূর্য্য কিরণে মরুভূমীর বালুকা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে, সন্নিহিত বায়ু-মণ্ডলকে উত্তপ্ত করিয়া তুলে, বায়ু উত্তপ্ত হইয়াই পাতলা হইয়া পড়ে। কাজেই বায়ুর সাধারণ যে ঘনত্ব তাহা নষ্ট হয়। বায়ু এইরূপে উর্দ্ধ দেশে কতক দূর পর্য্যন্ত উত্তপ্ত ও পাতলা হইয়া উঠে। আলোক এইরূপ পাতলা ও ঘন বায়ুস্তর দিয়া ক্রমাগত পরিবাহিত হইয়া ক্রমাগত বক্র হইতে থাকে। এইরূপে দূর স্থিত পদার্থ সমূহ মনে হয় উল্টাইয়া রহিয়াছে।

ঠিক এই কারণেই উত্তর সমুদ্রের অর্ণবপোতের লোক সমূহ দেখিতে পায় যেন আকাশে হিমশীলা, বন্দর বা তৎসন্নিহিত জাহাজ সমূহ শূন্যমার্গে উল্টাইয়া রহিয়াছে।

বায়ু-মণ্ডলের বা আকাশের সীমা নাই—বাস্তবিকই অনন্ত। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে সুদূর নক্ষত্র মণ্ডলেও আমাদের বায়ুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। তবে আমরা যে বায়ু উপভোগ করি তাহার একটা সীমা রহিয়াছে; পণ্ডিতগণ প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন যে এই বায়বীয় পদার্থ উর্দ্ধদেশে মাত্র ৪৫ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে; কিন্তু পরবর্ত্তী প্রমাণ সমূহে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বস্তুতঃ ইহার উচ্চতা ১২০ মাইল অপেক্ষা অল্পতর হইতে পারে না।

বায়ু-মণ্ডলের অনেক উচ্চ প্রদেশ পর্য্যন্ত ধুলী রাশি উদগত হয়। পণ্ডিতগণের

মতে এই ধূলীর জন্য আকাশের মেঘ উৎপত্তি সম্ভবপর হইয়াছে। কেননা সূর্য্যদেব সহস্র কিরণে বাষ্প উৎপাদন করিলেন। বাষ্প উত্তপ্ত ও লঘু বলিয়া তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকিল কিন্তু এই বাষ্প ঊর্দ্ধ দেশের শীতলতার সংস্পর্শে আসিবা-মাত্র জমিয়া জল বিন্দুতে পরিণত হইল। এই জল বিন্দু বায়ু বিন্দু অপেক্ষা ভারী কাজেই ইহার পতিত হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু ধূলী-কণার উপরে জল-কণা বিশ্রাম প্রাপ্ত হইল। ধূলী-কণাও নিম্নে অবতরণ করিত বটে কিন্তু তাহার বিস্তার অধিক। বিস্তার অধিক বলিয়া বায়ু-মণ্ডল তাহার অবতরণে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিল। কাজেই সহসা অবতীর্ণ হইতে পারিল না। এইরূপে বিন্দু বিন্দু বারি একত্রিত হইয়া প্রবল মেঘ সৃষ্টি হইল। তৎপরে বৃষ্টি সমেত ধূলী বিধৌত হইয়া যাইল। এই জন্যই একবার বৃষ্টির পর আকাশের সুনির্ম্মল নীল বর্ণে নয়ন স্নিগ্ধ হইয়া উঠে।

অনেকেই ঘূর্ণী বায়ু দেখিয়াছেন ঃ—ইহার উৎপত্তির কারণ কি? একটা রবারের বল দেওয়ালে ছুঁড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করে। অর্থাৎ রবার স্থিতিস্থাপক বলিয়া আঘাত পাইবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে বিপরীত দিকে গতি প্রাপ্ত হয়। বায়ুও স্থিতিস্থাপক। বায়ু প্রবাহিত হইতে হইতে পথে বাধা পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু যে মুখে বায়ু পূর্ব্বে প্রবাহিত হইতেছিল আহত বায়ুর পশ্চাতেও সেই অভিমুখী বায়ু আসিতেছে, এই দুই বিভিন্নমুখী বায়ু পরস্পর আহত হইয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। তাহাই ঘূর্ণী বায়ু। এতদ্ব্যতীত নানা কারণে এক স্থান হঠাৎ বায়ু শূন্য হইয়া উঠে। স্থানটি বায়ু শূন্য হইয়া উঠিলেই অমনই চারি পার্শ্বের বাতাস দ্রুত আসিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে। এই কারণেও ঘূর্ণী বায়ু উৎপন্ন হয়। এই ঘূর্ণী বায়ু অল্প পরিসর স্থানে হইলে স্তম্ভাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠে; আমরা ইহাকে ভূতের হাওয়া বলি। সাধু-ভাষায় ধূলীধ্বজ কহে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্ম কালেই ইহা অধিক হইয়া থাকে। যে বায়ুতে ধূলীধ্বজ উৎপন্ন হয় তাহাই সমুদ্রে প্রবাহিত হইলে ঊর্দ্ধে জলাকর্ষণ করিয়া জলস্তম্ভ উৎপাদন করে। সমুদ্রে জলস্তম্ভ উৎপাদিত হইবার সময় আকাশ প্রায়ই মেঘাবৃত থাকে। ঘূর্ণী বায়ুর বেগে জল স্তম্ভাকারে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং মেঘ স্তম্ভাকারে নিম্নে অবতরণ করিয়া মিলিত হয়।

উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে বায়ু-মণ্ডলে সময়ে সময়ে মেরুছটা নামক এক প্রকার আলোক উৎপাদিত হইয়া থাকে। আমরা বায়ু-মণ্ডলেই রামধনু দেখিয়া থাকি। রাম ধনুর কি শোভা তাহা অনেকেই উপভোগ করিয়াছেন। মেরুছটারও সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। সমস্ত মেরু প্রদেশে প্রকৃতি দেবী যেন একটি বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট আলোকময় চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়া দেন। এই সমস্ত প্রাণোন্মদ ছবি, বিশ্ব-নিয়ন্তার এইরূপ মধুর লিপি চাতুর্য্য, প্রকৃতির এই সকল মনোরম আলেখ্য দর্শনে হৃদয় যুগপৎ আনন্দ ও ভক্তিতে স্বতঃই আপ্লুত হইয়া পড়ে। •

অধুনাতন পণ্ডিতগণ ঘূর্ণীবায়ু, জলস্তম্ভ ও মেরুছটার অন্যতম কারণ তড়িৎ বলিয়া মনে করেন। ঘূর্ণীবায়ুর শক্তি অপরিমেয়। বাঙ্গালা ১২৪৪ অব্দে এই প্রকার ঘূর্ণী বায়ু ধাপা বেলিয়াঘাটা হইতে আরম্ভ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ দেশস্থ বেনিয়াপুকুর পর্য্যন্ত প্রায় আট ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয়, এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ-পোয়ার মধ্যে ঘর দ্বার বৃক্ষ প্রভৃতি যে কোন বস্তু ছিল, তৎসমূহের সমূলে উত্তোলন ও ধ্বংশ সাধন করে। সেই বায়ু কর্ত্তৃক প্রিন্‌সেপ সাহেবের লবণ কুঠি হইতে কয়েকটা কুড়ি মণের অধিক ভারি লৌহ কটাহ উড়িয়া গিয়াছিল এবং ইষ্টক নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া দুই তিন শত হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। একবার ঘূর্ণী বায়ুতে নলহাটী ষ্টেশনের অদূরে একখানি মাল গাড়ী রেল লাইন হইতে উত্তোলিত হইয়া বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই ঘূর্ণীবায়ুর মণ্ডল শতাধিক ক্রোশ পরিসর ব্যাপী হইলে প্রকৃত ঝড় বলা হয়। ফলতঃ ঝড় মাত্রেই ঘূর্ণী বায়ু, কেননা ঝড়ে বায়ু সদাই এলো মেলো বহিয়া থাকে।

বায়ুর প্রকৃতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইল। এক্ষণে প্রাচীনগণের বায়ু-মণ্ডল সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অতি প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণও বায়ু মণ্ডল স্থিত নানাবিধ নৈসর্গিক ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ হিরো, আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর পণ্ডিত টীবিয়াস, প্রভৃতি আরও বহুশত পণ্ডিত বায়ুর প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলীর উপরেই বায়ু বিজ্ঞান (science of pnemuatics) স্থাপিত করেন। আনাক্‌সিমিনিস্ যাবতীয় সৃষ্টির আদি বায়ু বলিয়া মনে করিতেন। আরিষ্টোটলের মতে ইহা একটি মৌলিক পদার্থ ছিল।

বেদান্ত মতে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। যখন ভগবান্ চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে আত্মা হইতে আকাশের, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। ইহার দুইটি গুণ শব্দ ও স্পর্শ।

যে দ্রব্যের রূপ নাই, স্পর্শ আছে, তাহার নাম বায়ু। পৃথিবী, জল ও তেজো-দ্রব্যে রূপ আছে এবং আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই। এই জন্য উহারা বায়ু নহে।

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের অবশ্যই একটি অধিকরণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির জন্য বায়ুর অপেক্ষা থাকিলেও বায়ু শব্দের আশ্রয় নহে। কারণ বায়ুর একটি বিশেষ গুণ স্পর্শ। এই স্পর্শ যাবৎ দ্রব্যভাবী। শব্দ কিন্তু সেরূপ নহে। বায়ু থাকিলেও শব্দ নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শের সহিত। এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ হইলে স্পর্শের ন্যায় উহাও দ্রব্যভাবী হইত।

শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক সূত্রের উপস্কারে লিখিয়াছেন যে দণ্ডাভিঘাতে ভেরীস্থ যে শব্দ

সমুদ্ভূত হয় উহার সেই শব্দসন্তান, বায়ুর লক্ষণ। আকাশে তৃণ তুলাদি বিধৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, উহাও বায়ুর অস্তিত্বের পরিচায়ক। বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কম্পনও একটি লক্ষণ।

সততমসৌ বাতি গচ্ছতি। এতদ্দ্বারা বুঝাইতেছে যে যাহা সতত গতিশীল, তাহাই বায়ু নামে অভিহিত। উপনিষদে সৃষ্টির বিষয় সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে। অনন্ত পরমাত্মা হইতে মূর্ত্তিমান পদার্থের অবকাশ স্বরূপ, সর্ব্ব রূপের নির্ব্বাহক, শব্দ গুণ পূর্ণ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আকাশ হইতেই বায়ুর উৎপত্তি। যেখানে ক্রিয়া সেইখানেই গতি (motion) আছে। কারণ ক্রিয়ার শব্দ হেতু কম্পন (vibration) উৎপন্ন হইয়া থাকে। কম্পনের প্রতিরূপই গতি। গতি হেতু স্পর্শ। অনন্ত ও অব্যক্ত পদার্থ সক্রিয় হইয়াও শব্দ ও স্পর্শ পূর্ণ। যেখানে আকাশ (space) আছে, সেই খানেই জ্ঞান-সত্তার ক্রিয়া জনিত শব্দ ও স্পর্শ আছে। এইরূপ সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ বায়ু সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা করিয়া ছিলেন।

প্রথমে লোক বলিত সমুদ্রের সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে বুঝিল পৃথিবীর সীমা আছে, কাজেই সমুদ্রেরও সীমা রহিয়াছে। বায়ু-মণ্ডল সমুদ্রের ন্যায় সসীম নহে, অনন্ত। কাজেই প্রতীয়মান অনন্ত সমুদ্রের সহিত তুলনায় বায়ু-মণ্ডল আরও কিছু অধিকতর। এই অনন্তের তলভাগে জীব মণ্ডলী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর উপরিভাগে উদ্ভিদ ও জীবের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বায়ু-মণ্ডল আলোক এবং উত্তাপের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া আসিতেছে। প্রশ্বাস দ্বারা দূরীকৃত বায়ু-বাহিত যাবতীয় মৃত জান্তব পদার্থ বায়ুতে প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হইয়া পরস্পরের জীবন রক্ষা কল্পে সহায়তা করিতেছে। বায়ু-মণ্ডল জগদীশ্বরের একটি প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান-আগার বা Laboratory। ইহাতে কত পদার্থ পরিশোধিত হইতেছে, কত পদার্থ অন্য পদার্থের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইয়া সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিতেছে। কত পদার্থ মিলিত হইয়া জগদীশ্বরের সৃষ্টি মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতেছে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জল ভাগকে সূর্য্য প্রচণ্ড কিরণ জালে বাষ্পীভূত করিতেছেন, বায়ু-মণ্ডল সেই বাষ্প বক্ষে ধারণ করিয়া পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পাতিত করিয়া সৃষ্টি রক্ষা কল্পে অতুলনীয় সহায়তা করিতেছে। এই যন্ত্রাগারে কত স্ফোটন শীল পদার্থ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যদি বায়ু মণ্ডলের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় তাহা হইলে পৃথিবী মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবিত পদার্থ-শূন্য হইয়া পড়িবে।

আমরা কথা কহি, কিন্তু যদি বায়ু মণ্ডল না থাকিত, তাহা হইলে Human voice devine থাকিত না, কেহ কাহারও স্বর শুনিতে পাইত না! কেবল বিভৎস নীরবতা রাজত্ব করিত। সঙ্গীতের মধুরালাপ, পাপিয়া মনোমোহন ঝঙ্কার, তটিনীর কল কল ধ্বনি ইহাদের কোন অস্তিত্ব থাকিত না। পুষ্পের মধুর সৌরভ বহন করে বলিয়াই

বায়ু গন্ধবহ। বায়ু মণ্ডলে আলোক কিরণ জাত কতশত অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্ট হয়। যদি বায়ু মণ্ডল না থাকিত, তাহা হইলে আমরা সূর্য্য দেখিতাম, ইহার উজ্জ্বল আলোকে চক্ষুর দীপ্তি চিরতরে নির্ব্বাপিত হইত, আলোক বিকীর্ণতা বশতঃ তীব্রতাশূন্য হইয়া নয়নানন্দকর হইত না। বস্তুতঃ পৃথিবীতে বায়ুর অনন্ত আবরণ জগদীশ্বরের করুণার অনন্ত নিদর্শন।

অদ্য বায়ুর এক অংশ মাত্র প্রদর্শিত হইল। ইহা অপেক্ষাও অতি প্রয়োজনীয় অংশ অবশিষ্ট রহিল। বায়ুর উপাদান সমূহ ও জীবিত পদার্থের সহিত ইহাদের কি সম্পর্ক তাহাই এ প্রবন্ধে অবশিষ্ট রহিয়াছে। কেননা এত বড় বিষয় একটি প্রবন্ধে একবারে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। ভবিষ্যতে এই সমস্ত আলোচিত হইবে।

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

ভারতে সোরার কারখানা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিশুদ্ধ সোরা প্রস্তুত প্রণালী।

আমার বিশ্বাস, নুনিয়াগণ যে অপরিষ্কৃত সোরা উৎপাদন করে, তাহার সমস্ত অংশই তাহারা সোরা সংশোধকগণকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। সোরা পরিষ্কৃত বা বিশুদ্ধ করিবার অনেক প্রণালী রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান তাহাই বর্ণিত হইতেছে। গত প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট দ্রাবণ * উত্তাপ প্রয়োগে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে এই অপরিষ্কৃত সোরা ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই দ্রাবণ সাধারণ লবণ এবং সোডিয়াম সালফেটে (sodium sulphate) সম্পূর্ণ অনুসিক্ত † হইয়া থাকে বটে, তথাপি

---

* গত প্রক্রিয়া অবশিষ্ট দ্রাবণ—ইংরাজীতে ইহাকে Mother liquor বলে। যে দ্রাবণে অপরিষ্কৃত সোরা দ্রবীভূত করিয়া পরিষ্কৃত সোরা বাহির করা হয়, সেই দ্রাবণ নষ্ট করা হয় না। পরবর্ত্তী বারে সোরা পরিষ্কৃত করিবার সময় এই দ্রাবণেই পুনরায় অপরিষ্কৃত সোরা দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রাবণই—"Mother liquor"।

† অনুসিক্ত দ্রাবণ—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজিতে ইহাকে Saturated Solution কহে। অনুসিক্ত দ্রাবণের অবস্থা এইরূপ :—মনে করুন /১ সের জল লওয়া হইল, এই /১ সের জলে /১ সের সাধারণ লবণ দ্রবীভূত হইতে পারে। কিন্তু যদি আমি /১।০ সের এমন কি /১ সেরের অতি সামান্য অধিকতর লবণও /১ সের জলে ঢালিয়া দিই, তাহা হইলেও /১ সেরের অধিকতর এই সামান্য লবণ কিছুতেই উক্ত পরিমাণ জলে দ্রবীভূত হইবে না। আলোচ্য প্রবন্ধেও যে mother-liquor এর কথা বলা হইতেছে, তাহাতে পূর্ব্ব প্রক্রিয়ার সাধারণ লবণ ও সোডিয়াম সালফেট প্রচুর দ্রবীভূত হওয়ায় সম্পূর্ণ অনুসিক্ত হইয়া রহিয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান প্রক্রিয়ায় এই mother-liquor সাধারণ লবণ বা সোডিয়াম সালফেট আর দ্রবীভূত করিতে পারে না।

এই দ্রাবণে সোরা যথেষ্ট পরিমাণে এবং পোটাসিয়াম ক্লোরাইড (potassium chloride) অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। এই শেষোক্ত লবণ অর্থাৎ পোটাসিয়াম ক্লোরাইড যদিও পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বিশ্লেষণ তালিকায় উল্লেখিত হয় নাই. তথাপি ইহা প্রায়ই সোরায় মিশ্রিত থাকে।

কাজেই গত প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট দ্রাবণে অপরিষ্কৃত বা মিশ্রিত সোরা ঢালিয়া দিলে, সোরা এবং যদি অন্যান্য নাইট্রেট সোরায় মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সেই সমস্ত নাইট্রেট এবং সামান্য পরিমাণে পোটাসিয়াম ক্লোরাইড বিগলিত হয়, সাধারণ লবণ, সোডিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য ময়লা দ্রবীভূত না হইয়া পড়িয়া থাকে। অতঃপর অগ্নি অপসারিত করা হয়। সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থ অতি শীঘ্র স্থিতাইয়া যায়। উত্তপ্ত পরিষ্কৃত দ্রাবণ কাষ্ঠের বড় বড় পাত্রে গড়াইয়া লওয়া হয়। এই কাষ্ঠ পাত্রে দ্রাবণ শীতল হইতে থাকে এবং দ্রাবণ যতই শীত হইতে থাকে, ততই সোরা দানা বাঁধিয়া অধঃস্থ হয়। যে পাত্রে উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া সোরা দ্রবীভূত করা হইয়াছিল, তাহাতে যে সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থ পড়িয়া থাকে. তাহাকে "সিটা" বলে। তাহাদিগকে অন্যরূপে ব্যবহার করা হয়। কাষ্ঠের পাত্রস্থ দ্রাবণ যথেষ্ট শীতল হইলে দানা বাঁধা সোরা অর্থাৎ সংশোধিত সোরা, দ্রাবণ ঢালিয়া ফেলিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। সময়ে সময়ে সামান্য জল দিয়া এই সোরার দানা গুলিকে ধুইয়া ফেলা হয়। এই সোরাই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। সোরা নির্ম্মুক্ত এই দ্রাবণ অর্থাৎ Mother liquor পরবর্ত্তী বারে আনীত অপরিষ্কৃত সোরা দ্রবীভূত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উপরে মোটামুটী রূপে সোরা সংশোধন প্রণালী বর্ণিত হইল। কিন্তু এই কার্য্যে যে যে প্রথা অবলম্বিত হয়, তাহার সমস্ত গুলিই বর্ণিত হইল না, বা যে বিষয় গুলি বাস্তবিকই অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক সেগুলিরও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল না। উদাহরণ স্বরূপ মাদার লিকারের কথা বলা যাইতে পারে। কার্য্যকালে দেখা যায় যে এই রক্ষিত দ্রাবণকে মাত্র কয়েক বার ব্যতীত উপর্য্যুপরি চিরকাল ব্যবহার করা যাইতে পারে না। এই মাদার লিকারকে বাষ্পীভূত করিবার সময় মধ্যবর্ত্তী কোন এক অবস্থায় সাধারণ লবণ অধঃস্থ হয়। "সিটা"তেও যথেষ্ট সোরা থাকে বলিয়া ইহাকে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করিতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিতে হইলে যে মাটীতে সোরা মিশ্রিত থাকে, তাহা হইতে আরম্ভ করাই সুবিধাজনক। প্রত্যেক সোরা পরিষ্কৃত করিবার কারখানায় এই মাটী প্রচুর স্তূপাকার [illegible] থাকে। এই সোরা মিশ্রিত মাটীর স্তূপ "সিটার" দ্বারা প্রস্তুত হয়। "সিটা" কি ?—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উত্তপ্ত দ্রাবণে অপরিষ্কৃত সোরার যে অদ্রবণীয় অংশ পড়িয়া থাকে, তাহাই সিটা। ইহাতে মৃত্তিকা ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে সাধারণ

লবণ সোডিয়াম সালফেট এবং সোরা মিশ্রিত থাকে। সাধারণতঃ এরূপ অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে, সোরা মাটীতে উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমানে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার প্রয়োজন নাই। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই মৃত্তিকা প্রত্যেক সোরা সংশোধিত করিবার কারখানায় একটা প্রয়োজনীয় উপাদান। এই সোরা মিশ্রিত মৃত্তিকা হইতে নুনিয়াগণ যে উপায়ে সোরা নির্মুক্ত করে, এই সোরা-সংশোধকগণও সেই উপায়ে অর্থাৎ মাটী "কুঁড়িয়া'র মধ্যে স্থাপন করিয়া সোরা নির্মুক্ত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার সহিত খানিকটা কাঠের ভস্ম মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, ইহার কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, (পৃষ্ঠা ৩৪৪), এবং শীতল জল এই সোরা মিশ্রিত মাটী ও ভস্মের মিশ্রণের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া আনিলে, সোরার ঘন দ্রাবণ বাহির হইয়া আইসে, এবং ইহাকে বাষ্পীভূত করা হয়। এতদ্ব্যতীত সোরার ক্ষীণ দ্রাবণও বাহির হয় এবং আর্দ্র মৃত্তিকা অবশিষ্ট থাকে। এই আর্দ্র মৃত্তিকাকে খনন করিয়া লওয়া হয়, কেননা ইহাতেও অনেক সোরা বর্ত্তমান থাকে। নুনিয়াগণের কুঁড়িয়া ও সোরা সংশোধিত করিবার কারখানায় কুঁড়িয়া সর্ব্বতোভাবে সমান, কেবল শেষোক্ত কুঁড়িয়া-গুলি ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, এবং কিঞ্চিৎ বৃহত্তর।

কুঁড়িয়া হইতে যে প্রথম ঘন দ্রাবণ নিঃসৃত হয় তাহার বিশ্লেষণ তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

উপাদান	পুসা শতকরা	বরহানপুরা শতকরা	সাভান শতকরা	বুক্রামাউ শতকরা
সোরা	১৫·২১	২৪·৮২	১৫·৩৩	৭·১৭
পোটাসিয়াম ক্লোরাইড (potassium chloride)	৩·৬৯	·৪৬	২·২১	২·৬১
সাধারণ লবণ	১৫·৪৬	২৫·৮৯	১৫·৩৭	১৯·৮৯
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (calcium chloride)	...	...	·৩৩	·৮৯
ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড (magnesium chloride)	১·৬৪	১·৯৯	১·৮৪	...
ক্যালসিয়াম সালফেট (calcium sulphate)	·৮৮	·৪১	·৭৫	...
ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট (magnesium sulphate)	·১৭	·৫১	...	·৫৯

সোরা সংশোধকগণের কুঁড়িয়া হইতে প্রথম যে ঘন দ্রাবণ নিঃসৃত হইয়া আইসে তাহাকে দুই বিভিন্ন প্রথার প্রয়োগ করা হয়। প্রথমতঃ একটি লৌহ কটাহে ইহাকে জাল দেওয়া হয়, এবং জল বাষ্পীভূত হইয়া যাইলে, সাধারণ লবণ অধঃস্থ হইয়া পড়ে। এই লবণ বাহির করিয়া লওয়া হয়। অতঃপর সোরা বিগলিত যে

৩য় চিত্র।

কুঠিয়ায় দ্রাবণ বাষ্পীভূত করা হইতেছে

দ্রাবণ থাকে, তাহাকে বড় বড় কাঁঠ বা মাটীর পাত্রে শীতল করা হয়। শীতল করিলেই সোরা দানা বাঁধিয়া যায়। এই সংশোধিত সোরার নাম—"কুঠিয়া সোরা"। ইহাও অতি বিশুদ্ধ নহে। নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ তালিকা হইতে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে :—

	বরহানপুরা শতকরা	সাভান শতকরা
সোরা (ভারতীয়) অর্থাৎ পোটাসিয়াম নাইট্রেট (potassium nitrate)	৬৫.২১	৫০.৯৫
সোরা (চিলি দেশীয় অর্থাৎ সোডিয়াম নাইট্রেট (sodium nitrate)	৭.৭৪	
পোটাসিয়াম সালফেট (potassium sulphate		১.৬৮
সোডিয়াম সালফেট (sodium sulphate)	৬১	...
পোটাসিয়াম ক্লোরাইড (potassium chloride		১৯.৮১
সাধারণ লবণ (sodium chloride)	২২.৯২	২০.৯৫

সোরা সংশোধিত করিবার যে সমস্ত কারখানায় "গুঁড়ি গুলাই" প্রণালী প্রচলিত আছে, তথায় প্রায় ১০ ফিট ব্যাস বিশিষ্ট একটি পাত্রে "কুঁড়িয়া" হইতে এই ঘন দ্রাবণ রক্ষা করিয়া গত বারের প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট সিটা সংযোগে উত্তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই উত্তপ্ত দ্রাবণ সিটা হইতে সোরা এবং সাধারণ লবণ ইত্যাদি বিগলিত করিয়া ফেলে। পরিস্কৃত উত্তপ্ত এই তরল পদার্থকে কর্দ্দম ইত্যাদি হইতে পৃথক করিয়া ফেলা হয়, এবং এই কর্দ্দমকে কারখানার সোরা সংশ্লিষ্ট মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কেননা যত সাবধানতার সহিতই এই কাদাকে দ্রাবণ হইতে পৃথক করা হউক না কেন, কাদার সহিত খানিকটা দ্রাবণ থাকিয়া যাইবেই, কাজেই কাদাতেও খানিকটা সোরা থাকিয়া যায়।

এই পরিস্কৃত দ্রাবণকে জ্বাল দেওয়া হয় (৩য় এবং ৪র্থ চিত্র)। এই দ্রাবণ আদৌ অত্যাসক্ত নহে। বস্তুতঃ প্রায় বার আনা রকম জল বাষ্পীভূত না করিয়া ফেলিলে যে তাপমাত্রায় দ্রাবণ ফুটিতে থাকে, সে তাপমাত্রায় সোরা দানা বাঁধে না। কিন্তু সাধারণ লবণের বিষয় অন্যরূপ। এই লবণে এই দ্রাবণ প্রায় অত্যাসক্ত থাকে। কাজেই জল বাষ্পীভূত করিলেই, সাধারণ লবণ অধঃস্থ হইয়া পড়ে। এবং প্রথমোক্ত প্রণালী অনুযায়ী ঐই অধঃস্থ লবণকে হাতা দ্বারা তুলিয়া লওয়া হয়।

সাধারণ লবণ হাতা দ্বারা বাহির করিয়া আনিলে, যে উত্তপ্ত দ্রাবণ অবশিষ্ট থাকে তাহাতে, সোরা দানা বাঁধিবার জন্য যে সমস্ত পিপায় দ্রাবণ ঢালিয়া রাখা হয় সেই দ্রাবণের অল্প পরিমাণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই মিশ্রিত দ্রাবণ অধিক উত্তাপে প্রচুর পরিমাণে সোরা দ্রবীভূত করিতে পারে। ইহাতেই অপরিস্কৃত সোরা ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই মিশ্রিত দ্রাবণকে কয়েক মিনিট ধরিয়া ফুটান হয় এবং পরে পাত্রের নিম্ন হইতে অগ্নি অপসারিত করা হয়। এই দ্রাবণে যে সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থ থাকে, তাহারা ক্রমশ থিতাইয়া যায়। এই সমস্ত অদ্রবণীয় পদার্থে সাধারণতঃ লবণ এবং মাটী মিশ্রিত থাকে। এই অদ্রবণীয় পদার্থ থিতাইয়া পড়িলে এই উত্তপ্ত দ্রাবণ কাষ্ঠের পিপায় গড়াইয়া লওয়া হয়। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৪র্থ চিত্র।

কুঠিথায় দ্রাবণ বাষ্পীভূত করা হইতেছে।

এই কাষ্ঠ পাত্রগুলি সাধারণতঃ আয়তক্ষেত্র, সময়ে সময়ে সমচতুর্ভুজও হইয়া থাকে। ইহাদের আয়তন পরিমাণ কখনও ৭ ফিট × ৫ ফিট বা ৬ ফিট × ৬ ফিট ও গভীর ২ ফিট। কখনও কখনও এই পাত্রগুলি কাঠের টবের ন্যায় (৫ চিত্র) হইয়া থাকে এই সমস্ত পাত্রস্থিত দ্রাবণ যতই শীতল হইতে থাকে, ততই লবণ সমূহ দানা বাঁধিয়া যায়। এই সমস্ত লবণের মধ্যে অবশ্য সোরাই প্রধান, অতি অল্প পরিমাণে সাধারণ

৫ম চিত্র।
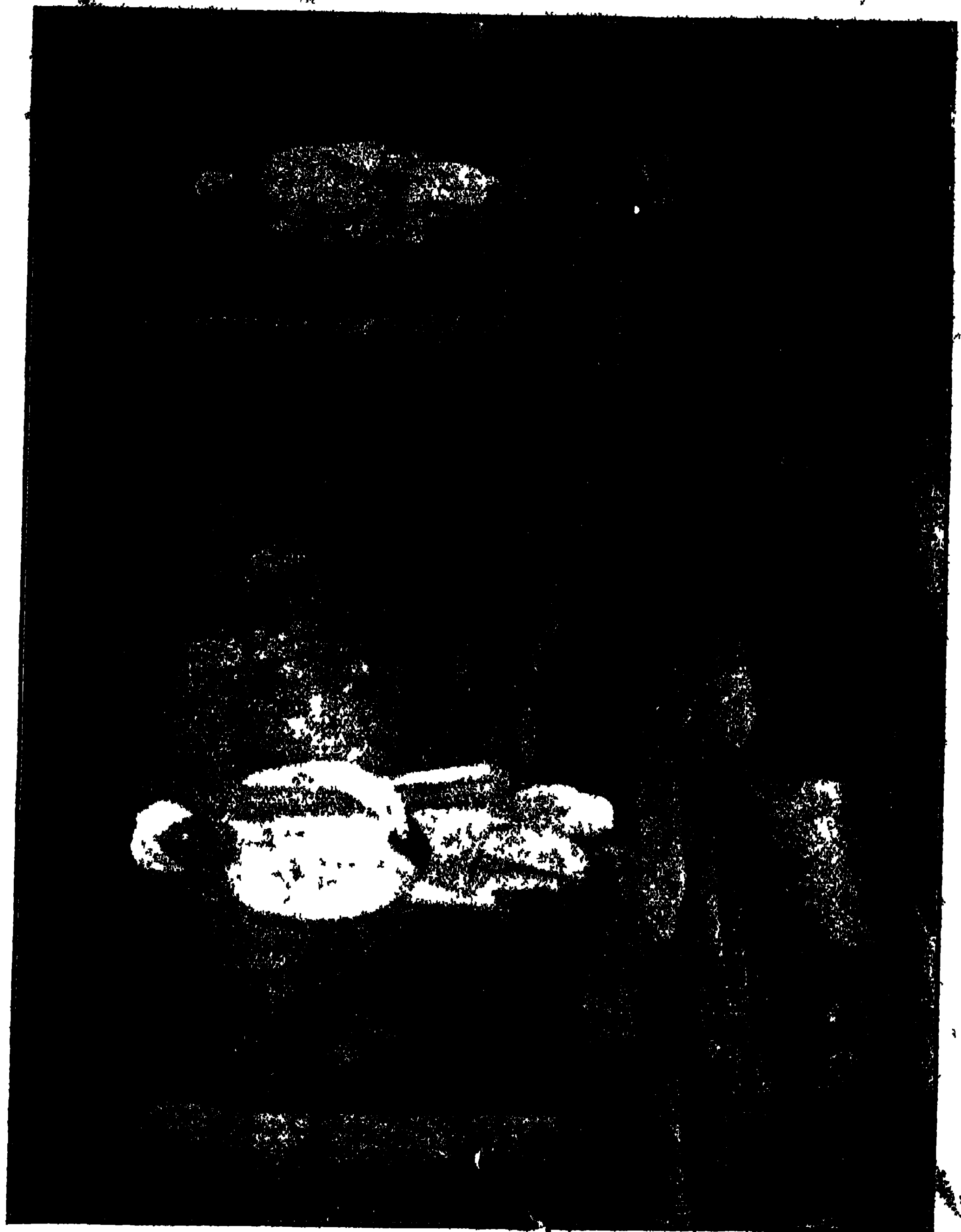
কাষ্ঠের পাত্রে সোরা দানা বাঁধিতেছে।

লবণ ও পোটাসিয়াম ক্লোরাইডও দানা বাঁধে। সোরা সংশোধকগণের মতে দ্রাবণ হইতে লবণ যত ধীরে ধীরে দানা বাঁধে ততই ভাল। দ্রাবণ হইতে দানা বাঁধা সোরা অতি সহজে বাহির করিয়া লইবার যন্ত্র পাতি তাহাদের না থাকায় তাহারা দ্রাবণকে গড়াইয়া

ষষ্ঠ চিত্র।

বস্তাবন্দী সোরা বিধৌত করিবার প্রণালী। মজঃফরপুর, ১৯০৬।

পৃথক করে। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত দানার উপরিভাগের মোট আয়তন পরিমাণ বৃহত্তর দানা অপেক্ষা অনেক অধিকতর, কাজেই দানা ক্ষুদ্র হইলে তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে দ্রাবণ থাকিয়া যায়। অতএব যাহাতে দানা বেশ বৃহদাকার হয়, তাহার জন্য দ্রাবণকে ধীরে ধীরে শীতল করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। সেই জন্য সংশোধকগণ কাঠের পাত্রগুলিকে মাটিতে প্রায় প্রোথিত করিয়া ফেলে। সময়ে সময়ে তাহারা আরও অন্যান্য প্রথা অবলম্বন করে, সেগুলি

অতীব চমৎকার। জলীয় পদার্থ মাত্রেই সর্ব্বদা বাষ্পীভূত হইতেছে। যদি উত্তপ্ত দ্রাবণকে কেবল মাত্র বায়ুতে উন্মুক্ত রাখা হইত, তাহা হইলে দ্রাবণ প্রচুর পরিমাণে বাষ্পীভূত হইয়া যাইত। এক্ষণে যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, দ্রাবণ আদৌ বাষ্পীভূত হইতেছে না, এবং সোরার প্রধান জঞ্জাল সাধারণ লবণ উত্তপ্ত এবং শীতল উভয় প্রকার জলেই সম পরিমাণে দ্রবণীয় তাহা হইলে অতি অল্প পরিমাণে সাধারণ লবণ সোরার সহিত দানা বাঁধিয়া যায়। যদি দ্রাবণকে বাষ্পীভূত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দ্রাবণস্থিত সাধারণ লবণও পৃথক হইতে থাকিবে, এবং সোরাও ইহাতে মিশ্রিত হইয়া উঠিবে। কাজেই দ্রাবণ যাহাতে আদৌ বা অতি অল্প পরিমাণে বাষ্পীভূত হয়; তাহারই চেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই জন্যই সংশোধকগণ কাষ্ঠ পাত্রস্থিত উত্তপ্ত এবং লবণ সংমিশ্রিত ঘন দ্রাবণের উপরিভাগে অতি সাবধানতার সহিত অল্প পরিমাণ শীতল জল ঢালিয়া দেয়। ঘন দ্রাবণ অপেক্ষা এই জল লঘুতর সেই জন্য ইহা উপরে ভাসিতে থাকে এবং এই জলই বাষ্পীভূত হইয়া যায়। স্বভাবতঃই এই জলের কিয়দংশ সোরা-দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু বেশ দক্ষতার সহিত ঢালা হয় বলিয়া শীতল জল সোরা দ্রাবণ হইতে বেশ পৃথক থাকে। জল এই ভাবে ঢালা হউক আর নাই হউক, সোরা দ্রাবণের উপরের অংশ শীঘ্রই নিম্নাংশের একটি আবরণ স্বরূপ হইয়া উঠে। এই উপরের অংশ প্রথমে শীতল হয় এবং ইহার সোরা অধঃস্থ হইয়া যাইলেই নিম্নের ঘন উত্তপ্ত দ্রাবণ অপেক্ষা লঘুতর হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। কাজেই এই সোরা শূন্য লঘুতর দ্রাবণ নিম্নস্থ দ্রাবণের বাষ্পীভূত হইবার পথে একটা আবরণ স্বরূপ বাধা প্রদান করে।

এইরূপে দানা বাঁধিবার প্রণালী প্রায় ৮।১০ দিন ধরিয়া চলিতে থাকে। এবং দ্রাবণ প্রায় ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উপনীত হইলে ইহা হইতে সোরার দানা পৃথক করিয়া ফেলা হয়। এই সংশোধিত সোরাকে "কলমি সোরা" বলে, ইহার বর্ণ ফিকে বাদামী এবং অনেকাংশে বিশুদ্ধ। নিম্নের বিশ্লেষণ তালিকা হইতে ইহার উপাদান বুঝা যাইবে:—

	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
	শতকরা	শতকরা	শতকরা	শতকরা
সোরা (potassium nitrate	৮২·৬১	৯৬·১৭	৯১·১৯	৯২·৯৮
পোটাসিয়াম ক্লোরাইড (potassium chloride)	১১·০৪	...	৩·৫৪	১·৮৭
সোডিয়াম সলফেট (sodium sulphate)	...	·১৫	...	·৬১
সাধারণ লবণ (sodium chloride	৩·৬৪	·৪৬	·৬১	৩·৩৩

৭ম চিত্র।

বস্তাবন্দী সোরা বিধৌত করিবার প্রণালী। মজঃফরপুর, ১৯০৬।

সোরা বিধৌত-করণ—"ধোলাই" প্রণালী। কোন কোন সোরা সংশোধিত করিবার কারখানায় এই কলমী সোরাকে বিধৌত করিয়া আরও অধিক পরিমাণে সংশোধিত করা হয়। এরূপ করিতে হইলে প্রথমে ইহাকে বস্তা বন্দী করিতে হয়। এই বস্তাবন্দী সোরাকে টব বা চৌবাচ্চার উপরে (৬ষ্ঠ এবং ৭ম চিত্র) স্থাপিত করা হয়। বস্তার মুখ খুলিয়া চৌবাচ্চা হইতে সোরার ক্ষীণ দ্রাবণ লইয়া বস্তার সোরায় ঢালিতে হয়। এইরূপ ক্ষীণ দ্রাবণ ব্যবহার করার সম্ভবতঃ দুইটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে;

ইহা সোরাকে অংশতঃ ধৌত করে, এবং বস্তাপূর্ণ যাবতীয় সোরার দানাকে সিক্ত করিয়া ফেলে। এই প্রাথমিক সংশোধন প্রক্রিয়া প্রায় একঘণ্টা বা তদূর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত পরিচালিত হয়। যে লোক এইরূপে ধৌত করে সে শ্রেণীবদ্ধ বস্তাগুলির প্রত্যেকটিতে এইরূপে পরে পরে এই সোরার ক্ষীণ দ্রাবণ ঢালিয়া যায়। অতঃপর অল্প পরিমাণে (কোন এক সময়ে আমি প্রায় ১ গ্যালন পর্য্যন্ত দেখিয়াছি) শীতল জল কৌশলের সহিত বস্তার মুখের সোরার দানার উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই জল ধীরে ধীরে সমস্ত সোরা বাহিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ এই প্রণালীতে কিয়ৎ পরিমাণে সোরা ও সাধারণ লবণ দ্রবীভূত হইয়া যায়; শেষোক্ত পদার্থ বিদূরিত করাই এইরূপে বিধৌত করার উদ্দেশ্য। ইহার ফল এই যে, ইহাতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সোরা উৎপাদিত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এইরূপে বিধৌত করায় কি ফল হয়, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে :—

	বরহানপুরা		সাভান		বাক্রামাউ	
	অবিধৌত	বিধৌত	অবিধৌত	বিধৌত	অবিধৌত	বিধৌত
সোরা (potassium nitrate)	৯০ ৭০	৯৪ ৯১	৮১ ৯৮	৯১ ৫৫	৮৮ ৬৩	৯৪ ৭০
পোটাসিয়াম সালফেট (potassium sulphate)			৫ ৪৪	৯৩	১৫	১৫
সোডিয়াম সালফেট (sodium sulphate)	·৯১	০৩				
পোটাসিয়াম ক্লোরাইড (potassium chloride)			২ ৫৯	২ ৫১	৬ ০৬	২ ৮৭
সাধারণ লবণ (sodium chloride)	৫ ৪০	৩ ১২	৭ ০৫	১ ৬৮	০৭	১০
বালি ..	৩০	২০	২০	৩৫		

সোরা সংশোধনের কারখানায় সোরার সহিত আনুসঙ্গিক যে সমস্ত পদার্থ উৎপাদিত হয় প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি তাহাদিগের সমস্তগুলি একত্রে বর্ণনা প্রয়োজনীয়। "সিটা" নামক দ্রব্য পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। নিম্ন তালিকা হইতে ইহা কোন্ কোন্ দ্রব্যে গঠিত তাহা বুঝা যাইবে :—

	মথুরা শতকরা	ফরাকাবাদ শতকরা	ফরাকাবাদ শতকরা	পাটনা শতকরা
সোরা	১৪·৯০	৪ ৮৪	৬ ৭০	৮ ২০
পোটাসিয়াম সালফেট	৩ ৬৮	৫ ৯৬	৬ ৯০	২১ ১০
পোটাসিয়াম ক্লোরাইড	২২·৯৭		২৬ ১১	
সোডিয়াম সালফেট		৫·৬০		৫·১৪
সাধারণ লবণ	৩৫ ৮০	৭৪ ৩৩	৪৬ ৫	৪৪·৫২
জল ...	১৫·৭২	৫ ৯৮	৯·৮৬	৬·৩১
প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ	১৮	·২১	·২১	·০৭
বালি ..	৫·২৯	·৯৬	২·০৪	১৩ ১৬

পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে যে, এই সিটা, সোরা সংশোধন করিবার কারখানার মাটীতে মিশাইয়া দেওয়া হয়, অথবা যখন ইহাতে লবণ সমূহের অধিক পরিমাণ মিশ্রিত থাকে তখন ইহাকে "কুঠি"র দ্রাবণের সহিত ব্যবহার করা হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় সিটার এই সমস্ত লবণ, বিশেষতঃ সাধারণ লবণ অবশেষে পৃথক করিয়া লওয়া হয়।

সোরা সংশোধনের কারখানার দ্বিতীয় আনুসঙ্গিক উৎপন্ন পদার্থ—সাধারণ লবণ। সিটার ন্যায় ইহাকেও কারিকরগণ ইচ্ছা করিয়া উৎপাদন করে না। বর্ত্তমানে যে প্রণালীতে কারিকরগণ সোরা সংশোধন করে, তাহাতে সাধারণ লবণ পৃথক না করিলে কিছুতেই চলিতে পারে না। আবার সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই লবণকে কেবল দ্রাবণ হইতে তুলিয়া লইলেই কার্য্য শেষ হয় না, ইহাকেও সংশোধিত করা প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে ৩৭৯ পৃষ্ঠায় যে উপায়ে ইহাকে দ্রাবণ হইতে তুলিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে, সেই উপায়ে ইহাকে তুলিয়া লইবার পরে, ইহাকে অতি সত্বর শীতল জলে ধৌত করিয়া ফেলা হয়। আমি পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছি যে, এইরূপে প্রায় ১/৩ অংশ লবণ পুনর্বিগলিত করিয়া ফেলা হয়। তাহা হইলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহাকে সংশোধিত করা হয় কেন? উত্তপ্ত দ্রাবণের পাত্র হইতে এই লবণ তুলিয়া লওয়া হইলে, প্রতি একশত ভাগ লবণে প্রায় ২৫ ভাগ দ্রাবণ থাকিয়া যায়। এই দ্রাবণ সোরার অতিশয় ঘন দ্রাবণ। এই দ্রাবণে সোরার পরিমাণ নানারূপ হইতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি ইহাতে সোরার পরিমাণ ১৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই থাকে। এক্ষণে এই দুই পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর মূল্যবান,—১০০ ভাগ সাধারণ লবণ বা ১৫ কিম্বা ২০ ভাগ সোরা? সরকারী শুল্ক বাদে ১ মণ উৎকৃষ্ট লবণের মূল্য মণ করা ।০ আনা। কিন্তু যাহা হইতে এক মণ সাধারণ লবণ পাওয়া যায় তাহা হইতে ১৩ হইতে ১৬ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধসের) পর্য্যন্ত সোরা পাওয়া যায়, ইহার মূল্য ১ টাকা হইতে ১।০ আনা। অতএব বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই সাধারণ লবণ ধৌত করা ও বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট লবণ উৎপাদন করা নহে, এই লবণে মিশ্রিত সোরাকে নির্মুক্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

সোরা সংশোধনের কারখানায় তৃতীয় আনুসঙ্গিক উৎপন্ন পদার্থ—পরিত্যক্ত দ্রাবণ। কুঁড়িয়া হইতে দ্রাবণ সমূহ ও মাদার শিকার উভয়ই পরিত্যক্ত হয়। কুঁড়িয়ার দ্রাবণ সমূহে এত অল্প সোরা বিগলিত থাকে যে তাহাকে সংশোধন করিবার কারখানার মাটীতে ফেলিয়া দেওয়াই ভাল, সেই স্থানেই ইহা সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক হইতে থাকে। যে সমস্ত পাত্রে সোরা দানা বাঁধে সেই সমস্ত পাত্রের দ্রাবণে অপরিষ্কৃত সোরা দুই এক বার গলাইয়া লওয়া হয়। তাহার পর ইহা অত্যন্ত অপরিষ্কার বোধ হইলে ইহাকেও কারখানার মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এইরূপে দেখা যায় যে, সোরা সংশোধন করিবার কারখানার মাটীর স্তূপে

ক্রমাগত পরিত্যক্ত পদার্থ সংযোজিত হইতেছে। এই পরিত্যক্ত পদার্থের প্রত্যেকটিতে যথেষ্ট পরিমাণে সোরা মিশ্রিত থাকে। ইহা ব্যতিত কারখানার যন্ত্রাদি সেরূপ সুগঠিত নহে বলিয়া সোরা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে এই ফল হয় যে, কেবল মাত্র গুদাম ঘরের মধ্যস্থলের মৃত্তিকার স্তূপে নহে, পরন্তু যে স্থানে জ্বাল দিবার লৌহ কটাহ বা দানা বাধিবার পিপাগুলি সজ্জিত থাকে, তথাকার মাটীতেও প্রচুর পরিমাণে সোরা আবদ্ধ থাকিয়া যায়।

সোরা সংশোধিত করিবার কারখানার মাটীতে নাইট্রিফিকেশন *। — সাধারণতঃ সকলেই এরূপ একটা অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে সংশোধন করিবার কারখানার মাটীতে সোরা স্বঃতই "বৃদ্ধি" পায়। অথবা বৈজ্ঞানিক ভাষা অনুসারে মাটীতে "নাইট্রিফিকেশন" সংঘটিত হয়।

এই বিষয়ে আমাদের সেরূপ কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ নাই। কেননা ইহা কোন রাসায়নিক বা আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদবিৎ পণ্ডিত দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই।

ইতি পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে, কারখানার মাটীতে প্রচুর সোবা সংযুক্ত হয়, বলিয়া এই মাটীতে অবশ্যই প্রচুর সোরা বর্ত্তমান থাকে। কাজেই—এই মাটী হইতে নিয়মমত সোরা নির্ম্মুক্ত হইতেছে, অতএব ইহাই মৃত্তিকাতে নাইট্রিফিকেশনের প্রমাণ—তাহা নহে। বস্তুতঃ এই মাটীতে অন্যান্য লবণও বর্ত্তমান থাকাতে বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মাটীতে আদৌ নাইট্রিফিকেশন সংঘটিত হয় না। যাহাই হউক না কেন, আমি দুইটি সুবৃহৎ কারখানা হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকটি হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সংশোধনের কারখানায় সোরার কেমন করিয়া সর্ব্বদা সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়।

৪ মাসের মধ্যে "ক' নামক সংশোধনের কারখানা ১১,২৪০ মণ অপরিস্কৃত সোরা ক্রয় করিয়া ছিল। ইহাতে শতকরা ৫৫ ভাগ সোরা ছিল অর্থাৎ বিশুদ্ধ সোরার পরিমাণ মোট ৬,১৮০ মণ। ইহ হইতে ৫,১৭৭ মণ সংশোধিত সোরা পাওয়া গেল। ইহাতে বিশুদ্ধ সোরার পরিমাণ শতকরা ৯০ ভাগ, অর্থাৎ মোট ৪,৬৬০ মণ বিশুদ্ধ সোরা ছিল। তাহা হইলে দেখা গেল যে, অপরিস্কৃত সোরার সহিত মোট যে পরিমাণ বিশুদ্ধ সোরা ক্রয় করা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১,৫২০ মণ সোরা কম আদায় হইল। দ্বিতীয়তঃ ঠিক উক্ত সময়ের মধ্যেই ১১,৯১০, মণ সোরা বিধৌত হইয়াছিল। ইহা হইতে মোট ৯৭৭২ মণ বিধৌত সোরা পাওয়া গেল। ইহাতেও প্রায় শতকরা ১০ ভাগ কম আদায় হইল। এই দশ ভাগের মধ্যে লবণের পরিমাণও প্রায় ২।৩ ভাগ, তাহা হইলে অবশিষ্ট ৭।৮ ভাগের অধিকাংশ নিশ্চয়ই সোরা। এই ৭।৮ ভাগের ৫ ভাগ মাত্র সোরা এইরূপ ধরিয়া লইলেও, সোরার পরিমাণ প্রায় ৫০০ মণ। তাহা

---

* নাইট্রিফিকেশন কি? — (৩৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হইলে উক্ত দুই প্রক্রিয়ায় ১৫০০+৫০০=২০০০ মণ সোরা কম আদায় হইল। এই সময়ের মধ্যে সংশোধনের কারখানায় মাটী হইতে ১,৭১৬ মণ সোরা উৎপাদিত হইল। ইহার প্রায় শতকরা ৬০।৭০ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা। শতকরা ৭০ ধরিয়া লইলে বিশুদ্ধ সোরার পরিমাণ প্রায় ১,২০০ মণ। এইরূপে মোটের উপর প্রায় ২,০০০ মণ সোরা পরিত্যক্ত দ্রাবণের সহিত থাকিয়া গেল। এবং ইহার মাত্র ১,২০০ ভাগ আদায় হইল।

এইরূপে ধরিয়া লওয়া হউক যে "খ" নামক সংশোধনের কারখানায় ৬,৬৭৪ মণ অপরিষ্কৃত সোরা সংশোধিত হইল। ইহাতে শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা ছিল। শতকরা ৫৫ ভাগ ধরিয়া লইলেও বিশুদ্ধ সোরার পরিমাণ ৩,৬৭০ মণ কিন্তু ৩,২৬৭ মণ মাত্র সংশোধিত সোরা আদায় হইল। এই সংশোধিত সোরাতেও বিশুদ্ধ সোরার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। তাহা হইলে এই সংশোধিত সোরার বিশুদ্ধ সোরার পরিমাণ ২,৯৪০ মণ। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় মোট ৭৩০ মণ সোরা কম আদায় হইল। এই সময়ের মধ্যে ৬,০৬৫ মণ সংশোধিত সোরা বিধৌত হইল, তাহাতে ৫,০৬০ মণ সোরা আদায় হইল অর্থাৎ শতকরা ১৬ ভাগ সোরা কম আদায় হইল। এই ১৬ ভাগের মধ্যে সাধারণ লবণের পরিমাণ ৬ ভাগ। এই ১৬ ভাগের যদি মাত্র ৫ ভাগও বিশুদ্ধ সোরা ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও প্রায় ৩০০ মণ বিশুদ্ধ সোরা কম আদায় হইল। এইরূপে প্রায় ১,০৩০ মণ সোরা পরিত্যক্ত দ্রাবণের সঙ্গে থাকিয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে মাটী হইতে ১৩৬০ মণ সোরা উৎপন্ন হইল, ইহাতে শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা, অর্থাৎ মোট ৬৮০ মণ বিশুদ্ধ সোরা আদায় হইল। এইরূপে সংশোধনের কারখানায় যে রাশি পাওয়া যায়, তাহার হিসাবে দেখা যায় যে কারখানার মাটীতে সোরা বৃদ্ধি পাইতেছে না বরং অল্পতর হইয়া যাইতেছে। অবশ্য এই সমস্ত রাশি তত গ্রহণযোগ্য বা প্রমাণযোগ্য নহে। কেননা যে পরিত্যক্ত দ্রাবণ মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে সস্ত সস্তই পুনরায় সোরা নির্মুক্ত করা হয় না। হয়ত কয়েক মাস পড়িয়া থাকিলে তবে সোরা পুনরায় নির্মুক্ত করা হয়। উপযুক্ত কালে ক্রমে ক্রমে এই মাটী হইতে সোরা আদায় করা হয়। যে সমস্ত রাশি উল্লিখিত হইল, তাহা কতিপয় মাসের প্রক্রিয়ার হিসাব, এবং উহা সোরা উৎপাদন-পরিমাণের হ্রাস নির্দেশ করিতেছে, কাজেই মাটীতে যে কোনরূপ নাইট্রিফিকেশন হইতেছে ইহার দ্বারা এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার সোরা সংশোধনের কারখানায় সোরা উৎপাদন পরিমাণের ক্রমাগত হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এরূপ মানিয়া লইলেও ইহাতে এরূপও প্রমাণ হয় না যে মাটীতে কোনরূপ নাইট্রিফিকেশন হইতেছে না। নাইট্রিফিকেশন প্রণালী বর্ত্তমান আছে, এবং ইহা সোরা উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে ইহাও সম্ভব;

তাহা হইলে সংশোধনের কারখানায়, উপরোক্ত হিসাবে যে পরিমাণ সোরা নষ্ট হইতেছে বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণ সোরা নষ্ট হইতেছে।

তৃতীয় অংশ।

সংশোধন করিবার প্রস্তাবিত উন্নত প্রণালী।

স্বভাবতঃই এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে ভারতীয় সোরা উৎপাদনের প্রণালীতে কোনরূপ উন্নতি বিধান করা সম্ভব কি না? অপরিস্কৃত বা মিশ্রিত সোরার বিষয়ে যেরূপ প্রণালী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন বিধান কার্য্যতঃ অসম্ভব। ইহার কারণ লুনিয়াগণ যেরূপ সোরা উৎপাদন করে তাহা অপেক্ষা ভারতীয় মাটী হইতে যে আরও অধিকতর বিশুদ্ধ সোরা পাওয়া যাইতে পারে না তাহা নহে, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারেই এরূপ কোন পরিবর্ত্তন অসম্ভব। উন্নত প্রণালীতে মূল্যবান ও ব্যয়বহুল যন্ত্রাদির আবশ্যক। ইহা এই সমস্ত লোকের আর্থিক সীমার বহির্ভূত। এতদ্ব্যতীত তখন এরূপ দূরস্থিত কোন একটি প্রধান কারখানায় এই সমস্ত মাটীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে যে, মাটী বহন করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহাতে যে লাভ হইবে তাহার তুলনায় সেই ব্যয় অনেক অধিকতর। লুনিয়াগণ অতি পরিমিত ব্যয়ে কার্য্য সম্পাদন করে, এবং এ সম্বন্ধে যত প্রণালী কল্পিত হইতে পারে তন্মধ্যে তাহাদের প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অপরিস্কৃত বা মিশ্রিত সোরা সংশোধন করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে এখানের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রতি বৎসর অধিকাংশ কারখানাতেই হাজার হাজার মণ সোরার কার্য্য হইয়া থাকে; ইহার মূল্য প্রচুর। কাজেই আরও অধিকতর পরিমিত ব্যয়ে কার্য্য করিবার জন্য সে সমস্ত উৎকৃষ্ট যন্ত্র পাতি আবশ্যক এখানে তাহাদের ব্যবহার সম্ভব। বর্ত্তমানে যে প্রণালী রহিয়াছে, তাহার প্রধান দোষ এইগুলি:—(১) কারখানার মাটীতে প্রচুর সোরা মিশ্রিত থাকে। ইহা ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে নির্ম্মুক্ত করা হয়। ইহাতে ঠিক যেন মূল ধন আবদ্ধ করা থাকে কাজেই অনেক দিন ধরিয়া কার্য্য শেষ হইলে কার্য্য তত লাভ জনক হয় না। (২) যে দ্রাবণ উৎপন্ন করা হয়, তাহা আপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, কাজেই তাহা হইতে অনেক জল বাষ্পীভূত করিতে হয়, ইহাতে জ্বালানি কাষ্ঠের অনেক ব্যয় হয়। (৩) বর্ত্তমান প্রণালীতে উপাদান সমূহের অত্যন্ত অপচয় হয়, ইহাতে সোরার অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। (৪) "কলমি" সোরা উৎকৃষ্ট হইলেও "কুঠিয়া" সোরা মন্দ। (৫) সংশোধিত সোরার বর্ণ বাদামী, এই বর্ণ নষ্ট বা বিদূরিত করিবার জন্য ইহাকে ধৌত করা প্রয়োজনীয়। (৬) বর্ষায় সংশোধনের কার্য্যে অনেক প্রতি বন্ধক হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সমস্ত দোষ অনেক পরিমাণে পরিহার করা সম্ভব। এরূপ অনুমান
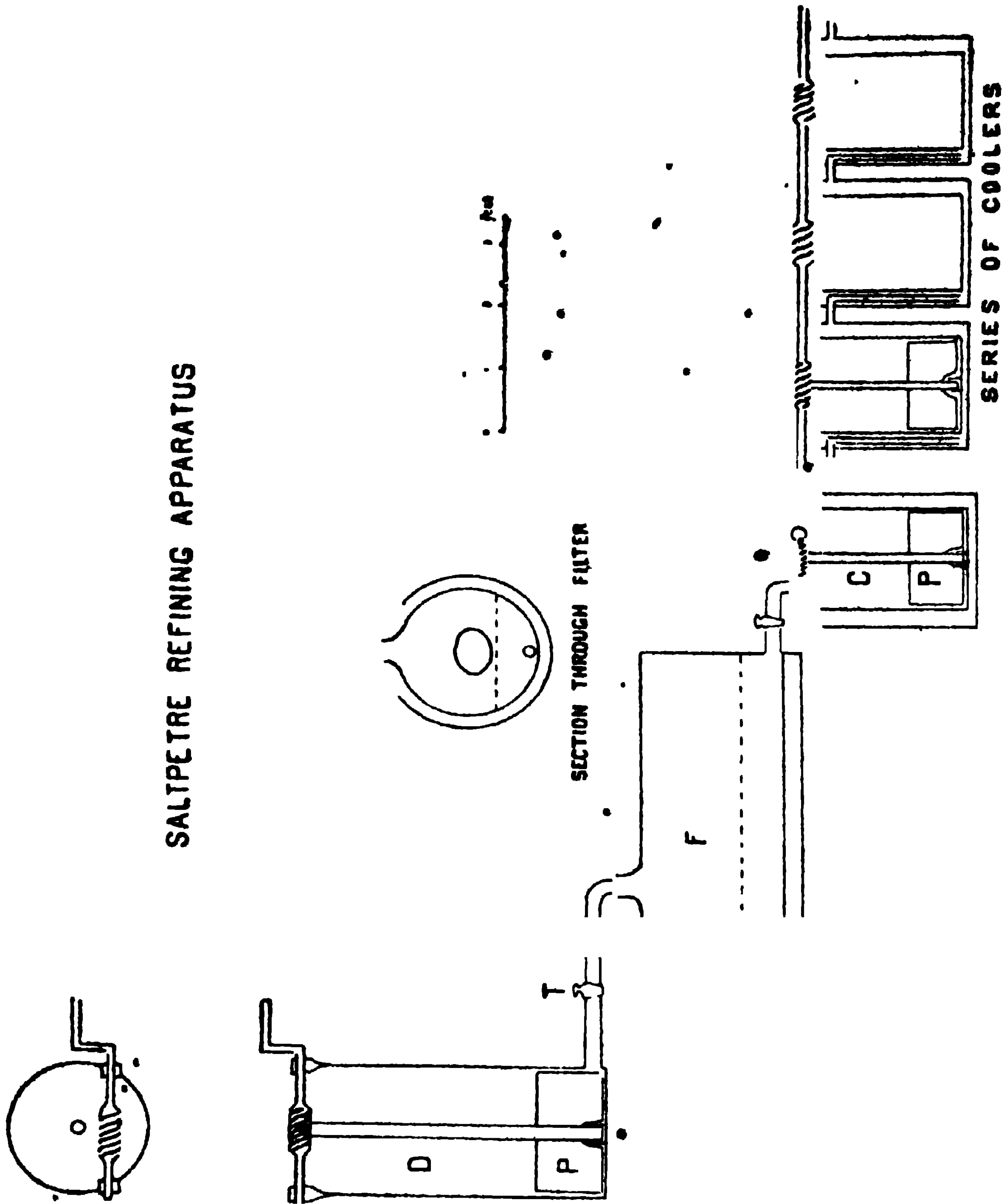
করিয়া লওয়া হউক যে উপযুক্ত পরিমাণ অপরিস্কৃত সোরা মাদার লিকারের সহিত উত্তপ্ত করা হইল, এই মাদার লিকারে সোরা প্রচুর পরিমাণে ও অন্যান্য লবণ সামান্য মাত্র দ্রবীভূত হইল। এই সমস্ত ব্যাপার পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এরূপও অনুমান করিয়া লওয়া হউক যে, যে অদ্রবীভূত ও অদ্রবণীয় পদার্থ হইতে মাদার লিকার যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা হইল, এবং সোরা পরে দানা বাঁধিতে লাগিল। ইহাতে অতি সামান্য পরিমাণেই বাজে পদার্থ সমূহ দানা বাঁধিবে, কাজেই তাহাদের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। এই মাদার লিকারকে সংশোধিত সোরা হইতে পৃথক করা যাইতে

পারে, এবং ইহাতে আরও অপরিস্কৃত সোরা মিশ্রিত করা যাইতে পারে। কাজেই যদি আমাদের উপযুক্ত যন্ত্রাদি থাকে, তাহা হইলে অপরিস্কৃত সোরা হইতে পরিস্কৃত সোরা আদায় করিবার জন্য জল একবারে বাষ্পীভূত না করাও সম্ভব। অবশ্য দ্রাবণকে উত্তপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু অর্দ্ধসের জলকে উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন, উহাকে বাষ্পীভূত করিতে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিকতর তাপ প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে এক পাউণ্ড জলকে ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হইতে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (জলের স্ফুটনাঙ্ক) তাপ মাত্রায় তুলিতে মাত্র ৭৫ সংখ্যক তাপ পরিমাণ আবশ্যক। কিন্তু এক পাউণ্ড জলকে বাষ্পীভূত করিতে ৫৩৫ সংখ্যক তাপ পরিমাণ প্রয়োজনীয়। অথবা এরূপ বলা যাইতে পারে যে এক পাউণ্ড জলকে কেবল ফুটাইতে যে পরিমাণ জ্বালানী কাঠের আবশ্যক তাহাকে বাষ্পীভূত করিতে তাহার ৭ গুণ অধিকতর কাঠের আবশ্যক।

উপরিলিখিত প্রস্তাবগুলিকে পরিষ্কাররূপে বিবৃত করিবার জন্য কোনরূপ উদাহরণ দিবার পূর্ব্বে পুসা কৃষি বিদ্যালয়ে যে প্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত। সর্ব্ব সমত ৫টি প্রক্রিয়ায় এই প্রণালী গঠিত। (১) অপরিস্কৃত সোরায় উপযুক্ত পরিমাণ মাদার লিকার ঢালিয়া, ইহাকে এরূপ উত্তপ্ত করিতে হয়, যেন ইহা প্রায় ফুটিয়া উঠে। ইহার জন্য একটি বিভিন্ন প্রকারের বিশেষ পাত্রের প্রয়োজন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে অপরিস্কৃত সোরার সমস্ত সোরাই সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিন্তু এই সোরা সংমিশ্রিত অন্যান্য লবণ আদৌ দ্রবীভূত হয় না। (২) এই দ্রবীভূত সোরার দ্রাবণ ও তন্মিশ্রিত অন্যান্য অদ্রবীভূত পদার্থকে একটি "ছাঁকনী" যন্ত্রে প্রবাহিত করান হয়। এই ছাঁকনীও উত্তপ্ত থাকে। অতঃপর ছাঁকনী যন্ত্র বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে পাম্প দ্বারা বাতাস প্রবাহিত করান হয়। এইরূপে ছাকনী যন্ত্রে বায়ুর চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি করিলে, দ্রবীভূত-সোরার দ্রাবণ অদ্রবীভূত পদার্থ হইতে নিষ্কাশিত হয়। অবশ্য এই অদ্রবীভূত পদার্থের সহিত খানিকটা সোরার দ্রাবণও থাকিয়া যায়। কেননা এই উপায়ে অদ্রবীভূত কঠিন পদার্থ হইতে কিছুতেই তরল পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যায় না। কাজেই এই অদ্রবীভূত পদার্থে খানিকটা সোরা দ্রাবণের সঙ্গে দ্রাবণের সহিত বিগলিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। (৩) এই উত্তপ্ত দ্রাবণকে ছাঁকনী যন্ত্র হইতে যে পাত্রে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাকে অতি শীঘ্র শীতল করা হয়। এইরূপ শীঘ্র শীতল করিলে প্রচুর বিশুদ্ধ সোরার ছোট ছোট দানা অধঃস্থ হয়। (৪) এই শীতলীকৃত মাদার লিকারকে (যাহাতে সোরার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা অধঃস্থ হইয়া রহিয়াছে) একটি সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে (centrifugal machine) প্রবাহিত করিয়া আনা হয়। এই যন্ত্র দ্বারা মাদার লিকার সোরার দানা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে। এবং বিশুদ্ধ সোরা শুষ্ক শুভ্র ও দানা বাঁধিয়া বাহির হইয়া আইসে। (৬) মাদার লিকার সম্পূর্ণরূপে

বিতাড়িত হইলে (সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রের কার্য্যবন্ধ হইবার পূর্ব্বেই) সোরার দানার সামান্য পরিমাণ জল সিরিঞ্জ (syringe) বা পিচকারী করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিলে সোরার দানার পাত্রে সাধারণ লবণ বা অন্যান্য ক্লোরাইড যাহা লাগিয়া থাকে, তাহা বিদূরিত হয়।

অষ্টম চিত্র এই যন্ত্রের একটি নক্সা। এই যন্ত্রে D চিহ্নিত পাত্রের নাম ডিজেষ্টার (digester)। ইহাতেই অপরিষ্কৃত সোরা মাদার লিকার সহযোগে ফুটাইতে হয়। ইহার জন্য A চিহ্নিত স্থানে অগ্নি থাকে। যাহাতে এই দ্রাবণ অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, তাহার জন্য P চিহ্নিত হাতল সংযুক্ত দণ্ড দ্বারা ইহাকে আলোড়িত করা হয়। ইহা বেশ উত্তপ্ত হইলে, T চিহ্নিত ছিদ্র রোধক গুঁজি খুবাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ভিতর দিয়া F চিহ্নিত ছাকনী যন্ত্রে উত্তপ্ত দ্রাবণ প্রবেশ করে। এই ছাঁকনী যন্ত্র হইতে বায়ু চাপ দ্বারা দ্রাবণ ছাঁকিয়া লওয়া হয়। নক্সা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই ছাকনী যন্ত্র দুই কক্ষ বিশিষ্ট। ভিতরের কক্ষটিই বাস্তবিক ছাঁকনী যন্ত্র। ইহাতে তারের এক প্রস্ত ছাঁকনী রহিয়াছে। ... . ছিহ্ন দ্বারা তারের জাল প্রদর্শিত হইয়াছে। বহিঃস্থ পাত্রে জল রহিয়াছে, এই জল A চিহ্নিত স্থানের অগ্নি সহযোগে উত্তপ্ত হইতেছে। কাদা এবং অন্যান্য জঞ্জাল ও সোরা মিশ্রিত দ্রাবণ (যাহা ডিজেষ্টারে উত্তপ্ত হইয়া আসিয়াছে) ছাকনী যন্ত্রে উত্তপ্ত রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। D হইতে উত্তপ্ত দ্রাবণ প্রবাহিত করিয়া আনিয়া ছাকনীর মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ছাকনীতে বাতাস পাম্প করা হয় (এই পাম্প অবশ্য চিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই)। উত্তপ্ত ছাকা দ্রাবণ F হইতে শীতল করিবার যন্ত্র C তে প্রবাহিত হয়। অনেক গুলি শীতল করিবার যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্র গুলিতে ডিজেষ্টার ন্যায় P চিহ্নিত দণ্ড রহিয়াছে। ইহার চারি দিকে বহিরাবরণ রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া শীতল জল প্রবাহিত হয়। এক্ষণে দণ্ড আলোড়িত করিলেই দ্রাবণ অতি শীঘ্র শীতল হইয়া যায়। যখন শীতল হয়, তখন এই দানা বাঁধা সোরা সম্বলিত মাদার লিকারকে শীতল করিবার যন্ত্র হইতে বালতিতে করিয়া সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়, কিম্বা একবারেই শীতল করিবার যন্ত্র হইতে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে প্রবাহিত করান হয়। এই সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্র চিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। এই যন্ত্র মাদার লিকার ও সংশোধিত সোরাকে পৃথক করিয়া ফেলে। এই সোরা সম্পূর্ণ শুভ্র, অতি সূক্ষ্ম দানাদার, চূর্ণ, প্রায় শুষ্ক এবং ইহার বিশুদ্ধতা শতকরা ৯০ ভাগ। ইহাকে আরও বিশুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে সামান্য পরিমাণে শীতল জল (দশ সের সোরায় এক সের জল) সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে পিচকারী করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। এইরূপ করিলে সোরা শতকরা ৯৩ হইতে ৯৪ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। ছাকনী যন্ত্রে যে কাদা এবং জঞ্জাল পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাতে অনেক পরিমাণে সোরা মিশ্রিত থাকে।

ইহাকে ছাঁকনী হইতে অপসারিত করিয়া পুনরায় ডিজেষ্টারে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাকে সেখানে পুনরায় মাদার লিকার দিয়া উত্তপ্ত করা হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় ছাকনিতে প্রবাহিত করা হয়। এই দ্বিতীয় বারে যতটুকু সোরা আদায় হয়, প্রথম বারের অপেক্ষা তাহার পারমাণ অবশ্য অল্পতর। দ্বিতীয় বারের পরিত্যক্ত মাটীতেও কিঞ্চিৎ সোরা থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহা তৃতীয় বার এই যন্ত্র দ্বারা আদায় করিবার ব্যয়ের উপযুক্ত নহে।

এই প্রণালী বেশ ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে যে অনতি-বৃহৎ আদর্শ যন্ত্র কার্য্য করিয়াছিল তাহার হিসাব উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ—

(১) ৭ ৭৫ মণ অপরিষ্কৃত সোরা হইতে (যে সোরায় শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা ছিল) ২ ৬ মণ সংশোধিত সোরা উৎপাদিত হইয়াছিল। এই সোরা শত-করা ৯০ ভাগ বিশুদ্ধ।

(২) ১৭৪ মণ অপরিষ্কৃত সোরা হইতে (যে সোরায় শতকরা মাত্র ৪৫ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা) ৬ ৫ মণ সংশোধিত সোরা আদায় হইয়াছিল। এই সোরা শতকরা ৯০ ভাগ বিশুদ্ধ।

(৩) ৫ ৫ মণ অপরিষ্কৃত সোরা হইতে (যে সোরায় শতকরা মাত্র ৫৩ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা) ২·৩ মণ সংশোধিত সোরা আদায় হইয়াছিল। এই সোরা শতকরা ৯০ ভাগ বিশুদ্ধ।

(৪) ৬ ৮ মণ অপরিষ্কৃত সোরা হইতে (যে সোরায় শতকরা মাত্র ৪৬ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা) ২·৪ মণ সংশোধিত সোরা আদায় হইয়াছিল। এই সোরা শতকরা ৩৯ ভাগ বিশুদ্ধ। এই এক মণের পরিমাণ প্রচলিত ৪০ সের।

যন্ত্রাদির মূল্য—প্রতিদিন আন্দাজ ৩০ মণ অপরিষ্কৃত সোরা সংশোধিত করিবার সম্পূর্ণ যন্ত্রের মূল্য প্রায় ৩,০০০ টাকা। এই যন্ত্র মজঃফর পুরের আর আর বাটলার কোম্পানীর নিকট হইতে ক্রয় করা যাইতে পারে। উক্ত প্রদর্শনীতে এই কোম্পা-নীর নির্ম্মিত ছোট যন্ত্রটিই কার্য্য করিয়া ছিল। উক্ত টাকা মূলধনের একটা গুরুতর ব্যয় নহে। যদি বৎসরের মধ্যে ৩০০ দিন কাজ চলে, তাহা হইলে, ৯,০০০ মণ সোরা লইয়া কাজ চালান যাইতে পারে। অথবা প্রতি মণ অপরিষ্কৃত সোরায়, যন্ত্রের মূল্য বাবৎ ⁄১০ আনা অধিক লাগে।

কর্দ্দম— এই যন্ত্র দ্বারা শেষে যে কর্দ্দম পড়িয়া থাকে, তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ সোরা থাকে এবং বর্ত্তমানে "কুড়িয়া" দ্বারা ইহা হইতে সোরা আদায় হইতে পারে। এমন কি যদি সংশোধন করিবার কারখানায় এই উন্নত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে এই কাদা হইতে সোরা আদায় করিবার প্রণালীরও উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে।

FOOD.

Translated from Rai Bahadur Dr. Chuni Lal Bose's book on Food.

(6)

We now propose to consider in what proportions the different principles of food need be taken for the maintenance of health as also the quantities of the various food-stuffs which would supply them. There is a simple way for finding this out. If we experimentally determine the amount of the various waste-products daily thrown out of our system, that would roughly represent the amounts of those constituents we should take with with our food in twenty-four hours to make up for the loss.

Of the substances which form the waste-products of the body, Nitrogen and Carbon form their principal ingredients. Therefore, by ascertaining how much Nitrogen and Carbon are eliminated from the system in twenty-four hours, we can fix upon the kind and quantity of food which would give us the required amount of these two elements to supply the need of the body.

On an average, about 300 grains of Nitrogen and 4500 grains of Carbon are daily eliminated from the body of a healthy European adult in the form of urine, fœces and exalations from the skin and the lungs. The average weight of a Bengali is less than that of a European, and the former usually does less physical work than the latter.

The elimination of Nitrogen in the case of a Bengali has been experimentally found to be a little less than that of a European, but the amount of Carbon remains nearly the same. If we fix 250 grains of Nitrogen as our daily loss, we do not think we go much beyond the mark. It is therefore necessary that we should take such an amount of food that would yield 250 grains of Nitrogen and 4500 grains of Carbon.

Now, we can not get Nitrogen and Carbon in these proportions from any one kind of food-stuffs. For instance, if we take a seer of meat, we can obtain the required amount of Nitrogen but only 1800 grains of carbon from it. On the other hand, by taking ¾ seer of rice, we can obtain 4500 grains of Carbon, but the quantity of Nittogen which this amount of rice would yield is not more than 78 grains. We thus see that neither of these food-stuffs taken alone can make up for the daily loss of these two elements from our system. This holds true also in the case of most other kinds of food. So if we use different kinds of food in such quantities as to yield Nitrogen and Carbon in the required proportions, then only the waste of the body is made up and good health maintained.

Now, to fix the quantity of the different food-stuffs required for the maintenance of our health, we must first of all have a knowledge of the exact proportions in which the different food-principles exist in the various kinds of food-stuffs. This has been ascertained by analysis and we give below a table showing the proportions of the alimentary principles present in 100 parts of the various substances ordinarily used as food, quoting the authority for such analysis.

Food-stuffs.	Water.	Proteids.	Fat.	Carbo-hydrates.	Salts.	Authority.
Rice	10	5·0	8	83·2	5	Parkes.
Do. (Indian) ...	9·4	6·39	15	83·3	76	Medical college.
Do. (Banktulsi, Atap)	12·4	6·83	7	79·2	·76	Science Association.
Do. (do. Siddha)	11·06	6·71	·9	80·1	·68	"
Pulses (average) ...	11·3	23·5	2·29	55·9	7·1	Parkes.
Moong (Sona) ...	11·4	23·8	2·0	54·8	9	Warden, Dymock and Hooper.
Do. (black) ...	10·8	22·2	2·7	54·1	10·2	Do.
Mosoor	11·8	25·1	1·3	58·4	3·4	Do.
Rahar	13·3	17·1	2·6	55·7	11·3	Do.
Khesari	10·1	31·9	9	53·9	3·2	Do.
Maskalai (*uridh*) ...	10·1	22·7	2·2	55·8	9·2	Do.
Chhola (Gram) ...	11·5	21·7	4·2	59·0	3·6	Do.
Matar (Peas) ...	15·0	22·0	2·0	53·0	2·4	Do.
Chhola dal ...	9·58	23·66	4·30	60·02	2·44	Science Association.
Wheat	14·0	14·6	1·2	67·9	1·6	Gautier.
Flour	15·0	11·0	2·0	71·2	8	Parkes.
Do.	17·8	11·02	1·06	67·5	7	Science Association.
Atta	14·65	11·5	2·9	67·1	3·85	Medical College.
Barley	11·3	12·7	2·0	71·0	3·0	Parkes.
Pearl barley ..	14·7	7·3	1·1	75·8	1·0	Church.
Maize	13·5	10·0	6·7	64·50	1·4	Parkes.
Oatmeal	15·5	12·6	5·6	63·0	3·0	Do.
Arrowroot ...	15·5	·8	.	83·3	·27	Do
Paniphal meal ..	...	8·6	..	74·7	...	Medical College.
Khoi	...	5·7	..	50·0	...	Do.
Bread	40·0	8·0	1·5	49·2	1·3	Parkes.
Biscuits	8·0	15·6	1·3	73·4	1·7	Parkes.
Milk (human) ...	88·0	2·97	2·9	5·87	·16	Blythe.
Milk (Eng. cow) ...	86·8	4·0	3·7	4·8	·7	Do.
Do. (Indian cow) ...	86·87	3·97	4·28	4·82	·6	Science Association.
Do. (Bazar) ...	92·17	2·57	2·27	2·60	·39	Do.
Do (Skimmed) ...	88·0	4·0	1·8	5·40	·8	Lethby.
Do. (Buffalo) ...	81·9	4·4	9·0	4·8	·8	Watson.
Do. (Goat) ...	87·54	3·62	4·20	4·0	·56	Blythe.
Do. (Ass) ...	91·17	1·79	1·02	5·50	·42	Do
Do, (Sheep) ...	79·54	6·44	8·80	4·40	·82	Science Association.
Do. (Condensed) ..	24·94	9·68	8·90	54·53	1·95	Henner.
Do. (Nestles Swis) ...	15·30	9·98	8·85	63·70	2·17	Do.
Butter	7·5	·1·0	90·5	...	1·0	Bell.
Chhana	.	24·0	2·5	—	1·1	Medical College.
Do.	57·02	22·33	18·64	·38	1·63	Food and Drugs.
Cheese	36·0	31·0	28·5	...	4·5	Parkes.
Do. (Swiss) ...	34·6	33·5	25·0	...	3·8	Gautier.
Do. (Parmesan) ...	27·5	44·1	15·9	...	5·7	Do.
Cream	66·0	2·7	27·7	2·8	1·8	Lethby.
Do. (Devon) ...	28·67	4·05	65·01	1·72	·49	Blythe.
Beans (dry) ...	13·0	22·0	1·5	57·5	2·5	Gautier.
Do. French (dry) ...	16·0	22·5	2·0	58·0	2·4	Do.
Pottatoes	74·0	2·0	0·16	21·0	1·0	Parkes.
Do.	80·2	1·31	2·36	15·23	·9	A. K. Turner.
Cabbages ...	91·0	1·8	·05	5·8	·7	Parkes.
Do.	92·0	1·56	1·11	4·9	·42	A. K. Turner.
Cauliflowers ...	92·0	·5	...	2·0	·7	Gautier.
Do. ...	88·66	3·06	2·11	5·0	1·16	A. K. Turner.
Green vegetables ...	...	2·05	·34	5·33	...	Medical College.

(To be continued)

বিবিধ।

ইজিপ্টে প্রাচীন সভ্যতা।— সমস্ত সভ্যজগতেই ইজিপ্টের ব্যাপার স্বপ্ন দৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি দেবী ইজিপ্টের প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ব্রিটিশ স্কুল অফ আর্কিওলজি ইন ইজিপ্ট কর্তৃক একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল; এই প্রদর্শনীতে ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে; ইজিপ্টের কেইরো নগরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে একটি সমাধিক্ষেত্রে কতকগুলি গৃহস্থ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইজিপ্টের প্রাচীন মেম্ফিস নামক রাজধানী সংস্থাপনের পূর্ব্বের কোন রাজধানীতে এই সমাধিক্ষেত্র ছিল। পিরামিড নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই স্থানেই রাজধানী ছিল। ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের সভ্যতা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখনকার গৃহস্থ তৈজস বর্ত্তমান যুগের তৈজসের সম্পূর্ণ অনুরূপ। তখনকার বস্ত্রাদি, ঝাড়ি, চুবড়ি, শয্যা, শবাধার সম্পূর্ণ বর্ত্তমানের ন্যায় ছিল।

নূতন রাসায়নিক পরীক্ষাগার।—স্থানীয় রাসায়নিক কারখানার কর্তৃপক্ষগণের সুবিধার নিমিত্ত আলিপুরে একটি নূতন রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ করিবার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষাগারে সিমেণ্ট, তৈলাদির রং, কয়লা এবং ধাতব পদার্থাদি পরীক্ষা করিবার জন্য যন্ত্রাদি থাকিবে।

এজবেষ্টাস সিমেণ্ট শ্লেট।—এজবেসটাস (Asbestos) একরূপ অদাহ্য পদার্থ। ইহার সহিত সিমেণ্ট মিশাইয়া একরূপ শ্লেট প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহাদ্বারা ঘরের ছাদ প্রস্তুত হইতে পারে। এই শ্লেটের ছাদ অগ্নি, বৃষ্টি এবং অন্যান্য উৎপাত হইতে একবারে সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই শ্লেট, দৃঢ় কঠিন, এবং বহুকাল স্থায়ী।

তৈলের ইঞ্জিন।—কিছুকাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কয়লার খনির শ্রমজীবিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ফলে রেল গাড়ীর যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কালিডোনিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি এই জন্য কয়লার পরিবর্ত্তে পেট্রোল দ্বারা এঞ্জিন চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর আয়।—গত মে মাসে এই কোম্পানীর আয় মোট—২,৫৩,২৪৭ টাকা। গত বৎসর এই মাসে যাহা আয় হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এবৎসর ৭, ৩১৮ টাকা আয় অধিক হইয়াছে।

মরভি রাজ্যে মোটরকার নির্ম্মাণের কারখানা।—কাথিয়াওয়ার প্রদেশে দেশীয় লোকের কর্তৃত্বাধীনে সম্পূর্ণ আধুনিক একটি মোটরকার নির্ম্মাণের কারখানা পরিচালিত হইয়াছে। মরভিরাজ ঠাকুর সাহেব অনেক দিন হইতে এইরূপ একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারই যত্নে কারখানার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

ইহাতে যে সমস্ত গাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা বিলাতী অপেক্ষা উচ্চ না হইলেও কোন ক্রমেই হীন নহে।

ট্রেণের গতির হ্রাস।— আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া রেলওয়ে কোম্পানী সম্প্রতি আদেশ জারি করিয়াছেন যে তাঁহাদের রেলওয়ে সিষ্টেমের কোন কোন অংশে যাত্রী গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ৭০ মাইলের অধিকতর হইবেনা। আমাদের দেশে ডাকগাড়ির গতিই মাত্র ৪৫ মাইল।

বৃটানিক জাহাজ।— হোয়াইটষ্টার কোম্পানী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা যে ৫০,০০০ টন (১ টন=২৭ মণ) জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহার নাম "বৃটানিক্" রাখা হইবে। বৃটিশগণ কর্তৃক যত জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই বৃহত্তম হইবে। টাইটানিক যে দুর্ব্বিপাকে বিনিষ্ট হইয়াছিল, সেই সমস্ত ও অন্যান্য বিপৎপাত হইতে বৃটানিককে সম্পূর্ণ রক্ষা করিবার জন্য ইহার কল কব্জা ও নির্ম্মাণ প্রণালী উন্নত এবং বিভিন্নতর করা হইয়াছে। ইহাকে এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা হইবে যে যদি ইহার প্রকোষ্ঠ সংখ্যার ৬টিও ডুবিয়া যায় তাহা হইলেও ইহা ভাসিতে থাকিবে।

তার বিহীন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্রে চিত্র প্রেরণ।— ফ্রান্‌সেসকো ডি বাবুনকৃসি নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক ইটালীর জনৈক ব্যবসায়ীর পুত্র তারবিহীন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্রে চিত্র প্রেরণ করিবার চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছেন। প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র, হস্তাক্ষর ইত্যাদি প্রেরিত হইতেছে, এবং আসলের সহিত প্রেরিত চিত্রের প্রায় অবিকল সৌসাদৃশ্য থাকিতেছে।

রবারের ছিপিতে ছিদ্র করিবার সহজ উপায়। রবার কর্ক ছিদ্র করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। সময়ে সময়ে ছিদ্র করিবার যন্ত্র এক পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে এবং ছিদ্রও সোজা হয় না বক্র হয়। যদি ছিদ্র করিবার "পঞ্চ"তে ও রবারের ছিপিতে সামান্য এমোনিয়ার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ছিদ্র করা সহজ হয় এবং ছিদ্রও বেশ পরিষ্কার হয়।

গ্যাসের মান্ট্‌ল বা বার্ণার পরিষ্কার করিবার সহজ উপায়।— যদি ম্যাণ্ট্‌ল বা বার্ণার গ্যাসের শিখা লাগিয়া কাল হইয়া যায়, তাহা হইলে গ্যাস জ্বালিয়া দিয়া ম্যাণ্ট্‌ল বা বার্ণারে সাধারণ লবণ ছড়াইয়া দিলে, শিখা-জনিত যে কাল দাগ তাহা বিদূরিত হয় এবং আলোকও উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

"এক্সরে" প্রক্রিয়ায় যাঁহারা কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের সকলকেই অল্পাধিক পরিমাণে ইহার শক্তিতে আহত হইয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত আহত ব্যক্তির মধ্যে ফরাসী মহিলা শ্রীমতী ভিড্‌মান্‌ই প্রথম। ফরাসীদেশের মন্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে একটি পদক দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে

কোন হাসপাতালের এক্সরে পরীক্ষাগারে নিযুক্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার চর্ম্ম কঠিন হইতে আরম্ভ করে। গত বৎসর তাঁহার দুইটি হস্তই অস্ত্র প্রয়োগে ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য। কেননা হস্ত কাটিয়া বাদ দেওয়া হইলেও রোগের প্রতাপ নষ্ট হয় নাই।

পৃথিবীর দ্বাদশ সুবৃহৎ মস্তিষ্ক।—নিম্নে কয়েকটি ব্যক্তির নাম ও তাঁহাদের মস্তিষ্কের ওজন উল্লেখ করা হইতেছে, তাঁহারা প্রত্যেকই স্বনাম ধন্য পুরুষ। ওজনের পরিমাণ গ্রাম (gramme) হিসাবে। (১) আইভ্যান্ টুরজেনিফ (Ivan Tourgenief) রাসিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক— ২,১০২। (২) জোসেফ বাউনি (Joseph Bouny) ফরাসী জুরিষ্ট— ১,৯৩৫। (৩) জর্জ্জ কুভেয়ার (Georgе Cuvier) ফ্রান্সো জারমান প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ—১৮৩০। (৪) ই. এইচ নাইট (E. H. Knight) আমেরিকার কর্ম্মকার—১৮১৪। (৫) ফ্রাঞ্জ একস্ ক্রউস্ (Franz X Kraus) জর্ম্মান দেশীয় নীতিজ্ঞ পণ্ডিত—১৮০০। (৬) জন আবারক্রম্বি (John Abercrombie) স্কটল্যাণ্ডের ডাক্তার—১৭৮৬। (৭) বেঞ্জামিন এফ বাটলার (Benjamin F. Butler) আমেরিকার রাজ নীতিজ্ঞ—১৭৫৮। (৮) এডওয়ার্ড অল্নি (Edward. Olney) আমেরিকার গণিত শাস্ত্রজ্ঞ—১৭০১। (৯) হারমান্ লেভি (Herman Levi) জার্ম্মান দেশীয় লেখক—১৬৯০। (১০) এ উইঞ্চেল (A. Winchell) আমেরিকার ভূতত্ত্ববিৎ —১৬৬৬। (১১) উইলিয়াম এম থ্যাকারি (William M Thackery) ইংরাজ ঔপন্যাসিক—১৬৫৮। (১২) রুডলফ্ লেন্জ (Rudolf Lenz) জারমান লেখক ১৬৩৬।

দান।—Natural History of Museum of Parisএর কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রায় ৫৫০০০ টাকা কোন এক অজ্ঞাত নামা বদান্য পুরুষ দান করিয়াছেন। প্রাণি-বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের উন্নতি কল্পে এই টাকা ব্যয়িত হইবে।

দান।—মিষ্টার টি জেফার্সন্ কুলিজ্, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্ম্মাণ কল্পে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

এইরোপ্লেনে তার বিহীন তড়িৎ বার্ত্তা।—সামরিক বিভাগ সম্প্রতি এইরোপ্লেন বা ব্যোমযানের যাত্রীর সহিত তার-বিহীন-তড়িৎ-বার্ত্তা-প্রেরণ-যন্ত্র দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করিবার চেষ্টায় সফল কাম হইয়াছেন।

অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।— জর্ম্মাণ দেশীয় একটি সংবাদ পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হইয়াছে— কোন এইরোপ্লেন হইতে একটি সোনার ঘড়ি ও চেন হারাইয়া গিয়াছে। [illegible] নামক স্থানের মাঠে কোন ক্ষেত্রের রাইয়ের গাদায় পড়িবার সময় ইহাকে [illegible] দেখা গিয়াছে। প্রত্যর্পণকারীকে রীতিমত পুরস্কার করা হইবে।

নূতন ধূমকেতু।—হারভার্ড কলেজের মানমন্দির হইতে অধ্যাপক গেল, এবং সিডনে (Gale & Sydney) [illegible] সেপ্টেম্বর একটি নূতন ধূমকেতু লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

বায়স্কোপের চলন্ত মূর্ত্তি ও তন্নিহিত কথোপকথন।— কলিকাতায় বায়স্কোপ কোম্পানী গত বৎসর মধ্যে মধ্যে "ফিল্‌মের" সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ভাবে গ্রামোফনের সঙ্গীত যোজনা করিয়াছিলেন যে মনে হইত যেন ফিলমের লোকেরাই গান গাহি-তেছে। সম্প্রতি আমেরিকায় ফিল্‌মের চিত্রের সহিত এরূপভাবে গ্রামোফোন সংযোজিত হইতেছে যে যেন ফিলমের চিত্রেরাই কথা কহিতেছে বলিয়া মনে হয়।

ধাতব পাত্র সহজে পালিশ করিবার উপায়।— সাধারণ প্রস্তরের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণের সহিত তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া কাদার ন্যায় করত ধাতব পাত্রে লাগাইলে পাত্রের গাত্রে "কলঙ্ক" বা অন্য দাগ (oxides or sulphides) বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়া যায়। এই মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা পাত্রটি মার্জ্জিত করিয়া পাত্রের গাত্র হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া অতঃপর শুষ্ক কাপড় বা ভেল্‌ভেট দ্বারা ঘসিয়া লইলে পাত্রের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হয়।

কাচের ভঙ্গুরতার অপনোদন।— কাচ এরূপ ভঙ্গপ্রবণ কেন? কাচের উত্তপ্ত উপাদান সমূহকে সহসা শীতল করা হয় বলিয়াই কাচ এরূপ ভঙ্গুর হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন পদার্থ ক্রমাগত নাড়াচাড়া করিলে তাহার অণুগুলি ক্রমশঃ নূতনতর ভাবে সজ্জিত হইয়া পড়ে। কাচেও এইরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সাধারণ লবণের ক্ষীণ জলীয় দ্রাবণে কাচকে ফুটাইয়া লওয়া হয় অতঃপর অতি ধীরে ধীরে শীতল করা হয় তাহা হইলে ইহার অণুগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত হয় যে, কাচের ভঙ্গুরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। সাধারণ কাচের পাত্র এরূপ ভাবে ফুটাইয়া লইলে ইহাদের ব্যবহার ততটা ক্ষতিজনক হয় না।

জার্ম্মানীর বিদুষী স্ত্রী-মণ্ডলী।— উক্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে সম্প্রতি সর্ব্ব সমেত ২,৯৬৮ জন ছাত্রী রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫৩৯ জন প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্র, ৭২৫ জন চিকিৎসা শাস্ত্র ৭৪ জন কৃষি শাস্ত্র ২৮ দন্ত চিকিৎসা শাস্ত্র, এবং ৭ জন ভেষজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। অবশিষ্ট সাহিত্য ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি।

বায়স্কোপের উপকারিতা।— বেলগ্রেডের আমেরিকান রাজদূত লক্ষ্য করিলেন যে স্থানীয় লোকে আমেরিকা দেশজাত টুপী, জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করিবার জন্য দিন দিন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছে। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বায়স্কোপে লোকে আমেরিকা দেশজাত "ফিল্‌ম্" দেখিয়া পোষাক পরিচ্ছদে আমেরিকানদের অনুকরণ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মতে কোন দেশের উন্নতি করিতে হইলে দেশের সকলকে কোন এক উন্নত দেশের আচার ব্যবহার বাণিজ্য কৃষি-প্রণালী এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার বায়স্কোপ সহযোগে দেখাইতে পারিলে দেশের লোকে সহজে সেই সমস্ত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া নিজেদের অবস্থা বা শিক্ষা প্রভৃতিও উন্নত দেশের অনুযায়ী করিয়া লইতে পারে।

প্রাপ্তি স্বীকার।— আর্য্যাবর্ত্ত— শ্রাবণ ১৩১৯ ; আলোক— অগ্রহায়ণ ১৩১৮ ; অবসর— ভাদ্র ১৩১৯ ; আলোচনা— ভাদ্র ১৩১৯ ; অর্ঘ্য— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ; অর্চ্চনা— আশ্বিন ১৩১৯ ; আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী— শ্রাবণ ১৩১৯ ; অলৌকিক রহস্য— ভাদ্র ১৩১৯ ; ভারতী— ভাদ্র, ১৩১৯ ; ভারত মহিলা — জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ; ভক্তি— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ ; বামাবোধিনী — আশ্বিন ১৩১৯ ; বসুধা— ভাদ্র ১৩১৯ ; বঙ্গদর্শন— ভাদ্র ১৩১৯ ; ব্যবসা ও বাণিজ্য— বৈশাখ, ১৩১৯ ; বঙ্গরত্ন— ; চিকিৎসাসম্মিলনী— চৈত্র, ১৩১৮ ; চিকিৎসা প্রকাশ— ভাদ্র ১৩১৯ ; The Calcutta University Magazine— Aughst, 1912; দেবালয়— আশ্বিন, ১৩১৯ ; The Dawn & Dawn Society's Magazine— October, 1912 ; Food and Drugs— No. 3 vol. II ; গৃহস্থ— ভাদ্র ১৩১৯ ; Hindu Spiritual Magazine— Sepmember, 1912. হিন্দুসখা— ভাদ্র ১৩১৯ ; হিতবাদী— ; হিন্দুপত্রিকা— ভাদ্র ১৩১৯ ; জগজ্জ্যোতিঃ— ভাদ্র, ১৩১৯ ; জন্মভূমী— আষাঢ, ১৩১৯ ; কুশদহ— আশ্বিন, ১৩১৯ , কৃষক— শ্রাবণ, ১৩১৯ ; কর্ম্মকার বন্ধু— আষাঢ, ১৩১৯ ; কোহিনুর— শ্রাবণ, ১৩১৯ ; কাজের লোক— April, 1912 ; কায়স্থ পত্রিকা— আশ্বিন, ১৩১৯ ; কৃষি সম্পদ— আষাঢ, ১৩১৯ ; মহাজন বন্ধু— শ্রাবণ, ১৩১৯ ; মেদিনীপুর হিতৈষী— ; মুকুল— ভাদ্র, ১৩১৯ ; নির্ম্মাল্য— বৈশাখ, ১৩১৯ ; নব্যভারত— শ্রাবণ, ১৩১৯ ; নাট্য-মন্দির— আষাঢ, ১৩১৯ ; প্রকৃতি— ভাদ্র, ১৩১৯ ; প্রসূন— ; পল্লিচিত্র— ভাদ্র, ১৩১৯ ; প্রজাপতি— ভাদ্র, ১৩১৯ ; পতাকা — আষাঢ, ১৩১৯ ; প্রতিভা— ভাদ্র, ১৩১৯ ; রংপুর সাহিত্য-পারিষৎ পত্রিকা— ৬ষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা ; শান্তিকণা — ফাল্গুণ, ১৩১৮ ; সমাজ— জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ ; সাহিত্য-সম্বাদ— আশ্বিন, ১৩১৯ ; শিল্প ও সাহিত্য— আষাঢ, ১৩১৯ ; স্বাস্থ্যসমাচার — আশ্বিন, ১৩১৯ ; সাহিত্য সংহিতা — আষাঢ, ১৩১৯ ; সঞ্জীবনী— , তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— আশ্বিন ১৩১৯ ; ত্রিশূল— ; তত্ত্বমঞ্জরী— শ্রাবণ ১৩১৯ ; উদয— ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা ; উপাসনা— ।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) . নভেম্বর, ১৯১২। (১১শ সংখ্যা।

জমীর উর্ব্বরতা।

জমীর উর্ব্বরতা শব্দের অর্থ কি? সাধারণ কৃষকের মতে ইহার অর্থ এই যে, জমীর যে শক্তির জন্য তিনি খাজনা প্রদান করেন, তাহাই জমীর উর্ব্বরতা। এই কারণেই কোনও জমীর খাজনা বিঘা প্রতি ৬৲ টাকা, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তীর জমীর খাজনা ॥৵০ আনাও নহে। বস্তুতঃ খাজনার হারই জমীর উর্ব্বরতা শক্তির প্রতিপাদক নহে। যে সমস্ত জটীল উপাদানের সন্নিবেশে জমী উদ্ভিদের প্রাণ ধারণ ও পোষণ উপযোগী খাদ্যে পূর্ণ থাকে জমীর আভ্যন্তরিক গঠন যেরূপ হইলে আদ্রতা সর্ব্বত্র সমান ও অক্ষুন্ন থাকে, যে বিশেষ জান্তব ও উদ্ভিজ্জ প্রাণী থাকিলে জমীর উপাদান সমূহকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উদ্ভিদের খাদ্য উপযোগী করিতে পারে,--এইরূপ নানাবিধ ব্যাপারই জমীর উর্ব্বরতা শক্তির প্রতিপাদক। উদ্ভিদ পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহের মধ্যে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থই প্রধান। কৃষক ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই উপাদানের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, কেননা যে সমস্ত কারণে জমীতে এই উপাদানের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, সেই সমস্ত কারণ কৃষক ইচ্ছা করিলে বিদুরিত বা সংবর্দ্ধিত করিতে পারেন। নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য পদার্থও জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়, যেমন ফসফরিক দ্রাবক এবং পটাশ। কিন্তু এই সমস্ত উপাদান জলে অতি অল্প দ্রবীভূত হইয়া জমী হইতে পরিবাহিত হইয়া যায়। কাজেই ইহাদের অপেক্ষা নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

নাইট্রোজেন একরূপ বায়বীয় পদার্থ,—আমাদের বায়ু-মণ্ডলের প্রায় ৪/৫ অংশ নাইট্রোজেন। ইহাতে এরূপ মনে হইতে পারে যে, যখন বৃক্ষাদি স্বতঃই বায়ু-মণ্ডলের সংস্পর্শে আসিয়া থাকে, তখন ইহাদের কখনই নাইট্রোজেনের অভাব হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, মৃত্তিকাতেও বায়ু মিশ্রিত থাকে, অর্থাৎ মৃত্তিকাতেও প্রচুর বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন বর্ত্তমান থাকে কিন্তু উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলস্থিত এরূপ বিশুদ্ধ বায়বীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু নাইট্রোজেন ঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ পরিশোষণ করিয়া পুষ্টি সাধন করিতে পারে। এই সমস্ত নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের মধ্যে সোরা, আমোনিয়া ইত্যাদিই প্রধান।

আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করিয়াছেন যে এমন কতকগুলি আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ রহিয়াছে যাহারা অনায়াসে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ উৎপাদনে সহায়তা করিতে পারে। এই সমস্ত আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের ইংরাজী নাম ব্যাকটিরিয়া (bacteria)। অবশ্য ব্যাকটিরিয়া মাত্রেই নাইট্রোজেনের পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতে পারে না। যাহারা এরূপ করিতে পারে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে। এক প্রকার ব্যাকটিরিয়া জমীর নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সমূহ হইতে নাইট্রোজেনকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে, এবং অন্য প্রকার বায়ু-মণ্ডলের নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগিকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। কোন্ বিশেষ জমীতে এই দুইটির কোন্‌টি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন তাহা জমীর মাটীর অবস্থার উপর নির্ভর করে। এবং ইহা হইতেই জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বা জমী কতকাল ফসল উৎপাদন করিতে পারে তাহা নির্ণীত হইয়া থাকে।

কৃষিকার্য্যে মাটীর পাটে তিনটি বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে কৃষকগণ জমী কর্ষণ করিয়া ইহার প্রাথমিক সংস্কার করেন। ইহার ফল এই যে, জমীতে বাস্তবিক যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ত্তমান থাকে সেগুলি মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী হয়, এবং মাটী শিথিল হইয়া যায় বলিয়া শস্যের কোমল মূল অনায়াসে মাটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কর্ষণের উপকারিতা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক কৃষকেই এ সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ। মৃত্তিকার প্রথম সংস্কার সম্পন্ন হইলে, যদি অভিজ্ঞ কৃষক বুঝিতে পারেন যে, যে শস্য উৎপাদিত হইবে, সেই শস্যের উপযুক্ত সার মাটীতে নাই, তাহা হইলে মাটীতে পুনরায় সার প্রক্ষেপ করিয়া মাটীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করেন, এবং তৃতীয়তঃ মাটীকে বৃক্ষের বীজ বপনের উপযোগী করেন। প্রত্যেক পতিত জমীই অনুর্ব্বর নহে, সেই জমী হয়ত যথেষ্ট উর্ব্বর কিন্তু তাহার উর্ব্বরতা শক্তির চিহ্ন সমূহ জমীর উপরিভাগে বর্ত্তমান নাই। গভীর কর্ষণ করিলে তবে জমীর সার পরিস্ফুট হইতে পারে। কৃষিকার্য্য সাধারণতঃ দুই প্রকার, ধ্বংশ প্রবণ এবং রক্ষণ প্রবণ। দুইটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাউক।

আমেরিকার সমতল ভূভাগে প্রথম ঔপনিবেশিকগণ দেখিলেন যে, জমীর মাটী ৪।৫ ফিট অভ্যন্তর পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। ইহার শতকরা $\frac{১}{২}$ নাইট্রোজেন। প্রায় ১০০ শত বৎসর যাবৎ এই সমস্ত জমীর উর্ব্বরতা শক্তি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। যদি মনে করা যায় যে কৃষ্ণ মৃত্তিকার গভীরতা মাত্র ৩ ফিট তাহা হইলে বিঘা প্রতি প্রায় ১০,০০০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন রহিয়াছে, অর্থাৎ এই নাট্রোজেনে ৫০০ শত বার অনায়াসে একইরূপ ও একই পরিমাণ শস্যোৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমেরিকান কৃষক ৫০০ শত বার শস্যোৎপাদন না করিতে করিতেই জমীর নাইট্রোজেন পরিমাণ অল্পতর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ কৃষিকার্য্য ধ্বংশ প্রবণ।

ইউরোপের পুরাতন জমী সমূহে অন্ততঃ একশত বৎসর কৃষিকার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ইউরোপের কৃষকগণ এক উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া কৃষিকার্য্য চালাইয়া থাকেন। এই প্রথায় কৃষিকার্য্য পরিচালন করায় এই ফল হইয়াছে যে, জমীর উর্ব্বরতা শক্তি প্রাচীন কালের ন্যায় এখনও সম্পূর্ণ সমতুল্য হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা জমীতে প্রথমে শালগাম চাষ করিলেন সেই শালগাম জমীতেই নষ্ট হইল অথবা জমী হইতে উপযুক্ত স্থানে অপসারিত করিয়া ও তাহাকে সারে পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় জমীতে দেওয়া হইল। ইহার পরে যব বপন করা হইল। এই যব কৃষক গ্রহণ করিলেন। পরে এই যবের জমীতে ক্লভার বপন করা হইল। এই ক্লভারকেও পূর্ব্ব নিয়মানুসারে জমীতে সারে পরিণত করিবার পর গম বপন করা হইল। এই গম কৃষক গ্রহণ করিলেন। কৃষক-সম্প্রদায় গম এবং যব ব্যতীত অন্য দুই প্রকার উৎপন্ন শস্য যাহাতে কৃষকগণ গ্রহণ না করেন, তৎসম্বন্ধে আপনাদিগের মধ্যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়া লয়েন। এইরূপে রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় হইতে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বা জমীর নাইট্রোজেন পরিমাণ সমান রহিয়াছে। অধিকন্তু কৃষকগণ সার প্রয়োগে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপে ইউরোপের জমী সমূহে পূর্ব্বে যত শস্য উৎপাদিত হইত, এখন তদপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপীয় কৃষকগণ জমীর এরূপ ভাবে পাট করেন, জমীতে এরূপ সার প্রয়োগ করেন, জমীর জন্য এরূপ যত্ন লইয়া থাকেন যে, জমী অপনা হইতেই উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী নাইট্রোজেন উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। এই সমস্ত জমী হইতে ক্রমাগত শস্য উৎপাদিত হইলেও জমীর উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে একরূপ ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সমূহ হইতে নাইট্রোজেনকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে এবং অন্যরূপ বায়ু-মণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃক্ষের খাদ্যোপযোগী করে। যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ফেলে, তাহারা জমীর অব্যবহৃত নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ হইতে নাইট্রোজেন বিদূরিত করে। ইহাতে এই ফল হয় যে, জমীতে

প্রচুর সার ঢালিলেও জমীর উর্ব্বরতা ক্রমশঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় না। ইউরোপীয় কৃষকগণ ইহা লক্ষ্য করিলেন। যাহাতে এইরূপে সারের অপচয় না হয়, তাহার উপায় অনুধাবন করিতে লাগিলেন। নানারূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে জমীতে উপরোক্ত দুই প্রকার ব্যাকটিরিয়া বর্ত্তমান থাকে বায়ু-মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে খাদ্যে পরিণত করিবার জন্য যে ব্যাকটিরিয়া থাকে, তাহার শক্তির নিমিত্ত প্রচুর অঙ্গারমূলক পদার্থের প্রয়োজন। একটা পতিত ভূমীতে আগাছা প্রচুর উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু শস্য উৎপাদন কেন সম্ভব হয় না, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, পতিত জমীতে যে সমস্ত বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, তাহারা সেই স্থানেই নষ্ট হয়। কাজেই ব্যাকটিরিয়া প্রচুর অঙ্গার মূলক পদার্থ প্রাপ্ত হয়, এবং আকাশের নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃক্ষের খাদ্যোপযোগী করে। এই জন্য আজকাল তাঁহারা প্রযোজনীয় শস্য উৎপাদনের পূর্ব্বে জমীতে অন্য উদ্ভিদ উৎপাদন করিয়া তাহাকে জমীতেই রাখিয়া দিয়া ব্যাকটিরিয়ার শক্তি বৃদ্ধির জন্য অঙ্গার মূলক পদার্থের প্রচুর সন্নিবেশ করেন।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে কেবল সার প্রয়োগ করিলেই জমীতে শস্য উৎকৃষ্ট হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। যাহাদের দ্বারা এই সমস্ত খাদ্য বৃক্ষের উপযোগী হইতে পারে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিলেই উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, জমীর মৃটীকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া লইলে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপে উত্তপ্ত করিলে জমীর অনিষ্টকারক পদার্থ সমূহ বিনষ্ট হয়। কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে জমীতে যথেষ্ট সার দেওয়া হইতেছে তথাপি তাহা হইতে উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে জমীর নাইট্রোজেন পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার শক্তি নাই। এরূপ হইলে জমীকে একবার রীতিমত উত্তপ্ত করিয়া লইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

আমাদের দেশের জমী উর্ব্বরতা শক্তির জন্য চির প্রসিদ্ধ। এইরূপ দেশে যদি কৃষকবর্গের পৃষ্ঠপোষকগণ সামান্য দুই একটি বিষয়ে কৃষকগণকে কি করিলে ফসল ভাল হইবে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে শস্যের অশেষবিধ উন্নতি হইতে পারে। পুসা কৃষি বিদ্যালয় হইতে সময়ে সময়ে পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত পুস্তিকায় জমী ও মাটী সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট থাকে। কৃষকবর্গের পৃষ্ঠপোষকগণ অনায়াসে তাহা পাঠ করিয়া কৃষকগণের কৃষিকার্য্যে প্রচুর সহায়তা করিতে পারেন, এবং নিজেও প্রভূত লাভবান হইতে পারেন।

জীবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

অনেকেই ইতর জীবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কথা শুনিয়াছেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কি ?— সার হাইরাম মাক্সিমের মতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যতীত ইহা অপর এমন একটি ইন্দ্রিয় যে ইহার দ্বারা নিকটবর্ত্তী কোন পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইতর জীব লইয়া এই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এমন কি কোন কোন জীবের পরে পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এক একটি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিয়া দিলেও, ইহারা সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্ব অবস্থায় নিটবর্ত্তী পদার্থের অস্তিত্ব জানিতে পারে ও বিপদ হইতে দূরে অপসারিত ও খাদ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইটালীর শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ল্যাজারো স্প্যালান্‌জানি প্রথমে এই ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে অন্যান্য জীব অপেক্ষা বাদুড়ের এই শক্তি অপেক্ষাকৃত প্রখরতর। তিনি বহুকাল পর্য্যবেক্ষণের পর স্থির করিলেন যে, যে সমস্ত বাদুড়ের চক্ষু ক্ষুদ্রতর, তাহাদেরই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রখরতর। এবং যে সমস্ত বাদুড়ের চক্ষু এত ক্ষুদ্র যে অন্ধকারে তাহারা কোন প্রয়োজনেই লাগে না. সেই সমস্ত বাদুড়েব ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এই ক্ষুদ্র চক্ষু ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট বাদুড়গুলির আকৃতিও প্রায় ক্ষুদ্র এবং ইহারা অতি ঘন ঘন পক্ষ সঞ্চালন করিয়া থাকে।

স্প্যালান্‌জানির পরে অনেকেই এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন কিন্তু ফারাসী দেশীয় জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ব্যারণ কুভেয়ারের পবীক্ষার ফলই সর্ব্ববাদীসম্মত। তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে ঘোর অন্ধকারে অতি তীক্ষ্ণ চক্ষুও কোন পদার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই স্থানেও পক্ষ সঞ্চালন করিয়া অতি ক্ষুদ্র-চক্ষু বাদুড় অনায়াসে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে পারে, অথচ কোন পদার্থে আহত হয় না। ইহার কারণ এই যে তাহাদের স্পর্শ শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং ইহা পাতলা চর্ম্মবৎ একটা আবরণে সঞ্জাত হয়, ও এই আবরণ পক্ষ মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকে। এই পক্ষীর স্পর্শ শক্তি স্বভাবতঃই অতিশয় সূক্ষ্ম, এবং পক্ষগুলি স্নায়ু দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। এই স্নায়ুসমূহের শাখা প্রশাখা সমূহের প্রান্তে একটি করিয়া ছিদ্র বা loop রহিয়াছে। মানবের যে সমস্ত স্থানে স্পর্শশক্তি অতি তীক্ষ্ণ সেই সমস্ত স্থানের স্নায়ু সমূহের প্রান্তেও এইরূপ এক একটি ছিদ্র থাকে। এই সমস্ত স্নায়ুর উপরিভাগে কণ্টক শ্রেণী থাকে এই কণ্টকগুলি মানবের জিহ্বার কণ্টকের ন্যায়। খুব সম্ভবতঃ এই কণ্টকগুলিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। কোন কোন স্থলে এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পক্ষতলে সন্নিবিষ্ট না হইয়া মুখের উপরে সন্নিবিষ্ট থাকে। আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার নামক বাদুড়ের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহাদের এই ষষ্ঠইন্দ্রিয় নাসিকার অগ্রভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং ইংরাজীতে ইহাকে "shield" বলে। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদুড় উড়িয়া উড়িয়া

পতঙ্গ ইত্যাদি ভক্ষণ করে, তাহাদের কর্ণের পার্শ্বে দুইটি পত্রবৎ আবরণ থাকে। এই পত্র অনেকটা ভক্ষিত পতঙ্গের পক্ষের ন্যায়। অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অতি তীক্ষ্ণ এই ইন্দ্রিয় মুখ-মণ্ডলের কোন কোন স্থানে সন্নিবিষ্ট থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে সমস্ত বাদুড়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রহিয়াছে তাহারা সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি, এবং প্রতি সেকেণ্ড সময়ে তাহারা অন্ততঃ ১০।১২ বার পক্ষ সঞ্চালন করিয়া থাকে। আমরা জানি কোন পদার্থ কাম্পিত হইলে শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। এক সেকেণ্ডে কোন পদার্থ ১০।১২ বার কম্পিত হইলেও শব্দ উত্থিত হয় বটে, কিন্তু শব্দ এত ক্ষীণ যে তাহা মানবের কর্ণগোচর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু এই কম্পন অতি অল্প সংখ্যক হইলেও শব্দ জনিত কম্পন যেরূপ বায়ুর মধ্য দিয়া পরিচালিত হয়, ইহাও সেইরূপ পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কম্পন পরিচালিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থে আহত হয় এবং আহত হইয়াই ইহা প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রত্যাবর্ত্তনের বেগ বা প্রকৃতি, কম্পন যেরূপ পদার্থে আহত হইয়াছিল, সেই পদার্থের প্রকৃতি এবং অবয়ব অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং প্রত্যাবর্ত্তিত কম্পন বাদুড়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ফেলে। কাজেই কোন্ কোন্ পদার্থ বা কিরূপ পদার্থ হইতে কম্পন আসিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে। এইরূপে বাদুড় চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পদার্থের আকৃতি প্রকৃতির উপলব্ধি করে। অবশ্য কম্পন প্রেরণ ও কম্পন প্রতিগ্রহণ এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান এক সেকেণ্ডের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

সার হাইরাম মাক্সিম্ এইরূপ ৬ষ্ঠ ইন্দ্রিয় অর্ণবপোত সমূহে ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ইহার জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাদুড়ের পক্ষের যেরূপ প্রতি সেকেণ্ডে ১০।১২ কম্পন হয়, ইহার দ্বারাও সেইরূপে প্রতি সেকেণ্ড ১০।১২ বার কম্পন সঞ্জাত হইতে পারে। কিন্তু এই কম্পন উৎপাদন করিবার জন্য বাদুড়ের যেরূপ অতি অল্প শক্তির প্রয়োজন হয়, তিনি সেইরূপ না করিয়া ইহাতে ২০০ বা ৩০০ অশ্বের শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি এই কম্পন দ্বারা বায়ু মণ্ডলে এমন তরঙ্গ উৎপাদন করিবেন যে সেই তরঙ্গের শক্তি ও বিস্তার বাদুড়ের কম্পনের শক্তি ও বিস্তার অপেক্ষা অন্ততঃ পক্ষে ১,০০,০০০ গুণ অধিকতর হইবে। এই কম্পনের শক্তি যথেষ্ট বটে, কিন্তু সংখ্যা অল্প বলিয়া আমাদের কর্ণ এই কম্পন গ্রহণ করিয়া শব্দ উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের শক্তি এত প্রচুর যে অনেক দূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকে কম্পিত করিতে পারে এবং অন্ততঃ ২০ মাইল দূর পর্য্যন্ত অনায়াসে পরিভ্রমণ করিতে পারে।

তিনি তিনটি বিভিন্ন যন্ত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। একটির দ্বারা প্রয়োজনীয় বায়বীয় কম্পন প্রেরিত হইবে, অন্যটির দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তিত কম্পন প্রতিগৃহীত হইবে, এবং

তড়িৎকোষ সংযুক্ত ঘণ্টা ধ্বনীর দ্বারা কম্পন যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে তাহা প্রচার করিবে। এবং তৃতীয়টির দ্বারা কম্পন জনিত বায়ুতরঙ্গের বিস্তার লিখিত হইবে। হাইরাম এই যন্ত্র এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে, যে পদার্থ হইতে কম্পন প্রত্যাবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার আকৃতি ও দূরতা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য এখনও যন্ত্রটি সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে পরীক্ষাকালেই যেরূপ আশাতীত ফল লাভ হইতেছে, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে অচিরকাল মধ্যে এই যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ ও যন্ত্র নির্দ্দোষ হইবে। গত টাইটানিক ধ্বংশের বহু পূর্ব্বে তিনি এইরূপ যন্ত্রের কথা লোক সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন লোকে তাঁহার কথায় তত কর্ণপাত করেন নাই। বর্ত্তমানে অনেকের এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহার উন্নতিকল্পে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। যদি এ যন্ত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে অর্ণবযাত্রায় একটা ভয়ঙ্কর বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথ পরিষ্কৃত হইবে। যাহা হউক বাদুড়ের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া যদি পণ্ডিত হাইরাম ম্যাক্‌সিম্ এই যন্ত্র সম্পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মানবের যে কল্যাণ সাধন করিয়া যাইবেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম চিরকীর্ত্তিত থাকিবে।

সেলুলয়েড।

রসায়ন-শাস্ত্রে অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেলুলয়েড তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নিত্য ব্যবহার্য্য বহুবিধ পদার্থ উৎপাদনের জন্য সেলুলয়েড প্রয়োজন, এমন কি অধিকাংশ বিলাসের উপাদানও সেলুলয়েড হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সমস্ত পদার্থ—শৃঙ্গ, কচ্ছপ পৃষ্ঠ, কাচ, রবার, কাগজে বা কার্ডবোর্ডে প্রস্তুত হইত, এখন সেই সমস্ত পদার্থ সেলুলয়েডে প্রস্তুত হইতেছে। এমন কি বিলাসিগণের গলবন্ধ (collars) প্রস্তুত করিবার জন্যও সেলুলয়েড প্রয়োজনীয়। সেলুলয়েডকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ বা সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ, চিক্কণ বা অচিক্কণ, নমনীয় বা ভঙ্গুর; শুভ্র বা রঞ্জিত করা এবং ছাঁচ দ্বারা ইহা হইতে ইচ্ছানুরূপ যে কোন প্রকার গঠন প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ দৈবাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেলুলয়েডএর আবিষ্কারও প্রায় দৈবঘটিত। ইহা আবিষ্কৃত হইবার পরেই ইহার উৎপাদন প্রণালী এরূপ সুসংস্কৃত ও সুনিয়মিত করা হইয়াছিল যে, ইহার আবিষ্কারের পর প্রায় ৩০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই ৩০ বৎসরের মধ্যে ইহার উৎপাদনের প্রথম

আবিষ্কৃত প্রণালীর কোনরূপ উন্নতি বিধান, বা কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হয় নাই। আজকাল সেলুলয়েডএর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার জন্য নানাবিধ পদার্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে বটে, তথাপি সেলুলয়েডের পরিমাণ বৎসর বৎসর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেলুলয়েডের এই সমস্ত প্রতিদ্বন্দীরও কার্য্যের অভাব হয় নাই, তাহাদেরও প্রয়োজনীয়তা সেলুলয়েডের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং পাশাপাশি অনেক কারবার সমভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে।

১৮৬৫ বারমিংহাম নিবাসী পার্ক স্। (Parkes) গানকটনের (guncotton) সহিত ন্যাপথা (naptha) এবং উদ্ভিজ্জ তৈল (vegetable oil) মিশ্রিত করিয়া একরূপ নমনীয় পদার্থ উৎপাদন করেন। এই পদার্থ তাপ এবং তড়িৎ অপরিচালক বলিয়া বাজারে বেশ চলতি হইয়াছিল, কিন্তু ইহা উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত ব্যয় হইত। বাজারে সেলুলয়েড আসিয়া উপস্থিত হইলে, অতঃপর পার্ক স্ এর এই অপরিচালক পদার্থ বাজার হইতে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। কেননা সেলুলয়েড উৎপাদনে উক্ত পদার্থ অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয় হইয়া থাকে। আমেরিকার বিখ্যাত মুদ্রাকর হায়াট্ ব্রাদার্স (Hyatt brothers, American Printers), মুদ্রাযন্ত্রে কালী দিবার রোলারের জন্য জিলাটিনের পরিবর্ত্তে অন্য কোন্ পদার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে যাইয়া নাইট্রেটেড কটন (nitrated cotton) সুরাসার (alcohol) এবং কর্পূর মিশ্রিত করিলেন, এবং এই মিশ্রণ হইতে তাঁহাদের মনোমত পদার্থ উৎপাদন করিলেন। সুরাসার বাষ্পীভূত হ য়া যাইলে সর্ব্বত্র সমনিবীড়তা-বিশিষ্ট, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক পদার্থ উৎপাদিত হইল,—ইহারই নাম সেলুলয়েড।

সেলুলয়েড যে বাস্তবিক কোন্ কোন্ পদার্থে উৎপাদিত হইতে পারে তাহার স্থিরতা নাই, এবং ইহার রাসায়নিক গঠনও আজপর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ইহাতে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। রেড়ির তৈল প্রয়োগ করিলে ইহা বেশ নমনীয় হয়, ইহাতে কর্পূরের পরিবর্ত্তে ঐ জাতীয় অল্প মূল্যের পদার্থও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ইহাকে অগ্নিতে অদাহ্য করিবার জন্য ইহাতে অদাহ্য পদার্থ যথা লবণ ইত্যাদি প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহাকে রঞ্জিত করিবার জন্য ইহাতে নানাবিধ বর্ণের পদার্থ মিশ্রিত করা যাইতে পারে। সেলুলয়েড আজকাল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহার উৎপাদনের ভিত্তিভূমি নাইট্রোসেলুলোজ (nitrocellulose) এবং কর্পূর।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সেলুলয়েড একবারেই ন্যাকড়া, বস্ত্রখণ্ড, বা কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রথমে সাধারণ তুলা বা অতি পাতলা কাগজ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। এই তুলা বা কাগজকে নাইট্রোসেলুলোজে (nitrocellulose) পরিবর্ত্তন করা হয়। এইরূপ করিবার জন্য বিশুদ্ধ নাইট্রিক

দ্রাবক ও বিশুদ্ধ সালফিউরিক দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া তাহাতে তুলা বা কাগজ সিক্ত করিয়া রাখিতে হয়। নাইট্রিক দ্রাবকে সালফিউরিক দ্রাবক মিশ্রিত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তুলা বা কাগজের উপর নাইট্রিক দ্রাবকের ক্রিয়াজনিত যে জলীয় অংশ উৎপাদিত হয়, সেই জলীয় অংশ এই সালফিউরিক দ্রাবক শোষণ করিয়া ফেলে। সালফিউরিক দ্রাবকের এই ক্ষমতা রাসায়নিক মাত্রেই অবগত আছেন। তুলা বা কাগজকে এইরূপে নাইট্রিক দ্রাবকের ক্রিয়ায় আনয়ন করাকে ইংরাজীতে নাইট্রেশন্ (nitration) কহে। এই নাইট্রেশন্ প্রণালী পরিচালন করিবার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কেননা সামান্য অসাবধান হইলেই যাবতীয় প্রক্রিয়া একবারে বিনষ্ট হইতে পারে। সাধারণতঃ মৃত্তিকার পাত্রে বা কোন বিশেষ পাত্রে এই নাইট্রেশন্ কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। উক্ত কার্য্যের জন্য যে সমস্ত পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাদের উপকারিতা এই যে তুলায় নাইট্রেশন্ কার্য্য হইয়া যাইবা মাত্র, দ্রাবককে নাইট্রেটেড তুলা হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলা যাইতে পারে। নাইট্রেশনে যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণ দ্রাবক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে নাইট্রিক এসিডে শতকরা ৬১ ভাগ বিশুদ্ধ নাইট্রিক এসিড রহিয়াছে, তাহার ৪ পাউণ্ড বা প্রায় ⁄২ সের এবং যে সালফিউরিক দ্রাবকে শতকরা ৯৫ ভাগ বিশুদ্ধ দ্রাবক রহিয়াছে তাহার ৯ পাউণ্ড বা ⁄৪॥ সের, এক পাউণ্ড বা প্রায় ⁄॥৹ সের কাগজের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে মুহূর্ত্তে নাইটেশন কার্য্য শেষ হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণরূপে উক্ত মিশ্রিত দ্রাবকদ্বয় কাগজ হইতে পৃথক করিয়া ফেলা প্রয়োজনীয়। এইরূপে পৃথক করিবার জন্য কোন চাপ প্রযোজক যন্ত্র (press) বা সেণ্ট্রিফিউগাল (centrifugal machine) যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নিস্কাশিত দ্রাবকে বিশুদ্ধ দ্রাবক ঢালিয়া তাহাকে নাইট্রেশনের উপযুক্ত করিয়া লইয়া পুনরায় তাহাকে অন্যবারে কার্য্য চালাইবার উপযোগী করা হয়।

এই নাইট্রেটেড কাগজকে সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করা হয়। অনেকে কাগজের কল দেখিয়াছেন, সেখানে যেরূপে কাগজের উপাদানসমূহকে চূর্ণ করা হয়, এই বিধৌত নাইট্রেটেড কাগজকেও সেইরূপে চূর্ণ করা হয়। এইরূপ করার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে এই কাগজ সর্ব্বত্র সমান ঘন হইয়া উঠে। এইরূপে সর্ব্বত্র সমঘন মণ্ডকে শুভ্র করা হয়। শুভ্র করিবার জন্য প্রথমে অতি অল্প পরিমাণ এসিড মিশ্রিত পোটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (acidulated potassium permanganate)এ মণ্ডকে নিমজ্জিত করিয়া পরে তাহাকে পুনরায় সোডিয়াম বাইসালফাইট (sodium bisulphite)এ নিমজ্জিত করা হয়। কোন কোন কারখানায় জ্যাভেল ওয়াটার (Eu de Javelle) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে মণ্ড সম্পূর্ণ শুভ্র হইয়া যাইলে অতঃপর ইহাকে জল শূন্য ও অংশতঃ শুষ্ক করা হয়। এইরূপে শুষ্ক করিবার জন্যও একরূপ সেণ্ট্রিফিউগাল মেশিন ব্যবহার

করা হয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক করিবার জন্য উক্ত শুভ্র মণ্ডকে খণ্ড খণ্ড পিষ্ঠকে বিভক্ত করিয়া তাহাতে ফেল্টের (felt) মোড়ক দিয়া হাইড্রলিক চাপ যন্ত্রে (Hydraulic Press) নিষ্পেশিত করা হয়। এইরূপে নিষ্পেশিত করিবার সময় ফেল্ট গুলি ভিজিয়া যাইলে পুনরায় পিষ্টকগুলি বাহির করিয়া সিক্ত ফেল্টের পরিবর্ত্তে শুষ্ক ফেল্টে আবৃত করিয়া পুনরায় উক্ত চাপ যন্ত্রে নিষ্পেষিত করা হয়, এইরূপে ক্রমশঃ পিষ্টকগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া উঠে।

অতঃপর এক গ্যালন সুরাসারে ৬ পাউণ্ড কর্প্পূর দ্রবীভূত করিয়া যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয় তাহাতে শুষ্ক পিষ্টকগুলি ভিজাইয়া ময়দা দলার ন্যায় দলিতে হয়। এই কর্প্পূর সিক্ত সম-ঘন পদার্থ অতঃপর বাষ্প সহযোগে উত্তপ্ত দুইটি শায়িত লৌহ দণ্ডের মধ্যে দিয়া পরিচালিত হয়। এই দণ্ড দুইটি উক্ত পদার্থকে পেশন করিয়া মণ্ডকে চাদরের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া ফেলে। শায়িত লৌহদণ্ড দুইটির ব্যবধান অল্প বিস্তর করা যাইতে পারে। কাজেই চাদরকে ইচ্ছানুরূপ মোটা বা পাতলা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত চাদরকে পুনরায় একত্রিত করিয়া তাহাতে প্রচুর চাপ প্রয়োগ করা হয়। এই চাপের পরিমাণ এক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে প্রায় ২৭ মণ। ইহার জন্যও হাইড্রলিক চাপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই চাপ যন্ত্রের যে দুইটি ধাতব পিঠীকা বা ফলকের মধ্যে এই চাদর সমূহ রক্ষা করা হয়, সেই ফলক দুইটিকে বাষ্প সহযোগে উত্তপ্ত করা হয়। এইরূপে চাপ প্রয়োগ করিলে পাতলা পাতলা চাদরগুলি একত্রীভূত হইয়া মোটা চাদরে পরিণত হয়। এই চাদরগুলি সর্ব্বত্র সমঘন, তথাপি ইহাদিগকে পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া পুনরায় হাইড্রলিক চাপ যন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মোটা চাদরে পরিণত করা হয়।

উত্তপ্ত অবস্থায় সেলুলয়েড অত্যন্ত নমনীয় থাকে, এবং এই অবস্থায় ইহাকে ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে গঠিত করা যাইতে পারে। সেলুলয়েডের চাদরকে হাইড্রলিক চাপ যন্ত্রে চাপিয়া পালিশ করা হয়। এই চাপ যন্ত্রের পিঠীকা বা ফলকের লৌহ নিকেল করা থাকে। বাষ্পে অত্যন্ত চাপ প্রয়োগ করিয়া সেই চাপগ্রস্ত বাষ্প সহযোগে এই ফলক দ্বয়কে ১৭৫ ডিগ্রি ফারেন্‌হিট পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। সেলুলয়েড এই চাদর সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইলে তাহাতে শীতল জল প্রবাহিত করিয়া শীতল করা হয়।

এই সমস্ত সেলুলয়েডের চাদর বা অন্য কোন গঠন কারখানা হইতে কর্ম্মকার-শালায় লইয়া যাওয়া হয়, তথায় করাত, পঞ্চ, ছুরিকা, বাটালী, কুঁদযন্ত্র, ঘর্ষণ যন্ত্র ইত্যাদির দ্বারা নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে ব্যয়ও প্রচুর হইয়া থাকে। কিন্তু বাজারে সাধারণতঃ অল্প মূল্যের যে সমস্ত সেলুলয়েডর জিনিষ পাওয়া যায় তাহাদিগকে ছাঁচে ঢালিয়াই কার্য্য করা হইয়া থাকে, কর্ম্মকার শালায় আর পুনঃ সংশোধিত হয় না। এই ছাঁচগুলি বাষ্প সহযোগে উত্তপ্ত করিয়া রাখা

হয়। পুষ্পের পাপড়ির ন্যায় অতি পাতলা পাতলা পদার্থও ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক সময়ে সেলুলয়েডকে গরম জলে ডুবাইয়া কোমল করিয়া লইয়া অতঃপর গরম ছাঁচে ঢালা হইয়া থাকে। যে সমস্ত পদার্থ খণ্ড খণ্ড জুড়িয়া প্রস্তুত করা হয়, তাহাদিগের খণ্ডগুলিকে সেলুলয়েডের দ্রাবণ দ্বারা জুড়িয়া ফেলা হয়। সুচিক্কণ বা সুদৃশ্য বা রঞ্জিত পদার্থগুলিকে এসেটিক এসিডের সহিত বর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা রঞ্জিত করা হইয়া থাকে। কখনও কখনও এসিটিক এসিডের পরিবর্ত্তে এসিটোন ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান পাঠক মাত্রেই এসিটোন কি তাহা জানেন। এই দ্রাবণ সেলুলয়েডের উপরিভাগের কিয়দংশ গলাইয়া ফেলে এবং গলিত পদার্থ অতঃপর বার্ণিশের ন্যায় সেলুলয়েডের সহিত দৃঢ় ভাবে লাগিয়া থাকে।

সূত্রধার বা কর্ম্মকারগণ যে সমস্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি লইয়াই সেলুলয়েড হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তবে এখন সেলুলয়েডের জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হাত করাত এবং উখার দ্বারা সেলুলয়েডের চিকণী প্রস্তুত হইত। এখন সে স্থলে এমন কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যে, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়া আসিলে তবে চিরুনী সম্পূর্ণ হয়। প্রথম যন্ত্রে সেলুলয়েডকে উপযুক্ত আকারে খণ্ড খণ্ড করা হয়। দ্বিতীয় যন্ত্র দ্বারা এক ধার অন্য অপেক্ষা ক্রমশঃ পাতলা করা হয়। তৃতীয় যন্ত্রে চিরুণীর দাড়া প্রস্তুত হয়, ৪র্থ দ্বারা চিকনীর দাঁতের মুখগুলি পরিষ্কৃত করা হয়, ইত্যাদি। অবশেষে চিরুণীর উপরিভাগ ঘর্ষণ যন্ত্রে ফেলিয়া পালিশ করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে অনেক সেলুলয়েড অপচিত হয় দেখিয়া ইহা অপেক্ষাও উন্নত প্রণালীর যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দুইটি চিকণী একবারে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং দুইটি চিকণী উপর্য্যুপরি রাখিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ ভাবে চাদরকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। পূর্ব্বে হাতকরাত ও উখা দ্বারা যে সময়ে একটি চিরুণী প্রস্তুত হইত, এখন সেই সময়ে ৫০।৬০ খানি চিরুণী প্রস্তুত হইতে পারে। যন্ত্রপাতি দ্বারা সেলুলয়েড হইতে এইরূপ অল্প সময়েই নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কেবল চিরুণীর কথাই উল্লিখিত হইল।

কোন বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সাধারণ সেলুলয়েড ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের বা বিভিন্ন বর্ণের সেলুলয়েড পাওয়া যায়। মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় এক প্রকার সেলুলয়েড উৎপাদিত হইয়া থাকে। নানারূপ বর্ণের সেলুলয়েডের পাতলা চাদর একত্রিত করিয়া উত্তাপ সহযোগে এক করিয়া ফেলিলে এইরূপ মর্ম্মর চিক্কণ সেলুলয়েড পাওয়া যায়।

গলায় ব্যবহার করিবার জন্য কলারে (collars) যে সমস্ত সেলুলয়েড ব্যবহৃত হয়, তাহাকে স্বচ্ছ এবং শুভ্র করিবার জন্য তাহাতে জিঙ্ক হোয়াইট (zinc white) মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, রেড়ির তৈল মিশ্রিত করিয়া নমনীয় করিয়া লওয়া হয়।

এই সেলুলয়েডের পাতলা চাদর হইতে কলারের মাপ অনুযায়ী তুইটি খণ্ড কাটিয়া লইয়া সুরাসারে সিক্ত করতঃ তাহার মধ্যস্থলে মসলিন দিয়া অতিশয় চাপ প্রয়োগে এক করিয়া ফেলা হয়। এই সমস্ত কলারের ভাঁজ, সেলাইএর অনুরূপ দাগ, বোতামের ঘর ইত্যাদি নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে ২০ জন কর্মকারের হাতে ঘুরিয়া তবে কলারকে প্যাকবন্দী করা হয়।

সেলুলয়েডের কতগুণ তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার দোষও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথম সেলুলয়েডের মূল্য অত্যন্ত অধিক, কেননা কর্পূরের মূল্য সুলভ নহে। দ্বিতীয়—ইহা অতি সহজ দাহ্য। কেননা ইহার উপাদান প্রধানতঃ নাইট্রোসেলুলোজ। আজ কাল যুদ্ধ বিগ্রহে যে সমস্ত ধূম হীন বারুদ ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদানও এই নাইট্রোসেলুলোজ। রাসায়নিকগণ সেলুলয়েডের এই দোষ অপনোদনার্থে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য ইহাতে লবণ মিশ্রিত করা হয়। এই লবণ সংযুক্ত থাকায় উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, হয় ইহার উপর একটা আবরণ পড়িয়া যায়, সেই জন্য দগ্ধ হইতে পায় না, অথবা আমোনিয়া (ammonia) বা সালফার ডাইঅক্সাইড (sulphur dioxide) উৎপাদিত হয়। কাজেই সেলুলয়েড দগ্ধ হইতে পায় না। কিন্তু ইহাতে সেলুলয়েড উৎপন্ন করিতে এত অসুবিধা উপস্থিত হয় যে, বস্তুতঃ কার্য্যকালে লবণ আদৌ ব্যবহৃত হয় না। কর্পূরের পরিবর্ত্তে সময়ে সময়ে এসিট্যানিলিড (acetanilid) বা ঐ জাতীয় অল্প মূল্যের পদার্থ ব্যবহৃত হয়। অবশ্য একবারেই কর্পূর ব্যবহার করা হয় না, তাহা নহে, কর্পূরের পরিমাণ কিছু হ্রাস করিবার জন্য ঐ গুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে যে জিনিষের জন্য সেলুলয়েড উৎপাদিত হয়, সেই সেই জিনিষের উপযোগী করিয়া কর্পূরের পরিবর্ত্তে ঐ সমস্ত পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্লিসারিণ (glycerine) বা এসেটিক এসিডএ (acteic acid) দ্রবীভূত জেলাটিনও কিয়ৎপরিমাণ কর্পূরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া উৎপাদিত সেলুলয়েডর মূল্যের হ্রাস করা হয়। নানারূপ অল্প মূল্যের সেলুলয়েডের পেটেণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে। অল্প মূল্যের উপাদান দিয়া যে সমস্ত সেলুলয়েড উৎপাদিত হয়, তাহারা প্রায়ই অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে।

নাইট্রিক এসিডের পরিবর্ত্তে অন্য কোন আরক ব্যবহার করিলে সেলুলয়েড অপেক্ষা অল্পতর দাহ্য পদার্থ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এক শত ভাগ জলে ২০ ভাগ কষ্টিক সোডা (caustic soda) মিশ্রিত করিয়া যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহার ৩০ মণে, ২॥০ মণ কাগজের মণ্ড মিশ্রিত করিতে তাহার ১।০ সের কারবন্ ডাইসাল-ফাইড (carbon disulphide) ঢালিয়া ময়দা দলার ন্যায় দলিলে একরূপ কাদার ন্যায় পদার্থ পাওয়া যায়, ইহাকে ছাঁচে ঢালিয়া ৮০ ডিগ্রি ফারেনহিট উত্তাপে ৩০ ঘণ্টা ধরিয়া উত্তপ্ত করিলে দৃঢ় হয়। ইহাকে "ভিসকলিথ" (viscolith) বলে

ইহা সেলুলয়েডের ন্যায় তত দাহ্য নহে, কিন্তু অত্যন্ত ভঙ্গ প্রবণ কাজেই ইহার ব্যবহার অতি অল্প। ইহার সহিত রবাব, কর্ক গুঁড়া ইত্যাদি মিশ্রিত করিলে ইহা অনেকটা ইবনাইটের গুণ ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

কত প্রকার সেলুলয়েড বা ইহার অনুরূপ পদার্থ উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ফ্রান্সে দশটি সেলুলয়েডের কারখানা রহিয়াছে। এই সমস্ত কারখানায় প্রায় ২০০০ লোক প্রতিপালিত হইতেছে। প্রতিবৎসর এই সমস্ত কারখানা হইতে ৬,০০০ টন সেলুলয়েড উৎপাদিত হইতেছে। ইহার জন্য ৩০০০ টন কাগজের মণ্ড, ২০,০০০ টন সালফিউরিক এবং নাইট্রিক এসিড ১.২৫০ টন কর্পূর, ১৪,০০,০০০ গ্যালন সুরাসার প্রয়োজন হয়। একমাত্র প্যারিস্ নগরেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেলুলয়েডের জিনিষ প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে, পৃথিবীতে যত সেলুলয়েডের চিরুণী ব্যবহৃত হয় তাহাব অৰ্দ্ধেক এক ফ্রান্সেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ফরাসী দেশে কলারেব (collars) কারখানা মাত্র ১টি, জারমানি এবং ইংলণ্ডে অনেক রহিযাছে। কামিজেব কাফ এবং গলার কলার প্রস্তুত করিবাব জন্য প্রতিবৎসর ২৭০০০ মণ সেলুলয়েড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিদিন ৫,০০০ কলার ও কাফ উৎপাদিত হইয়া থাকে। বায়স্কোপে যে চলিষ্ণু চিত্র প্রদর্শিত হয় তাহাও সেলুলয়েডর পাতলা স্বচ্ছ ফালির উপব ফটোগ্রাফ করা থাকে। প্রতি-বৎসর যে ফালি প্রস্তুত হয় তাহার দৈর্ঘ্য ৬২,০০০ মাইল। ফরাসী দেশের কারখানায় যে সমস্ত বিশুদ্ধ সেলুলয়েড প্রস্তুত হয়, তাহাকে সেলুলয়েড বলা হয় না, ওজোনাইট, লোরিআইড ইত্যাদি বলা হয়। কেননা সেলুলয়েড এই নামটি হায়াট ব্রাদার্স (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) পেটেণ্ট করিয়া লইযাছেন। ইহাদের প্যাবিসের সন্নিকটেই একটি কারখানা আছে।

সেলুলয়েডের উপাখ্যান শেষ হইল। আমাদের দেশে অনেক উচ্চশিক্ষিত ছাত্র বিদেশে গমন করিয়া নানাবিধ কার্য্যকব জ্ঞানলাভ করিয়া আসেন। হয়ত তাঁহাদের অনেকেই সেলুলয়েডের কারখানার কি ব্যাপার তাহাও দেখিয়া আসিয়াছেন। দেখিয়া না আসিলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বসায়ন শাস্ত্রে এরূপ কৃতবিদ্য হন যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বচ্ছন্দে অবসর মত তাঁহারা সেলুলয়েডের উপাদান লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতে পারেন। ফরাসী দেশে এই কারবারে সহস্র সহস্র লোকের অন্ন সংস্থান হইতেছে, আমাদের দেশে দশ জনেরও তাহাতে অধিকার নাই। সেলুলয়েডে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাদের অধিকাংশই এখন অমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের এরূপ লাভকর বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইবার মূল কারণ অর্থাভাব। যদি দেশের মঙ্গলেচ্ছু কোন এক সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি একক হয়ত এই বিষয়ে শিক্ষা লাভার্থে

বিদেশে কতিপয় শিক্ষিত যুবক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে কৃতবিদ্য করিয়া ফিরাইয়া আনাইয়া সেলুলয়েডের কারবার আরম্ভ করাইতে পারেন। আমাদের দেশে এখনও যৌথ কারবার পরিচালিত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। আমাদের দেশে দেখা যায় যে, যে কারবারে অংশ অল্প সেই কারবারে কতকটা উন্নতি হইতেছে। কোন জমীদার ইচ্ছা করিলে, তিনি একক এদেশে সেলুলয়েডের কারবার খুলিতে পারেন।

মৎস্য।

বিজ্ঞান প্রভাবে পাশ্চাত্য দেশের লোক মানুষের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী সকল হইতে কত যে নূতন নূতন প্রয়োজন সাধনের উপকরণ প্রস্তুত করিয়া দেশের ধন বৃদ্ধি করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ কোন সামগ্রীর কোন অংশের অণু-মাত্র অপচয় হইতে দেন না। এই জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে ততই দ্রব্য সামগ্রীর অপচয় হ্রাস হইতেছে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন বিজ্ঞানের প্রভাবে ক্রমে "অপচয়" শব্দ ভাষা হইতে বিলুপ্ত হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ইহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

মৎস্য মানুষের একটী প্রধান আহার্য্য সামগ্রী। আহারের জন্য জীব হিংসা শাস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেও ভারতের হিন্দুগণের অধিকাংশই মৎস্য ভোজী। এই আহার সামগ্রী সরবরাহ করিবার জন্য আমাদের দেশের নদী, নালা, খাল, বিল হইতে বহু মৎস্য ধৃত হইয়া নানাস্থানে প্রেরিত হয়। আহার ব্যতীত মৎস্য হইতে আর কোন প্রয়োজন সাধিত হয় এদেশের লোক তাহা অবগত নহে। এই জন্য মাছের যে অংশ রুচিকর বা ভোজন যোগ্য নহে তাহা সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। মাছের আঁইশ ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহার পেটের ভিতর "তৈল" বলিয়া যে পদার্থ থাকে তাহা ছাড়া অন্যান্য যাহা কিছু থাকে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, আর বিড়াল কুকুরের খাদ্য ব্যতীত মাছের কাঁটার অন্য কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এই সকল সামগ্রীর কিছুই ফেলা যায় না। তথায় মাছের সকল অংশেরই সদ্ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মাছের তৈল, চর্ব্বি, ঘী প্রভৃতি হইতে বহু শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আঁইস প্রভৃতি হইতে ভূমির সার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, ছাল হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর সৌখীন সামগ্রী প্রস্তুত হয়, কাঁটা হইতে হস্তী দন্তের নকলে অনেক সামগ্রী তৈয়ার হয়। মার্কিন যুক্ত রাজ্যে বৎসরে তিনকোটি টাকার অধিক মৎস্যজাত শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায়ও

ইউরোপের নানা স্থানে যে সকল মাছের কারখানা আছে তথা হইতে মাছের যে তৈল বাহির করা হয় তাহা পৃথিবীর নানাস্থানের কল কারখানায় ব্যবহৃত হয়। তিমি মৎস্যের তৈল, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নরওয়ে ও নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ সীল মৎস্যের তৈল ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কড মাছের তৈল দ্বারাও সেইরূপ কত লোক জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। অন্যদিকে আবার কত লোক কষ্টসাধ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে। কোন কোন মাছের তৈলে জ্বালাইবার বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জলচর জীবের তৈল মধ্যে গো মেষাদির চর্ব্বির ন্যায় একটি পদার্থ পাওয়া যায়, উহাকে stearine বলে। তৈল শোধন করিবার সময় উহা হইতে ঐ stearine বাহির হয়। পাঁচ সের তৈল বাহির হইলে তাহা হইতে প্রায় এক সের stearine বাহির হয়। বস্ত্র বয়নের সূতায় মাড় দিতে এই stearine ব্যবহৃত হয়। তদ্ব্যতীত চামড়া পরিষ্কার করিতে ও অন্যান্য শিল্প কার্য্যে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় চারি আনা সের দরে এই stearine বিক্রয় হইয়া থাকে। কতকগুলি মৎস্যজাত তৈল হইতে আর এক প্রকার নরম চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ বাহির হয় উহা sperm soap, menhaden soap প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহা সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তদ্ব্যতীত উহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ফলকর বৃক্ষে ঢালিয়া দেওয়া হয়। যে সকল ফলকর বৃক্ষ কোন প্রকার পোকা ধরিয়া নষ্ট-প্রায় হয় ঐ পদার্থ জলে মিশাইয়া তাহাতে ঢালিয়া দিলে পোকা নষ্ট হয়। এদেশে অনেক চা-বাগানে চা-গাছে পোকা ধরিলে ঐরূপ প্রথায় তাহার পোকা নষ্ট করা হয়।

অনেকে অবগত আছেন যে, মাছের তেল ও আঁইশ, আম প্রভৃতি ফলকর বৃক্ষের ও গোলাপ প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়ায় দিলে গাছ বেশ সতেজ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন একটি সার বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। মাছের আঁইশ বা তেল সার প্রস্তুত করিবার জন্য কেহই যত্ন করিয়া রাখেন না। দক্ষিণ ভারতের মহীসুর রাজ্য, মালাবার উপকূল প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ ব্যতীত আর কোথাও মাছের সার কৃষি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এরূপ আমরা শুনি নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মাছের সার কৃষি কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দেশের ন্যায় য়ুরোপে ও, আমেরিকায় এমন অনেক মাছ আছে যাহা সচরাচর লোকে খায় না। তথায় এই সকল মাছ হইতে জমীর সার প্রস্তুত করা হয়। তদ্ব্যতীত শামুক গুগ্‌লি প্রভৃতির খোলা হইতেও সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাজ্যে বৎসরে প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ মণ মাছের সার প্রস্তুত হয়। ইহার মূল্য প্রায় ৬০।৬৫ লক্ষ টাকা। আমাদের দেশে প্রত্যেক গ্রামে যে পরিমাণ মৎস্য ব্যবহৃত হয় তাহার আঁইশ ও তৈল

যদি সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে কৃষি কার্য্যের জন্য অনেক সার প্রস্তুত হইতে পারে। বড় বড় সহরের বাজারে যে সকল পচা মাছ বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়, অনেক সময়ে স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক দিগের আদেশে তাহা নষ্ট করা হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি উহা সার প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োজিত হয় তাহা হইলে এই দরিদ্র দেশের কতকটা অর্থ-ক্ষতি নিবারিত হইতে পারে। এদেশে জমীর সারের যেরূপ অভাব পৃথিবীর আর কোন দেশে বোধ হয় সেরূপ নহে। অন্যান্য দেশে গোময় প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগের পুরীষ সার প্রস্তুত করিবার জন্য সংরক্ষিত হয় এদেশে উহা জ্বালানী কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ভূমি হইতে যাহা আহরণ করা হয় তাহার কতক অংশ যে কোন আকারে ভূমিকে পুনঃ প্রদান না করিলে যে ভূমরি শক্তি হ্রাস হয় ইহা কৃষি বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র। আমাদের দেশে তিসি, সরিষা, তিল প্রভৃতি তিলি শস্য ভূবি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল বীজ যদি এদেশে পিষিয়া তৈল বাহির হইত তাহা হইলে উহাব তৈল সিটায় এদেশের ভূমিতে সার দেওয়া হইত, কিন্তু অধিকাংশ তিলি শস্য বিদেশে রপ্তানি হয় এবং তাহার তৈল সিটায় বিদেশে সার প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিক নিয়মে যাহা এদেশের ভূমিব প্রাপ্য তাহা বিদেশেব ভূমির পরিপোষণে নিয়োজিত হয়। এরূপ অবস্থায় এদেশে সারের কিরূপ অভাব তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন তাহার অপব্যয় অতীব গর্হিত কার্য্য।

পাশ্চত্য দেশে মাছ হইতে আরও যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হয় আমরা তাহার দুই একটির পরিচয় দিতেছি। প্রায় সকল জাতীয় মাছের ছাল হইতে চামড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবশ্য এই সকল চামড়ায় টাকা পয়সা রাখিবাব জন্য মণিব্যাগ প্রভৃতি সৌখীন সামগ্রী প্রস্তুত ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয় না, তবে সীল, তিমি প্রভৃতি বড় বড় মাছের ছাল হইতে বহু লক্ষ টাকার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। সমুদ্রে এক প্রকার শ্বেত তিমি মৎস্য আছে কেবল মাত্র ইহার চামড়া বৎসরে ছয় লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কুম্ভীর মকরাদি জলচর জীবেব চামড়া হইতেও মার্কিন দেশের লোক বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

খাইবার জন্য মৎস্য কর্ত্তিত হইলে তাহার আঁইশ, কানকুয়া, ফুস্কো, পটপটী প্রভৃতি যে সকল অংশ অভোজ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয় তাহা হইতে শিরীশের ন্যায় এক প্রকার আঠা প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কড প্রভৃতি তৈল বিশিষ্ট মৎস্যের ঐসকল পরিত্যক্ত অংশ হইতে ঐ আঠা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে আমেরিকাব লোকেরাও ঐ সকল অংশ ফেলিয়া দিত, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলে উহার দ্বারা মনুষ্যের নানা প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। ডাকের টিকিটের পশ্চাদ্ভাগে যে আঠা লাগান হয়, আমেরিকায় সেই কার্য্য এই মৎস্যজাত আঠা দ্বারা সম্পন্ন হয়। তদ্ব্যতীত আদালতের ইস্তাহার

লট্‌কাইতে, বাক্স প্রভৃতির উপরে লেবেল লাগাইতে এবং তাল পাতা নির্ম্মিত টুপিতে (straw hats) মাড় দিতে এই মাছের আঠা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্তন্যপায়ী জীবের চামড়া হইতে যে আঠা প্রস্তুত হয় তদপেক্ষা এই মৎস্যজাত আঠা স্থায়ী এবং যাহাতে উহা লাগান হয় তাহা দৃঢ় ও মজবুত হয়। আমেরিকায় সহস্র সহস্র টাকা মূল্যের এই আঁঠা নানা কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে এই আঠা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে, অথচ যে উপকরণে এই আঠা প্রস্তুত হয় ভারতের গৃহে গৃহে তাহার অপচয় হইতেছে।

কতকগুলি মৎস্যের ফুক্কো, পটকা ইত্যাদি হইতে Isinglass প্রস্তুত হয়। সুরা পরিশোধনার্থ ও অন্যান্য অনেক কার্য্যে এই Isinglass ব্যবহৃত হয়। লিথোগ্রাফ ছাপিবার জন্য যে transfer কাগজে লেখা হয়, Isinglass সেই কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি উপকরণ। শুনিয়াছি উড়িষ্যা অঞ্চলের ধীবরেরা তথাকার সমুদ্রজাত মৎস্য হইতে এক প্রকার Isinglass প্রস্তুত করে, কিন্তু উহা তাদৃশ পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ নহে। বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিগণ যদি এই Isinglass প্রস্তুত বিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলে তাঁহারা দেশের ধন বৃদ্ধির একটী পথ উন্মুক্ত করিতে পারেন। এদেশে বিশুদ্ধ Isinglass প্রস্তুত হইলে আর বিদেশ হইতে উহা আমদানী করিবার আবশ্যক হইবে না।

আমাদের দেশে যে সকল তৈল-প্রধান মৎস্য আছে তন্মধ্যে ইলিশ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই ইলিশ মাছের তৈল এদেশে কিরূপ নষ্ট হইয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের মনে হয়, বৈজ্ঞানিকেরা কড মৎস্যের তৈল দ্বারা মানবের যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছেন, হয়ত ইলিশ মাছের তৈল দ্বারাও সেইরূপ প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল কার্য্য সাধনের জন্য যেরূপ বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রয়োজন, এদেশে এখনও সেরূপ হয় নাই। যতদিন বিজ্ঞানালোচনার প্রতি লোকের এইরূপ অনাস্থা থাকিবে, ততদিন দেশের অর্থাগমের এইরূপ বহু পথ অবরুদ্ধ থাকিবে।

এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে মৎস্যের এরূপ অভাব যে লোকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ খাইতে পায় না, তখন অন্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য মাছ কোথায় পাইবে, নানা কারণে যে এক্ষণে দেশে মৎস্যের অভাব হইয়াছে তাহা সত্য। কিন্তু চেষ্টা করিলে যে এই মৎস্যাভাব দূর করা যাইতে পারে, তাহা গভর্ণমেণ্ট বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন দেশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এজন্য মৎস্যের চাহিদা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং যাহাতে মৎস্যের বংশ বৃদ্ধি হয় তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা এই জন্য পাশ্চাত্য দেশে যে প্রণালীতে মাছের চাষ হয়, তাহা শিক্ষা করিবার

উদ্দেশ্যে তথায় এদেশ হইতে লোকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করিয়া মৎস্যের চাষের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এজন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশের লোককেও চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা করিলে অচির কাল মধ্যে দেশের মৎস্যের অভাব দূরীভূত হইতে পারে। বড়ই আহ্লাদের বিষয় বাঙ্গালার কতক গুলি শিক্ষিত জমীদার এই মৎস্যের অভাব দূর করিবার জন্য সম্প্রতি একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইরূপে আরও অনেকে উদ্যোগী হইলে বর্ত্তমান মৎস্যাভাব বহুদিন থাকিবে না। কিন্তু এই অভাব শীঘ্র দূর না হইলেও যাহাতে মৎস্যের অপচয় না হয় সে জন্য যত্নবান হওয়া আবশ্যক। মাছের যে সকল অংশ আহারের উপযোগী নহে তাহা ফেলিয়া না দিয়া তাহা হইতে উল্লিখিত রূপ দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারিলে দেশে নূতন নূতন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা বহু লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় হইতে পারে। ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের আলোচনাই এই সকল কার্য্য সংসাধনের উপায়, অতএব যাহাতে ইহার বহুল আলোচনা হয় তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক।

শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

অদ্ভুত পঠন ও স্মৃতি শক্তি।

কোন ইংরাজ চিকিৎসকের "ক" নামক কোনও ইংরাজ চিকিৎসিতের অদ্ভুত পঠনশক্তি ছিল। তিনি সাধারণ একখানা অকটেভো পুস্তকের ১ পৃষ্ঠা চকিতের মধ্যে পড়িতে পারিতেন। মোট ২ কিম্বা ৩ সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে কোন পৃষ্ঠা মনোযোগ সহকারে দর্শন করিয়া ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে পঠিত বিষয় বিবৃত করিতে পারিতেন। এইরূপে তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, গ্রন্থের পর গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাইতেন। এক সন্ধ্যায় কতিপয় পুস্তকের পাঠ সম্পূর্ণ করিতে পারিতেন। অবশ্য পুস্তকের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ইংরাজী হওয়া প্রযোজনীয় এবং পঠনীয় বিষয় সমূহ জটীল, দার্শনিক বা দুর্ব্বোধ্য হইলে চলিত না। তিনি যাহা সহজে বুঝিতে পারেন, যথা সুপাঠ্য উপন্যাস, ইতিবৃত্ত, ইতিহাস, প্রবন্ধ, কাব্য বা সাময়িক পত্রিকা হইলেই তাঁহার শক্তি পরিস্ফুট হইত। তিনি অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। কাব্য পাইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন, এবং অন্যান্য কবিতার সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া এমন পরিষ্কার ভাবে দোষ গুণ বর্ণনা করিতেন বা কোন্ পদ্যের সহিত তাহার পরিষ্কার তুলনা রহিয়াছে তাহার নিখুঁত সমালোচনা করিতে পারিতেন যে, তাহা শুনিলে বস্তুতঃই চমৎকৃত হইতে হইত।

তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তি যৌবন সময়ে মুকুলিত হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সহকারিগণ বা তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রায়ই তাঁহার এই শক্তির পরীক্ষা করিতেন। তিনি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতেন এবং মনে করিতেন যে সকলেই তাঁহার মত ক্ষমতাপন্ন অথচ তাঁহাকে বিনা কারণে লোক বিরক্ত করে। কিন্তু কাহারই তাঁহার এই শক্তির বিন্দু মাত্রও ছিল না। যখন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বা অন্য কেহ তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তিনি কিরূপে এরূপ ভাবে ত্বরিত গতিতে অধ্যায়ন করিতে অভ্যাস করিয়াছেন বুঝাইয়া দিতে হইবে, তখন তিনি বলিতেন যে সকলেই ইচ্ছা করিলে এরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন। তিনি বলিতেন যে—"পঠিতব্য পৃষ্ঠার মধ্য স্থলে দৃষ্টি ও মনোযোগ স্থাপন করিলেই সমস্ত পৃষ্ঠার কথা গুলি যেন সন্তরণ করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং স্মৃতিতে খোদিত হইয়া যায়। এক এক পংক্তি করিয়া পাঠ করাকে তিনি নিন্দা করিতেন। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত কেহই সেরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন নাই, আর তিনিও ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি প্রায়ই বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং বলিতেন মানসিক দুর্ব্বলতা ও অভ্যাসের অভাবেই লোকে তাঁহার মত পাঠ করিতে পারে না। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তাঁহার চক্ষুর কোন পীড়ার অদ্ভুত বিশেষত্ব হইতেই এই শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে।

প্রত্যেক চক্ষুস্মান ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, কোন পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া অধঃ উর্দ্ধ, পার্শ্বদ্বয় বা সর্ব্বস্থান একবারে পাঠ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ বোধ করা স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তিতে অসম্ভব। দর্শন স্নায়ুর (retina) গঠন ও তাহার শক্তির কার্য্যকারিতা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কেবল কোন পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে দৃষ্টি করিলে দৃষ্টি-শক্তির হয়তঃ সমস্ত পৃষ্ঠাতেই বিন্যস্ত হইবে বটে; এমন কি যদি সীমান্ত প্রদেশদ্বয়ে উজ্জ্বল পদার্থ সন্নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে দৃষ্টি শক্তির বিস্তার আরও প্রসারিত হইত পারে বটে অর্থাৎ পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিলেও বহুদূর পর্য্যন্ত অক্ষর রেখা বা দাগ নয়ন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বটে কিন্তু দূরবর্ত্তী রেখা সমূহের বা পংক্তিগুলির পাঠ মূর্খের পক্ষেই শুধুই অসম্ভব নহে, অতি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমানেও, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, স্মৃতিতে চিত্রিত করাত দূরের কথা।

"ক"—মহাশয় অতিশয় সুশিক্ষিত ও বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার মানস ক্ষেত্র বিশুদ্ধ সাহিত্য পাঠে অত্যন্ত উর্ব্বর হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতি শক্তিও নির্দ্দোষ এবং তীক্ষ্ণ ছিল, অতএব সাহিত্য সমালোচনায় তাঁহার শক্তিও যে অদ্ভুত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি।

দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে অনুধাবন করিলে প্রথমতঃ এইরূপ মনে হয়, যে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অল্পাধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানসিকশক্তি ও স্মৃতিশক্তি সমূহ অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল, কাজেই যাহা দর্শন করিতেন তাহাই মানস দর্পণে প্রতিফলিত ও খোদিত হইয়া থাকিত। শেষোক্ত শক্তি সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু দর্শন শক্তির এরূপ বিবৃদ্ধির ও কারণ নির্ণীত হইতে পারে। ইহা দর্শন যন্ত্রের কোন অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক লোকের ন্যায় শৈশবাবস্থা হইতে তিনি দক্ষিণ হস্তে কার্য্য পটু ছিলেন। কাজেই তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুরও দৃষ্টি শক্তি প্রখরতর ছিল। কেননা চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে দুই চক্ষুর মধ্যে যেটির শক্তি প্রখরতর হয়, সেই পার্শ্বের হস্তের শক্তিও প্রবলতর হইয়া থাকে। "ক"— মহাশয়ের যৌবনাবস্থায় তাঁহার কোরিওডাইটিস্ (chorioditis) হইয়াছিল। এই পীড়ার চক্ষু অত্যন্ত স্ফীত হয়। দর্শন স্নায়ুর ইংরাজী নাম রেটিনা (retina)। এই রেটিনার মধ্য অংশের নাম ম্যাকুলার প্রদেশ (macular region)। উক্ত চক্ষু-স্ফীতি পীড়ায় তাঁহার এই ম্যাকুলার প্রদেশ ধ্বংশ হইয়া যায়। এই পীড়ায় উক্ত ম্যাকুলার প্রদেশ ধ্বংশ হইয়া যাইলে পর, সকলেরই কোন কিছু পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্লান্তহইয়া পড়ে বটে, কিন্তু দর্শন করিবার ক্রমাগত চেষ্টা করিলে দৃষ্টি শক্তি ক্রমশঃ তীক্ষ্ণতর হইয়া থাকে। "ক"—মহাশয়ের রেটিনার যে অংশে পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া দর্শন করিবার উপযুক্ত করে (fixing part of the retina) তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এবং তথায় কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার একটা দাগ বা গহ্বর হইয়া গিয়াছিল। বাম চক্ষু কিন্তু বেশ সবল ও সুস্থ ছিল, কাজেই ইহার ম্যাকুলার প্রদেশ বেশ পরিপুষ্ট ও অক্ষুণ্ণ ছিল। দক্ষিণ চক্ষুর ম্যাকুলার প্রদেশের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেটিনা অবশ্য বেশ অক্ষুণ্ণ ছিল। "ক"— মহাশয় ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া এই চতুষ্পার্শ্বস্থ রেটিনাকে এরূপ করিয়া তুলিলেন যে সেই স্নায়ুতে একবারে কোন জিনিষের যতটা প্রতিফলিত হয়, তৎক্ষণাৎ মস্তিস্কে সেই সমস্ত অংশের প্রতিফলনের ক্রিয়া উপনীত হইয়া থাকে। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করিয়া এরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাহার পাঠ করিবার বাসনা সাধারণতঃই অতি প্রবল ছিল, কাজেই তাঁহার অজ্ঞাতসারে রেটিনা যেন এরূপে প্রতিফলন গ্রহণ করিতে স্বতঃই শিক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দক্ষিণ চক্ষুর মধ্য স্থলে পূর্ব্বোক্ত fixing part নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই মধ্যস্থলের, যে অংশে প্রতিফলিত হইত সেটুকু দক্ষিণ চক্ষুর সাহার্য্যে দৃষ্ট হইত না। কিন্তু বামচক্ষু বেশ সবল ও স্বাভাবিক ছিল। কাজেই দক্ষিণ চক্ষুতে যে অংশটুকু বাদ থাকিত, বাম চক্ষু তাহা পূরণ করিয়া দিত। দুই চক্ষুর সাহায্যে তিনি অনায়াসে সমস্ত অংশ দেখিতে পাইতেন। এক্ষণে কিরূপে দক্ষিণ চক্ষুর দৃষ্টি-শক্তির এত প্রসার হইয়াছিল তাহাই

বিবেচ্য। ইহা অতি সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে। যদি আমি কোন পুস্তকের পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে সেই পৃষ্ঠার সীমার পংক্তি গুলিও দৃষ্ট হইবে বটে কিন্তু সেগুলি সুস্পষ্ট না হইয়া যেন একটি মসি রেখা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, অর্থাৎ পৃষ্ঠার মধ্যস্থলকে কেন্দ্র করিয়া যদি কতকগুলি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে পরিধি যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে, আমার দৃষ্টিশক্তিও মধ্য বিন্দু হইতে ততই অল্পতর হইতে থাকিবে। মধ্য পংক্তি যেরূপ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তাহার উপরের এবং নিম্নের পংক্তি তাহা অপেক্ষা অল্পতর, দূরের পংক্তি আবও অল্পতর এইরূপ হইয়া অবশেষে সীমান্তের পংক্তি রেখাবৎ প্রতীয়মান হইবে। যদি দৃষ্টিশক্তিকে শিক্ষিত করা যায় অর্থাৎ আমরা একই স্থানে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিয়া যদি আরও দরতর প্রদেশ দৃষ্টি করিবাব জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করি, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে একই স্থানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অনেকটা স্থান এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃষ্ঠা এককালে দেখিতে পারি। পূর্ব্বে ম্যাকুলা কাহাকে বলে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে নয়নের আদিম ম্যাকুলা কোন কারণ বশতঃ বিনষ্ট হইলে তাহার স্থানে নূতন ম্যাকুলা প্রায়ই সৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন পক্ষীর স্বভাবতঃই আবার দুইটি ম্যাকুলা থাকে। একটির দ্বারায় নিকটস্থ পদার্থ এবং অন্যটির দ্বারা দূরস্থিত পদার্থ অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারে। দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হওয়ায় পদার্থ সমূহ দেখিবার জন্য "ক"—মহাশয় বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কাজেই আদিম ম্যাকুলার চতুষ্পার্শ্বের স্থান অতি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার তাহার প্রথম হইতে দক্ষিণ চক্ষুর শক্তি অন্য চক্ষু অপেক্ষা প্রবলতর ছিল বলিয়া দক্ষিণ চক্ষুর অন্যান্য অংশের শক্তি আপনা হইতেই কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহাক মস্তিষ্ক অত্যন্ত উর্ব্বর ছিল কাজেই যে পীড়ায় তাঁহার সমূহ ক্ষতি হইতে পারিত, সেই পীড়ার সাহায্যে তিনি চেষ্টা করিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন।

স্বাভাবিক শক্তি বিশিষ্ট লোকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অর্দ্ধ ইঞ্চ বা ১ ইঞ্চ দীর্ঘ এরূপ এক এক পংক্তি ১৫ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে যতগুলি থাকিতে পারে, তাহা এক-কালে পড়িতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর চেষ্টা করিয়া ৩।৪ ইঃ দীর্ঘ পংক্তিগুলি এবং ৪০।৫০ ইঞ্চ পরিমিত স্থান কিছুতেই পাঠ করিতে পারেন না। ম্যাকুলার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান যে ক্রমে ক্রমে অনেকটা স্থান এককালে দেখিতে পারে, তাহা বেশ, বুঝিতে পারা যায়। একজন শিশু প্রথম পুস্তক পাঠ করিবার সময় এক একটি পৃথক পৃথক রেখা দেখিতে পায় ক্রমে অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর, বাক্য এমন কি পংক্তির কতক অংশ এককালে দেখিতে শিক্ষা করে। অবশ্য তাহার চক্ষু তারকাও অতিদ্রুত সঞ্চালিত হইতে শিক্ষা করে। চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে স্বাভাবিক চক্ষু কিছুতেই এককালে মধ্যস্থল এবং সীমান্ত প্রদেশ দেখিতে পারে না। যদি এক

চক্ষুর ম্যাকুলা নষ্ট হয়, তাহা হইলে বরং ইহা সম্ভব। যাহা হউক ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে লোকে কোনরূপে পীড়িত হইলে, সেই পীড়ার সাহায্যে এমন একটা শক্তিলাভ করে, যে তাহা স্বভাবতঃ অসম্ভব এবং সেই শক্তি তাহার পরবর্ত্তী জীবনকে এরূপ কার্য্যক্ষম করে যে স্বভাবতঃ সেরূপ শক্তিলাভ মানবের সাধ্যায়ত্ব নহে।

সার উইলিয়াম হার্শেল।

গত ২০ বৎসর ধরিয়া নক্ষত্র-সমূহ অন্তরীক্ষে কিরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং তাহাদেব গতিরই বা কিরূপ প্রকৃতি, তাহা লইয়া নানারূপ আলোচনা হইতেছে। অনেক জ্যোতির্ব্বেত্তা এইরূপে অন্তরীক্ষের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুধাবন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের গঠন কিরূপ তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সমস্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে গ্রনিনজেন নগরের মহামতি ক্যাপটিন (Capteyn of Groningen) দলপতি স্বরূপ বরণীয় হইয়াছেন। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তাগণও এ সম্বন্ধে সামান্য সামান্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মহামতি হার্শেল এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং তাহার আবিষ্কার ও ক্রিয়া কলাপের প্রসার এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তাঁহার কৃতিত্বে প্রাচীনগণের কার্য্যাবলি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। অথবা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন অনুধাবনে যে সমস্ত পণ্ডিত বর্ত্তমানে চেষ্টা করিতেছেন সেই সমস্ত লোকের অনুধাবন প্রয়াসের প্রবর্ত্তকই সার উইলিয়ম হার্শেল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহ বর্ত্তমানে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইতেছে। ইংলণ্ডেব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা রয়াল সোসাইটি ও য়্যাস্‌ট্রনমিক্যাল সোসাইটি (Royal Society and Ataronomical Society) তাঁহার গ্রন্থ মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হার্শেলের জন্মাবধিই ভাষা ইংরাজি নহে। তথাপি তাহার লিখিত গ্রন্থ সমূহের ভাষা এত প্রাঞ্জল এবং এত সরল যে প্রত্যেক ইংরাজি শিক্ষিতেই ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার লেখা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। তাহার জীবনে তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত তাহার সহোদরী ক্যারোলিনের নাম চির বিজড়িত রহিয়াছে। হার্শেল ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে এবং ক্যারোলিন ১৭৫০ খৃঃ অব্দে হ্যানোভার নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পিতা সৈনিক বিভাগের বাদক দলে কার্য্য করিতেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের পূর্ব্বেই হার্শেল সৈনিকগণের বাদক দলে কার্য্য করিবার জন্য প্রবিষ্ট হন। হার্শেল যে সৈনিক দলে কার্য্য করিতেন, সেইদল ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে প্রায় এক বৎসর কাল অবস্থান করে। জার্ম্মানিতে বিখ্যাত

৭ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে (Seven Years' War) এই দল উক্ত দেশে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। এই সময়ে হার্শেলের কার্য্যাবলী ও অন্যান্য ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই অভিযানে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার জনক জননী যখন লক্ষ্য করিলেন যে, হার্শেলের ন্যায় লোকে কখনই সৈনিক জীবনের কষ্ট ভোগ করিতে পারিবে না কেননা তাহার সেরূপ শক্তি নাই, তখন তাঁহারা উক্ত কষ্ট ও পরিশ্রম সাধ্য কার্য্য হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিবার জন্য মনস্থ করিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহাকে অপসারিত করা হয় নাই, তিনিই হঠাৎ কর্ম্ম হইতে পলায়ন করেন। হ্যারেনহসেন নামক স্থানের শেষ শান্তি পাহারার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবামাত্র তিনি তাঁহার সৈনিক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিজ্ঞানের সৌভাগ্য বশতঃই হয় ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি এই সময় হইতে যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ও সেই সময়ে তিনি কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নির্দ্দেশ করা বা তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্বানুসন্ধান করা এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার এই অজ্ঞাত বাসের সময় তিনি একবার ডারহাম মিলিশিয়ার (Durham Militia) বাদক দলের বাদ্য শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। লীডস্, হ্যালিফ্যাক্স, পন্‌টিফ্রাক্ট, ডনকাষ্টার প্রভৃতি স্থানে কিয়ৎকাল ব্যবসায়ী বাদকরূপে জীবিকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এমন কি ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে তিনি হ্যানোভারেও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সাহস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার প্রিয়তমা সহোদরা ক্যারোলিনকে পুনবায় দর্শন করিয়া আসিলেন। বাথ নগর ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে বিলাসিতার উচ্চ সোপানে উপনীত হইয়াছিল, সেই সময়ে হার্শেল তথায় অর্গান বাদকের পদ গ্রহণ করেন।

বাথের রঙ্গালয়ের বাদক বিখ্যাত অধ্যক্ষ লিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলে হার্শেল সেই পদে নিযুক্ত হইয়া নগরে বাদক দলের অগ্রণী স্বরূপ বরণীয় হইলেন। এইরূপে তিনি একটা স্থায়ী পদে অভিষিক্ত হইলেন। ক্যারোলিন ইতিমধ্যে সহোদরের কর্ম্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল সঙ্গীতালয়ে সঙ্গীত কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। তাঁহার উচ্চ অভিলাষ ছিল যে সহোদর যেরূপ বাদ্যে অগ্রণী তিনিও বাদ্যে সেইরূপ সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠা ও বরণীয়া হইবেন। কিন্তু তাহার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। তিনি এই সময়ে সহোদরের গৃহস্থালী কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন এবং ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে হার্শেলের জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক কার্য্যে প্রধান যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

হার্শেল এইরূপে সঙ্গীতের মধুর আলাপে ও প্রাণোন্মাদক এবং সর্ব্বসময়াপহারক বাদ্যে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া থাকিলেও যখনই অবসর পাইতেন, তখনই জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার কার্য্য কলাপ দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে অহো-

রাত্রের মধ্যে তিনি এক মুহূর্ত্তও সঙ্গীত বা বাদ্যের কর্ম্মক্ষেত্রে হইতে অবসর পাইতেন না, তথাপি তাঁহার উক্ত জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠের প্রগাঢ় ইচ্ছা থাকায় তিনি যেমন করিয়াই হউক সামান্য সামান্য সময় করিয়া লইতেন। অতঃপর তিনি একটি রিফ্লেক্‌টিং দূরবীক্ষণ (reflecting telescope) ক্রয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সময়ে এই জাতীয় যন্ত্রগুলি অতিশয় ক্ষুদ্রকায় ছিল। বিশেষতঃ উক্ত যন্ত্রে যে দর্পণ ব্যবহৃত হইত তাহা অতিশয় অসংস্কৃত ও অল্পায়তন ছিল। কাজেই তিনি নিজেই একটি দর্পণ গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি যে কিরূপে দর্পণ গঠন করিয়া ছিলেন, তাহা অনুধাবন করিতে হইলে ইহার মৌলিক বিবরণ অধ্যয়ন করা আবশ্যক *। এ বিবরণ সম্বন্ধে সেরূপ অধিক সংখ্যক গ্রন্থ নাই। বর্ত্তমানে রসায়নবেত্তা মাত্রেই কিরূপে দর্পণ প্রস্তুত হয় তাহা অবগত আছেন। কাচের পৃষ্ঠে রাসায়নিক আরক সহযোগে রৌপ্য অধঃস্থ করতঃ সংলেপিত করিলেই দর্পণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে দর্পণ ব্যবহৃত হইবার প্রাথমিক অবস্থায় সেরূপভাবে দর্পণ প্রস্তুত হইত না। তৎকালে তাম্র এবং টিনের সংমিশ্রণ জাত একরূপ মিশ্রিত ধাতব সংযোগে দর্পণ প্রস্তুত হইত। যেরূপেই প্রস্তুত করা হউক না কেন, প্রাচীন কালে অথবা বর্ত্তমানে সর্ব্ব সময়েই এই সমস্ত দর্পণের গঠন একই প্রকার ভাবে চলিয়া আসিতেছে। আমেরিকার "নলেজ" (knowledge) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় একবার এই সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছিল †। ইহাতে বিখ্যাত ইয়ার্‌কিস্ মানমন্দিরে (Yarkes Observatoy) যে প্রকাণ্ড দর্পণ রহিয়াছে তাহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে বিবৃত আছে। হার্শেল যে দর্পণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার সহিত এই প্রকাণ্ড দর্পণের নির্ম্মাণ প্রণালীর পার্থক্য এই যে হার্শেল স্বহস্তে দর্পণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন কিন্তু এই ইয়ার্‌কিস্ দর্পণ নির্ম্মাণের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইয়ার্‌কিস্ মানমন্দিরের দর্পণের ব্যাস ৬ ফিট এবং ইহার ভার প্রায় ২৭ মণ। যে সমস্ত "শান" যন্ত্রে (grinding tools) এই দর্পণ সুগঠিত হইয়াছিল, তাহাদেরও ভার অত্যন্ত অধিক।

প্রথমে যে যে যন্ত্রাদির দ্বারা দর্পণের কাচ সুমসৃণ ও চিক্কণ হইয়া থাকে তাহাদের যথোপযুক্ত বর্ণনা করিয়া তাহারা কি প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাই বর্ণিত হইবে। প্রথমে দুইটি তাল লৌহকে গলাইয়া নিজের ইচ্ছামত কুব্জপৃষ্ঠ করিয়া ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া হয়। এই ঢালাই লৌহ দুইটিকে কুঁদ যন্ত্রে ফেলিয়া এরূপ ভাবে ক্ষয়িত

* ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের "Royal Society" নামক জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভায় সার হাওয়ার্ড গ্রাব্ এই সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। লর্ড রস নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকএর প্রবন্ধ সমূহেও এতৎসম্বন্ধে বহুল আলোচনা রহিয়াছে।

† Paper by Prof. G. W. Ritchey vol. 34 (1904) of the Smithsonian Contributions to Knowledge.

করা হয় যেন তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণরূপে একের কুব্জ পৃষ্ঠ অন্যের গহ্বরের ভিতর মিলিত হয়। প্রকাণ্ড দর্পণ প্রস্তুত করিতে হইলে এই লৌহ যন্ত্রগুলির ব্যাসের পরিমাণ অন্ততঃ ২ ফিট ৬ইঃ হওয়া আবশুক। অল্লায়তন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ প্রস্তুত করিতে হইলে দর্পণের আকৃতি অনুযায়ী করিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে অতঃপর এই কুব্জ পৃষ্ঠ লৌহ দুইটিকে এমারি চূর্ণ ও জল দ্বারা ক্রমাগত ঘর্ষণ করিতে হয়। অবশেষে দুইটি পরস্পরের মধ্যে বেশ সন্নিবিষ্ট হইয়া যাইলে আর ঘষণের প্রয়োজন হয় না। এইরূপ হইয়া যাইলে তাহারা উভয়েই একই বৃত্তের অংশ স্বরূপ হয়। একটি বন্ধুর কুব্জ পৃষ্ঠ কাচের গোলক ব্রাসেল্‌স্ কারপেটে বন্ধ করিয়া একটা প্রকাণ্ড শায়িত ঘর্ষণ যন্ত্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয়। অতঃপর পূর্ব্ব লিখিত কুব্জ পৃষ্ঠ লৌহ যন্ত্র নানারূপ যন্ত্র পাতির সাহায্যে এই কাচের উপর সংলগ্ন করা হইলে ঘর্ষণ যন্ত্র ঘুরাইয়া দেওয়া হয় এবং এমারি চূর্ণ ও জল প্রয়োগ করা হইতে থাকে। এইরূপে কাচের অবন্ধুরতা ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইয়া ঠিক লৌহ চাকতির ন্যায় হইয়া উঠে। অবশেষে অতি সূক্ষ্মরূপে কাচের চাক্‌তিকে ঘর্ষণ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্ম এমারি চূর্ণ ও জল প্রয়োগ করা হয়। এবারে পূর্ব্বোক্ত লৌহযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। এই লৌহযন্ত্রের অনুরূপ অবিকল আর এক প্রস্থ কুব্জ পৃষ্ঠ লৌহ প্রস্তুত করা হয়। এই লৌহের কুব্জ গাত্রে নালা কাটা থাকে। সেই নালা বাহিয়া জল ও এমারি চূর্ণ দেওয়া হয়। কতিপয় ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত এই যন্ত্র পরিচালিত হয়। এইরূপ করিতে করিতে কাচের অবস্থা এরূপ হইয়া পড়ে যে তাহার গোলত্বে আর কোনরূপ দোষ থাকে না।

এইরূপে ঘর্ষণ করিয়া কাচকে সম্পূর্ণরূপে গোল করিয়া ফেলা হইলে তাহাকে পালিস করা হয়। পালিশ করিতে হইলে প্রত্যেক পদার্থেরই উপরিভাগের কিঞ্চিৎ ক্ষয় হইয়া থাকে। কাচেরও ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়িত অংশের পরিমাণ ১ইঞ্চের দশ সহস্র অংশ অপেক্ষাও অল্পতর। পালিশ করিবার জন্য উপরোক্ত লৌহ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। হস্ত সাহায্যেই কার্য্য চালিত হইয়া থাকে। অতি কোমল ভাবে কার্য্য চালান আবশুক বলিয়া একটি কাষ্ঠের কুব্জ পৃষ্ঠ যন্ত্র প্রস্তুত করা হয়। এই কাষ্ঠের যন্ত্র লম্বা ফালি কাষ্ঠ জুড়িয়া প্রস্তুত করা হয়। কাজেই ইহা কাষ্ঠের জালের ন্যায় দেখায়। এই যন্ত্রের পৃষ্ঠ দেশ সম্পূর্ণ সমতল করিবার জন্য ইহার পৃষ্ঠে রজন বা পিচ ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই রজনগুলি এক একটি চতুষ্কোণ ঘন ক্ষেত্রের ন্যায় হয় এবং ইহাদিগকে কাষ্ঠের গাত্রে শিরিস সহযোগে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং যন্ত্রটিকে সামান্য উত্তপ্ত করা হয় অত পর পূর্ব্বোক্ত দর্পণের কাচের গহ্বরে এই কাষ্ঠ যন্ত্র ন্যস্ত করা হয়। উত্তপ্ত করার উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে রজন সামান্য গলিয়া যায় এবং কাচের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংলিপ্ত হয়। অতঃপর রজনের উপরিভাগে উত্তপ্ত গলিত মোমের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই কাষ্ঠের যন্ত্র সম্পূর্ণ শীতল হইলে দর্পণের কাচের

উপরিভাগে রুজের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া রঙ্গ লাগাইয়া দেওয়া হয়। রঙ্গ দেওয়া হইলে পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠের যন্ত্র ইহার উপর ন্যস্ত করা হয়। প্রতি দশ মিনিট অন্তর অতি সামান্য পরিমাণে এই যন্ত্রটিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বে যে উপায়ে কাচকে ঘর্ষণ করা হইয়াছিল এখন সেই উপায়েই পালিশ করা হয়,—প্রভেদ এই যে তখন যন্ত্রপাতি সাহায্যে কাচ ঘূর্ণিত ও পরিচালিত হইয়াছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে হস্ত সাহায্যেই সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। এইরূপে যন্ত্র সুমসৃণ চিক্কণ ও প্রায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বৃত্তাংশের ন্যায় হইয়া উঠে। যদি কোনও দোষ থাকে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কেননা পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই দোষ পরিহার করিতে হইলে প্রায় এক ইঞ্চের ৫,০০,০০০ অংশ ঘর্ষণ করা প্রয়োজন।

দর্পণের জন্য কুব্জপৃষ্ঠ কাচ, প্রস্তুত করিতে হইলে যাহা করা প্রয়োজন তাহার অতি সামান্য অংশ নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইল। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, হার্শেল বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইচ্ছা করিয়া মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে কর্ম্মকার ছিলেন না। তথাপি তিনি স্বয়ং প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়াই এইরূপে দর্পণ নির্ম্মাণ করিবার যাবতীয় পন্থা স্বয়ং উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং যাবতীয় যন্ত্রপাতি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার সহোদরা ক্যারোলিনের বিবরণী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কিরূপ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ক্যারোলিন এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"হার্শেলকে জীবিত রাখিবার জন্য তাহার কর্মশালায় আমাকে খাদ্যের টুকরা মুখে তুলিয়া দিতে হইত, তিনি কর্ম্মে উন্মত্তবৎ থাকিতেন, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। তিনি একটা ৭ ফুট দর্পণ প্রস্তুত করিবার সময় এককালে ১৬ ঘণ্টা একস্থানে বসিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও দর্পণ হইতে হস্ত অপসারিত করেন নাই।

এই নিদারুণ পরিশ্রমে ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ক্রমাগত আলাপাদিতে তাঁহার শরীর ক্রমেই অসুস্থ হইতে লাগিল। তাহার সহোদরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১৮০৬ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে সমস্ত দিবস নিদারুণ পরিশ্রমের পর তিনি সন্ধ্যার পরেই প্রায় ৫০।৬০ জন বন্ধু পরিবেষ্টিত হইয়া সভ্যতার খাতিরে খাদ্য গ্রহণ না করিয়াই এমন কি রীতিমত ভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত না হইয়াই রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্যের এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, তিনি সমস্ত জীবনেও এ ক্ষতি পরিপূরণ করিতে পারেন নাই।

হার্শেল ১৮২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং অসংখ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন বটে তথাপি তিনি তাঁহার প্রকৃত কার্য্যারম্ভের পর আর কখনও স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্যারোলিনও তাঁহার জীবন

কার্য্যতঃ শেষ হইয়াছিল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হ্যানোভারে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিতেন যে "কেন আমি সুখের ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলাম।" তিনি যে কেন ইংলণ্ডে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। সহোদরের মৃত্যুই তাঁহার জীবনে দুর্ব্বিসহ শোক আনয়ন করিয়াছিল। ইংলণ্ডে আগমন করিলে পাছে সেই সমস্ত স্মৃতির যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারি, এই ভয়েই তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৯৮ বৎসর হইয়াছিল।

হার্শেলের কন্যা আর ব্লে এবং ডাক্তার বার্ণির বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, হার্শেলের গঠনে একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল। ডাক্তার বার্ণি "A Poetical History of Astronomy" নামক একখানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা নানা স্বর্গ উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের কলেবর অতি প্রকাণ্ড। ইহা কখনও প্রকাশিত হয় নাই—কেননা প্রকাশের উপযুক্ত হয় নাই। গ্রন্থ আদৌ উপাদেয় হয় নাই। কোন সময়ে হার্শেলকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। ডাক্তার বার্ণি এই গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য হার্শেলকে অনুরোধ করেন। অপ্রয়োজনীয় ও অমনোমত গ্রন্থ পাঠ করিতে কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। এই গ্রন্থ হার্শেলের আদৌ অভিলাষানুরূপ হয় নাই। তথাপি তিনি ডাক্তার বার্ণি ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ সমক্ষে অতি উচ্চৈঃস্বরে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এরূপ প্রকাণ্ড গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে তিনি যে ধৈর্য্য ও তিতীক্ষার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেরূপ অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর কি না সন্দেহের বিষয়। হার্শেলের জীবনের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ১৮০২ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে তিনি পারিস নগরে নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের পর ইংরাজ কবি ক্যাম্পবেল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি নেপোলিয়নের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিরূপ অভিমত পোষণ করেন। হার্শেল তদুত্তরে বলেন :—

তিনি নেপোলিয়নের জ্ঞান ও শাস্ত্রীয় গবেষণায় বিস্ময়ের কিছুই দেখিতে পান নাই। নেপোলিয়নের প্রথম পারিষদ হার্শেলের নিকট বর্ণনা করেন যে, নেপোলিয়নের ন্যায় সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত ও বীরাগ্রগণ্য তৎকাল পর্য্যন্ত জগতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য বীরত্বের কথা পৃথক। কিন্তু তিনি আদৌ সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ ছিলেন না। বিশেষতঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অত্যন্ত অল্প ও নিরতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। একজন ভদ্র লোকের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান থাকা সম্ভব, নেপোলিয়নের তাহা অপেক্ষা কিছুতেই অধিক জ্ঞান ছিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে নেপোলিয়নের আদৌ জ্ঞান ছিল না একথা বলিলে অন্যায্য হয় না। একজন সাধারণ রাজার

যেরূপ জ্ঞান থাকা উচিত, নেপোলিয়নের তাহাই অথবা তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। কাজেই তিনি সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ আদৌ ছিলেন না। নেপোলিয়নের প্রকৃতি কিছু গর্ব্বিত ছিল, এবং তিনি বাক্যালাপ কালে অবয়বের এরূপ একটা ভঙ্গী করিতেন যে, তাহা দেখিলে মনে হইত যেন তিনি অনেক বিষয় জানেন। কিন্তু একজন প্রকৃত পণ্ডিতের নিকট তাঁহার ছলনা ও চাতুরীপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী অতি সহজে ধরা পড়িত। নেপোলিয়নের প্রকৃতির অসরলতা বা hypociisy বেশ বুঝিতে পারা যাইত। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিষয় যেন কত অবগত আছেন' এইরূপ ভানে বলিতেন যে এই সমস্ত অত্যুজ্জল ও মহিমামণ্ডিত দৃশ্য সর্ব্ব শক্তিমানের কত অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা প্রকাশ করে!

হার্শেল নাক্ষত্রিক এত অসংখ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, তাহার এক মাত্র তালিকাই এক খণ্ড প্রকাণ্ড পুস্তক হইতে পারে। ইহার মধ্যে কোন একটি বাছিয়া লইয়া হার্শেল ও তাহার সহোদরার কার্য্য কলাপ সমালোচনা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক নক্ষত্র জগতের গঠন সম্বন্ধে কোনরূপ সুমীমাংসিত অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য তিনি কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। অবশেষে দ্বিযুক্তনক্ষত্র (double stars) সম্বন্ধে তিনি কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে।

আমরা পৃথিবী হইতে কোন নক্ষত্রের নিকটত্ব বা দূরত্ব নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়াই সাধারণতঃ স্থির করিয়া থাকি। ইহার কারণ কি তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। আলোক যত দূর হইতে আগমন করে, তাহা উজ্জলতাও তত অল্পতর হইতে থাকে। কাজেই যে নক্ষত্রের আলোক যত ক্ষীণতর সেই নক্ষত্রের দূরত্বও তত অধিকতর। ইহা লক্ষ্য করিয়া হার্শেল স্থির করিলেন যে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা এবং নক্ষত্র সমূহের বিন্যাস ও তাহাদেব গণনা দ্বারা মহাব্যোম প্রদেশে প্রবেশ করা বোধ হয় সম্ভব হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া হার্শেল ব্যোমপ্রদেশে চারিবাব পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অবশ্য ইংলণ্ডের নিরক্ষান্তর রেখা হইতে যতটুকু আকাশ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কেবল তিনি তত টুকুই পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাঁহার দূরবীক্ষণ লইয়া প্রথমে উজ্জল তৎপরে অল্পতর উজ্জল এইরূপে যত হীনপ্রভ নক্ষত্র দৃষ্ট হইতে পারে তিনি তৎসমুদায়ই লক্ষ্য করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে দূরবীক্ষণের অবয়ব প্রয়োজন মত বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। তিনি পরিদৃশ্যমান আকাশকে বিভিন্ন আবর্ত্তনে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। প্রত্যেক আবর্ত্তন অংশের বিস্তার পরিমাণ ২ ডিগ্রি ১৫ মিঃ। তিনি স্বীয় প্রবর্ত্তিত এক প্রণালীর দ্বারা প্রত্যেক আবর্ত্তন অংশ করিলেন। তিনি এই প্রণালীর নাম "star gaging" রাখিলেন। যে দূরবীক্ষণ দ্বারা তিনি এইরূপে নক্ষত্র সমূহের গণনা করিয়াছিলেন, তাহার দর্পণের ব্যাস ২০ ফুট ছিল। এই দূরবীক্ষণ সহযোগে পূর্ণ চন্দ্রের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ দৃষ্ট

হইত অর্থাৎ এই দূরবীক্ষণ অন্তর্গত দৃষ্টি সীমা (field view) পূর্ণ চন্দ্রের এক চতুর্থাংশ। আকাশের কেবল উত্তর গোলার্দ্ধের জন্যই এইরূপ দৃষ্টি সীমার ৩,০০,০০০ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক প্রয়োজনীয়। তাঁহার দূরবীক্ষণ সহযোগে উত্তর গোলার্দ্ধের সমস্ত অংশ এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধের যতটুকু সম্ভব তিনি ততটুকু পরিমাণ অংশ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, তিনি কেবল মাত্র অতি দূরতম প্রদেশ দর্শন করিতেছেন তাহা নহে, এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতি দূরতম অতীত যুগও দেখিতে পাইতেছেন। কেননা কোন কোন নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে উপস্থিত হইবার জন্য লক্ষ লক্ষ বা কোটী কোটী বৎসর পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছে। আকাশ-চিত্রাগারে আমরা কেবল বর্ত্তমানে চিত্র দেখিতে পাইতেছিনা, পাশাপাশি অতীতের চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। এইরূপে আমরা নক্ষত্রের রাজ্য কিরূপ বিবর্তন প্রণালীর মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহারও একটা অভ্রান্ত ধারণা করিতে পারি। বর্ত্তমান কালে আলোক চিত্রণ প্রণালী উদ্ভাবিত হওয়ায় নক্ষত্র সমূহ সহজেই চিত্রিত হইয়া যাইতেছে। কাজেই আজকাল নক্ষত্র রাজ্য গঠন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনেক সুবিধা হইয়াছে। মহামতি হার্শেল এরূপ সুবিধার অভাব সত্বেও এই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

নক্ষত্র রাজ্যের মধ্যে ছায়া পথই (milky way) সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জনক ও নয়নাকর্ষক। ইহা একটা নদীর ন্যায় সমস্ত আকাশের মধ্য দিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। দেখিতে অনেকটা নদীর ন্যায় বলিয়া অনেকে ইহাকে "আকাশ গঙ্গা" বলে; অথবা ইহা সুদীর্ঘ শুভ্রপুষ্প-ক্ষেত্রের ন্যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে ইহার ঔজ্জ্বল্য দুগ্ধের ন্যায় সুখদায়ক শুভ্র। সেই জন্যই ইহাকে ইংরাজীতে Milky Way বলে। হার্শেল তাঁহার অনুবীক্ষণ সহযোগে লক্ষ্য করিলেন যে, এই ছায়া পথ অসংখ্য নক্ষত্র সমষ্টির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে পশমস্তূপের ন্যায় বহুসংখ্যক নভঃস্তূপ রহিয়াছে। এই সমস্ত নক্ষত্র অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা শুভ্রঃ এবং অধিকতর উত্তপ্ত। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ এইরূপে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা এবং বহু গবেষণা ও বাদানুবাদের পর স্থির করিয়াছেন যে, এই ছায়াপথের নক্ষত্র সমূহ আকাশের অন্যান্য স্থানের নক্ষত্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক।

আকাশে নানাবিধ নভঃস্তূপ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যে সমস্ত নভঃস্তূপের আকৃতিতে ঠিক যেন প্যাঁচ লাগিয়া গিয়াছে, সেইগুলি বড়ই বিস্ময় কর। ইংরাজীতে এই সমস্ত নভঃস্তূপকে Spiral নভঃস্তূপ বলে। আমরাও ইহাকে স্পাইরাল নভঃস্তূপ বলিব। আকাশে যত প্রকার নভঃস্তূপ রহিয়াছে, তন্মধ্যে গ্রহোৎপাদক, স্পাইরাল ও পশমস্তূপের ন্যায় নভঃস্তূপ সমূহই প্রধান। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে পশমস্তূপের ন্যায় নভঃস্তূপ অন্যান্য নভঃস্তূপ অপেক্ষা অল্পবয়স্ক। ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গার মধ্যে একটিও

স্পাইরাল বা গ্রহোৎপাদক নভঃস্তূপ নাই। কিন্তু আকাশের অন্যান্যস্থানে এরূপ বহুসংখ্যক নভঃস্তূপ রহিয়াছে। এই ছায়া পথ সমস্ত আকাশ ঘেরিয়া রহিয়াছে। অতএব সূর্য্য ইহার মধ্যস্থলের কোন এক অংশে অবস্থান করিতেছে।

ছায়াপথের সর্ব্বত্র নক্ষত্র সমূহের সন্নিবেশ সমনিবীড় নহে। কোন কোন স্থলে দুই একটি. আবার কোন কোন স্থলে একবারে আদৌ নক্ষত্র নাই। ক্যারোলিন ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপে সার জন হার্‌শেলকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহোদর বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলী পরীক্ষা কালে অনেকক্ষণ যাবৎ স্থির নিশ্চল নির্ব্বাক থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন;—"Hier ist wahrhaftig ein Loch im Himmel"—(একি! আকাশের এই অংশে নিশ্চয় একটি গহ্বর রহিয়াছে)। হার্শেলের পুত্র অতঃপর বৃশ্চিক নক্ষত্র মণ্ডলির সমস্ত স্থানটি দূরবীক্ষণ সহযোগে যতদূর সম্ভব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলীতে বস্তুত অনেক স্থানে এমন কি অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও বিদ্যমান নাই।

নিম্নে হার্শেলের একটি প্রবন্ধ হইতে কতকটা অংশ উদ্ধৃত হইল*। তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আমাদের এই প্রকাণ্ড সূর্য্য একটি নক্ষত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে তিনি নক্ষত্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"এই সমস্ত সূর্য্যের হয়ত প্রত্যেকটিরই আমাদের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু রহিয়াছে এবং ইহারা প্রত্যেকে একটা প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। আমি ব্যোম প্রদেশের যে বিশ্লেষণ করিয়াছি. তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আকাশে এরূপ প্রদেশ রহিয়াছে যেস্থানে সূর্য্য সমূহ বিভিন্ন পর্য্যায়ে একত্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমি যে নক্ষত্র সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি সেই তালিকায় এইরূপ কতকগুলি পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিলেই আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টি হইবে না। এই সমস্ত ব্যাপার হইতে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। কোন প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ২।৪ টি বৃক্ষের বা জীবের উদাহরণ লইয়াই যেমন স্বীয় অনুসন্ধিৎসা বলে বৃক্ষের বা জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি এবং ধ্বংশের প্রায় সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করেন, সেইরূপ এই সমস্ত নক্ষত্র মণ্ডলির গঠন হইতে আমরাও এইরূপ অনেক বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে পারি। এই অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জকে আমরাও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, একের সহিত অন্যের তুলনা করিতে পারি, এবং কোন্ প্রাকৃতিক শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে পারি। আমরা যেরূপ গঠনে একটা নক্ষত্রপুঞ্জের পর্য্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি, সেইরূপ গঠন সমূহের মধ্যে গোলকের ন্যায় গঠনই সর্ব্বাপেক্ষা সরল গঠন।

* Philosophical Transactions, vol. LXXIX, p. 212.

প্রথমতঃ নক্ষত্রপুঞ্জ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ, এবং আমাদের এরূপ ধারণার কারণ কি তাহারই মীমাংসা করা উচিত। যে অবস্থা অনেক পুঞ্জে দেখিতে পাওয়া যায় আমি তাহাই মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। পুঞ্জে অনেক গুলি প্রভাময় চিহ্ন থাকে। তাহাদের প্রত্যেকের জ্যোতিঃ সমান। এই চিহ্নগুলি একটা গোলকের পরিধির মধ্যে বিক্ষিপ্ত থাকে। তাহারা এরূপ ভাবে সজ্জিত যে দাগগুলি যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হয় ততই তাহাদের বিন্যাস ঘনীভূত হইতে থাকে, অবশেষে মধ্যস্থলে অত্যুজ্জ্বল আলোকের ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ইহার কারণ এইরূপে নির্ণীত হইতে পারে—যে সমস্ত নক্ষত্রের আয়তন ও গঠন পরিমাণে পরস্পরের সহিত আদৌ ঐক্য নাই এই সমস্ত নক্ষত্রকে বিক্ষিপ্ত, প্রসারিত এবং অসংযত শ্রেণীতে একপ ভাবে সজ্জিত করা যাইতে পারে যে, তাহাদের দ্বারা উক্ত চিত্র পরিস্ফুট হওয়া সম্ভব। অনেক দাশনিক পণ্ডিতের অভিমত এই যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার জন্য কোন সৃষ্টি কর্ত্তার প্রয়োজন হয় নাই। ইহা দৈব ঘটিত নহে হঠাৎ এরূপ হইয়াছে। এই সমস্ত দার্শনিক নক্ষত্রপুঞ্জের এইরূপ সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া কি মনে করিতে পারেন?

আমি যত নক্ষত্রপুঞ্জ এবং নভঃস্তূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি তাহাদের সংখ্যা ২,৩০০ অপেক্ষা অল্পতর নহে। তাহাদের প্রত্যেকটিরই কেন্দ্রাংশ পার্শ্ব অংশ অপেক্ষা ঘন এবং উজ্জ্বলতর। কেন্দ্রাংশ এরূপ উজ্জ্বল বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জের শক্তি বা বল কেন্দ্রেই ব্যবস্থিত হইয়া আছে। এবং এই কেন্দ্র হইতে শক্তি সম্প্রসারিত হইয়া নক্ষত্রপুঞ্জ গঠন করিয়াছে। যে শক্তির দ্বারা এইরূপে বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের পর্য্যায় গঠিত হইয়াছে আমরা কিরূপে সেই শক্তিকে অন্যান্য বিষয়ে ব্যবহার করিতে পারি, তৎসম্বন্ধে অনুধাবন করা উচিত। আমি যে নক্ষত্রপুঞ্জ ও নভঃস্তূপের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা রীতিমত ভাবে পরীক্ষা করিয়া এই শক্তি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মশালায় কিরূপে কার্য্য করিতেছে তাহাও অনুসন্ধান করিতে পারিব। যদি প্রত্যেক নক্ষত্রপুঞ্জ এবং নভঃস্তূপের গঠন একরূপ হইত এবং প্রত্যেকের নক্ষত্র সমূহ যদি একইরূপে ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইত তাহা হইলে আমরা যাহা অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

এক্ষণে যে শক্তি দ্বারা এইরূপ বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ গোলাকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই অনুধাবন করা উচিত। যদি কোন শক্তি কোনরূপে প্রতিহত না হইয়া কার্য্য করিতে পায়, তাহা হইলে শক্তির কার্য্যকালের পরিমাণ অনুসারে ফল উৎপাদিত হইয়া থাকে। কোন নক্ষত্রপুঞ্জের গোলাকারের কারণ এই যে নক্ষত্রপুঞ্জে শক্তির স্থূল মধ্যবিন্দু। তাহা হইলে যে সমস্ত নক্ষত্র পুঞ্জের আকৃতি সম্পূর্ণ অথবা প্রায় সম্পূর্ণ গোল তাহাদের মধ্য শক্তির ক্রিয়ার কাল নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক। মনে করা যাউক কোন নক্ষত্রপুঞ্জে ৫০০০ নক্ষত্র রহিয়াছে, ইহারা কোন একটা সময়ে ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত হইয়া বিন্যস্ত ছিল। ঠিক এইরূপ ৫০০০ নক্ষত্রের আর একটি পুঞ্জ ছিল। তাহা হইলে যে নক্ষত্রপুঞ্জে মধ্য-শক্তির ক্রিয়ার কাল অধিক, তাহাই সম্পূর্ণ গোল এবং ঘন হইবে। ইহা হইতে আমরা নক্ষত্রপুঞ্জের বয়ঃক্রম ইত্যাদি অনায়াসে ধারণা করিতে পারি। নভঃস্তূপ সমূহের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য অনুসারে নক্ষত্র সমূহ বিভিন্নরূপে পুঞ্জে পুঞ্জে একত্রিত হইয়াছে এরূপ ধরিয়া লইলেও আমরা বয়ঃক্রম ইত্যাদি বুঝিতে পারি। কিন্তু কেবল গোলত্ব ধরিয়া লইলেই চলিবে না। যদি কোন পুঞ্জে ১০০০ সহস্র মাত্র নক্ষত্র থাকে, তাহা হইলে সেই নক্ষত্রপুঞ্জে মধ্যশক্তি কার্য্য করিয়া সম্পূর্ণ গোল করিতে যত সময় গ্রহণ করিবে, যে নক্ষত্রপুঞ্জে ১০,০০,০০০ নক্ষত্র রহিয়াছে তাহা গোল করিতে অবশ্য সময়ের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে। কাজেই এসম্বন্ধেও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আবার শৈশব বা বার্দ্ধক্য এইরূপ বলিলে কেবল মাত্র একটা কালের তুলনাই সূচিত হয়। একটা বটবৃক্ষ যে বয়সে অতি শিশু বলিয়া বিবেচিত, সেই একই সময়ে একটা ঝোপ হয়ত মরণের পথে উপস্থিত হইতে পারে।

কাজেই কোন নক্ষত্রপুঞ্জ বা অন্য নভঃস্তূপের বয়ঃক্রম কত তাহা না বলিয়া যে সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পূর্ণ গোল এবং ঘন হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে প্রাচীন এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আকাশ একটি অতি উর্ব্বর উদ্যানের ন্যায়। ইহাতে নানাবিধ উজ্জ্বল পদার্থ উৎপন্ন, বর্দ্ধিত এবং ধ্বংশ হইতেছে।"

যাহা হউক এক্ষণে হার্শেলের অন্য একটি আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা হউক। ১৮৩৮ খৃঃ অঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ হার্শেলের মৃত্যুর ১৬ বৎসর পর পর্য্যন্ত কেহই একটা নক্ষত্রের দূরত্ব স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ বৎসরে হেণ্ডারসন এবং বেজেল উভয়েই দূরত্ব নির্দ্ধারণের উপায় আবিষ্কার করেন। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতই এই দূরত্ব নির্দ্ধারণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন কি হার্শেল ও এই চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ইহা অপেক্ষা আরও একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ৯,৩০,০০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। এবং আমরা ৬ মাসে ১৮,৬০,০০,০০০ মাইল দূরে সরিয়া যাই। যদি দুইটি নক্ষত্র থাকে, এবং তাহাদের একটি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, এবং অন্যটি দূরবর্ত্তী হয়, কিন্তু তাহারা এরূপে অবস্থিত যে তাঁহাদিগকে দেখিলে আমরা মনে করিব যে তাহারা পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে নিকটস্থ নক্ষত্রটি দূরস্থ নক্ষত্র অপেক্ষা প্রত্যেক ছয় মাসে যেন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এই স্থান পরিবর্ত্তনকে জ্যোতির্ব্বিদগণ বৎসরিক প্যারাল্যাক্স (Parallax) বলিতেন। ইহা হইতেই নিকটস্থ নক্ষত্রের দূরত্ব কত তাহা বুঝা যায় অবশ্য দূরস্থ নক্ষত্রের দূরত্ব অত্যন্ত

অধিক হওয়া উচিত। মহামতি গ্যালিলিওর সময় হইতে লোকের এই ধারণা ছিল কিন্তু কেহই ইহার দ্বারা দূরত্বের হিসাব করিতে কৃতকার্য্য হন নাই।

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে কোন নক্ষত্রের দূরত্বের সাধারণ পরীক্ষা তাহাদের ঔজ্জ্বল্য। সেই জন্যই হার্শেল দুইটি বিভিন্নরূপ উজ্জ্বল নক্ষত্র লইয়া দূরত্বের পরিমাণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি অতি নিকটস্থ দুইটি নক্ষত্র দেখিলে প্রথমে মনে করিতেন যে হয়ত দৈবাৎ তাহারা এরূপ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে মিচেল মনে করিলেন যে অন্তরীক্ষে ঐরূপ অতি নিকটস্থ নক্ষত্রগুলি খুব সম্ভবতঃ দ্বিযুক্ত নক্ষত্র বা ডবল্‌ষ্টার (double star)। কিন্তু তিনি ইহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে হার্শেল ইহাদের অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। হার্শেল নক্ষত্রের দূরত্বের নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া ডবল্ ষ্টার আবিষ্কার করিলেন।

বৈজ্ঞানিক আরাগো (Arago) মনে করেন যে হার্শেল যত প্রকার আবিষ্কার করিয়াছেন তন্মধ্যে ডবল ষ্টারের আবিষ্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসংশনীয়। ইহাতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, মহাকর্ষণ কেবল আমাদের সৌরজগতেই নিয়ন্ত্রিত নহে, অন্তরীক্ষে সমস্ত নক্ষত্রই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এক্ষণে প্রতি বৎসরেই প্রায় এরূপ ডবল ষ্টার আবিষ্কৃত হইতেছে এবং তাহাদের কক্ষও নির্দ্ধারিত হইয়া যাইতেছে। এই নক্ষত্র জগৎ আমাদের সৌর জগতের অনুরূপ নহে। কেননা ডবল ষ্টারের প্রত্যেক নক্ষত্র অনেক স্থলে আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর এবং পরস্পরকে কখনও কখনও কয়েক ঘণ্টায় আবার কখনও কখনও বহু বৎসরে পরিভ্রমণ করে।

ডবল ষ্টারের সংখ্যা যে কত তাহা ইয়ত্তা নাই। লিক্ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ক্যাম্পবেল (Campbell) মনে করেন যে প্রত্যেক ছয়টি নক্ষত্রের মধ্যে একটি ডবল ষ্টার।

আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ জগৎ

এবং ইহার সহিত প্রাণহীন ও প্রাণী বিশিষ্টপদার্থের সম্পর্ক। *

কোন সময়ে একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত সাধারণ শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে "চন্দ্র" সম্বন্ধে বক্তৃতা কালে প্রথমে এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বক্তব্য বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা অতীব কষ্টকর, কেননা চন্দ্রের পরিমাণ প্রকাণ্ড, এতদ্ব্যতীত এই

* Translated from the Inaugural address delivered by Dr. Gopal Chandra Chatterjee, M. B. in the Hall of the Indian Association for the Cultivation of Science at the opening day of its Session, 1912-13.

বক্তৃতা প্রসঙ্গে বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্পতর প্রকাণ্ড প্রদেশ, যথা এসিয়ার বিবরণ বলিতে বলা হয়, তাঁহা হইলে ইহার দুরূহতা উক্ত বিষয়ের দুরূহতা অপেক্ষা অনেক অল্পতর। ইহাতে ইহাঁই সূচিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কেবল ইহার ভৌগোলিক আলোচনা করিতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু মানব জাতি তত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এইরূপ অসংখ্য বিষয় আলোচনা করিতে হইবে।

উক্ত দুই বিষয়ের সহিত তুলনায় যদিও আমার বক্তব্য বিষয় বস্তুতঃ সামান্য তাহা-হইলেও আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহের বিবিধত্ব, স্বাভাবিক বিন্যাস, জগতের মঙ্গলজনক বা অশুভকর নানপ্রকার কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিলে আমার প্রবন্ধের দুরূহতা পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বক্তার প্রবন্ধের দুরূহতা অপেক্ষা অতি সামান্য মাত্রও অল্পতর নহে। যাঁহারা সাধারণের উপকারার্থে কোন বিশেষ বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই যাহাতে নির্ব্বাচিত বিষয়টি মনোরম হয়, তজ্জন্য সাধারণের চক্ষুর উপর কাল্পনিক চিত্র সমূহ ধারণ করেন কিন্তু এই চিত্রগুলি বাস্তবিক প্রকৃত তথ্যানুমোদিত নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এরূপ করা বস্তুতঃই বিপজ্জনক, কেননা যে সমস্ত আনুবীক্ষণিক প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ বর্ণিত হইতেছে, তাহারা জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিষয়ক লোকপ্রিয় প্রবন্ধ সমূহের বর্ণিত বিষয়াবলি যথা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার কি লম্বাকৃতি, সূর্য্য জ্বলন্ত পদার্থ-সমষ্টি বা অন্য কিছু ইত্যাদির ন্যায় আমাদের নিত্য আচরিত কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক শূন্য নহে।

পক্ষান্তরে ইহাই সরল সত্য যে এই সমস্ত আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জীবনের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া আমাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এতদ্ব্যতীত এই প্রবন্ধের তত্ত্বসমূহের যদি প্রকৃত মর্ম্ম গৃহীত হয় তাহা হইলে ইহারা আমাদের চিত্তে যতটুকু প্রবেশ করিবে, কাল্পনিক বিবরণ সমূহের সে প্রবেশাধি-কারের আদৌ আশাও নাই।

সাধারণ লোকে প্রায়ই আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ জগৎ সম্বন্ধে একরূপ সত্য-মিথ্যা-বিজড়িত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা দৈনিক পত্রিকা সমূহ হইতে অনেক কাল্পনিক বিবরণ পাঠ করেন। এই সমস্ত বিবরণ অর্দ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা সমূহ হইতে চয়িত হয় এবং তাহাদিগকে আবার দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকগণ কতকটা অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া মুদ্রিত করেন। এই আনু-বীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহের পরিপ্রেক্ষিত ও অভ্রান্ত চিত্র দেখিতে হইলে সমস্ত আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রকৃতিতে ইহার স্থান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা প্রয়োজনীয়।

এই সমস্ত আনুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সমূহের কতকগুলির ইংরাজী নাম ব্যাক্‌টিরিয়া (bacteria)। আমরাও ইহাকে ব্যাক্‌টিরিয়া বলিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্যাক্‌-

টিরিয়া উদ্ভিদ রাজ্যের অন্তর্গত এবং মানব বা অন্য চতুষ্পদ বা উন্নত শ্রেণীর তরুলতার ন্যায় প্রাণ বিশিষ্ট প্রকৃতির একটা অংশ স্বরূপ। ব্যাক্‌টিরিয়াকে প্রকৃতির একটা ভ্রমাত্মক লীলা খেলা মনে করা, অথবা কলুষিত জীবন মানব জাতির ধ্বংশের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করা, একটা বিশেষ ভ্রমাত্মক ধারণা। এক শ্রেণীর লোকের শিক্ষা হইতেই এরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভুত হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, এই জগৎ মানব জাতির উপকারার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের উপকার করা বা তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করাই অবশিষ্ট প্রাণ-বিশিষ্ট প্রকৃতির উদ্দেশ্য। তাঁহারা বিশ্বাস করেননা যে, মানব জাতি জান্তব রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র একটি শাখা মাত্র এবং অন্যান্য শাখা সমূহ এই তথা-অনুমিত শক্তি-শালী প্রভুগণের সহিত কোনকালে সম্পৃক্ত না হইয়াও স্বীয় জীবন ধারণ ও জীবনের কার্য্য সমাধান করিতে পারে। এইরূপে প্রাণ বিশিষ্ট প্রকৃতির অন্যতম প্রকাণ্ড বিভাগ—উদ্ভিদ রাজ্য—সম্পূর্ণ পৃথকরূপে এবং কোনও কালে মানব জাতির ব্যবহারে বা অন্য প্রয়োজনে না আসিয়াও তাহাদের জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতে পারে।

অতএব প্রকৃতরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে ব্যাক্‌টিরিয়া প্রকাণ্ড জান্তব-উদ্ভিজ্জ রাজ্যের একটি শাখা বিশেষ। ইহারা স্বকীয় প্রথায় জীবন ধারণ করে, এবং অধিকাংশ স্থলে আদৌ মানবীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে না। মানব ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর জন্তুর শরীরান্তপুষ্ট হইয়া জীবিত থাকিবার প্রবণতা অতি যৎসামান্য সংখ্যক ব্যাক্‌টিরিয়াতেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহারাই বিষক্রিয়া উৎপাদন করে এবং মানব শরীরে অনিষ্টজনক কার্য্য করিয়া থাকে, কোন কোন স্থলে ইহারা মানবকে ধ্বংশও করিয়া ফেলে। এই জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া,—ইহাদের ব্যাধি এবং মৃত্যু আনয়ন করিবার শক্তি জন্য—সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত। কিন্তু সাধারণে আদৌ চিন্তা করেন না যে, সম্পূর্ণ নিরাপদ অন্য জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা ও শ্রেণী পূর্ব্বোক্ত ব্যাক্‌টিরিয়া অপেক্ষা অনেক অধিকতর।

তৃতীয় শ্রেণীর একরূপ ব্যাক্‌টিরিয়া রহিয়াছে, তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যাপার সমূহের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার শক্তি বর্দ্ধিত করে, এবং এই পরিবর্ত্তনসঞ্জাত পদার্থ সমূহ মানবের বহু প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহাদের সংখ্যা ও অবয়বের পরিমাণ সম্বন্ধে আমি কোন সংখ্যার উল্লেখ করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। কেন না এই সমস্ত সংখ্যা হইতে আপনারা কোন রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, যদি একটি সাধারণ কাচের চুঙ্গীতে দুগ্ধ বা ঐরূপ কোন ব্যাক্‌টিরিয়া পোষক তরল পদার্থ থাকে এবং ইহাতে সাধারণ গৃহতাপ মাত্রায় ব্যাক্‌টিরিয়াকে ২৪ ঘণ্টার জন্য সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা পৃথিবীর সমগ্র নর নারীর সংখ্যার দশ গুণ অপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইবে।

মাইক্রোকোকাশ নামক একজাতীয় ব্যাকটিরিয়া রহিয়াছে। আমি উপরোক্ত অবস্থায় ইহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া বাস্তবিক গণনা করিয়া দেখিয়াছি যে ইহাদের সংখ্যা ২০,০০,০০,০০,০০,০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে স্থলে প্রচুর পরিপোষণোপযোগী খাদ্য এবং উপযুক্ত উত্তাপ রহিয়াছে, ব্যাকটিরিয়ার বিন্যাসও তথায় অধিক। বায়ুমণ্ডলে ইহারা পরিপুষ্ট হয় না, এবং বায়ু প্রবাহে ইহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিতে দেখা যায়, কেননা ইহাদের গুরুত্ব অতিশয় লঘু। অতি উচ্চ প্রদেশে (পার্ব্বত্য প্রদেশ) ইহারা অতি বিরল। ব্যোমযান যাত্রিগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাঁহারা ঊর্দ্ধ প্রদেশে উপনীত হইলে ব্যাকটিরিয়া সমুহের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান না। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। জলে ইহারা বর্ত্তমান থাকে এবং ইহাদের সংখ্যাও অধিক। মেরু প্রদেশের যে সমস্ত স্থানে জীবিত পদার্থ বাস করেনা, সেই সমস্ত স্থানে ব্যাকটিরিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানে জীব জন্তু রহিয়াছে, ব্যাকটিরিয়াও তথায় বর্ত্তমান আছে। মানব শরীরের বহির্ভাগে চর্ম্মের উপর অতি অল্প সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শরীরাভ্যন্তরের আন্ত্রিক প্রদেশে (intestinal tract) কোটী কোটী ব্যাকটিরিয়া রহিয়াছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার আন্ত্রিক প্রদেশ এই সমস্ত উদ্ভিদাণু শূন্য থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা পোষণ করা হয় এই সমস্ত উদ্ভিদাণু সেই মুহূর্ত্তে শরীরের আন্ত্রিক প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে, এবং আমরণ তথায় বসবাস করে। অধিকাংশ স্থলেই তাহারা বিশেষ অনিষ্ট দায়ক নহে, এবং কোন ক্ষতি করে না। কোন কোন স্থলে তাহারা বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করিয়া শরীরকে বিষাক্ত করে এবং পরমায়ু হ্রাস করে।

(ক্রমশঃ)

কাজের জিনিষ।

সাবানে অমিশ্রিত ক্ষার আছে কিনা তাহার পরীক্ষা।—সাবানে যদি ক্ষার অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে সেই সাবান মাখিলে শরীরের অপকার হইয়া থাকে। কাজেই অমিশ্রিত ক্ষার আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইলে শুষ্ক সাবানে উত্তপ্ত কোন যৌগিক পারদ দ্রব আস্তে আস্তে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিলে যদি সাবানের গাত্রে কোনরূপ হরিদ্রাভ দাগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সাবানে অমিশ্রিত ক্ষার রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

কাচ, চীনা মাটি এবং ধাতব পদার্থে লিখিবার পেন্‌সিল।—কাল পেন্‌সিল্‌ঃ—ভুষা ১০, মোম ৪০, চর্ব্বি ১০ ভাগ। শুভ্রঃ হোয়াইটিং (ক্রম্‌স্‌) ৪০, মোম ২০, চর্ব্বি ১০ ভাগ। ফিকে নীলঃ—বার্লিন্‌ ব্লু (ফিকে) ১০, মোম ২০, চর্ব্বি ১০ ভাগ। গাঢ় নীলঃ—বার্লিন্‌ ব্লু (গাঢ়) ১৫, গলিত আঠাল পদার্থ ৫, চর্ব্বি ১০ ভাগ। লালঃ—হিঙ্গুল ২০, মোম ২০, চর্ব্বি ২০ ভাগ। হরিদ্রাঃ—ক্রোম ইয়োলো ১০, মোম ২০, চর্ব্বি ২০ ভাগ।

ধাতব পদার্থে ভার্ণিশ লাগাইবার প্রথম সোপান।—সাধারণতঃ ধাতব পদার্থে ভার্ণিশ লাগাইলে ভার্ণিশ স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ কাঁচা এবং নূতন থাকে, ততক্ষণ ভার্ণিশ ঠিক থাকে। শুষ্ক হইয়া সামান্য পুরাতন হইলেই ভার্ণিশ চটিয়া যায়, এবং পদার্থের গাত্র হইতে স্খলিত হয়। ইহা নিরাকরণ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ধাতব পদার্থের গাত্র হইতে তৈলাক্ত বা ঐ জাতীয় পদার্থ সম্পূর্ণ অপসৃত করা উচিত। তৎপরে ১৫ ভাগ নাইট্রিক্‌ দ্রাবক, ২০ ভাগ সুরাসার, ৫ ভাগ তরল গাম আরেবিক, এবং ১০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থ হইবে, তাহাদ্বারা পদার্থের গাত্রে একটা পাতলা আবরণ দিয়া এবং শুখাইয়া যাইলে আবরণ অপসারিত করিয়া সাধারণ উপায়ে ভার্ণিশ লাগাইলে আর সহজে ভার্ণিশ চটিয়া যায় না।

কাষ্টআয়রন্‌, ইস্পাত এবং বার লৌহ বুঝিবার সহজ উপায়।—পাত্রের গাত্র পরিষ্কৃত থাকিলে অথবা উখার দ্বারা রীতিমত ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া পরিষ্কৃত স্থানে নাইট্রিক দ্রাবক লাগাইলে কয়েক মিনিট পরে কাষ্ট আয়রণে গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ দাগ, ইস্পাতে বাদামী কৃষ্ণ বর্ণ দাগ, এবং বার লৌহে ঈষৎ শ্বেতাভ ভস্মের ন্যায় দাগ পড়ে।

টীন বা ধাতব চাদরে কাগজ লাগাইবার লেই প্রস্তুত প্রণালী।—তাপমাত্রার হ্রাস বা আধিক্যে ধাতব পদার্থের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য কাগজ সাধারণ লেই বা গঁদ দিয়া ধাতব চাদরে জুড়িলে কাগজ অল্প পরেই ছাড়িয়া যায়। কাজেই শুষ্ক হইয়া যাইলেই বেশ স্থিতিস্থাপক থাকে ধাতব চাদরে কাগজ যুড়িবার জন্য এরূপ লেই প্রয়োজন। (১) উত্তপ্ত শিরীষের ঘন দ্রাবণের সহিত টাটকা প্রস্তুত ২ ভাগ শ্বেতসারের লেই ১ ভাগ তারপিন তৈল এবং ১ ভাগ সুরাসারের সহিত মিশ্রিত করিলে যে লেই প্রস্তুত হয় তাহা অতি শীঘ্র কাগজ পত্র জুড়িয়া ফেলে এবং কাগজ ফুটিয়া বাহির হয় না বলিয়া বিশেষ উপকারী। (২) ৬০ ভাগ গঁদ, ৪৫ ভাগ ময়দার লেই, জল উপযুক্ত পরিমাণ। প্রথমে জলে গঁদ দ্রবীভূত করিয়া পরে ময়দা চালিয়া দিতে হয় পরে ইহাতে ১৫ ভাগ চিনি ঢালিয়া দিয়া ইচ্ছানুরূপ ঘন করিয়া লইলেই লেই প্রস্তুত হয়। উত্তাপে ফুটিবার সময় ইহাতে সামান্য কর্পূর দিলে ইহা বোতলে বা টীনের কৌটায় অনেক কাল অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যাইতে পারে। ইহা অতি অল্প সময়ে কাগজ জুড়িয়াফেলে।

কাচের ভঙ্গ প্রবণতার নিরাকরণ।—কাচ যে এত সহজ ভঙ্গুর তাহার একমাত্র কারণ—উত্তপ্ত কাচদ্রবকে অতিশীঘ্র শীতল করা হয়। পদার্থ বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, কোন পদার্থের অণুগুলিকে ক্রমাগত গতিশীল রাখিতে পারিলে, অণুগুলি পুনঃ সজ্জিত হইবার চেষ্টা করে। ক্ষীণ লবণ দ্রাবণে ফুটাইয়া লইয়া অতি ধীরে ধীরে শীতল করিলে কাচেরও আণবিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। ইহাতে কাচের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থালীতে বা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যে সমস্ত কাচের দ্রব্য ও পাত্র ব্যবহৃত হয় সে গুলিকে ও আলোকের চিমনি ও ডোম গুলিকে এইরূপে একবার ফুটাইয়া লইয়া এবং অতি অল্পে অল্পে শীতল করিয়া লইয়া ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

বিবিধ।

প্যারিসে এইরোপ্লেন।— প্যারিসের পুলিশ এই আদেশ প্রচার করিয়াছে যে, প্যারিসের সীমার মধ্যে কোন এইরোপ্লেন অবতরণ করিতে পারিবে না। এমন কি সীমার বহির্ভাগে ১,৭৪০ ফুটের মধ্যেও কেহ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত কোন বসত-বাড়ী হইতে এইরোপ্লেনে আরোহণ বা অবতরণ করিতে পারিবেন না।

নূতন ধূমকেতু।— হারভার্ড কলেজের মানমন্দিরে গত ৮ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক গেল এবং সিডনে একটা নূতন ধূমকেতু দর্শন করিরাছেন।

চলিষ্ণু চিত্রাবলী ও বাক্য কথন।— অনেকেই বায়স্কোপ দেখিয়াছেন। বায়স্কোপের চিত্রসমূহ কেন ওরূপ ভাবে জীবন্ত বা চলিষ্ণু মনে হয় তাহার কারণ সময়ান্তরে আলোচিত হইবে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বায়স্কোপ কোম্পানী সময়ে সময়ে চলিষ্ণু চিত্রের সহিত গ্রামোফনের গান এইরূপ ভাবে সংযোজিত করেন, তাহাতে মনে হয় যেন চিত্রই বাস্তবিক গান করিতেছে। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে ডাক্তার কিটুসি এই পন্থা উদ্ভাবন করেন। সম্প্রতি তিনি গানের পরিবর্ত্তে গ্রামোফোনের রেকর্ডে চিত্র সমূহের কথাবার্ত্তা উত্থিত করিয়া লইয়া এইরূপ ভাবে চিত্র প্রদর্শন করিছেন যে হঠাৎ মনে হয় যেন চিত্র সমূহ কথা বার্ত্তা কহিতেছে। ইহা এখনও আমাদের দেশে আমদানী হয় নাই।

রমণী ও জারমান বিশ্ববিদ্যালয়।— জারমান বিশ্ববিদ্যালয়ে রমণী ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ২,৯৫৮ জন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাসিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০৬২, তিনটি ব্যাভেরিয়ান বিশ্ব

বিদ্যালয়ে মোট ২৭৯, দুইটি বাডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪৩৭ এবং অবশিষ্ট ৩০০ সমগ্র জারমান দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২,৫০০০ রমণী বিশুদ্ধ জারমান বংশ সম্ভূতা। ২,৯৫৮ জন ছাত্রীর মধ্যে ১,৬৩৫ জন সাহিত্য এবং ইতিহাস, ৫৩০ গণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, ৬২৫ জন চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৭৪ জন রাজনীতি এবং কৃষি বিজ্ঞান, ৩৯ জন আইন বিদ্যা, ২৮ জন দন্ত বিজ্ঞান, ৭ জন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং ১১ জন ধর্ম্ম নীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।

মানব জীবনে বায়স্কোপের কার্য্যকারিতা।— বেলগ্রেড স্থিত আমেরিকান রাজদূত রিপোর্টে প্রচার করিয়াছেন যে, উক্ত নগরের যুবকগণ আমেরিকার আদব কায়দা ও পোষাক পরিচ্ছদের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় দোকান সমূহে আমেরিকার টুপী, জুতা এবং পোষাক পরিচ্ছদের অত্যন্ত বিক্রয়াধিক্য হইয়াছে এমন কি তাহারা আমেরিকার লোকের ন্যায় কেশেরও বিন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তমানে যাবতীয় বায়স্কোপ চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার সমস্তই আমেরিকায় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা একটি বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। যদি আমাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদেশের কৃষি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের বায়স্কোপ ফিল্‌ম্ এ দেশে আমদানি করিয়া জন সাধারণ এবং কৃষিকুলকে চিত্র প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের কৃষকগণ অনায়াসে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে পারে।

প্রাপ্তি স্বীকার।— আর্য্যাবর্ত্ত— শ্রাবণ ১৩১৯; আলোক— অগ্রহায়ণ ১৩১৮; অবসর— ভাদ্র ১৩১৯; আলোচনা— ভাদ্র ১৩১৯; অর্ঘ্য— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; অর্চ্চনা— আশ্বিন ১৩১৯; আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী— শ্রাবণ ১৩১৯; অলৌকিক রহস্য— ভাদ্র ১৩১৯; ভারতী— ভাদ্র, ১৩১৯; ভারত মহিলা— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; ভক্তি— জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯; বামাবোধিনী— আশ্বিন ১৩১৯; বসুধা— ভাদ্র ১৩১৯; বঙ্গদর্শন— ভাদ্র ১৩১৯; ব্যবসা ও বাণিজ্য— বৈশাখ, ১৩১৯; বঙ্গরত্ন— ; চিকিৎসাসম্মিলনী— চৈত্র, ১৩১৮; চিকিৎসা প্রকাশ— ভাদ্র ১৩১৯; The Calcutta University Magazine— Aughst, 1912; দেবালয়— আশ্বিন, ১৩১৯; The Dawn & Dawn Society's Magazine— October, 1912; Food and Drugs— No. 3. vol. II; গৃহস্থ— ভাদ্র ১৩১৯; Hindu Spiritual Magazine— September, 1912. হিন্দুসখা— ভাদ্র ১৩১৯; হিতবাদী— ; হিন্দুপত্রিকা— ভাদ্র ১৩১৯; জগজ্জ্যোতিঃ— ভাদ্র, ১৩১৯; জন্মভূমী— আষাঢ়, ১৩১৯; কুশদহ— আশ্বিন, ১৩১৯; কৃষক— শ্রাবণ, ১৩১৯, কর্ম্মকার বন্ধু— আষাঢ়, ১৩১৯; কোহিনুর— শ্রাবণ, ১৩১৯; কাজের লোক— April, 1912; কায়স্থ পত্রিকা— আশ্বিন, ১৩১৯; কৃষি সম্পদ— আষাঢ়, ১৩১৯; মহাজন বন্ধু— শ্রাবণ, ১৩১৯; মেদিনীপুর হিতৈষী— ; মুকুল—

ভাদ্র, ১৩১৯; নির্মাল্য— বৈশাখ, ১৩১৯; নব্যভারত— শ্রাবণ, ১৩১৯; নাট্য-মন্দির— আষাঢ়, ১৩১৯; প্রকৃতি— ভাদ্র, ১৩১৯; প্রসূন— ; পল্লিচিত্র— ভাদ্র, ১৩১৯; প্রজাপতি— ভাদ্র, ১৩১৯; পতাকা— আষাঢ়, ১৩১৯; প্রতিভা— ভাদ্র, ১৩১৯; রংপুর সাহিত্য-পারিষৎ পত্রিকা— ৬ষ্ঠ ভাগ, ২য় সংখ্যা; শান্তিকণা— ফাল্গুণ, ১৩১৮; সমাজ— জৈষ্ঠ, ১৩১৯; সাহিত্য-সম্বাদ— আশ্বিন, ১৩১৯; শিল্প ও সাহিত্য— আষাঢ়, ১৩১৯; স্বাস্থ্যসমাচার— আশ্বিন, ১৩১৯; সাহিত্য সংহিতা— আষাঢ়, ১৩১৯; সঞ্জীবনী— ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা— আশ্বিন ১৩১৯; ত্রিশূল— ; ী— শ্রাবণ ১৩১৯; উদয়— ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা; উপাসনা—।

কলিকাতা ৫১ নং শাঁখারীটোলা, এংলো-সংস্কৃত প্রেস হইতে শ্রীপঞ্চানন সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ।) ডিসেম্বর, ১৯১২। (১২শ সংখ্যা

জীবনী শক্তির মূল এবং প্রকৃতি।

(অধ্যাপক শাফারের বক্তৃতা)

ডাণ্ডি নগরে বিটিশ এসোসিয়েসন নামক সভার স্বনামধন্য অধ্যাপক শাফার উক্ত বিষয়ে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হইলে বা বক্তৃতা প্রদত্ত হইলে সাধারণতঃ বক্তব্য বিষয়ের প্রাথমিক ব্যাপার গুলির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করাই রীতিসঙ্গত। শাফারের বক্তৃতার প্রথম প্যারাগ্রাফ জীবনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সংজ্ঞার উপসংহার তত সন্তোষজনক বলিয়া মনে হয় না। শাফার বুদ্ধিমানের ন্যায় জীবনের কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হইতে বিরত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি জীবনের কোনরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি না, কেননা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চেতন বা তথা কথিত অচেতন পদার্থের সীমা নির্দ্দেশ সূচক কোন সূক্ষ্ম চিহ্ন স্থির করা তত সহজসাধ্য নহে।

সাধারণতঃ লোকে জীবন এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশক চৈতন্যকে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন করিতে চায়,—যেন এই দুইটি অবিচ্ছিন্নরূপে শৃঙ্খলিত। সেই জন্যই চেতন ও অচেতন এইরূপ বাক্য উদ্ভূত হইয়াছে। এই গুলি সাধারণতঃ জীবন-বিশিষ্ট ও জীবন-শূন্য এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই অভিমতের জন্য কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং অধ্যাপক শাফার যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন বা যে সমস্ত প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, তাহা কেবল পদার্থ বিষয়ক—আদৌ "আত্মা" বিষয়ক নহে।

জীবনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, আমরা যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা জীবনের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, শাফার সেই সমস্ত দ্বারা জীবন বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও অনেক বাধা বিপত্তি আছে। যে ব্যক্তি পথে চলিয়া যাইতেছে, সে যদি কখনও "কোন্ ধর্ম্ম জীবিত পদার্থের পরিচায়ক" এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করিবে যে ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন গতিই জীবিত পদার্থের পরিচায়ক, কিন্তু প্রকৃত আমরা দেখিতে পাই যে যাহারা বস্তুতঃ প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থ,—যেমন উন্নত শ্রেণীর বৃক্ষাদি—তাহাদের এই নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতা অতি সামান্য বা অত্যন্ত অনুন্নত। আবার বর্ত্তমানে আমরা বিজ্ঞান চর্চ্চার বলে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাস্তবিক সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের— তরল স্ফটিক (liquid crystals) ইত্যাদির—অতি বিস্ময়কর গতি রহিয়াছে, ইহাদের গতি বা বৃদ্ধি জীবিত পদার্থের গতি ও বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সমতুল্য।

জীবিত পদার্থের আর একটা ধর্ম্ম এই যে, ইহারা চতুস্পার্শ্বস্থ পদার্থ সমূহ হইতে নিজের দৈহিক গঠনে যে সমস্ত পদার্থ রহিয়াছে সেই সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া পরিপাক করে এবং বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু স্ফটিক সমূহও এইরূপে চতুস্পার্শ্বস্থ পদার্থ হইতে শরীর পুষ্টির উপযোগী 'খাদ্য' শোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। এমন কি সময়ে সময়ে বৃদ্ধ স্ফটিক যখন নির্দ্দিষ্ট আয়তন বিশিষ্ট হয়, তখন নূতন স্ফটিক উৎপাদন করে।

জীবনের এই সমস্ত ভৌতিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া যদি জীবনের রাসায়নিক তত্ত্ব অনুধাবন করা যায়, তাহা হইলেও আমরা প্রায় পূর্ব্বোক্তরূপ সমধর্ম্ম ব্যাপার সমূহ লক্ষ্য করিয়া থাকি। প্রাথমিক রসায়নবিৎ পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে, যাবতীয় জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ অর্থাৎ অঙ্গার মূলক পদার্থ কেবল মাত্র প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থ হইতে অথবা তাহাদের জীবনী শক্তির ক্রিয়ার দ্বারাই উৎপাদিত হইতে পারে, কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উৎপাদন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে উলার (Wohler) এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোচ্ছেদ করেন। তিনি বিশুদ্ধ অনঙ্গারক রাসায়নিক পদার্থ সমূহের যোগে ইউরিয়া নামক এক প্রকার জান্তব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। ইহার পরে অনেক রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত নানাবিধ জান্তব পদার্থ উৎপাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ফিসার এবং অন্যান্য রাসায়নিকগণ পলিপেপটাইডস্ (polypeptides) নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপাদন করিতেছেন। ইহা জান্তব এলবুমিন এবং প্রোটিড ঘটিত পদার্থ। কাজেই জীবনীশক্তির ক্রিয়া ব্যতিত যে জান্তব বা প্রাণ-বিশিষ্ট-পদার্থ-জাত পদার্থ উৎপাদিত হইতে পারে না তাহা সত্য নহে।

এইরূপ নানাবিধ ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণতঃ এইরূপ মনে হয় যে আমরা কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে জীবিত পদার্থ উৎপাদিত করিতে পারি। অধ্যাপক শাফারের মতে এই বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত রাসানিক পণ্ডিতগণ যতটুকু

অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাতে অনায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই জ্ঞানোন্নতি ভবিষ্যতে জীবিত পদার্থ উৎপাদন করার পক্ষে নিতান্তই অনুকূল। যাহা হউক আমরা অধ্যাপক শাফারের সম্পূর্ণ বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ "বিজ্ঞানে" প্রকাশিত করিতেছি।

সংজ্ঞা।

জীবন কি?— তাহা প্রত্যেক লোকেই জ্ঞাত আছেন অথবা মনে করেন যে তিনি জ্ঞাত আছেন; অন্ততঃ আমরা জীবনের সাধারণ এবং সর্ব্বদা পরিদৃশ্যমান নানারূপ ক্রিয়ার সহিত সকলেই পরিচিত আছি। কাজেই এরূপ মনে হয় যে ইহার নির্ভুল বা প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা তত কষ্টসাধ্য নহে। তথাপি অতি তীক্ষ্ণ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও এ বিষয়ে বিফল-প্রযত্ন হইযাছেন। মহামতি হাববার্ট স্পেনসার তাঁহার প্রসিদ্ধ "Principles of Biology" নামক গ্রন্থের দুইটি অধ্যায়ে, তৎকাল পর্য্যন্ত জীবনের যে সংজ্ঞা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল তৎসম্বন্ধে রীতিমত সমালোচনা করিয়া স্বয়ং অন্য একটি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু উপসংহারে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে জীবিত পদার্থের অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত পরিচিত সমস্ত ক্রিয়ার পরিচায়ক অথচ সমস্ত প্রাণহীন পদার্থের ক্রিযার পার্থক্য সূচক একপ কোন সংজ্ঞাই তিনি স্থির করিতে পারিতেছেন না।

সাধারণ অভিধান জীবিত থাকিবার অবস্থাকেই জীবনের সংজ্ঞা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। রুডি বারনর্ডএর পথানুসরণ করিয়া দার্শনিক ডাষ্টার, যাবতীয় জীবিত পদার্থের সাধারণ যে সমস্ত ব্যাপার, তাহাদের সমষ্টিই জীবনেব সংজ্ঞা বলিযা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যে পৌরহিত্যের সমস্ত ক্রিয়া করে সেই পুরোহিত—পুরোহিতের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ যেরূপ, জীবনের উপরোক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ও অবিকল সেইরূপ। দার্শনিক মহাজ্ঞানবান পণ্ডিত সমূহের পক্ষে যে কার্য্য কষ্ট-সাধ্য হইয়াছিল আমি সেই সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা কবিনা, কেননা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞান যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, চেতন বা তথাকথিত অচেতন পদার্থের সীমা নির্দ্দেশসূচক কোন সূক্ষ্ম চিহ্ন স্থির করা তত সহজসাধ্য নহে।

জীবন আত্মার সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে।

জীবন, এই কথাটির ঠিক বিপরীত কোন একটি কথা নাই। তবে কোন কোন লোকে মৃত্যুকে ইহার বিপরীতার্থক মনে করেন। সামান্য চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে বাস্তবিক তাহা নহে। মৃত্যু বলিলেই বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বে জীবন ছিল, এবং দৈহিক তত্ত্ব হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মৃত্যু জীবনের একটি অন্যতম ক্রিয়া মাত্র,—ইহা জীবনের অবসান বা শেষ কার্য্য। "একটা জীবিত

পদার্থের প্রাণ আছে" এই কথা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, ঠিক সেই অর্থে "একটা প্রাণহীন পদার্থের মৃত্যু আছে" একথা ব্যবহার করিতে পারি না। সাধারণ লোকে যে সমস্ত পদার্থ কোন কালে প্রাণ-বিশিষ্ট ছিল না, তাহাদের পূর্ব্বে— 'মৃত' এই বিশেষণ প্রয়োগ করে। উদাহরণ স্বরূপ— "as dead as a door nail" এই কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এইরূপ প্রয়োগ যুক্তি সঙ্গত নহে, কেননা মৃত বা জীবিত বলিলে ইহাই বুঝায় যে হয় অতীতকালে জীবিত পদার্থের স্বতঃ সিদ্ধান্ত বিষয় সমূহ ইহাতে ছিল বা বর্ত্তমানে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে জীবিত বা জীবন হীন, চেতন বা অচেতন এই কথাগুলি সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক। নিয়মমত ও অর্থতঃ ধরিতে হইলে চেতন ও অচেতন এই দুইটি বাক্যে ইহাই বুঝায় যে একের আত্মা (anima) রহিয়াছে অন্যের তাহা নাই। এবং আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে লোকে ভুল করিয়া আত্মা এবং জীবনকে সমান বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমার প্রবন্ধে আমি যে জীবনের কথা বলিতেছি, তাহাতে এরূপ আত্মার যে কোন সম্পর্ক নাই, তাহা বলিয়া দিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

জীবনের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ পদার্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে অবিভিন্ন।

উপরোক্ত ধারণা কেবল জীবনের সম্পর্কেই সম্ভব ও এই ধারণার উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি অতিশয় জটীল জীবিত পদার্থের জটীল জীবনী ক্রিয়ার ফল স্বরূপ এবং ইহা হইতেই জীবন ও আত্মা যে এক এরূপ বিশ্বাস উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু আত্মা বলিলে আমরা জীবন ব্যতীত আরও বিশেষ যে অর্থ গ্রহণ করি, আত্মা হইতে সেই অর্থ অপসারিত না করা হইলে, আত্মা ও জীবন এই দুইটি কথার পার্থক্য বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। কেননা জীবনের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ মূলতঃ ও যথার্থতঃ পদার্থের প্রতিপাদ্য বিষয় ভিন্ন আর অন্য কোন কিছু নহে। প্রকৃত বিজ্ঞান মতে বুঝিতে হইলে পদার্থের ব্যাপার হইতে পৃথক করিয়া জীবনের ধারণা করা যায় না। যে সমস্ত প্রণালীতে পদার্থের ক্রিয়া, ঘটনা ও ব্যাপার সমূহ আলোচিত হয়, জীবনেরও যাবতীয় ক্রিয়া, ঘটনা ও ব্যাপারাদি আলোচনা করিতে হইলে সেই সমস্ত প্রণালীই অবলম্বিত হয় অথবা সেই সমস্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াই জীবনের ঘটনাদির আলোচনা করা সম্ভব। এইরূপ আলোচনা হইতে ইহাই প্রকাশিত হয় যে অচেতন বা প্রাণহীন পদার্থ যে সমস্ত নিয়মে অনুশাসিত, প্রাণবিশিষ্ট বা চেতন পদার্থও সেই অদ্বিতীয় নিয়মে অনুশাসিত হইয়া আসিতেছে। আমরা জীবনের ক্রিয়া সমূহের যত অধিক গবেষণা করি, ততই আমরা উক্ত বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারি এবং জীবনের ক্রিয়া সমূহ বুঝিবার জন্য কোন এক সম্পূর্ণ অবোধ্য বা অপরিচিত বিশেষ তেজের সাহায্য লইবার প্রবৃত্তি আমাদের ততই অল্পতর হইতে থাকে।

কোন্ কোন্ ব্যাপার জীবনের জ্ঞাপক :—গতি।

জীবনের অস্তিত্বের সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট ব্যাপার— নিরবচ্ছিন্ন গতি। আমরা মানবকে চলিতে দেখি, কুকুরকে দৌড়াইতে দেখি, পক্ষীকে উড়িতে দেখি এবং আমরা জানি যে ইহারা জীবিত। একটা তড়াগের অপরিষ্কৃত জল অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখি যে, জলে অসংখ্য কণিকার ন্যায় জীবিত পদার্থ নিরবচ্ছিন্ন এবং দ্রুত পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং তৎক্ষণাৎ আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, জলে রাশি রাশি জীবিত পদার্থ রহিয়াছে। এই জলের মধ্যে একটা পরিষ্কার নরম পদার্থ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সময়ে সময়ে তাহার অবয়ব পরিবর্ত্তন করে ; সময়ে সময়ে উক্ত কোনরূপ গঠন বিহীন পদার্থ হইতে হঠাৎ এক এক অংশ লম্বা হইয়া বাহির হইয়া আইসে এরং এই পদার্থটি অনুবীক্ষণের দৃষ্টভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা বুঝিতে পারি এই নরম অবয়ব হীন পদার্থটি জীবিত এবং ইহাকে য়্যামিবা লাইমাক্স্ (amaeba limax) নামে অভিহিত করি। আমাদের শরীরের প্রত্যেক আনুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠেরও * এইরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের শরীরের শ্বেত রক্ত কণিকা †, সংযোজক তন্তু ও বর্দ্ধনশীল স্নায়ুর আনুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠ, ও সমস্ত কোমল নবীন আনুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠেই অর্থাৎ সর্ব্বত্রই এইরূপ গতি বর্ত্তমান। শরীরের যে যে অংশে বা যে প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের য়্যামিবার ন্যায় গতি রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার সময় আমরা "য়্যামিবানুরূপ" এই বিশেষণ সংযুক্ত করিয়া থাকি। এই সমস্ত গতি জীবনের পরিচায়ক। এবং গতি হইতে জীবনের অস্তিত্ব স্বীকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায় সঙ্গত সিদ্ধান্ত।

প্রাণ-বিশিষ্ট ও প্রাণহীন পদার্থের গতির সাদৃশ্য।

কিন্তু পদার্থ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ পদার্থের মধ্যেও এইরূপ গতি আছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাদের গতিও পূর্ব্বোক্ত প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের গতির সমতুল্য। কিন্তু আমাদের কল্পনাকে যেরূপ ইচ্ছা পরিচালিত করিয়াও, কিছুতেই এই সমস্ত পদার্থকে জীবিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। তৈলাক্ত পদার্থের গতি, অঙ্গার বা অঙ্গার মূলক যৌগিক পদার্থের মিশ্রণজাত গতি, এমনকি বিন্দু বিন্দু পারদ গোলকের গতিও আমাদের আলোচ্য জীবিত পদার্থের গতি হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। এই সমস্ত পদার্থের গতির নাম আমরা য়্যামিবা অনুরূপ গতি বলিয়া বর্ণণা করিব। কিন্তু যে সমস্ত তরল পদার্থ পরীক্ষিত হইতেছে, তাহাদের রাসায়নিক অথবা ভৌতিক ক্রিয়ার অনুবর্ত্তী উপরিভাগের টানের পরিবর্ত্তনের জন্যই এরূপ গতি উদ্ভূত হইয়া থাকে। কাজেই ইহা স্থির নিশ্চয় যে, এই সমস্ত গতিশীলতা বিশেষ

---

* আনুবিক্ষণিক প্রকোষ্ঠ বা (cell) কাহাকে বলে তাহা বিজ্ঞানে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।

† শোণিতে দুইরূপ কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়—শ্বেত ও লোহিত।

জীবনীশক্তির ক্রিয়া নহে, এবং তাহাদের অস্তিত্ব জীবনের পরিচায়ক নহে। এবং যখন আমরা প্রাণী অঙ্গের কোন কম্পনশীল কেশ বা লোম, বা যে সমস্ত ব্যাপার জীবনের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ (উদাহরণ স্বরূপ পেশীর সঙ্কোচনের বা বিস্ফারণের কথা বলা যাইতে পারে) তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করি, তখন দেখিতে পাই যে ইহারা য়্যামিরা অনুরূপ গতিশীলতার সহিত এত সাদৃশ্য আনয়ন করে, যে আমারা অনায়াসে মীমাংসা করিতে পারি যে, ইহাদের গতি মূলতঃ য়্যামিবার অনুরূপ এবং যে প্রথায় য়্যামিবার গতি উৎপাদিত হইয়া থাকে, ইহাদেরও গতি সেই প্রথাতেই উৎপাদিত হয়। এবং বিভিন্ন জীবিত পদার্থের দেহান্তর্গত অবিভিন্ন প্রোটোপ্ল্যাসমের * স্বকীয় গতিশীলতা হইতে বিবর্ত্তন প্রণালীর মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়াই যে বিভিন্ন শরীরধারী উন্নত শ্রেণীর জীবিত পদার্থের বিভিন্ন এবং জটীল গতিশীলতা উদ্ভূত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সমস্ত গতি প্রাণহীন পদার্থ সমূহও অনুকরণ করিতে পারে। জীবনের অস্তিত্ব জ্ঞাপক এই গতিশীলতার প্রমাণ সমূহ একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে। জলচর অতি মৌলিক কোন জীবের য়্যামিবা অনুরূপ গতি বা শ্বেত রক্ত কণিকার বিশেষ গতিই হউক, অথবা কোন কৈশিক আনুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠের বা গলিত পদার্থ উদ্ভূত কোন জীবিত পদার্থের গতিই হউক, অথবা ইচ্ছা উদ্রিক্ত কোন পেশীর সঙ্কোচন বিস্ফারণ বা মনের কোন বিশেষ ভাব উদ্ভূত হৃদয়ের প্রত্যেক ঘাত প্রতিঘাত হউক অর্থাৎ যে কোনরূপ গতিই হউক না কেন আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে প্রাণহীন জগতের পদার্থ সমূহ যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত সাধারণ নিয়ম সমূহ দ্বারাই জীবনের পরিচায়ক গতি সমূহ নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

খাদ্যের গ্রহণ ও পরিপোষণ ও অখাদ্যের বর্জ্জন।

এ স্থলে এরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে প্রাণহীন ও প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের যে গতির সাদৃশ্য বর্ণিত হইল, সেই গতি কেবল উপরিভাগেই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সেই গতি দেখিয়া উক্ত উভয়বিধ পদার্থের মধ্যে যে কি সম্পর্ক তৎসম্বন্ধে আমরা যে অভিমত স্থাপন করিতে পারি, তাহা, ঐ সমস্ত গতির বা উক্ত উভয়বিধ পদার্থের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার আরও গভীরতর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে হয়তঃ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কেননা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে গতি শীলতার সঙ্গে সঙ্গে

---

* প্রোটোপ্ল্যাসম্ (Protoplasm)— ইহা জীবনী শক্তির মৌলিক উপাদান। যে সমস্ত শারীরিক বা জৈবিক দেহান্তর্গত আনুবীক্ষণিক প্রকোষ্ঠের কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকোষ্ঠগুলি প্রোটোপ্ল্যাসমে পূর্ণ থাকে। প্রোটোপ্ল্যাসম যে সমস্ত প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান নাই, তাহারা মৃত। জীব বা উদ্ভিদ গতায়ু হইয়াছে বলিলে ইহাই বুঝায় যে প্রোটোপ্ল্যাসম মৃত হইয়াছে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত জীবিত পদার্থেই প্রোটোপ্ল্যাসম দেখিতে একরূপ।

প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে এমন কতকগুলি স্বাভাবিক ব্যাপার পরিলক্ষিত হয় যে তাহা প্রাণহীন পদার্থের মধ্যে আদৌ বর্ত্তমান নাই। জীবিত পদার্থের এই সমস্ত স্বাভাবিক ব্যাপারের মধ্যে খাদ্যের গ্রহণ ও খাদ্য হইতে স্বীয় পরিপুষ্টি ও অখাদ্য বর্জ্জন প্রণালীই সর্ব্ব প্রধান। আমরা এরূপ মনে করিতে পারি যে নিশ্চয়ই এ প্রণালী প্রাণহীন পদার্থে আদৌ বিদ্যমান নাই। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই তর্কও প্রাণহীন পদার্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ধারণা আনয়ন করিতে পারে না। কেননা যে সমস্ত স্থলে জীবনের কোনরূপ অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনা করাও অসম্ভব, সেরূপ স্থলেও খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদির ন্যায় ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ উদাহরণ অস্‌মটিক (osmotic) * ব্যাপার। ইহা কোন কাগজবৎ পাতলা চর্ম্ম দ্বারা ব্যবহিত দুইটি বিভিন্ন ঘন তরল দ্রাবণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঠিক অনুরূপ এই অবস্থা প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

জীবনের সহগামী রাসায়নিক ব্যাপার।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ ভাবিতেন যে, জৈব রসায়ন শাস্ত্র, অজৈব বা প্রাণহীন পদার্থের রসায়ন শাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই দুই বিভিন্ন রসায়ন শাস্ত্রের সীমা রেখা বেশ সুস্পষ্ট ছিল, ক্রমে ক্রমে রেখা অস্পষ্ট হইয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে. অর্থাৎ উভয়বিধ রসায়ন শাস্ত্রে এখন আর কোন পার্থক্য নাই। এইরূপে প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের রসায়ন শাস্ত্র (যাহা বর্ত্তমানে অঙ্গার মূলক রসায়ন শাস্ত্রের একটা শাখা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে) পূর্ব্বে সাধারণ রাসায়নিক পণ্ডিতের আয়ত্বের সীমার বহির্ভূত এবং যাহারা জীবের জীবনীশক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করেন তাঁহাদেরই বিশেষরূপে করায়ত্ত বলিয়া বিবেচিত হইত; কিন্তু এক্ষণে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের হস্ত হইতে বিশুদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিতের হস্তেই এই জৈব রসায়ন শাস্ত্র আসিয়া পড়িতেছে।

প্রাণ বিশিষ্ট পদার্থের শারীরিক আঠাল (colloid) উপাদান; প্রাণহীন এবং প্রাণ-বিশিষ্ট পদার্থ সমূহের ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাদৃশ্য।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল টমাস্ গ্রেহাম একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহাতে তিনি পদার্থের আঠালবৎ বা colloidal অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সম্বন্ধে যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই লিখিত ছিল। বাস্তবিক এই গ্রন্থ জ্ঞানরাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ আমাদের প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের ধর্ম্ম

* অসমটিক (osmotic) ব্যাপার। যদি দুই জলীয় বা তরল দ্রাবণের একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিকতর ঘন হয়, এবং এই দুই বিভিন্ন ঘন দ্রাবণকে কোন পাতলা চর্ম্ম দ্বারা ব্যবহিত করা হয়, তাহা হইলে ঘনতর পদার্থ চর্ম্মের উপরেই থাকুক অথবা নিম্নেই থাকুক, চর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিবাহিত হইয়া পাতলা দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত হইবে। এই ব্যাপারের নাম অসমসীস্।

সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সহায়তা করে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কেননা উত্তরোত্তর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জীবিত পদার্থের ভৌতিক বা রাসায়নিক শাস্ত্র—নাইট্রোজেন ঘটিত আঠাল পদার্থের ভৌতিক বা রাসায়নিক শাস্ত্র হইতে ভিন্ন নহে। জীবনের উপাদান বা প্রোটোপ্ল্যাসম্ বস্তুতঃই সর্ব্বদা আঠালবৎ দ্রব আকার গ্রহণ করে। এই সমস্ত আঠাল পদার্থের দ্রবে আঠাল পদার্থের সহিত স্ফটিক (electrolytes) পদার্থ সম্পৃক্ত থাকে। এই স্ফটিক পদার্থ সমূহ হয় দ্রাবণে সম্পূর্ণ অনাবদ্ধ বা উহার অণুগুলিতে সংলগ্ন থাকে।

জীবনীশক্তির এই আঠাল এবং স্ফটিকবৎ উপাদান পরিবেষ্টন করিয়া একটা পাতলা পর্দ্দা রহিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ঐ আঠালবৎ পদার্থ হইতেই এই পর্দ্দা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই পর্দ্দা অসমটিক ক্রিয়া পরিচালিত হইবার ব্যবধান স্বরূপ কার্য্য করে এবং যে আঠাল পদার্থে প্রোটোপ্ল্যাসম জীবিত থাকে তাহারও বিনিময় চলিতে থাকে। প্রোটোপ্ল্যাসমের মধ্যভাগেও এইরূপ অনেক পর্দ্দার ভৌতিক এবং রাসায়নিক উভয়-বিধ নানারূপ বিশেষত্ব থাকে। এই বিশেষত্বের বলেই প্রোটোপ্ল্যাসম হইতে বিশেষ কোন এক জাতীয় পদার্থ নিঃসারিত ও তাহাতে অণুপ্রবিষ্ট হয় অথবা প্রোটোপ্ল্যাসমের এক অংশ হইতে অন্য অংশে বিভিন্ন পদার্থ নিঃসারিত বা অণুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভৌতিক অবস্থায় উৎপাদিত পরিবর্ত্তন সমূহ, প্রোটোপ্ল্যাসমের গঠনের ভিতর এনজাইম (enzymes) নামক যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া খাদ্যের গ্রহণ ও পরিপোষণ ও অখাদ্যের বর্জ্জন ইত্যাদি ক্রিয়া পরিচালিত করে। সম্পূর্ণ ভৌতিক এবং রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীব দেহের বহির্ভাগে পূর্ব্বোক্ত পরিবর্ত্তন অনায়াসে উৎপাদিত করা যাইতে পারে। তবে ইহা সত্য যে জীবিত পদার্থ যে সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহারা কোন্ কোন্ অবস্থায় ক্রমান্বয়ে পরি-বর্ত্তিত হইয়া জীবিত পদার্থ হইতে বাহির হইয়া আইসে, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু প্রাথমিক প্রণালী এবং শেষ পরিণতি এই উভয়ই, আমরা আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত রাসায়নিক ও ভৌতিক নিয়ম অবগত আছি, সেই সমস্ত নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া যেরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব সেইরূপই হইয়া থাকে, এইরূপ ধরিয়া লইলে, আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারি যে, জীবিত পদার্থে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ ভৌতিক এবং রাসায়নিক শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

আলুর বীজ রক্ষা করিবার উপায়।

ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে আলুর চাস হয় সেই সমস্ত প্রদেশের কৃষকেরাই কতকগুলি আলুকে পুনর্ব্বার বাজের জন্য কয়েক মাস অত্যন্ত যত্ন করিয়া রক্ষা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ বর্ষাকালে সেই বীজগুলিকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা না করিলে, অধিকাংশ বীজই রোগাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই সেইগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা কষ্টকর হইয়া উঠে। বহুবৎসর পূর্ব্বে ইটালি হইতে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে আলুর বীজ আমদানি হইয়াছিল, এবং ইটালি প্রভৃতি দেশে আলুর কীট অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া, আমদানির সময় বীজের সহিত আনীত সেই সমস্ত কীট বর্ত্তমানে এদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত পোকাগুলি যে কেবল আলুর গাছ নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা নহে, তাহারা বীজের জন্য রক্ষিত আলুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে থাকে ও সেই বীজ আমদানি রপ্তানির সহিত দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সমস্ত কীটের কবল হইতে আলুর বীজ রক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয়। যাহাতে কীটগুলি বীজের ভিতর প্রবেশ না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। সেই জন্য আলুর বীজগুলিকে প্রথমতঃ ভাল করিয়া বাছিয়া লইয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে আলুর বীজ বদ্ধ স্থানে রক্ষা করিলে প্রায় সমস্তগুলিই রোগাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। অতএব কিরূপ উপায়ে বীজগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ঃ—

প্রথমতঃ আমরা কীটগুলির জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ক্ষেত্রে আলুর চাষ হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেই সহস্র সহস্র কীট উড়িয়া বেড়ায় এবং যে স্থানে আলুর বীজ রক্ষা করা হইয়াছে, সেই স্থানেও বহুল পরিমাণে উহারা বিদ্যমান থাকে। পোকাগুলি বীজ-আলুর চক্ষুর ভিতর ছিদ্র করিয়া ডিম্ব প্রসব করে, সময়ে সময়ে আলুগাছের পাতার নিম্নেও তাহাদের ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কীটগুলি শৈশবাবস্থায় গাছের পাতায় বাসা করিয়া থাকে এবং গাছের কোমল ডাল কিম্বা পাতা কাটিয়া গর্ত্ত করে। সেই জন্য মাঝে মাঝে গাছের ডগা ও পাতা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও পোকাগুলি আলুর চক্ষুতে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করে এবং থাকিবার স্থান প্রস্তুত করে। একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেই কীটগুলির আবাস স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে পারা যায়, কারণ তাহাদের পরিত্যক্ত মল কৃষ্ণ বর্ণ দানার ন্যায় আলুর

গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ডিম্বের অবস্থা হইতে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত একটি কীটের প্রায় এক মাস কাল সময় লাগে। একটি কীট ২৫টি হইতে ৩০টি ডিম্ব প্রসব করে, কখনও কখনও অধিক সংখ্যকও প্রসব করে দেখা যায়। এমন কি একটি কীট ৮৬টি ডিম্ব প্রসব করিয়াছে এরূপও দেখা গিয়াছে।

আলু যখন ভারতবর্ষের একটি প্রধান খাদ্য, তখন উহার রোগ বীজ হইতে সমূলে বিনষ্ট করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যখন আমদানির সময় কীট আসিয়া এদেশের এরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে তখন তাহাদিগকে নষ্ট করা সম্ভবপর। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে রোগ দূরীভূত নাই হউক অনেক পরিমাণে যে হ্রাস হইতে পারে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পুসার কৃষিবিদ্যালয়ের প্রধান কীটতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Imperial Entomologist) অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল লেফরয় (Prof. Maxwell Lefroy) কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষ বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে আলুবীজকে কীটের বিষম আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অনেক গুলিতে কৃতকার্য্য হইয়া উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি সহজ-সাধ্য তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

প্রত্যেক বারে ২৫ সের বাছা আলু লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছিল।

(১ম) ২৫ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই বা মাদুরের উপর ছড়াইয়া রাখা হইয়াছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল যে ৫ সের নষ্ট হইয়াছে এবং শুষ্ক হইয়াছে বলিয়া ওজনে আরও প্রায় ৫ সের কমিয়াছে। অবশিষ্ট ১৪ সের ১ ছটাক আলু উপযুক্ত সময়ে বপনের পর তাহা হইতে ৩ মণ ২৪ সের আলু উৎপন্ন হইয়াছে।

(২য়) ২৫সের বিজ আলু বাছিয়া চাটাই এর উপর ন্যাপ্থালিন (Naphthalene) গুঁড়া দিয়া রাখা হইয়াছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল ৩ সের নষ্ট হইয়াছে এবং শুখাইয়া গিয়া ১৫ সের ৮ ছটাক অবশিষ্ট আছে। বপনের পর তাহা হইতে ৫ মণ ২২ সের উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩য়) ২৫ সের বীজ আলু চাটাই বা মাদুরের উপর কাঠকয়লা বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল, ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল যে ৩ সের ২ ছটাক নষ্ট হইয়াছে এবং শুখাইয়া গিয়া ১৩ সের ১২ ছটাক অবশিষ্ট আছে, বপনের পর তাহা হইতে ৩ মণ ৩৬ সের উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত তিনি অনেক স্থানে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন৷ সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ও অধিক ফলদায়ক উপায় গুলিই বর্ণিত হইল।

যাঁহারা আলুব চাষ করিয়া থাকেন ও যাঁহাদিগকে কীটের উৎপীড়নে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাঁহারা সকলেই উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করিবেন।

শ্রীআশুতোষ দে।

সাসেক্স দেশের প্রাচীন মনুষ্য।

যাঁহাবা মানব জাতীব প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিবাব জন্য উৎসুক, তাঁহারা ইংলণ্ডের "ভূতত্ব-বিষয়ক সভা"তে সম্প্রতি এতৎসম্বন্ধে যে একটি অতীব প্রয়োজনীয়, নূতন আবিষ্কাব বর্ণনা কবিযা এক প্রবন্ধ পঠিত হইযাছে, তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতুহল যে অনেক পবিমাণে চবিতার্থ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি লিউইস নগবেব (Lewes) চার্লস্ ডসন্ (Charles Dawson) এবং ইংলণ্ডের যাদুঘবেব (British Museum) ভূতত্ব বিভাগেব তত্বাবধাযক ডাক্তাব এ স্মিথ (Dr. A. Smith) ইংলণ্ডেব আদিম নিবাসী কোন একটি মানবেব চিবুকের এবং মাথার খুলির এক অংশ দর্শকবৃন্দকে প্রদর্শন কবাইযাছিলেন।

চার্লস্ ডসন্ পৃথিবীর আদিম জীব-বিজ্ঞান বিষয়ের জনৈক মেধাবী পণ্ডিত। তিনি এক বৎসর পূর্ব্বে আকফিল্ড সাসেক্স (Uckfield Sussex) এর সন্নিকট পিল্ট ডাউন কমনেব (Pilt Down Common) নিকটবর্ত্তী স্থানে সাসেক্স দেশের একটি আদিম মনুষ্যেব দেহাবশেষ প্রথম আবিষ্কার কবিয়াছিলেন এবং ইহা ডাক্তার স্মিথ উড্ওযার্ডকে (Dr Smith Woodword) জ্ঞাপন কবাইয়া, তাঁহারা দুইজনে একত্রে গত গ্রীষ্মকালে সেই দেহাবশেষেব আরও অন্যান্য অংশ পাইবার জন্য উৎসুক হইয়া অতীব কঠিন পবিশ্রম সহ অনুসন্ধান কবিযাছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারা মাথার খুলির অন্যান্য অংশ পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে তাঁহাবা মাথাব খুলির কতক অংশ ও চিবুকেব অর্দ্ধভাগ আবিষ্কার কবিয়াছিলেন। অতি সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই নিম্ন চিবুক স্পষ্টই বানরের চিবুকের সদৃশ এবং সেই অস্থি ও অন্যান্য আকৃতি সুনিশ্চিত মনুষ্যের মত। আবার কতকগুলি প্রধান প্রধান চিহ্ন দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সেই দেহাবশেষের অনেক অংশ মনুষ্যের মত এবং অনেক অংশ বানবের মত।

সৌভাগ্যের বিষয় মস্তকের খুলির অংশ এত অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের দ্বারাই মস্তিষ্কেব আধারটির সম্পূর্ণ পুনরোদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সেই মস্তিষ্কাধারের পরিমাপ দুই পাইন্টের কিছু অল্পতর অর্থাৎ

একটা বৃহৎ বানরের মস্তিষ্কের প্রায় দ্বিগুণ। অবশ্য ইংরাজ জাতির মস্তিষ্কের পরিমাপ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিকতর। ইহা আড়াই পাইন্টের কম নহে।

বহু প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সাসেক্স দেশে এই সকল মনুষ্য সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাস করিত। তাহাদের কিরূপ প্রকৃতি, কিরূপ ভাবে তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কিরূপ জন্তু শিকার করিত এবং কোন্ কোন্ জন্তু দ্বারাই বা বিতাড়িত হইত, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। খুব সম্ভবতঃ এই বর্ণনাই অনেক পরিমাণে সত্য।

যতদূর বুঝিতে পারা যায় যে, এই সাসেক্স মনুষ্য আকারে খর্ব্বাকৃতি এবং অত্যন্ত পেশল ছিল, আধুনিক মনুষ্য জাতির ন্যায় যদিও তাহাদের সুগঠিত ও সুঠাম দেহ ছিল না তথাপি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অল্পাধিক তীক্ষ্ণতর ছিল, পরিধেয় বস্ত্র ছিল না কিম্বা বাসের জন্য গৃহ ছিল না। কেবল রাত্রিতে নিরাপদে থাকিবার জন্য তাহারা কোনরূপ আশ্রয় উদ্ভাবন করিত। তৎকালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী, গণ্ডার ও অন্যান্য জন্তু দলে দলে বিচরণ করিত। তাহারা ঐ সকল জন্তু ও সিন্ধুঘোটক ইত্যাদি খাদ্যের জন্য বধ করিত।

খুব সম্ভবতঃ তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের নিকট হইতে অগ্নির ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল এবং এই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সাহায্যে তাহারা তাহাদের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বর্শার মুখ কঠিন করিত ও তাহাদের খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিত। তাহারা অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মাণ করিত।

শ্রীআশুতোষ দে।

দীপ-শলাকা।

যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানবের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, দীপ-শলাকার আবিষ্কার তন্মধ্যে অন্যতম। অগ্নি মানব সভ্যতার প্রধান উপকরণ। দীপশলাকা এই অগ্নিকে অত্যন্ত সুলভ করিয়াছে। বাস্তবিক দীপশলাকা আবিষ্কৃত না হইলে বর্ত্তমান সভ্যতা হয়তঃ আরও পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িত। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রধান পদার্থের জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীগণের সময়ে পাটকাটীখণ্ড সমূহকে উত্তপ্ত গলিত গন্ধকে ডুবাইয়া শলাকা প্রস্তুত করা তাঁহাদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরি-গণিত ছিল। এখনও বঙ্গপল্লীর অনেক স্থলে চকমকি ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে চকমকি ও ইস্পাত অতীত যুগের দর্শনীয় পদার্থের মধ্যে পরিগণিত

হইয়া আসিতেছে। চকমকির প্রস্তরে ইস্পাত ঠুকিয়া অগ্নি নিঃসারিত করতঃ দগ্ধমুখ সোলায় সেই অগ্নি প্রক্ষিপ্ত করিলে সোলায় অগ্নি উদ্দীপিত হইত। তাহাতে গন্ধকমুখ পাটকাটি লাগাইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইত। কিন্তু যতবার অগ্নি প্রয়োজন হইত ততবার চকমকি ঠুকিয়া উৎপাদন করা বড়ই কষ্ট-সাধ্য বলিয়া প্রত্যেক গৃহস্থে তুষ ইত্যাদির অগ্নি একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাটির পাত্রে সর্ব্বদা রক্ষিত হইত। তাহাতে উক্ত পাটকাটি লাগাইয়াই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার প্রথা ছিল। ৫০।৬০ বৎসর পুর্ব্বে কলিকাতার পথে গন্ধক-মুখ-শলাকার ফেরিওয়ালা ঘুরিয়া বেড়াইত।

সভ্যতার প্রধান উপকরণ অগ্নি কখন কোন্ সময়ে বা কিরূপে প্রথম কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অগ্নিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ ইত্যাদিতে ইহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে। যে সময়ে অগ্নি উৎপাদন করা অতীব কষ্টসাধ্য ছিল, অথচ অগ্নি ব্যতীত কোন কার্য্য হওয়া অসম্ভব, তখনকার দিনে এরূপ মহোপকারী প্রয়োজনীয় সামগ্রীর শক্তিকে দেবতা বলিয়া পূজা করায় বস্তুতঃই আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুতেই নহে। এরূপে পূজা করিতেন বলিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অগ্নিকে তাঁহারা কিরূপ প্রয়োজন-সাধক মনে করিতেন। বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক গৃহস্থের কোন এক পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা অগ্নি উদ্দীপিত রাখা হইত। কখনও নির্ব্বাপিত হইত না। এই অগ্নি পিতা পুত্রকে পবিত্র উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া যাইতেন। প্রাচীন ইউরোপীয়গণও এইরূপে অগ্নি রক্ষা করিতেন। ভারতবর্ষের পারসীকগণ এখনও এইরূপে অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এইরূপ কথিত আছে যে, সহস্র বৎসর গত হইল যখন পারসিকগণ ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ প্রদত্ত অগ্নির কিয়দংশ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই অগ্নি এখনও বোম্বাই প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত মন্দির সমূহে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। গ্রীকগণের পৌরাণিক উপাখ্যান পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমতঃ গ্রীক দেবতাগণ অগ্নির ব্যবহার জানিতেন। প্রমিথিউয়াস নামক কোনও ব্যক্তি এই অগ্নি স্বর্গ হইতে অপহরণ করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন। আতসী কাচ (lens) বা গোলাকার দর্পণ প্রয়োগে কিরূপে অগ্নি উৎপাদিত করিতে হয়, প্রাচীন গ্রীকগণ তাহাও অবগত ছিলেন। সাইরাকজে রোমান রণপোত সমূহ এই দর্পণ প্রয়োগে সন্দীপিত অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন ইজিপসীয়গণ মিশ্রিত খনিজ দ্রব্য হইতে ধাতু নিষ্কাসিত করিবার জন্য অগ্নির ব্যবহার জানিতেন। এমন কি তাহারা মৃত্তিকা নির্ম্মিত তৈজসাদিও অগ্নি দগ্ধ করিয়া লইতেন। চুল্লী এবং উপরোক্ত কার্য্যাদি সমাধা করিবার যন্ত্রাদির চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ক্রমে ক্রমে লোকে দুইটি শুষ্ক কাষ্ঠ বা দুইখণ্ড প্রস্তর ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন

করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। আদিম অসভ্য অধিবাসিগণের কোন কোন জাতির মধ্যে এখনও এই প্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের দেশের সাঁওতালগণ এখনও এই উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। অবশেষে চকমকি ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন প্রণালী প্রচলিত হয়। ইউরোপে ১৯শ খৃঃ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে অগ্নি উৎপাদনের নানা প্রথা অবলম্বিত হওয়ায় চকমকির ব্যবহারও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। ডুবারেনিয়ার সাহেব এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহার সাহায্যে কৃষ্ণ প্লাটিনাম ধাতুতে হাইড্রোজেন বাষ্প অনুপ্রবিষ্ট হইলে ইহাতে এত উত্তাপ উৎপাদিত হইত যে, মুহূর্ত্তমধ্যে হাইড্রোজেন বাষ্প জ্বলিয়া উঠিত। ক্রমে ফায়ার-সিরিঞ্জ নামক এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। ইহার সাহায্যে পিচকারী (syringe) মধ্যস্থ বায়ুকে সহসা এত চাপপ্রয়োগে সঙ্কুচিত করা হইত যে, বায়ু অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত এবং পিচকারীর ডাঁটির (piston) মুখাস্থিত দগ্ধমুখ সোলায় অগ্নি উদ্দীপিত হইত।

১৮০৫ খৃঃ অব্দে প্যারিস নগরের চ্যানসেল (Chancel) নামক জনৈক রাসায়নিক কর্ম্মকার পোটাসিয়াম ক্লোরেট দীপশলাকা প্রস্তুত করেন। পোটাসিয়াম ক্লোরেট কিরূপ পদার্থ, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। দীপালীর সময় এই পদার্থ ও মনঃশিলা (মনছাল) দিয়াই বারুদ প্রস্তুত করা হয়। পোটাসিয়াম ক্লোরেট ও চিনি চূর্ণ করিয়া তাহাতে গঁদ ঢালিয়া দিয়া অতঃপর পাটকাটীর মুখে সংলগ্ন করা হইত। এই প্রলিপ্তমুখ বিশুদ্ধ শালফিউরিক দ্রাবকে নিমজ্জিত করা হইলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া পাটকাটিকে প্রজ্জ্বলিত করিত। এইরূপ ১০০ শলাকা ও উপযুক্ত দ্রাবকের মূল্য প্রায় ১।৷০ টাকা ছিল।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়াম কনগ্রিভ— "কনগ্রিভ" নামক এক প্রকার দীপ-শলাকা প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন। জন ওয়াকার নামক এক ব্যক্তি এই শলাকা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। ইহাতে শলাকার মুখে পোটাসিয়াম ক্লোরেট ও মনঃশিলা গঁদ সহযোগে প্রয়োগ করা হইত, এবং বালি ধরান কাগজে ঘর্ষণ করিলেই কাটি জ্বলিয়া যাইত। দীপালীতে বারুদ প্রস্তুত করিবার সময় অনেক বালক বালিকা হঠাৎ এই মিশ্রণ ঘর্ষণ করিয়া প্রায়ই বিপদে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপ ৮৪ শলাকার মূল্য প্রায় ৸৪ আনা ছিল। ক্রমে ক্রমে ফসফরাস আবিষ্কৃত হইল। এবং ইহা আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে শলাকায় ফসফরাসই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ফসফরাসের ন্যায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী অতি অল্পই আছে। সেই জন্য ফসফরাস কি এবং কিরূপে উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ফস্‌ফরাস্ কখন এবং কোন্ সময়ে কোন্ রাসায়নিক পণ্ডিত প্রথম আবিষ্কার

করেন তাহা আদৌ বুঝিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ হামবার্গ নিবাসী ব্রাণ্ড ইহা প্রথম উৎপাদন করেন। প্রাচীন রাসায়নিকগণ মনে করিতেন যে মূত্র সহযোগে এরূপ এক প্রকার তরল পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব যদ্দ্বারা রৌপ্য স্বর্ণে পরিবর্তিত হইতে পারে। ব্রাণ্ড এই মূত্র হইতে ফসফরাস্ উৎপাদন করেন। তিনি ইহার উৎপাদন প্রণালী অতি গোপনে রক্ষা করেন। পরে এই গুপ্ত প্রণালী তিনি ক্রাফ্ট্‌কে বিক্রয় করেন। কুঙ্কেল তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্য জানিয়া লইয়া সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করত ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন।

ফসফরাস প্রথমে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। ১৬৭৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের নরপতি দ্বিতীয় চার্লশ্ এবং অগণিত দর্শক বৃন্দের সম্মুখে ক্রাফ্ট্ ইহা প্রদর্শন করেন। স্বনামধন্য রবার্ট বয়েল ফসফরাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাদি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রাফ্‌টের নিকট হইতে তিনি এসম্বন্ধে কোন সন্ধানই পান নাই। কুঙ্কেল এবং ব্রাণ্ড পূর্ব্বে মাটির পাত্রে মূত্র এবং বালী উত্তপ্ত করিয়া যেরূপে ফসফরাস্ উৎপাদন করিয়াছিলেন, বয়েলও সেই উপায়ে ১৬৮০ খৃঃ অব্দে ফসফরাস প্রস্তুত করেন। এই উপায়ে ফসফরাস প্রস্তুত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। অনেক রাসায়নিক কর্ম্মকার উৎপাদন করিতে অক্ষম হইতেন। সেই জন্য ১৭৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। এক আউন্স ৮৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত। রাসায়নিক গন (Gahn) ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে অস্থির মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেটের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু ১৭৭১ খৃঃ অব্দে শীল এই সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলে পর অস্থিভস্ম হইতে ফসফরাস উৎপাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থলে অস্থি হইতেই ফসফরাস উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে।

ফসফরাস দুইটি গ্রীক বাক্য হইতে উদ্ভূত লইয়াছে। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে ইহা অন্ধকারেও আলোক রশ্মি বিকীর্ণ করিতে পারে। প্রথম যে রাসায়নিক যৌগিক এইরূপে আলোক বিকীরণ করিতে পারিত, তাহার নাম বোনোনিয়ান ফসফরাস ছিল (বেরিয়াম সালফাইড)। ইহা হইতে প্রকৃত ফসফরাসকে পৃথক বুঝিবার জন্য ফসফরাস মিরাবিলিস্ বা ফসফরাস ইগ নিয়াস নামে ফসফরাস্‌কে অভিহিত করা হইত। অষ্টাদশ খৃঃ অব্দে ইহাকে সাধারণতঃ ব্র্যাণ্ড বা কুঙ্কেল বা বয়েলের ফসফরাস বলা হইত। কখনও কখনও ইংলিশ ফসফরাসও বলা হইত। কেননা লণ্ডন নগরের হ্যান্‌কুইজ, বয়েলের নির্দ্ধারিত নিয়মাবলী দ্বারা ফসফরাস প্রস্তুত করিতেন।

লাভয়সিয়ারের সময় পর্য্যন্ত ফসফরাসকে লোকে ফ্লজিস্টন ও একটা বিশেষ কোন এসিডের অর্থাৎ দ্রাবকের যৌগিক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু ১৭৭২ খৃঃ অব্দে উক্ত বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক প্রমাণ করিলেন যে, ফসফরাস দগ্ধ করিয়া যে দ্রাবক

উৎপাদিত হয় তাহার ভার আদিম ফসফরাস অপেক্ষা অধিকতর। ইহার আধিক্যের কারণ এই যে ইহা দগ্ধ হইবার সময় বায়ুর উপাদানের কোন একটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। ফরাসী বিজ্ঞান সভায় ১৭৮০ খৃঃ অব্দে যে একখানি পুস্তিকা পঠিত হয় তাহাতে তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, ফসফরিক দ্রাবক ফসফরাস এবং অক্সিজেনের যৌগিক, এবং ইহা হইতে যে সমস্ত যৌগিক লবণ উৎপাদিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধেও তিনি বিশেষ গবেষণা করেন।

ফসফরাস সহসা অক্সিজেনের সহিত যৌগিক উৎপাদন করে। কাজেই মৌলিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফসফরাস প্রকৃতিতে থাকিতে পারে না। অক্সিজেন ও ক্যালসিয়াম এর সহিত যৌগিক হইয়া ক্যালসিয়াম ফসফেট রূপে ইহা প্রকৃতিতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম ফসফেট অনেক সাধারণ প্রস্তরের এবং আগ্নেয় গিরির প্রস্তরেও সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ইহার জন্যই জমীর মাটীতে ফসফরাস দেখিতে পাওয়া যায়।

গান প্রথমে লক্ষ্য করিলেন যে, জীব শরীরের একটা প্রধান উপাদান ফসফরাস। সেই হইতেই লোকে বেশ বুঝিতে পারিত যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ফসফরাস প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রথম লোকে ইহা প্রমাণ করিতে পারিতেন না। অবশেষে লোকে পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাইল যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ফসফরাস বিদ্যমান রহিয়াছে। সমুদ্রের জলে, নদীর জলে, ঝরণায়, উষ্ণ প্রসবণে সর্ব্বত্রই ফসফরাস রহিয়াছে। যে সমস্ত মৃত্তিকায় বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইতে পারে সেই সমস্ত জমীর উর্ব্বরত্বের প্রধান উপাদান ফস্‌ফরাস। কেননা যে ক্ষেত্রে ফসফরাস নাই সে ক্ষেত্রে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। বৃক্ষের দৈহিক গঠনে বিশেষতঃ ফল এবং বীজের গঠনে ফসফরাস প্রধান উপাদান। বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ ভোজ্য হইতে জীবশরীরে ফসফরাস প্রবেশ করে। এবং তন্তুর রসে বিদ্যমান থাকে। সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর অস্থিতে প্রচুর ফস্‌ফরাস থাকে। এই অস্থি ভস্মের প্রায় সমস্ত অংশই ক্যালসিয়াম ফসফেট। জীবের জীবনী-শক্তির প্রধান উপাদান ফস্‌ফরাস এবং মস্তিষ্কাদি উত্তমাঙ্গ ও পেশী সমূহ ফসফরাস দিয়া গঠিত। জীবের পেশী সমূহ বা অন্য প্রধান উপাদান ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ইহাই বুঝায় যে, তাহাদের ফসফরাস ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এবং এই ফসফরাস পুনর্ব্বার শরীরে প্রবিষ্ট না হইলে শরীর ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই ক্ষয়িত ফসফরাস মল মূত্রাদির দ্বারা বহির্গত হয়। এই বহির্গত ফসফরাসকেই ইংরাজিতে মাইক্রোকস্‌মিক লবণ বলে। উল্কা সমূহের মধ্যেও ফসফরাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ব্যোম প্রদেশেও প্রচুর ফসফরাস বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহামতি শীল ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কিরূপে অস্থি হইতে ফসফরাস নিস্কাশিত করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যন্ত্রাদি নির্ম্মান করেন। তিনি ক্ষীণ-শক্তি নাইট্রিক দ্রাবকে

অস্থিভস্ম অনেক দিন ধরিয়া ফুটাইয়া লইতেন। এই দ্রাবণে সালফিউরিক দ্রাবক ঢালিয়া দিলে চূণ অধঃস্থ হয়। অতঃপর অবশিষ্ট দ্রাবণকে উত্তপ্ত করিয়া বাষ্পীভূত করিয়া লইলেই জিপসাম ঘন সরবোতের ন্যায় অবশিষ্ট থাকে এবং কাঠ-কয়লা দিয়া অবশিষ্ট অংশকে উত্তপ্ত করিয়া চুয়াইয়া লইতে হয়। নিকোলাশ এবং পেলেটিয়ার একবারেই অস্থিভস্মে সালফিউরিক দ্রাবক প্রয়োগ করিলেন। এই সমস্ত উপায়ে ফস্‌ফরাস অতি অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হইত। অবশেষে ফোরক্রয় এবং ভকেলিন অস্থিভস্মে কতটুকু পরিমাণ সালফিউরিক দ্রাবক প্রয়োগ করিলে অস্থিভস্ম হইতে সম্পূর্ণ ফসফরাস যৌগিক বিগলিত হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারিত করিলেন। এই সময় হইতেই ফসফরাস ব্যবসা বাণিজ্যে বা লোক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল।

অস্থি হইতে ক্যালসিয়াম ফসফেট পাইবার জন্য অতীত কালে অস্থি সমূহকে চুল্লীতে দগ্ধ করা হইত, বর্ত্তমানে অস্থি মধ্যে যে সমস্ত জান্তব পদার্থ থাকে, তাহা-দিগকে নানারূপে বাহির করিয়া লইয়া অশেষবিধ কার্য্যে লাগান হয়। সেই জন্য আজকাল হয় অস্থিগুলিকে প্রথমে উত্তপ্ত জলে ফুটাইয়া অথবা অত্যন্ত উত্তপ্ত বাষ্প প্রয়োগ করিয়া অস্থি মধ্য হইতে জিলাটিন বাহির করিয়া লওয়া হয়। কিম্বা অস্থিগুলিকে লৌহ নির্ম্মিত রিটর্টে চুয়াইয়া লইয়া য়্যামোনিয়া ইত্যাদি উদ্বায়ী পদার্থকে পৃথক করিয়া ফেলা হয়। শেষ উপায়ে অর্থাৎ রিটর্টে অস্থি চুয়াইয়া লইলে ইহারা পুড়িয়া কয়লা হইয়া যায় এবং ইহাদিগকে অস্থিঅঙ্গার বলা হয়। এই অস্থি-অঙ্গার, অঙ্গার ও ক্যালসিয়াম ফসফেটের মিশ্রণ। আজকাল এই অস্থিঅঙ্গার, লবণ বিশেষতঃ চিনি পরিষ্কৃত ও শুভ্র করিবার জন্য ছাঁকনীস্বরূপ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপে ছাঁকনীর ন্যায় ব্যবহার করিতে করিতে যখন অস্থিভস্ম আর আদৌ ছাকনীর ন্যায় কার্য্য করিতে পারে না, তখন তাহাদিগকে খোলা চুল্লীতে একবারে দগ্ধ করা হয়। পুড়াইয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই অস্থিভস্ম। এই ভস্মে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষীণশক্তিবিশিষ্ট সালফিউরিক দ্রাবক ঢালিয়া দিলে জিপসাম্ অধঃস্থ হয়। এই জিপসামকে ছাঁকিয়া পৃথক করিয়া অবশিষ্ট দ্রাবণকে উত্তাপ প্রয়োগে বাষ্পীভূত করিলে যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ইংরাজীতে ক্যালসিয়াম মেটাফসফেট বলে। এই মেটাফসফেটকে কয়লার সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নি প্রয়োগে রক্তবর্ণ করিয়া তুলিলে মৌলিক ফসফরাস বাষ্পরূপে নিঃসৃত হইয়া আইসে ও শীতল হইয়া কঠিন হইয়া যায়।

মেটাফসফেটে যতটুকু পরিমাণ ফসফরাস থাকে তাহার $\frac{২}{৩}$ অংশ মাত্র বাহির হয়, অবশিষ্ট ট্রাই-ক্যালসিয়াম ফসফেটরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু মেটাফসফেট ও কয়লায় যদি উপযুক্ত পরিমাণ বালি মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত ফসফরাস নিঃসৃত হইয়া

আইসে। এইরূপ উপায়ে ফসফরাস নির্মুক্ত করিবার যন্ত্রপাতি আছে। ব্যবসার জন্য ফসফরাস প্রস্তুত করিতে হইলে উপরোক্ত নিয়মাবলীর দ্বারাই ফসফরাস উৎপাদন করিতে হয় সত্য কিন্তু নানারূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করিলে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস উৎপাদিত হইতে পারে না।

ইংলণ্ডে যে ফসফরাস্ প্রস্তুত হয়, তাহার অধিকাংশ সম্‌বারাইট নামক এক প্রকার মিশ্রিত ক্যালসিয়াম-ফসফেট হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই পদার্থ আমেরিকা দেশস্থ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া-দ্বীপ-পুঞ্জে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইংরাজগণ তথা হইতে স্বীয় দেশে ইহা আমদানি করিয়া ফসফরাস উৎপাদন করেন।

ফসফরাস প্রস্তুত করা কিছু বিপজ্জনক। কেনন্য ইহা সহসা প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিশ্রুত করিতে ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ ২ দিন ২ রাত্রি প্রয়োজন হয়, এবং এই সময়ের মধ্যে একবারও পরিশ্রুত করিবার স্থান পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। প্রথম যে ফসফরাস পরিশ্রুত হয়, তাহাতে অনেক অঙ্গার-চূর্ণ আসিয়া মিশ্রিত হইয়া থাকে। অঙ্গার-চূর্ণ অপসারিত করিবার জন্য উত্তপ্ত জলে ফসফরাস দ্রবীভূত করিয়া জলেই ইহাকে "শ্যাময়" চর্ম্ম দ্বারা ছাঁকিয়া ফেলা হয়। অথবা প্রতি ১০০ ভাগ ফসফরাসে ৩$\frac{১}{২}$ ভাগ পটাশ-বাইক্রমেট ও ৩$\frac{১}{২}$ ভাগ সালফিউরিক দ্রাবক মিশ্রিত করিয়া গলিত ফসফরাসে প্রয়োগ করিলে, অঙ্গার দগ্ধ হইয়া সরের ন্যায় ফসফরাসের উপরে ভাসিয়া উঠে এবং বিশুদ্ধ ফসফরাস নিম্নে পড়িয়া থাকে। শেষোক্ত উপায়েই ফসফরাস বিশোধন করা হইয়া থাকে। ফসফরাসকে গোল দণ্ডের ন্যায় করা হয়, এবং এইরূপ করিবার জন্য কারিকরগণ পূর্ব্বে কাঁচের নলে দ্রবীভূত ফসফরাসকে মুখ দ্বারা শোষণ করিয়া প্রায় মুখের নিকট পর্য্যন্ত টানিয়া তুলিত; ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রথা ছিল। পরে সিউবার্ট অন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করেন। এই উপায়ে একটি তাম্রপাত্রে জলের মধ্যে ফসফরাস দ্রবীভূত করা হয়, এই পাত্র হইতে গলিত ফসফরাসকে কাচ বা তাম্রের নলে পরিবাহিত করা হয়, এই নল অর্দ্ধেক শীতল জলে ও অর্দ্ধেক উত্তপ্ত জলে পরিবেষ্টিত থাকে। এখন এই উপায়ে অতি সহজে ফসফরাস দণ্ডের ন্যায় ঢালাই হয়। এই দণ্ড হইতে ফসফরাসকে অনায়াসে ইচ্ছানুরূপ দৈর্ঘ্যে জলের ভিতরেই কাটিয়া লওয়া হয়।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ৪০০ মণ ফসফরাস উৎপাদিত হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই দীপশলাকা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল। অতি অল্প অংশই কীটপতঙ্গ বা শস্যাদির ক্ষতি-কারক পক্ষী প্রভৃতির ধ্বংশের জন্য বিষরূপে ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হইয়াছিল (ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়

প্রাচীন সিংহলের লৌহ ও ইস্পাত।

জগতের পুরাবৃত্ত লিখিত হইবার বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সিংহলবাসিগণ লৌহের ব্যবহার ও বিগলিত লৌহে অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া যে পদার্থ উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যাহাকে আমরা বর্ত্তমানকালে ইস্পাত বলি তাহারও ব্যবহার অবগত ছিলেন। আমাদের প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাস আদিতে সিংহল লঙ্কা নামে অভিহিত হইয়াছে। লঙ্কা কিরূপে সিংহল হইল, তৎসম্বন্ধে ডাক্তার বারো তাহার "Buried Cities of Ceylon" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ৫৪৩ পূঃ খৃঃ অব্দে বিজয় নামক কোন রাজপুত্র এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ লঙ্কা দ্বীপে বর্ত্তমান পুত্তলমের নিকটে অবতরণ করেন। তিনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী কোন নৃপতির নির্ব্বাসিত পুত্র। ইনি লঙ্কায় রাজ্য স্থাপন করেন। লঙ্কার ইতিহাস সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে বিজয় কোন এক সিংহ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই জন্য এই দ্বীপের সিংহল এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত অতি সহজে বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত যৌগিক উৎপাদন করিয়া নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ মরিচা পড়িয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া কোনরূপ প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদির অস্তিত্ব আবিষ্কার করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কাজেই প্রাচীন কালে কিরূপে ইস্পাত বা লৌহ প্রস্তুত হইত তাহার কোনরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে সিংহলের যাদুঘরে যে সমস্ত প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা হইতে আমরা অতীত যুগে লৌহ সম্বন্ধে ভারতীয় কর্ম্মকারগণের অভিজ্ঞতার অনেক আভাস পাইয়া থাকি।

ইউরোপীয়গণ স্বতঃই মনে করেন যে খনিজ মিশ্রিত পদার্থ হইতে মৌলিক ধাতু নিষ্কাশিত করিবার যাবতীয় প্রণালীর উদ্ভাবন তাঁহারাই করিয়াছেন। আমরাও অনেকটা তাহাই মনে করিয়া থাকি কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিলে আমাদের ও ইউরোপীয়গণের সে ভ্রম প্রমাদ অবশ্যই বিদূরিত হইতে পারে আমাদের এই প্রাচ্য-ভূখণ্ডে লৌহ নির্ম্মিত যাবতীয় যন্ত্রাদির অস্তিত্বের আবিষ্কার বা প্রাচীন কালে ব্যবহৃত লৌহ যন্ত্রাদির চিহ্নসমূহ অতি যৎসামান্য হইলেও যাহা অল্প এখনও পাওয়া যায় তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কেবল কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে নহে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য জগতে অনেক উন্নত প্রণালীর ধাতব যন্ত্রাদির উৎপাদন বা খনিজ পদার্থ হইতে মৌলিক ধাতুর নিষ্কাশন সম্বন্ধে লোকের প্রভূত জ্ঞান ও কর্ম্মদক্ষতা ছিল।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখে ডাক্তার জর্জ্জ পিয়ার্সন, বিখ্যাত Royal Societyর জনৈক সভ্য, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ঃ—

"Experiments and Observations to Investigate the Nature of a kind

of Steel manufactured at Bombay, and there called "Wootz" with Remarks on the Properties and Composition of the different States of Iron"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে বম্বে প্রদেশে উৎপাদিত "উজ" নামক ইস্পাতের গঠন, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণা ও পরীক্ষা।

সিংহলে যে সমস্ত প্রাচীন নগরাবলী বর্ত্তমান কালে কালবশে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত স্থান হইতে এই লৌহযন্ত্র সমূহ উত্তোলন করিয়া কলম্বো যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিলুপ্ত নগর অন্ততঃ ৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিল। অতএব এই সময় হইতে যে সিংহলে সুসভ্য মানব জাতি বসবাস করিয়া আসিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কোন কোন নগরের ইতিহাস পাওয়া যায়।

কলম্বো যাদুঘরে কেবল অতি প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদিই রক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদের সহিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক যন্ত্রাদিও রক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রাদি সম্ভবতঃ ১৩৭৪ হইতে ১৪১৬ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে সিংহলের পৌরাণিক উপাখ্যান সমূহ খোদিত রহিয়াছে। যাঁহারা খনিজ মিশ্রিত-লৌহ হইতে বিশুদ্ধ লৌহ নির্ম্মুক্ত করিবার ও এই লৌহ হইতে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট এই সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের যন্ত্রপাতির বিবরণ যে বিশেষ আদরণীয় হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কেননা এই সমস্ত প্রাচীন যন্ত্রপাতি জগতের মধ্যে অসাধারণ ও ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্পূর্ণ দোষ শূন্য। নিম্নে কয়েকটি দ্রব্য সম্বন্ধে ডাক্তার উইলির অভিমত উল্লিখিত হইল :—

(১) একটি ইস্পাতের বাটালী খুব সম্ভবতঃ ৫ম খৃঃ শতাব্দীতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চ।

(২) একটী প্রাচীন পেরেক। ইহার সূচ্যগ্র প্রান্ত ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। দৈর্ঘ্য ১৩$\frac{1}{2}$ ইঞ্চ। ইহারও উৎপাদন কাল ৫ম খৃঃ শতাব্দী। খুব সম্ভবতঃ ইহা সাইগিরিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার কোন বিবরণী লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ইহা সিংহলের ধ্বংশীভূত নগরী সমূহের যে একটা প্রধান শিল্পদ্রব্য ছিল, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

(৩). একটি দেশজ দা বা "কেট্টা"। ইহা কতকটা আধুনিক।

এই প্রবন্ধে অতি প্রাচীন কালের লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। কেননা বর্ত্তমানকালে যে সমস্ত লৌহদ্রব্য বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহাদের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। লৌহ দ্রব্যাদি অধিককাল রক্ষিত হওয়া কিরূপ অসম্ভব তাহা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, কাজেই বর্ত্তমানকালে ইহাদের অস্তিত্বই আশ্চর্য্যজনক; এতদ্ব্যতীত প্রাচীন জগৎ যে ইস্পাতের অর্থাৎ লৌহ ও অঙ্গারের মিশ্রণজাত পদার্থের ব্যবহার জানিত না লোকের যে এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা এই সমস্ত লৌহজাত পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সংশোধিত

হইতে পারে বলিয়া প্রাচীন-তথ্য-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের—এমন কি জন সাধারণের—নিকটও এই সিংহলীয় লৌহময় পদার্থগুলি অত্যন্ত আদরণীয়।

ইজিপ্টের নাম প্রায় সকল শিক্ষিত লোকেই অবগত আছেন। প্রাচীন প্রস্তর-কীর্ত্তিতে ইজিপ্ট অতুলনীয়। কিরূপ যন্ত্রাদি-সাহায্যে মূর্ত্তিমতী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ বা প্রস্তরগৃহ গঠিত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণের বিশেষ গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ইজিপসীয়গণ তাম্রের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এমন কি তাম্রকে কিরূপে লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও কঠিন করিতে হয় তাহাও তাঁহারা জানিতেন। এই সমস্ত যন্ত্রাদিতে ক্ষুরধারও উৎপাদন করা যাইতে পারিত। কিন্তু কাইরো নগর হইতে খার্টুম নগর বা আরও অনেক দূরবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তরগৃহ বা প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে ও তাঁহাদের নির্ম্মাণ কৌশল অদ্যাপি যেরূপ অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে তাম্র-যন্ত্রপাতিকে যতই দৃঢ় করা হউক না কেন কিছুতেই প্রস্তর-কাঠিন্যের তুল্য অর্থাৎ সেই সমস্ত যন্ত্রদ্বারা প্রস্তরকে কাটিয়া অলঙ্কৃত করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই সমস্ত প্রস্তর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য অসংখ্য প্রস্তর-রাজ-মজুরের অবশ্যই আবশ্যক হইয়াছিল। আর এই সমস্ত রাজ-মজুর বিনা যন্ত্রপাতিতে বা বিনা অস্ত্রে কিছুতেই প্রস্তর গঠন করিতে সক্ষম হন নাই ইহাও নিশ্চয়। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে লৌহ অনায়াসে কর্ত্তন করিতে পারে তাম্রকে এরূপ ভাবে দৃঢ় করিবার প্রণালী তৎকালে ইজিপসীয়গণ আদৌ জানিতেন না। সম্প্রতি Institution of Mechanical Engineers নামক বৈজ্ঞানিক আগারে ডাক্তার রসেন্‌হেইন্ ও মিষ্টার ল্যাণ্ট্‌স্‌বেরি একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাম্র অন্যান্য ধাতবপদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া এরূপ কঠিন করা যাইতে পারে যে, তদ্দ্বারা লৌহ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইজিপ্ট নগরের প্রাচীন প্রস্তরগৃহে যে সমস্ত প্রকাণ্ডকায় কঠিন প্রস্তর রহিয়াছে, এই সুদৃঢ় তাম্র তাহাদিগকে কিছুতেই কর্ত্তন করিতে সক্ষম নহে।

এই সমস্ত দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, হয় ইজিপসীয়গণ লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ ছিলেন, অথবা লৌহ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ অন্য কোন জাতীর সহায়তায় লৌহ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়া আনিয়া তৎসাহায্যে এইরূপ প্রকাণ্ডকায় প্রস্তরস্তম্ভ গঠন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এরূপ বহু প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে যদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইজিপসীয়গণ বাস্তবিক লৌহের ব্যবহার জানিতেন না। লৌহযন্ত্রাদির জন্য তাঁহাদিগকে হয় ভারতীয় বা চীন দেশীয় কর্ম্মকার গণের মুখাপেক্ষী হইতে হইত। ইজিপ্টে কোনরূপ লৌহযন্ত্রাদির চিহ্ন দেখিতে

পাওয়া যায় না, বা এরূপ কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই যদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ইজিপসীয় লৌহযন্ত্রাদি ইজিপ্ট হইতে অন্য দেশে রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের যাদুঘরে একটি কাস্তে রক্ষিত হইয়াছে। সেটিতে এরূপ মড়িচা পড়িয়াছে যে তাহা লইয়া কোনরূপ পরীক্ষা করা অসম্ভব। তবে যে ইহা লৌহ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ইহা এত ভঙ্গুর ও পাতলা হইয়াছে ও ইহাতে এত মড়িচা ধরিয়াছে যে, হাতে করিতেও ভয় হয়। মনে হয় যেন এখনই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রকাণ্ড পিরামিড হইতে আর এক খণ্ড লৌহ পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ দুই একটী অতি নগণ্য লৌহযন্ত্রাদি ইজিপ্টে আবিষ্কার হইয়াছে। ইজিপসীয়গণের ইস্পাতের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে প্রথমে জানিয়া রাখা উচিত যে, নানা উপায়ে লৌহকে দৃঢ় করা যাইতে পারে—প্রথমতঃ ইহাকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া জলে বা শীতল করিবার অন্য কোনরূপ পদার্থে শীতল করিয়া লইলে লৌহ বেশ দৃঢ় হয়। আমরা যে লৌহকে রট আইরণ (wrought iron) বলিয়া থাকে তাহা সিমেণ্টেশন (Cementation process) প্রণালী দ্বারা অঙ্গার গ্রহণ করিয়া থাকে। এই প্রণালী শেফিল্ডে এখনও বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ এইরূপে লৌহদণ্ডসমূহ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এই সমস্ত বারলৌহে বিভিন্ন পরিমাণ কারবন্ বা অঙ্গার মিশ্রিত থাকে। এই সমস্ত বারলৌহকেই অবশেষে মুচিতে গলাইয়া অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। এই সিমেণ্টেড্ ইস্পাতসমূহই কর্ত্তন করিবার যন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ইহাকে বারষ্টীল বলে। এই সমস্ত কথা উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে যদিও প্রাচীন লৌহ যন্ত্রাদিতে প্রচুর শক্তিবিশিষ্ট অঙ্গারমিশ্রিত দৃঢ় ইস্পাত নাও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে ঢালা বা পেটাই লৌহকে সিমেণ্ট করিবার প্রণালী প্রাচীনগণ জানিতেন অন্ততঃ লৌহ যন্ত্রের ধারগুলিকে এরূপ করিয়া লইতে পারিতেন।

প্রাচীনগণ যে এইরূপে লৌহ দৃঢ় করিতে অর্থাৎ লৌহকে ইস্পাত করিতে জানিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট ন্যায় সঙ্গত কারণও রহিয়াছে। তবে ইহা নিশ্চয় যে তাঁহাদের জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমানে যাহাকে "কেস হার্ডনিং" (case hardening) বলে, প্রাচীনগণের প্রবর্ত্তিত প্রণালী খুব সম্ভবতঃ তাহারই অনুরূপ ছিল। এই প্রণালীতে যে লৌহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকে হয় বায়বীয় পদার্থে অথবা কয়লা বা অন্য কোন বিশুদ্ধ অঙ্গারে আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। এরূপ করিলে লৌহের অভ্যন্তর ভাগের কতকদূর পর্য্যন্ত অঙ্গার মিশ্রিত হইয়া যায়। এই অঙ্গার মিশ্রিত লৌহকে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া শীতল করিলে, ইহাতে কর্ত্তন করিবার উপযুক্ত ধার হইতে পারে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সিংহলে যে সমস্ত লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রাদি পাওয়া যায়

তাহার অধিকাংশই, বিশেষতঃ উপরোক্ত বাটালী, এইরূপে অঙ্গারময় করা রহিয়াছে। পরে ইহার গঠন উপাদান সবিশেষ বিস্তারিত করিয়া বর্ণিত হইবে।

কাষ্ঠ-ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রধান প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। এই ইস্পাতে শতকরা ০.৫০ হইতে ১.৮০ ভাগ অঙ্গার থাকে। দ্রবীভূত বার-লৌহে এই অঙ্গার একবারে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় অথবা প্রথমোক্ত উপায়ে ইস্পাত করা থাকিলে, সেই ইস্পাত বদ্ধ-মুখ মুচিতে দ্রবীভূত করিয়া তাহাতে অঙ্গার ঢালিয়া দেওয়া হয়। বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলে কিছুতেই এইরূপে ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। এতদ্ব্যতীত লৌহ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে কিরূপ ধর্ম্ম বিশিষ্ট লৌহের প্রয়োজন তাহা বুঝিতে না পারিলে কোন কাজই হয় না। লৌহে প্রায় গন্ধক ও ফসফরাস মিশ্রিত থাকে। এই বার-লৌহ অর্থাৎ যাহা বিগলিত করিয়া ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে আদৌ গন্ধক বা ফসফরাস থাকিবে না, অথবা অত্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত মুচি প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কেননা মুচির উপাদান এরূপ হইবে যে ইহা লৌহ গলিবার ভয়ানক উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে অথচ ফাটিয়া বা দ্রবীভূত হইয়া যাইবে না। অতএব রসায়নশাস্ত্রে ও পদার্থতত্ত্বশাস্ত্রে কিরূপ জ্ঞান থাকিলে এরূপ করা সম্ভব, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। সিংহলে যে মুচি পাওয়া গিয়াছে সেই মুচিগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচ্যদেশের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের লোকের প্রকৃতি এত রক্ষণশীল যে অতি প্রাচীনকালে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে প্রথা একবার অবলম্বিত হইয়াছে এখনও লোকে সেই প্রথা অনুসারেই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। কাজেই এই সমস্ত মুচি অতি প্রাচীনকালের প্রণালী অনুসারেই উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা মনে করা নিতান্ত অন্যায় নহে। যদি কোন কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কাজেই লৌহকে ইস্পাত করিবার প্রথা ইউরোপ আবিষ্কার করিয়া জন-সমাজকে শিক্ষা দিয়াছে, এরূপ অভিমত আদৌ সত্য নহে।

কলম্বো-যাদুঘরে যে সমস্ত লৌহময় পদার্থ বা যন্ত্রাদি সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ধ্বংশীভূত ও ভূগর্ভে প্রোথিত নগর হইতেই উত্তোলিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রোথিত নগরের মধ্যে অনুরাধাপুর (৪৩৭ পূঃ খৃঃ হইতে ৭৬৯ খৃঃ অঃ), পলন্নারুব (৭৬৯ খৃঃ অঃ হইতে ১৩১৯ খৃঃ অঃ) এবং সাইগিরিয়া (৪৭৯ পূঃ খৃঃ অঃ) —এই কয়টিই প্রধান। সাইগিরিয়ার ধ্বংশবিবরণী রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য বিবরণীতে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল—(Royal Asiatic Society's Proceedings Vol. 8, 1876).

সিংহল দেশীয় মন্দির এবং কার্ত্তিস্তম্ভসমূহ ইজিপ্ট দেশের ঐ জাতীয় মন্দির সমূহ

অপেক্ষা অনেক পরবর্ত্তিকালের বটে কিন্তু লৌহ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার হিসাব ধরিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, যে সময়ে এই সমস্ত সিংহলীয় মন্দির বা স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে সেই সময়ে ভারতীয় কর্ম্মকারগণ লৌহ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল. সে অভিজ্ঞতা অল্প সময়ে লব্ধ হয় নাই, বহু শতাব্দীর নানা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারাই এইরূপ হওয়া সম্ভব। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনগণের রক্ষণশীল প্রকৃতি হইতেও জানা যায় যে, যে প্রথা অবলম্বনে প্রাচীন সিংহলীয় স্তম্ভ সমূহ গঠিত হইয়াছিল সেই প্রথা অনেক পূর্ব্বে ভারতীয়গণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত এমন কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই যে তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে ইজিপ্টের কর্ম্মকারগণ লৌহ সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন আর এরূপ অনুমান অভ্রান্ত বলিয়াও বুঝিতে পারা যায় যে ইজিপ্সীয়গণ তাহাদের প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভগৃহ বা পীরামীড ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য হয় ভারতবর্ষের অথবা চীনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। অতীতকালে ভারত, চীন, ইজিপ্ট বা তৎকালিক সভ্য দেশ সমূহে রীতিমত ব্যবসা বাণিজ্য ও নানাবিধ পদার্থের আদান প্রদান চলিত এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই ইজিপ্টের যে প্রস্তরমন্দির, পীরামীড ইত্যাদি জগতে প্রাচীন সভ্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিলাসিতা. সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ইত্যাদির অমর কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, শত সহস্র বর্ষেও যাহা বিধ্বংশ হয় নাই তাহা নির্ম্মাণ কৌশলে প্রাচ্য বা ভারতীয় কর্ম্মকারের কৃতিত্ব, কলানিপুনতা লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া ও কালের সর্ব্বসংহারক আবরণে আবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ দৈবাৎ সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধচিত্ত হইয়া থাকেন ও প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণের জ্ঞানমহিমায় নির্ব্বাক হইয়া পড়েন। যদি ভারতবর্ষের এইরূপ সাহায্য না পাইতেন তাহা হইলে ইজিপ্সীয়গণ কখনই অতি দৃঢ় ও নিরতিশয় কঠিন প্রস্তরের এরূপ মন্দির সমূহ কখনই নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না। কতকগুলি হাইরোগ্লিফিক* দুই ইঞ্চ করিয়া খোদিত রহিয়াছে। এরূপভাবে খোদিত করা সুদৃঢ় ইস্পাতের যন্ত্র না হইলে অন্য কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

কলম্বো যাদুঘরে শত শত লৌহ যন্ত্রাদি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে সাধারণ বাটালী, প্রস্তর কাটিবার বাটালী (২½ ইঃ লম্বা ½ ইঃ ব্যাস), কুঠার. কাঁচি, তালা ও চাবি ইত্যাদি প্রধান। এই সমস্ত পদার্থের বয়ঃক্রম কত তাহা মীমাংসা করা বড়ই কষ্ট

* হাইরোগ্লিফিক—Hyroglyphic—বা চিত্র বাক্যমালা। ইজিপ্ট দেশে যে সমস্ত প্রস্তর মন্দির, পিরামীড ইত্যাদি বিদ্যমান আছে, তাহাদের গাত্রে নানাবিধ পশুপক্ষী জীবজন্তুর চিত্র খোদিত আছে। পণ্ডিতগণ বলেন যে এইরূপ চিত্র সমষ্টি হইতে বাক্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। এইরূপে অনেক বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে।

প্রাচীন সিংহলের লৌহ ও ইস্পাত।

করে। কেননা যাঁহারা এই সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ও এ সম্বন্ধে অ
করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব। যখন এই সমস্ত যন্ত্রপাতি
তৎকালিক যাদুঘরের অধ্যক্ষ ডাক্তার উইলি, এফ. আর. এস অ
এই সমস্ত লৌহময় পদার্থের বয়ঃক্রম অত্যন্ত অল্প বলিয়া ধরিলে
বৎসরের অপেক্ষা কিছুতেই অল্পতর হইতে পারে না।
অতিশয় স্থূলকায় এবং ভার-বিশিষ্ট, তাহাদিগকে লইয়া
পারে ; কাজেই এই সমস্ত পদার্থের গঠন কিরূপ ও
তাহাও অনায়াসে জানা যাইতে পারে। এই সমস্ত
অবস্থায় সংরক্ষিত হইয়াছে। অত্যন্ত প্রাচীন
কোনরূপে একবারে ধ্বংশ হইয়া যায় নাই।

সিংহলের আদিম অধিবাসিগণ, ...
তাহারা সাধারণতঃ পাহাড়ে, অরণ্যে ও জঙ্গলে,
করিয়া খাইয়া থাকে। তাহাদের আচার ব্যবহা
তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি নিকৃষ্ট. কাজেই এরূপ কখ
পুরুষের কেহ কখনও এই সমস্ত লৌহময় পদার্থ উৎপাদন
দ্রুত করা. অঙ্গার মিশ্রিত করা ইত্যাদি কার্য্যে অদ্ভুত গবেষণা, ধীশক্তি
প্রয়োজনীয়।

মানব জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এবং পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠেও বুঝিতে পারা যায় যে সিংহল ভারতের একটা অংশ স্বরূপ। এই দুই দেশের দূরতা এত অল্প যে আজ কাল রেলওয়ে কোম্পানীগণ দুই দেশ রেললাইন দ্বারা শীঘ্রই সংযুক্ত করিয়া দিবেন। ভারতের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম্ম-শক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি অসীম ছিল বলিয়াই মনে হয়। সিংহলের আধুনিক সভ্যগণের অধিকাংশই ভারতীয় আর্য্যবংশসম্ভূত। এইরূপ নানা কারণে এরূপ সিদ্ধান্ত করা আদৌ ভ্রমাত্মক নহে যে, প্রাচীন ভারতের লোক সিংহলে গমন করিয়া এই সমস্ত যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহারই চিহ্ন অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরৎ চন্দ্র রায়।

আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ জগৎ

সহিত প্রাণহীন ও প্রাণবিশিষ্ট পদার্থের সম্পর্ক।*

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ব্যাক্টিরিয়ার শরীরপোষণ-প্রণালী।

তুলনায় উদ্ভিদসমূহ সরলতর যৌগিক পদার্থ গ্রহণ
জন্য বিশেষ জটীল অঙ্গারমূলক পদার্থ গ্রহণ করে।
মধ্যে পরস্পরের কার্য্যের প্রতিনিয়ত আদান
অ্যামোনিয়া, কারবন্ ডাই-অক্সাইড্ ইত্যাদি
অপেক্ষাকৃত জটিলতর যৌগিক যথা, শ্বেতসার,
জীবসমূহ এই সকল জটিলতর পদার্থ গ্রহণ করিয়া
আরও অধিকতর জটিল অঙ্গারমূলক পদার্থ উৎপাদন
মূত্র, নিশ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি উদ্ভিদসমূহ গ্রহণ করিয়া
ন পদার্থ উৎপাদন করে। এই মলমূত্রাদি পদার্থ, কারবন্ ডাই-অক্সাইড,
নিয় ইত্যাদির ন্যায় অনেকটা সরল যৌগিক পদার্থ দ্বারা গঠিত কিন্তু ইহারা অতি জটীল অঙ্গারমূলক পদার্থ। এই সমস্ত পদার্থ অথবা জীব গতায়ুঃ হইলে উদ্ভিদরাজ্য তাহাদিগের জটীল শারীরিক উপাদান সমূহ স্বতঃই গ্রহণ করিয়া নিজশরীর পোষণ করিতে পারে না। এইরূপ স্থলেই ব্যাক্‌টিরিয়ার কার্য্যশীলতা প্রকাশ পায়। ইহারা এই সমস্ত জটীল পদার্থকে পচাইয়া ফেলে, এবং জল, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, কারবন ডাই-অক্‌সাইড, সালফার ডাই-অক্‌সাইড ইত্যাদি সরলতর যৌগিক পদার্থে বিশ্লিষ্ট করে। এই বিশ্লিষ্ট সরলতর যৌগিক পদার্থ বৃক্ষাদি গ্রহণ করে এবং ইহা হইতে পুনরায় জটীলতর পদার্থসমূহ উৎপাদিত হয়। প্রতিদিন ব্যাক্‌টিরিয়া, জীব ও উদ্ভিদ রাজ্যে এই মিতব্যয়িতামূলক সম্পর্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ব্যাক্‌টিরিয়ার অস্তিত্ব না থাকিলে এই জগতে প্রাণধারণ শুধু বিড়ম্বনাজনক হইত তাহা নহে, জীবনধারণ স্বভাবতঃ অসম্ভব হইত। সাইবিরিয়া দেশের কোন কোন অংশে এখনও তুষারাবৃত হস্তীসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবজাতির পুরাবৃত্ত প্রারম্ভের বহু পূর্ব্বে এই সমস্ত জীব গতায়ুঃ হইলেও তাহাদের শরীর এখনও সদ্যঃ মৃতের ন্যায় রহিয়াছে। যদি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এইরূপ ঘটিত—যদি ব্যাক্‌টিরিয়াসমূহ ধ্বংশীভূত হইত

---

* Translated by Sarat Chandra Roy from the Inaugural address delivered by Dr. Gopal Chandra Chatterjee, M.B., in the Hall of the Indian Association for the Cultivation of Science at the Opening day of its Session, 1912-13.

কিছু জানা গিয়াছে। ইহার কক্ষ সূর্য্যের এত নিকটবর্ত্তী যে ইহার ভাগ পরীক্ষা করা বড়ই কষ্টকর এবং নিতান্ত অসুবিধাজনক। যাহা হউক ৮১-৮২ খৃঃ অঃ সিয়াপ্যারেলি (Schiaparelli) ইটালীর দ্বিপ্রহরের স্বচ্ছ আকাশের মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া ইহার উপরিভাগে কয়েকটি চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে বুধ গ্রহ সূর্য্যকে যে সময়ে একবার প্রদক্ষিণ করে সেই সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার মাত্র আবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর ৩৬৫ বার আবর্ত্তন করে কিন্তু বুধ সূর্য্যকে একবার মাত্র আবর্ত্তন করে। এবং বুধের এক দিকই ক্রমাগত সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে লাওয়েল, আরিজোনা প্রদেশের অন্তর্গত ফ্ল্যাগষ্টাফের মানমন্দিরে উক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপরোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। খুব সম্ভবতঃ উক্ত সিদ্ধান্তই সত্য। কিন্তু সমস্ত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ এখনও ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না। যদি উক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হয় তাহা হইলে এই প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়ের সহিত উহার যথেষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। যদি বুধের একার্দ্ধই কেবল সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই দিকেই চিরকাল আলোক বা দিন এবং অন্য দিক অন্ধকার বা রাত্রি। এক্ষণে যদি এরূপ কল্পনা করা যায় যে সূর্য্য এক দিন দ্বিপ্রহরের সময় মধ্য গগনে স্থির নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল, আর দিবার অবসান হইল না, মধ্যাহ্ন গগন হইতে সূর্য্য যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রচণ্ড অনল বর্ষণ করিতে লাগিল তখন আমাদের অবস্থা কি হইতে পারে?—তাহার উপর আমাদের বিষুবরেখাস্থিত প্রদেশসমূহে যে উত্তাপ বর্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা ৯ গুণ অধিকতর উত্তাপ বুধে পতিত হয়। তাহা হইলে যদি আমরা বুধের সূর্য্যমুখীদিকে অবস্থান করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনের আশা কোথায়? অনন্ত প্রদেশ কিরূপ শীতল তাহা সহজেই অনুমেয়। বুধের সূর্য্যবিপরীতমুখপ্রদেশ অনন্তের ন্যায় তুষারশীতল। কাজেই বুধের এদিকের অবস্থা অন্য দিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। সূর্য্যমুখগোলার্দ্ধ সূর্য্যের অনল সংস্পর্শে দগ্ধ, বিপরীত দিক অনন্তের শীতল সংস্পর্শে মৃত। কাজেই বুধে আমাদের ন্যায় জীব থাকিতে পারে না। এই দুই গোলার্দ্ধের সম্মিলন প্রান্তে, ৪৭ ডিগ্রি পরিমিত প্রশস্ত প্রদেশে, গ্রহের সূর্য্য প্রদক্ষিণ কালে আমাদের পৃথিবীর ৮৮ দিন আলোক ও অন্ধকার এইরূপ হইয়া থাকে। কেন না সূর্য্য একই স্থানে একবারে বদ্ধমূল হইয়া দণ্ডায়মান নাই, অন্যান্য গ্রহগণের গতির নানাবিধ বিভিন্নতার জন্য বৃত্তাভাস কক্ষে কখনও সম্মুখের দিকে কখনও পশ্চাতের দিকে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে ৪৭ ডিগ্রি পরিমিত পরিধি অংশে সামান্য ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে এই স্থানটিতে মানব বা আমাদের পৃথিবীর জীব

বসবাস করিতে পারে। কেননা ইহার শীতলতা বা উষ্ণতা পৃথিবীর সমান। কিন্তু বুধেও চন্দ্রের ন্যায় বাতাস বা জল নাই। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যে পরিমাণ, বুধের মাধ্যাকর্ষণ তাহার $\frac{1}{21}$ ভাগ মাত্র। কাজেই সেরূপ আকর্ষণে জল বা বাতাস আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। লাওয়েলও লক্ষ্য করেন যে, যে সমস্ত চিহ্ন দ্বারা বুধের বার্ষিক গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেগুলি লক্ষ্য করিবার সময় তাহারা আদৌ অস্পষ্ট হয় নাই, কেন না মেঘমণ্ডল বর্ত্তমান নাই। কাজেই বুধ যে আমাদের বাসের উপযুক্ত নহে তাহা একরূপ মীমাংসা করিয়া লইতে পারি

তাহার পরবর্ত্তী গ্রহ শুক্র (Venus)। আয়তনে এবং ঘনত্বে ইহা পৃথিবীর সমান। কাজেই অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহ অপেক্ষা শুক্রগ্রহেই আমাদের ন্যায় জীবের অস্তিত্ব থাকিবার সম্ভাবনা অধিকতর। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে ইহার আহ্নিক গতি ও পৃথিবীর অনুরূপ। কাজেই পৃথিবীর ন্যায় শুক্রেও দিন রাত্রি আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যে সমস্ত চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তাহারা অস্পষ্ট অন্ধকারাবৃত দেখায় কাজেই প্রথমে ইহাতে মেঘ ও বায়ু আছে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে সিয়াপারেলি স্থির করিলেন যে, বুধের ন্যায় ইহারও মাত্র এক পৃষ্ঠ সূর্য্য অভিমুখে অবস্থিত। লাওয়েল পরবর্ত্তী কালে লক্ষ্য করিয়া উক্ত অভিমত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। ফ্ল্যাগষ্টাফে যে স্পেক্‌টোগ্রাম্ গৃহিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহার গতি অতিশয় মৃদু। কিন্তু স্পেক্‌টোগ্রামের প্রমাণ তত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। স্পেক্‌টোগ্রাম দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহীত হয়। কাজেই আমাদের বায়ুমণ্ডল হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যালোক বিশ্লিষ্ট হইয়া শুক্রের বিশ্লিষ্ট আলোকের উপরে পতিত হয় এবং শুক্রের গতির দ্বারা উৎপাদিত বিশ্লিষ্ট আলোকরেখার যে অবনতি আনয়ন করে তাহা উক্ত বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোক দ্বারা আবৃত হইয়া যাইতে পারে। শুক্রের কক্ষ প্রায় গোলাকার। কাজেই সূর্য্যমুখী ও সূর্য্যবিপরীত-মুখী গোলার্দ্ধদ্বয়ের মিলন-প্রান্তের পরিসর অর্থাৎ বুধের যে স্থানে দিন রাত্রি হইয়া থাকে শুক্রের সেই স্থানের পরিসর নিতান্ত অল্প বা একেবারেই নাই। এবং দুই গোলার্দ্ধের অবস্থা বুধের অবস্থা অপেক্ষা আরও অপরিবর্ত্তনীয় এবং আরও কষ্টদায়ক। লাওয়েল মীমাংসা করিয়াছেন যে ইহার বায়ুমণ্ডলের গতি প্রায়ই একমুখী। নিম্নের বায়ুর গতি সূর্য্যের নিম্নবিন্দু হইতে ক্রমাগত বিপরীত অভিমুখে পরিচালিত। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে সূর্য্যমুখী গোলার্দ্ধ হইতে জলীয়বাষ্প, জল ইত্যাদি বায়ুর সাহায্যে বিপরীত গোলার্দ্ধে নীত হয় এবং এই অন্ধকারময় প্রদেশে জমিয়া তুষার ও বরফ হইতে থাকে। এই তুষার-

প্রদেশের শীতলতা এত অধিক যে জলীয় বাষ্প তথায় যাইয়া বরফ হইয়া যায় এবং তাহার অতি অল্পপরিমাণমাত্র প্রত্যাবর্তন করে বা আদৌ করে না। এইরূপ যদি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে শুক্রের এক দিক চির তুষারাবৃত হইয়া উঠিবে অন্যদিক সম্পূর্ণরূপে জলশূন্য হইয়া পড়িবে। যদি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সত্য হয় তাহা হইলে বুধ অপেক্ষা শুক্রের বাসোপযোগীতা আরও নিকৃষ্টতর।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবী ব্যতীত অন্য দুই গ্রহে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল না একণে মঙ্গলের (Mars) অবস্থা কিরূপ দেখা যাউক। এখানে পৃথিবীর অনুরূপ সকল অবস্থাই পাওয়া যায়। শুক্র বা পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের ঘনতা অল্পতর এবং অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা ইহার উপরিভাগে চিরস্থায়ী তথ্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে নীলাভ হরিৎ প্রদেশসমূহ বর্তমান আছে, প্রথমে সেই গুলিকে সমুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। একণে পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে সেই সমস্ত প্রদেশ বৃক্ষলতায় পূর্ণ। অন্য একটা প্রকাণ্ড প্রদেশ রহিয়াছে, ইহা প্রায় মঙ্গলের প্রায় অর্দ্ধ আয়তন এবং ইহা লোহিতাভ হরিদ্রাবর্ণ। এই প্রদেশকে মরুভূমি বলা হয়। মেরুপ্রদেশসমূহ শ্বেতবর্ণ। শ্বেতবর্ণের ব্যাপকতা মঙ্গলের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অল্লাধিক হইয়া থাকে। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশের তুলনায় আমরা স্বভাবতঃই স্থির করিয়া লই যে উক্ত প্রদেশদ্বয় তুষারাচ্ছাদিত। মঙ্গলের দিবসসমূহ আমাদের দিবস অপেক্ষা ৪০ মিনিট অধিকতর দীর্ঘ। আমাদের দিনের ৬৮৭ দিনে অথবা মঙ্গলের ৬৬৯ দিনে মঙ্গলের এক বৎসর হয়। মঙ্গলের মেরুদণ্ড কক্ষতলের লম্বরেখা হইতে ২৩ ডিগ্রি ৫৬ মিনিট বক্র হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবী অপেক্ষা মাত্র অর্দ্ধ ডিগ্রি অধিক, কাজেই মঙ্গলের শীত, গ্রীষ্মাদি ঋতুসমূহ ঠিক আমাদেরই অনুরূপ, কেবল তাহাদের কালপরিমাণ আমাদের ঋতুর কালপরিমাণের দ্বিগুণ।

এত সমতা সত্ত্বেও যে মঙ্গলে আমাদের ন্যায় জীব আছে একথা একবারে স্থিরসিদ্ধান্ত না করিবার তিনটি কারণ আছে। ১ম—সূর্য্যোত্তাপের অভাব; ২য়—বায়ুমণ্ডলের অভাব; ৩য়—প্রকাণ্ড জলাশয়ের অভাব। সূর্য্য হইতে পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল ১৪ গুণ অধিক দূরে অবস্থিত। অতএব পৃথিবী যতটুকু সূর্য্যোত্তাপ প্রাপ্ত হয়, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র মঙ্গল পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বায়ুমণ্ডলের আবরণ না থাকায় ইহার তাপমাত্রা অতিশয় নিম্ন এত নিম্ন যে এই তাপমাত্রায় বরফ বিগলিত হইতে পারে না। কিন্তু মেরু-প্রদেশের তুষারক্ষেত্রের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি এরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিকূল। কাজেই যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে মঙ্গলের তাপমাত্রা অতিশয় নিম্ন তাঁহারা এই শুভ্র ক্ষেত্রের পরিবর্তনের অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে কারবণ-ডাই-অক্সাইড জমিয়া ঐরূপ শুভ্র দেখায়। কিন্তু লাওয়েল বলেন যে আমাদের পৃথিবীর উপরে

বায়ুমণ্ডলের যে চাপ সেইরূপ চাপে কারবন্-ডাই-অক্সাইড্ কিছুতেই জমাট বাঁধিয়া থাকিতে পারে না, বাষ্পে পরিণত হয়। নিশ্চয়ই জল তরল বা এইরূপ কোন অবস্থায় রহিয়াছে। এই বরফ দ্রবীভূত হইয়া যাইলে মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে একটা নীল প্রান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রান্তর আবার ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায় ও মেরুপ্রদেশ তুষারশুভ্র হইয়া উঠে। যদি জল জমিয়া বরফ হয়, তাহা হইলেই এরূপ হওয়া সম্ভব ইহার উপর যদি কারবন্-ডাই-অক্সাইডের আধিক্যের অনুমান করা হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ রক্ষা করিবার ক্ষমতা অধিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে এবং ঋতুপরিবর্ত্তনের দ্বারা সূচিত অধিক তাপমাত্রাবও কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল যে অত্যন্ত বিরল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলের পরিমাণ অনেক অল্প। কাজেই ইহার মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ন্যায় বায়ুমণ্ডলকে কখনই আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না। এমন কি যাঁহারা স্থির-বিশ্বাস করেন যে মঙ্গলে জীব জন্তুর অস্তিত্ব সর্ব্বথা সম্ভব তাঁহারাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে যদি আমাদের কোন মানব হঠাৎ মঙ্গলে নীত হন তাহা হইলে বায়ু মণ্ডলের বিরলতার জন্যই তিনি কয়েক মিনিট পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু অনেকে বলেন যে মানব অভ্যাস বলে ক্রমশঃ অতি বিরল বায়ুমণ্ডলেও বসবাস করিতে পারে। অবশ্য একথা অনেকটা সত্য।

মঙ্গলে জলও তত অধিক নহে বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। স্পেক্ট্রস্কোপ দ্বারা আলোক বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় না যে মঙ্গল গ্রহ-নিঃসৃত আলোকরশ্মি জলীয়-বাষ্প ভেদ করিয়া আসিতেছে, এবং ক্যাম্পবেল, হুইটনিপর্ব্বতস্থিতমানমন্দিরে স্পেক্ট্রস্-কোপ ব্যবহার করিয়া দেখিযাছেন যে মঙ্গলে বিন্দুমাত্র জলের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না. কিন্তু লাওয়েল বলেন যে এই জলের অভাব হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী বর্ত্তমান আছে। লোহিত হরিদ্রাভ প্রদেশ (যাহা মরুভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে) পার হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে জলের ন্যায় অসংখ্য অস্পষ্ট রেখা সমূহ রহিয়াছে। সিয়াপ্যারেলি এই গুলি প্রথম আবিষ্কার করেন, তাহার মতে এই গুলি খাল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই রেখাগুলি বা যাহাদিগকে অধুনা খাল বলিয়া স্থির করা হইয়াছে তাহারা এত অল্পবিস্তৃত যে তাহাদিগের বর্ণ কিরূপ তাহা আদৌ বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহারা স্থানে স্থানে পরস্পরের সহিত কাটাকাটি করিয়াছে বা সংযুক্ত হইয়াছে। এবং সকলেই পূর্ব্বকথিত হরিৎ প্রদেশে মিলিত হইয়াছে। কাজেই তাহাদের বর্ণ, খুব সম্ভবতঃ, যে গভীর কৃষ্ণবর্ণ প্রদেশ রহিয়াছে তাহারই সমান এবং তাহার বর্ণের যে কারণ, এই খাল গুলিরও বর্ণের কারণও তাহাই। এই খাল সমূহকে লক্ষ্য করাই দুরূহ। এমন কি অনেক